

বাংলা সাহিত্য পত্রিকা

চতুর্দশ সংখ্যা

২০০৫



যুগ্ম সম্পাদক

মানস মজুমদার

বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

কলিকাতা ৭০০ ০৭৩



০০২ - ১১০৫৬৫১ - ১১-৩৮/৪৫৭/১২

বাংলা সাহিত্য পত্রিকা

চতুর্দশ সংখ্যা

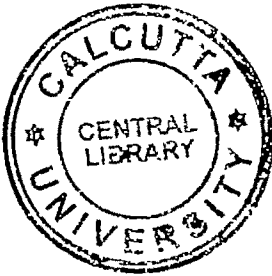
২০০৫



যুগ্ম সম্পাদক

মানস মজুমদার

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

Joint Editors :

Prof Manas Majumdar
Prof Bimal Kumar Mukhopadhyay

॥ সম্পাদক মণ্ডলী ॥

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

মানস মজুমদার

মণিলাল খান

বিশ্বনাথ রায়

হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

ছন্দা রায়

তরুণ মুখোপাধ্যায়

সনৎকুমার নস্কর

উর্মি রায়চৌধুরী

সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

G-145913

মূল্য : ১০০.০০

নিবেদন

এখন থেকে বাংলা সাহিত্য পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য সংখ্যাটি সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক মানস মজুমদার ও অধ্যাপক বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়। অধ্যাপক মজুমদার ১৯৯৫-এর নভেম্বর থেকে ১৯৯৭-এর অক্টোবর পর্যন্ত বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ১৯৯৭-এর নভেম্বর থেকে ১৯৯৯-এর অক্টোবর পর্যন্ত বিভাগীয় প্রধানের পদে বৃত্ত ছিলেন।

পত্রিকার প্রবন্ধগুলিতে যে সমস্ত মত ও মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে তার দায় ও দায়িত্ব লেখকদের। তাঁদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয় নি।

সম্পাদক মণ্ডলী

== সূচিপত্র ==

কবি টি. এস. এলিয়ট এবং কয়েকজন বাঙালি কবি —বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়	১
লোকসাহিত্য ও লোকশিক্ষা —মানস মজুমদার	১২
বাঙালির নিজস্ব সভ্যতার প্রাচীনত্ব —মণিলাল খান	২৩
রবীন্দ্রকাব্যে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য : সঙ্ক্যাসংগীত থেকে গীতালি —কিশ্বনাথ রায়	৪৫
হেমন্তর অরণ্যের এক পোস্টম্যান : শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার প্রথম পর্যায় —হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৩
জ্যোতির্ময়ীর গল্পে রাজপুতানার রাজপ্রাসাদ : অন্তরমহল : অন্তরমহল —ছন্দা রায়.	৯৯
বাল্মীকির কবিত্বলাভ এবং... —তরুণ মুখোপাধ্যায়	১১৪
রবীন্দ্রবীক্ষণে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য —সনৎকুমার নস্কর	১২৮
কবিতায় নারীচেতনাবাদ —উর্মি রায়চৌধুরী	১৫০
বাংলা উপন্যাস : বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ —সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬৫
অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় লোকচেতন্য ও লোকাভরণ —বিপ্লব চক্রবর্তী	১৭১
কালান্তরের পথে মেয়েরা —গোপা দত্তভৌমিক	১৯৫
শিল্প ও সাহিত্য —বীতশোক ভট্টাচার্য	২০৬
‘রক্তকরবী’র নন্দিনী : ঈশানীর আর্কেটাইপ —শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী	২১৫

‘অস্তর্জলী যাত্রা’-র ভাষা : নিজস্ব সঙ্কেতে সময়ের দাগরাজি

—চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত

২২৪

মঙ্গলকাব্যের চেনা মুখ অচেনা মানুষ

—স্মৃতিকণা চক্রবর্তী

২৩২

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্মারক বক্তৃতা : ২০০০

—হাসান আজিজুল হক

২৪২

দীনেশচন্দ্র সেন স্মারক বক্তৃতা ২০০৪

তুলনামূলক সাহিত্য

—অমিয় দেব

২৫০

বিভাগীয় পাঠচক্রে প্রদত্ত ভাষণ

গল্প পড়ার কিছু অসুবিধে ও বাংলায় একটি গল্প

—দেবেশ রায়

২৬০

বিভাগীয় পাঠচক্রে প্রদত্ত ভাষণ

‘নবশিখ’ প্রসঙ্গ: মধ্যযুগের কাব্য

—রাবেয়া মঈন

২৭০

কবি টি. এস. এলিয়ট এবং কয়েকজন বাঙালি কবি

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

১৩৪৮-এ ‘রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা’ শিরোনামের যে-প্রবন্ধটি লিখেছিলেন জীবনানন্দ সেখানে রবীন্দ্রনাথগী অথচ স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তকদের সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন ‘রবীন্দ্রনাথের কবিতার চর্চা আধুনিক বাঙালী কবির তেমন মন যোগাত না; অন্তত: যাঁরা আধুনিক বিশিষ্ট বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা এলিয়ট-এর সদর্থক বা নগুর্থক মনন ও বিচিত্রার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। এলিয়টের আরও একটি বিশিষ্ট কবিতার নামও উল্লেখ করেছেন জীবনানন্দ—‘আধুনিকদের একটা বিশিষ্ট পক্ষ এবং অস্বাভাবিকভাবে সকলেই মনে করল বর্তমান পৃথিবীর ‘ওয়েস্টল্যান্ড’-এর সুর এলিয়টের মতো কে আর ব্যক্ত করতে পেরেছেন।’ জীবনানন্দের এই প্রবন্ধ লেখার সময় এলিয়ট-এর ‘Four Quartets’ প্রকাশ পেতে বিলম্ব ছিল আরও চারটে বছর। কিন্তু জীবনানন্দের স্বীকারোক্তিতে এটা স্পষ্ট যে জীবনানন্দের সময়কার তরুণ প্রজন্মের কবিরা যে সব প্রতীতি কবিদের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন এলিয়ট ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বিষ্ণু দে ‘এলিঅট প্রসঙ্গে’ (১৯৬৫) প্রবন্ধে জানানেন ‘কলকাতার প্রথম প্রকাশ্য আলোচনা বোধ হয় সেই ছাত্রসভার বৈঠকে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধে, যা পরে মার্জিত হলো কাব্যের মুক্তি নামে।’ সুধীন্দ্রনাথের যে-প্রবন্ধটির দিকে বিষ্ণু দে ইঙ্গিত করছেন সেই প্রবন্ধটি ১৯২৮-২৯ নাগাদ যুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত একটি সভায় খশড়া আকারে পঠিত হয়েছিল। সেই সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন সরল শৈলীর সবুজপত্রের লেখক অভুলচন্দ্র গুপ্ত। সামান্য কিছু পরে ১৩৩৮-এর শ্রাবণে (১৯৩১ অগাস্ট) ‘পরিচয়’ পত্রিকার ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় ‘কাব্যের মুক্তি’ আত্মপ্রকাশ করে। সেই প্রবন্ধটি শেষ করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ‘তীর্থযাত্রী’ নামের কবিতাটি দিয়ে যা কিনা রবীন্দ্রনাথ কৃত টি. এস. এলিয়টের ‘The Journey of the Magi’ নামের প্রসিদ্ধ কবিতাটির অনুবাদ। রবীন্দ্রনাথবলীতে দেখছি ‘তীর্থযাত্রী’র নীচের তারিখটা হল ১৩৩৯ এর মাঘ অর্থাৎ ১৯৩২-এর একেবারে গোড়ার দিকে। তাহ’লে সুধীন্দ্রনাথের ‘কাব্যের মুক্তি’র শেষে প্রবন্ধটি যুক্ত হল কীভাবে? যাইহোক এলিয়টের কবিতার বিশেষ ভঙ্গ না হলেও ‘The Journey of the Magi’-এর এই অনুবাদ কেন করলেন কবি? ১৩৩৯-এর বৈশাখে (১৯৩২ এপ্রিল) রবীন্দ্রনাথ ‘সাহিত্যের পথে’ গ্রন্থের অন্তর্গত ‘আধুনিক কাব্য’ নামে যে প্রবন্ধটি ‘পরিচয়’ পত্রিকার ১৩৩৯-এর বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় সেখানে এলিয়টের কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করছেন কখনও মূল উদ্ধৃত করে কখনো বা অনুবাদ করে নিয়ে। যেমন পাচ্ছি ‘His soul stretched tight across the skies / That fade behind a city block / or trampled by insistent feet / At four and five and six o’clock’.

তেমনি পাচ্ছি :

এ-ঘরে ও-ঘরে যাবার রাস্তায় সিদ্ধ মাংসের গন্ধ,

তাই নিয়ে শীতের সন্ধ্যা জমে এল।

এখন ছটা—

খোঁয়াটে দিন, পোড়া বাতি, শেষ অংশে ঠেকল।

যার মূল ছিল :

The Winter evening settles down
with small of steaks in passageways.
Six O’clock
The burnt-out ends of smoky days.

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ যে অন্য এক সৃষ্টি হওয়ার দিকে উন্মুখ, শুধুই অনুবাদ নয়, তার প্রমাণ চতুর্থ পঙক্তিটি। এর ছবিতেও পোড়া বাতি কথাটার আভাস আছে বলে আমাদের মনে হয় নি। বরং ‘পোড়া সিগারেট’-এর একটা অপ্রীতিকর ঝাঁঝালো গন্ধের কথা মনে হয়েছিল। এলিয়টের ‘Preludes’-এর আগে এজরা পাউন্ডের ‘Aesthetics’ কবিতাটিকে স্মরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং পৃথক মেরুর বস্তু বলে চিহ্নিত করেছিলেন রবার্ট ব্রিজসের কবিতার কথা। পাউন্ড, এলিয়ট এবং এমি লোয়েল-এর কবিতা নিষ্কাশন করে রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার যে-তত্ত্ব সন্দর্ভের সন্ধান পেলেন তা হল :

আধুনিকতার যদি কোনো তত্ত্ব থাকে, যদি সেই তত্ত্বকে নৈর্ব্যক্তিক আখ্যা দেওয়া যায়, তবে বলতেই হবে, বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি এও আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিন্তাবিকার। এও একটা মোহ, এর মধ্যের শাস্ত নিরাসক্ত চিন্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই। অনেকে মনে করেন, এই উগ্রতা, এই কালাপাহাড়ি তাল-চৌকাই আধুনিকতা। আমি তা মনে করি নে।

এলিয়ট তথা আধুনিক পশ্চিমের কবিদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শগত বিরাগ যে কতটা গভীর ও স্পষ্ট তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। অথচ এটাও তো সত্য যে, এই প্রবন্ধ লেখার ন’মাস পরেই রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেন এলিয়টের ‘The Journey of the Magi’ কবিতাটি। কোনো কবির কবিতা যিনি অনুবাদ করেন তিনি নিশ্চেষ্ট চিন্তে কি কাজটি করতে পারেন, যদি তা করে থাকেন তাহলে পরিচয় গোষ্ঠীর কাছ থেকে কী প্রত্যাশা ছিল বৃদ্ধ কবির? হতেও তো পারে এই স্বল্প অবকাশে কোনো স্নেহাস্পদ অনুজ কবি রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এলিয়টের দিকে। তবে রবীন্দ্রনাথের গভীর কোনো অনুরাগ ছিল না এলিয়টের প্রতি এবং আমরা এও জানি ‘The Hollow Men’-এর আদলে ‘ফাঁপা মানুষ’ কথাটা ব্যবহার করেও বদল্যার-অনুরাগী বুদ্ধদেব বসু ভালোবাসতে পারেননি এলিয়টকে। ‘চাই আনন্দের সাহিত্য’ প্রবন্ধটি আমাদের এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে ভাবতে পারি এখানে।

সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে এবং জীবনানন্দকে এলিয়ট যতটা প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন মনে হয় না বাংলাদেশের অন্য কোনো কবিকে তা করতে পেরেছেন। এঁদের মধ্যে আবার বিশেষ নামটি বিষ্ণু দে যিনি কিনা এলিয়টের দ্বারা প্রভাবিত যেমন হয়েছেন নন্দন ভাবনায়, তেমনি তাঁর মননশীল প্রবন্ধে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করেছেন এলিয়টকে। সুধীন্দ্রনাথ ‘কাব্যের মুক্তি’ প্রবন্ধে এলিয়টের ‘The Waste Land’ কবিতাটি থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে আপন সিদ্ধান্ত প্রমাণ করেছেন এবং এলিয়ট যে কবিকে ‘ক্যাটালিটিক এজেন্ট’ বলেছেন সে কথা উল্লেখ করে নিজের ভাষায় বলেছেন ‘কবি ঘটকের মতো’। ‘ঘটক’ শব্দটি সুধীন্দ্রনাথ দেশি অর্থে ব্যবহার করেছেন ঠিকই, কিন্তু ‘ক্যাটালিটিক এজেন্ট’ কে তো বাঙলায় বলে ‘অনুঘটক’ অর্থাৎ বলতে চাইছি যে ‘ঘটক’ শব্দটা ব্যবহারের পিছনে এলিয়টের কথাটাও ভোলেন নি সুধীন্দ্রনাথ। ‘ঐতিহ্য ও টি এস. এলিয়ট’ প্রবন্ধের প্রকাশ ১৯৩৪-এ। সুধীন্দ্রনাথ এলিয়টের বার্নট্ নটন-এর কিছুটা অনুবাদ করেছিলেন, বিষ্ণু দেও মত বেশ কয়েকটি কবিতার অনুবাদ তিনি করেন নি। বিষ্ণু দেও ‘The Waste Land’-এর অনুবাদ করেন নি। ঐ কবিতার অনুবাদ করেছিলেন জগন্নাথ চক্রবর্তী এবং পরে বার্নিক রায়। প্রসিদ্ধ দুই কবির কি এলিয়ট- অনুবাদে সাহস হয় নি? একটা কারণ হতে পারে ‘আমাদের কালে যে-ইংরাজ কবির প্রভাব অতিবিস্তৃত, তিনি—অর্থাৎ টি এস. এলিয়ট—কোনও দিন দুরাহতার ভয়ে দার্শনিক মনোভাব ঝেড়ে ফেলেন নি’ (সুধীন্দ্রনাথ)। দার্শনিক মনোভাব থেকে লেখা কবিতা স্বভাবতঃই তত্ত্বের গভীরতার গুণে দুরাহ হয়ে ওঠে এবং এই দুরাহ কবিতার

অনুবাদ শুধু কষ্টসাধ্য নয়, প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, হয়ত এই কারণেই ‘বার্ণট নর্টন’ অনুবাদ ছাড়া অন্য কোনো কবিতার অনুবাদ করেন নি সুধীন্দ্রনাথ এবং বিষ্ণু দেও কয়েকটির মাত্র অনুবাদ করেছিলেন (The Love song of Alfred J. Prufrock, Gerontion)। সুধীন্দ্রনাথ যখন ‘ঐতিহ্য ও টি এস. এলিয়ট’ প্রবন্ধটি লেখেন (১৩৪১ শ্রাবণ) তখনও এলিয়টের ‘Murder in the cathedral’ প্রকাশিত হয় নি। সুতরাং এলিয়টের যে-মূল্যায়ন বিষ্ণু দে করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ তা করেন নি। এলিয়টকে নিয়ে বিষ্ণু দে’র লেখা প্রবন্ধ তিনটি “টি এস. এলিয়টের মহাপ্রস্থান” [‘রুচি ও প্রগতি’-র অন্তর্গত], “টমাস স্টার্নস এলিয়ট” [‘এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য’-এর অন্তর্গত] এবং “এলিয়ট প্রসঙ্গে” (‘জনসাধারণের রুচি’ গ্রন্থে)। শেষোক্ত প্রবন্ধটির শেষ বাক্য : ‘এলিঅট সাহেবের নির্দেশে তাঁর মরদেহ দাহের পরে ভস্ম সমাহিত হবে তাঁর ইংরেজ পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস সমারসেটের ঈষ্ট কোঁকর গ্রামে’। অর্থাৎ সুধীন্দ্রনাথ চিনতে- প্রথম পর্বের এলিয়ট-কে কিন্তু বিষ্ণু দে সমগ্র এলিয়ট-কে; এবং আমরা দেখব এলিয়ট সম্পর্কে এক-আধটু মন্তব্য করলেও জীবনানন্দ কতটা পরিমাণে ছিলেন এলিয়টের কাছাকাছি। এলিয়ট সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের অসাধারণ কয়েকটি মন্তব্য শুধু স্মরণীয় নয়, একেবারে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। যেমন :

- (ক) এলিয়ট ফ্রেড-পছী মনোবিদদের বিদ্রূপবাণে বিধেছেন; এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে অবচেতনত্বের সমীকরণে তাঁর সমর্থন নেই। তাঁর বিবেচনায় এই ঐতিহ্য ইতিহাসবোধ ও ধর্মানুরক্তির যোগফল। তিনি ভাবেন যে ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না ঘটা পর্যন্ত অনুকরণ আর উদ্ভাবনের মধ্যে কোনও তফাৎ থাকে না।
- (খ) অমনোযোগী পাঠকের অভিশাপ কুড়িয়েও এলিয়ট এ-প্রত্যাশা ছাড়তে পারেন না যে বুদ্ধির দরজায় খিল লাগালেও, তাঁর কবিতার আবেদন রসিকের তদ্রূপ চিন্তে পৌঁছাবে উপলব্ধির সুদৃষ্টি বেয়ে।
- (গ) ধর্ম শব্দের অর্থে এলিয়ট মুখ্যত ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মতামতকে বুঝলেও উপনিষদ, বৌদ্ধধর্ম, কন্ফিউসিয়াস-এর উপদেশাবলী, মিসরী পূজাপদ্ধতি, এমনকি প্রাগৈতিহাসিক আচার-ব্যবহার থেকে তিনি একই মহাবাণী সংগ্রহ করেছেন।
- (ঘ) কাব্য জীবনের সমালোচনা—আর্নল্ড-এর বিখ্যাত মন্তব্যের প্রতিবাদে এলিয়ট যদিও আহ্বাহীন, তবু তাঁর গদ্যে-পদ্যে যতখানি জিজ্ঞাসার সন্ধান পেয়েছি, তা আধুনিককালে একান্ত দুর্লভ। হয়তো এই জন্যে বর্তমান ইংরাজী সাহিত্যে তাঁর প্রভাব এত পরিব্যাপ্ত, হয়তো এই জন্যে তিনি ভবিষ্যতের পূজ্য।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় এলিয়টের সুস্পষ্ট প্রভাব তেমন চোখে পড়ে না এবং তিনি নিজেই মালার্মে পছী বলে ঘোষণাও করেছিলেন। তবু এলিয়টের Gerontion পাঠের পর সুধীন্দ্রনাথের ‘যযাতি’ পড়লে মনে হয় Gerontion-এর মত যযাতিও যৌবন ও জীবনের সারাংশের হারিয়ে দুটোকেই খোঁজে। মৃত্যুই এই জীবনের সীমান্ত প্রহরী। অনন্ত আকাশের মতো চতুর্দিকে তার বিস্তার। সুধীন্দ্রনাথ এই সত্যকে বোঝালেন একালের জীবন থেকে সংগৃহীত চিত্রের আশ্রয়ে। প্রাচীর, পরিখা, রক্ষী, গুপ্তচর, ভগ্নসেতু, ধ্বংসাবশেষ, অদৃশ্য শকুন, নৈশ হানা—দুই বিশ্বযুদ্ধের সাক্ষীর মর্মের গভীর থেকে উথিত এক একটি চিত্র; স্থির চিত্র নয়, চলচ্চিত্র। মরণশীল মানব-সন্তান সাধনা করেছিল অমৃতের। কিন্তু মৈত্রেরী যতই প্রার্থনা করুন তথাপি কোনো দেহী কি জেনেছেন কোনোদিন অমৃতের স্বরূপ? একটি মাত্র শব্দ ‘অমৃত’ কবিতায় একে দিয়েছে ভারতীয় সংস্কার, জাগাল Stock response, বুঝিয়ে দিল চিরযৌবন দাতা যে ‘অমৃত’ এবং যৌবন হারিয়েছে যযাতি এই দুয়ের, সম্পর্কটা কোথায়? নতুবা চীন থেকে পেরু যে-দৃশ্যের প্রলম্বিত ছায়া তাতো এলিয়টের ভাষায়

Unreal city-রই আভাস আনে। আন্তর্জাতিক সেই রূপ যা ‘উষর ধূলিতে নিষ্পিষ্ট’ মনে করিয়ে দেয় ‘Here is no water but only rock’. অথবা ‘fear in a handful of dust’. সুধীন্দ্রনাথ আবার ফিরে আসেন প্রতিদৈনিক ভাষায়—‘অরণ্যে রোদন’। ‘মগ্ন শৈলে’ ‘মাতাল নৌকা’র বানচাল হওয়া এবং ‘অপ্রাপ্তসংশবের’ অস্থিসার রূপ লাভ কিছুটা কি শেক্সপীয়রের ‘The Tempest’ নাটকখানি স্মরণ করায়? না কি স্মরণে আনে এলিয়টের ‘The Waste Land’ এর চতুর্থ অংশটি (Death by water) যেখানে ফ্রেবাস নামক ফিনিসীয় নাবিক যে ছিল ‘Handsome and tall’, ডুবে গিয়েছিল জলে এবং ‘A current under sea / Picked his bones in whispers. As he rose and fell / He passed the stages of his age and youth / Entering the whirl pool?’ এলিয়ট আমাদের একালের জীবনকে সেকালের মিথের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন যেভাবে Heap of broken images-এর দ্বারা, সুধীন্দ্রনাথও একই কাজ করেছেন তাঁর ‘যযাতি’ কবিতায়। আসলে পুরাণ কাহিনীকে একালের জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার যে-প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছিলেন এলিয়ট তার একটা গভীর প্রভাব সুধীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সমকালীনদের ওপর তো ছিলই; এমন কি পৌরাণিক কাহিনীবৃত্তের যে-ছায়া একালের কবিদের মধ্যে দেখি তার কিছুটায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যেমন স্বীকার্য, তেমনি কিছুটায় এলিয়টেরও।

এলিয়ট-অনুরাগী, এলিয়ট-প্রভাবিত বলে যে কবিকে আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে স্বীকার করি তিনি বিষ্ণু দে। ‘এলিয়টের মহাপ্রস্থান’ প্রকাশিত হয় ১৩৫১-এর কার্তিকের ‘পরিচয়’ পত্রিকায়। প্রবন্ধটির শুরুতে রয়েছে কয়েকটি পঙক্তি যার উৎস ‘The Dry Salvages’। এই প্রবন্ধে এলিয়ট সম্পর্কে বিষ্ণু দে-র বক্তব্য হল :

- (ক) ‘এলিঅট হচ্ছেন আত্মসচেতনতারই মহাকবি। তাঁর কাব্যের মূল বিষয়ই হচ্ছে আত্মসচেতন মানস, তার নাট্যরূপ ভিন্ন কবিতায় ভিন্ন হলেও।’
- (খ) পুরাণ যে ঐতিহ্য-জ্ঞানার্জনে তৈরি করা যায় না বা পুরাণ যে কখনো ব্যক্তিগত সৃষ্টি হয় না, এ-ভুল প্রাচীন রোমান্টিক কবিরা পণ্য-বিপ্লবের পরে তাঁদের উদ্ভ্রান্ত মানুষের মর্যাদায় অন্বেষণ করলেও, এলিঅট নিশ্চয় তা করেন নি।
- (গ) এলিঅটের যে ঐ ব্যক্তিনিরপেক্ষ শাস্ত্র দৃষ্টির উপরে লোভ আছে, সেটা স্পষ্ট।
- (ঘ) তাঁর সুর পণ্যবিপ্লবের দ্বিধাদীর্ঘ বেদনার—What man has made of man.
- (ঙ) গীতা এলিঅটকে তাঁর কাব্যের চমৎকার রসদ জুগিয়েছে।

‘এলিয়ট প্রসঙ্গে’ নামাঙ্কিত প্রবন্ধটি চারভাগে বিভক্ত। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৫-তে এলিয়টের মৃত্যু উপলক্ষে। চারভাগে বিভক্ত এই প্রবন্ধের প্রথম অংশটি এলিয়টের ‘The Rock’-এর এবং ‘Murder in the cathedral’-এর সমালোচনা। সমালোচনাটি ১৩৪২-এ ‘পরিচয়’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় অংশটি ‘এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য’ গ্রন্থের অন্তর্গত এবং প্রকাশিত হয় ‘টমাস স্টার্নস্ এলিঅট’ নামে। তৃতীয় অংশটি ১৩৬৩-র শ্রাবণের ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি এলিঅটের ‘The Three voices of Poetry’ এবং ‘The Literature of Politics’ গ্রন্থদ্বয়ের সমালোচনা। চতুর্থ অংশটির নাম ছিল ‘শেষ কথা’। অর্থাৎ প্রথম অংশটি এলিয়ট সম্পর্কে লেখা বিষ্ণু দে-র প্রথম প্রবন্ধ। দ্বিতীয় প্রবন্ধ হল ‘এলিঅটের মহাপ্রস্থান’ এবং ১৩৬৩ তে লেখা গ্রন্থদ্বয়ের সমালোচনা হল এলিঅট সম্পর্কে তৃতীয় প্রবন্ধ। চতুর্থ অংশটি এলিঅট সম্পর্কে লেখা বিষ্ণু দে-র শেষ প্রবন্ধ। ‘The Rock’ এবং ‘Murder in the cathedral’-এর সমালোচনায় বিষ্ণু দে জানিয়েছিলেন, ‘এলিঅটের কাব্যপ্রতিভার লক্ষণ অবশ্য এই দুই বইয়ে প্রচুর। কোরাসগুলি তাঁর শিল্পকৌশল ও গভীর চিন্তার পরিচয়। সাধারণ মানুষের মন-কে তিনি নাটকে তুলে ধরেছেন এই

অনামিক কোরাসের মেয়েপুরুষের মধ্যে দিয়ে এবং রাজা, সামন্তরা আর বেকেরের লড়াই তাই পেয়ে গেছে আরেক নাটকীয় বাস্তবানুগ মর্যাদা। নিঃসন্দেহে এই আলোচনায় বিষ্ণু দে-র ব্যক্তিগত নান্দনিকবোধের প্রকাশ পায়, কিন্তু এলিঅট সম্পর্কে তাঁর প্রীতি-পক্ষপাতটুকু অস্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয় অংশটি ‘টমাস স্টার্নস্ এলিঅট’ নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এই অংশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যটি হল ‘এলিঅটের কাছে বাংলা লেখকদের ঋণ গ্রহণ মুখ্যত এই আত্মসচেতনতার ক্ষেত্রে। আত্মসচেতনতা হয়ে উঠল কবিমার্গে প্রত্যক্ষ সম্মুখসম্পর্ক। ঋণের অন্যান্য দিক এরই জ্ঞাতিসম্পর্কীয়, যথা, বিশেষ কবিতা ভালো কাব্য হয় তখনই যখন যা বিশেষ একটি ভালো কবিতাও বটে’। এলিঅটকে তাঁর ষাট বছরের জন্মদিনে ‘ভিনগাঁয়ের ভিন্নধর্মী খুড়ো-মেসোর মতো’ বলে সাবালকের শ্রদ্ধানিবেদন মুহূর্তে এলিঅট সম্পর্কে যা বললেন তা এক কথায় মজা করে বলা যায় ‘এলিঅটের সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন’ (Cultural Globalization of T. S. Elliot-পণ্ডিতেরা মাপ করবেন)। সবটাই তার উদ্ধারযোগ্য বিবেচনা করি—

‘এলিঅটের সব কবিতার অনুবাদ ঘটনে বাধা থাকলেও তাঁর রীতি আমাদের সহায়। এমন কি তাঁর কবিতার অঙ্গবিন্যাস জগৎ ভিন্ন হলেও। কাব্যের মুক্তির চেতনায় ফল হয়েছে এই। প্রতীকী রীতির নিহিত স্বাধীনতার বশেই রাজর্ষিদের যাত্রার মতো ক্রিস্টিয়ান কবিতা গান্ধীজীর দ্বিতীয় আন্দোলনের স্মৃতিতে অনুবাদসম্ভাব্যতা পায়, কোরিওলান পান ইনটেরিম সরকারের কালে, গেরোনশন হঠাৎ এসে যায় অবলম্বন অনুবাদের মিশে যাওয়া গোষ্ঠীলিতে যখন কলকাতার উন্মাদ হত্যার বিরুদ্ধে গান্ধীজী অভিযান করছেন অনশনে এবং ছেলেমেয়েরা প্রাণ দিচ্ছে শোভাযাত্রায়। তা ছাড়া, এই প্রভাব বা তুল্যমানসের প্রসার আজও চলছে। আজই হয়তো সে প্রসারের সীমা স্পষ্ট—বুদ্ধদেব বসুর মতো লব্ধ প্রতিষ্ঠ জনপ্রিয় লেখক বন্ধুরাও আজকাল বলছেন পরিশ্রমী ও আত্মসচেতন কাব্যসাধনার কথা। এবং ওদিকে ইতিমধ্যে কমলবন পরিক্রান্ত আর গোলাপের রহস্য আমরা নিঃশেষ করে ফেলেছি। আর প্রতীক্ষা করছি তীব্র স্বৈরাঙ্ক প্রত্যক্ষবাদের’।

‘শেষ কথা’ নামে লেখা সর্বশেষ অংশটিতে প্রয়াত এলিয়টের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিষ্ণু দে লিখলেন, ‘কীর্তিমান ব্যক্তির মৃত্যুতে নিশ্চয়ই অভাবগ্রস্ত লাগে, কিন্তু এলিঅটের মৃত্যু-সংবাদ এল অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় সভ্যভাব্য স্নেহশীল কোনো আপন মানুষের বিদায়ের মতো, যার সাহায্যে আমাদের অনেকেই প্রথম বয়ঃপ্রাপ্তির সংবেদন, জিজ্ঞাসা, সাহিত্য চিন্তা পেয়েছিল এবং আশাকরি পেতে থাকবে পরিণতির দিশা’। এই প্রসঙ্গেই বলে নিতে ইচ্ছে করছে এলিঅটের ‘The Waste Land’ নিয়ে সমর সেন ও সরোজ দত্তে সেই লড়াই এর কথা। যে-অবক্ষয়ের কথা এই দীর্ঘ কবিতায় এলিঅট লিখেছিলেন সমর সেন বলেন তাতো একটা কালের ছবি। কালের অবক্ষয়ের ছবি থাকলেই কোনো সাহিত্যকে অবক্ষয়িত সাহিত্য বলা সংগত নয়। সরোজ দত্তের কুলিশ কঠোর আক্রমণ সমর সেন-কে দিয়ে আর এক কিস্তি লেখা লিখিয়ে নিয়েছিল। সমালোচক বিষ্ণু দে-র এলিয়ট-প্রীতির স্বরূপ দেখা গেল তাঁর প্রবন্ধে। কিন্তু কবি বিষ্ণু দে কীভাবে এবং কতটা এলিয়ট-কে আত্মীকৃত করেছিলেন তার স্বরূপ লক্ষ্য করা যাক।

‘নাম রেখেছি কোমল গান্ধার’ কাব্যের একটি বিশিষ্ট কবিতার শিরোনাম ‘তিনটি ছোট কবিতা’। তার মধ্যে একটির নামই হল ‘লর্ড এলিঅট অফ দি ওয়েস্টল্যান্ড’। একমাত্র এই কবিতাতেই স্পষ্টতঃ ওয়েস্টল্যান্ডের উল্লেখ আছে :

পোড়ো জমি চবে শেষে স্বস্তি জমে লাট-কি-বেলাট,
সে সম্রাস তবে ছদ্মবেশ।
পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের অস্ত্রিমে কি লর্ড এলিয়ট

ওয়েস্টল্যান্ডে চষে নেন আপন স্বদেশ?

তাই তো বলেছে শাস্ত্রে সদা আছে ভয়

বিড়াল তপস্বী হোক, নয় মহাশয়।

তবে অন্যত্র ওয়েস্টল্যান্ডের অনুসৃতি না থাকলেও স্মৃতি আছে বহু জায়গা জুড়ে। 'The Waste Land'-এর 'The Fire Sermon' অংশে যিনি মজাখালে মাছ ধরেছিলেন, পিছনে তাঁর ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপট, হাড়ের খটখট শব্দ এবং কাদা-মাখা পেট টেনে টেনে চলছিল একটি ইঁদুর। অনুরূপ একটি ছবি মেলে 'উর্বশী ও আর্টেমিস' কাব্যের "সন্ধ্যা" কবিতায় :

পশ্চাতে রয়েছে প'ড়ে পাথরের একখানি হাড়,

শিরে-শিরে রিনিবিনি রক্তমাখা স্পর্শ তার পায়।

পাথরের কী যে ভাষা। রক্তমাখা হিম হয়ে যায়।

অজ্ঞাত ধমনী কার স্পর্শ করে আমাকে নিঃসাড়।

এলিয়টের 'The Waste Land'-এর 'The Burial of the Dead' অংশে পাওয়া যায় 'A crowd flowed over London Bridge, so many / I had not thought death had undone so many.'

আর "সন্ধ্যা" কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে বিষ্ণু দে লিখছেন :

অন্য দিকে চলে যায় অস্তহীন ঘন অরণ্যানী,

মানুষেরও দেখিনি তো অস্তহীন এত ঘন ভিড়।

মানুষের ভিড় কছু নয় এত অজ্ঞাত নিবিড়।

'অনিষ্ট' (১৯৪৭-৪৯) কাব্যগ্রন্থের "জল দাও" কবিতাটি বার বার 'দি ওয়েস্টল্যান্ড'-কে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর কবি প্রতীক্ষা করেছিলেন জলের। চতুর্দিকের শুষ্ক, দক্ষ পরিবেশে একান্ত প্রতীক্ষা ছিল জলের। কিন্তু চতুর্দিকে শুধু পাথর, পাথর আর পাথর। 'Dry stones', 'stony rubbish', 'Dull canal', 'Brown fog' এবং 'Sand Sand and Sand' অথবা Oil, Tar গোটা পরিবেশের মধ্যে যেখানে যা কিছু সুন্দর ও সরস ছিল তাকে ক্রিম করেছে। এলিয়ট তাঁর দীর্ঘ কবিতার শেষে বর্ষণ-সিক্ত মাটির মিষ্টি গন্ধ প্রাণ-ভ'রে নিয়েছেন। বিষ্ণু দে'র 'জল দাও' কবিতার বহু অংশে পোড়ো জমির স্মৃতি অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে আছে : ক) 'কোথায় শ্রাবণ-ধারা আঘাটের গান,' খ) 'গ্রীষ্মের সন্ধান', গ) 'কাজের বিরস দিন করে দেবে বৈশাখের মেঘ/রচনার দিন', ঘ) 'দিগন্তে দিগন্তে ঝোঁজা তৃষ্ণার্ত নিখিল', ঙ) 'স্নায়ুর ঘাটিতে/অল্লান পিপাসা আজো', চ) 'দক্ষ দিনের টলোমলো', ছ) 'বিরিট মৃত্যুর ডাঙা, এক ফোঁটা জল নেই প্রাণ এক ছিটে', জ) 'এক ফোঁটা জলকণা নেই চোখ/এমন কি চোখ অশ্রুবাষ্পহারা'। 'The Waste Land'-এর 'Unreal City', 'rat' এবং 'bats' ভাষান্তরে আছে বিষ্ণু দে'র বহু কবিতায় যেমন : ক) 'অগণন ভিড়াক্রান্ত এ শহর, হে শহরে স্বপ্ন ভারাতুর', খ) 'চাষীরা ফিরছে ঘরে, শূন্য খেতে, খামারে ইঁদুর', গ) 'পাহাড়ের দিকে ওড়ে শব্দময় অদৃশ্য বাদুড়' (সাতভাই চম্পা : মফঃস্বলে)।

এরকমই বেশ কিছু পঙক্তি চোখে পড়ে 'স্মৃতি সস্তা ভবিষ্যৎ'-এ—'এখানে সভ্যতা নেই, হৃদয় শুকানো দিঘি,/বুদ্ধি মজা খাল, চোখ-কান সব বোধ চোরাইমালের চেয়ে বাসি,/এখানে হয়তো নেই, আপামর কোনোই নরক'।

উত্তমর্গ এলিয়ট বিষ্ণু দে'র হাতে তুলে দিয়েছেন 'মিথ' ব্যবহারের আধুনিক কৌশল। 'সন্দীপের চর' কাব্যগ্রন্থের 'চৈতে-বৈশাখে' কবিতায় বিষ্ণু দে যেন এলিয়টের মতই প্রাচীন প্রসঙ্গের মালা

গেঁথে দিয়েছেন। অংশবিশেষ উদ্ধার করতে হয় প্রলোভন সংবরণ করে : ‘নৃশংস নিগড়ে বাঁধা বৃদ্ধা মাতা বসুন্ধরা/ঝলক সজ্জল হাস্যে।/স্বচ্ছ স্থিত শান্তি জল ধরে/ঝরতো যেমন ধারা বাষ্মীকির যুগে ক্রৌঞ্চ মিথুনের স্বরে/বড়ু চতুর্দাসের প্রাপ্তগে/ঝরতো যেমন বৃষ্টি যশোদার চোখে শিশুগোপালের গালে,/ঝরতো যেমন বৃষ্টি পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে/...কিংবা যেন বঁধুয়ার হাসি/আমার অভিনা দিয়ে যবে ভিজে যায়।’ বাষ্মীকির যুগের ক্রৌঞ্চ মিথুন, বড়ু চতুর্দাসের প্রাপ্তগে শিশু গোপালের জন্য যশোদার চোখের জল, লক্ষ লক্ষ মানস বলাক-অনুষঙ্গক্রমে কবির স্মরণে এসে দেশ ও কালের পার্থক্যের বেড়া ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে। সব কাল মিলে মিশে হয়ে গিয়েছে একটি কাল। কবে কোথায় বাষ্মীকি লিখেছেন ক্রৌঞ্চমিথুনের যন্ত্রণা, আর রবীন্দ্রনাথ লিখছেন সারিবদ্ধ বলাকার অভিসারের কথা। সবকালের নদী এক মহাকালের সমুদ্রে গোত্র পরিচয় হারিয়ে বসে।

জীবনানন্দের পাঠকেরা জীবনানন্দকে পশ্চিমের যে-কবির সঙ্গে উপমিত করতে ভালোবাসেন তিনি ইয়েট্‌স্‌। কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাইরের পরিগ্রহণের পরিমাণ কম হলেও আন্তরিকভাবে এলিয়টের কবিতাকে বুঝেছিলেন জীবনানন্দ অত্যন্ত গভীরভাবে। কেন যে তরুণেরা এলিয়টকে নিয়েছিলেন আপন করে তার কারণ বিষ্ণু দে ব্যাখ্যা করছেন তাঁর প্রবন্ধে এবং প্রবন্ধের সেই সব পঙক্তিগুলি নিঃসন্দেহে স্মরণীয়। কিন্তু ‘The Waste Land’, ‘The Hollow Men’ এবং ‘Four Quartets’ জীবনানন্দের অন্তরের বিশ্বাসের শিকড় ধরে টান দিয়েছিল। ‘The Waste Land’-এ প্রবেশ-মুখে সাইবিলের যে-উপাখ্যানের দিকে ইঙ্গিত আছে তার মর্মার্থ তোলা যায় না। যদিও ওয়েস্টল্যান্ডের কন্টকাক্রান্ত জীবনের অবসানে আছে এক দীর্ঘ যাত্রার কথা এবং সবশেষে বেদনাক্লান্ত শান্তির মন্ত্র, তবু যে-যাত্রনা মেরি-র এবং টেমস-কন্যাদের, যে-প্রবঞ্চনা মাদাম সোসোসট্রিসের, যে-উৎকণ্ঠা মহিলা টাইপিষ্টের, পুরুষের লাগসার কাছে কন্যাকে সমর্পণে যে-ঘৃণ্য অবমাননা মাতৃহের; সে সর্বের চেয়ে অনেক অনেক ভালো নয় কি মৃত্যু? সাইবিলের উক্তি স্মরণে রেখে যদি জীবনানন্দের দীর্ঘ কবিতা ‘জীবন’-এর কিছু পঙক্তি লক্ষ্য করি, তাহলে এলিয়টের ‘The Waste Land’-এর বেদনার বীজ এখানেও দেখব। মেরি অথবা হায়াসিঙ্ঘ গার্ল অথবা টেমসের তিনকন্যা কি বলতে পারত না: ‘জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ!/মরণ সে-ভালো এই অন্ধকার সমুদ্রের পাশে?’ ইয়েট্‌স বা এলিয়ট যে-কালে জন্মেছিলেন বা অবস্থান করছিলেন তখন সুস্থ রোমান্টিকতার বিলাসভূমি কোথায়? সন্তা-বিভাজনের বিক্ষত এই সময়ে খণ্ডিত হওয়াই তো নিয়তির নির্ধারণ। দুই দেহ, এক সন্তা-সহজ সংজ্ঞায় এইই তো প্রেমের সারমর্ম। কিন্তু এক সন্তাই যে-কালে নানাখণ্ডে বিভক্ত, তখন প্রেমের ‘সাধন বেগ’ ও সহজরূপ তো অপমানিত হবেই প্রসাধনকলার কাছে। যে-কবি লেখেন ‘This is the dead land/This is the cactus land’, এবং ‘Here we go round the prickly pear’ সেই তিনিই শেষকালে লেখেন ‘This is the way the world ends/This is the way the world ends/This is the way the way the world ends/Not with a bang but a whimper!’ এক অস্বুট গোষ্ঠানিতে দুনিয়ার শেষ যিনি ভাবতে পেরেছেন তিনি রোমান্টিক নন, তিনি তাঁর কালের সন্তান। তবু তিনিও আগামী প্রত্যাশা করেন। কাল-সচেতন এবং ইহ-সচেতন কবি বলেই জীবনানন্দও লেখেন, যদিও ‘অন্ধকার অধীর বাতাসে গেছে ভ’রে’ এবং পৃথিবীর বুকে যদিও রোজ লোগে থাকে আশা-হতাশা, তবু শেষ পর্যন্ত ‘মৃত্যু’ নয়, ‘মড়ার কবর ছেড়ে পৃথিবীর দিকে ছুটে গেল মন’। গোটা কবিতায় ‘মৃত্যু’ ‘মরণ’ শব্দ দুটো উচ্চারিত হয়েছে বহুবার। তবু কবিতার শিরোনাম ‘জীবন’; মনে হয়, মরণকে জীবনের অপর পিঠ হিসেবে দেখার জন্য ‘মরণ’ শব্দের বারংবার

উচ্চারণ। মুমূর্ষুর যাতনার চেয়ে মৃত্যুকে যিনি কাম্য মনে করেন, সেই এলিয়টও পলাতক হতে পারতেন না। আশ্রয় তাঁর দরকার ছিলই। সেই আশ্রয় যদি জীবনের পরিধিতে মিলে যেত, তাহ'লে এলিয়ট হয়ত লিখতেন না: 'Only / There is shadow under this red rock' (Come in under the shadow of the read rock) 'Red rock'-এর ছায়ায় আসা আর 'স্বপ্নের হাতে' আত্মসমর্পণের মধ্যে মূলগত ভেদ কোথায়? এলিয়ট এই বলে আহ্বান জানিয়েছেন 'Come in under the shadow of the read rock'-আর জীবনানন্দে পাই 'মরণের যত তৃষ্ণা আছে/তারই খোঁজে ছায়া আর স্বপ্নের কাছে/তোমরা চলিয়া আস—/তোমরা চলিয়া আস সব/ভুলে যাও পৃথিবীর ঐ ব্যথা-ব্যাঘাত বাস্তব'। মূল কথা তো আশ্রয়ের সন্ধান। আসলে তিল তিল মরণের হাত থেকে বাঁচার জন্যেই আশ্রয় খুঁজতে হবে একালের মানুষকে। যদি না মেলে আশ্রয় তাহলে শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে আসবে অস্বুট গোঙানির মত। কালজ্ঞান এবং ইহ-সচেতনতাই এলিয়টকে সামনের দিকে চালিয়েছে ঐতিহ্যের সঙ্গে অস্থিত থেকে। এই 'ঐতিহ্য' শব্দটা বাদ দিয়ে সম্ভব নয় এলিয়টের দার্শনিক জিজ্ঞাসার পরিমাপ করা এবং দার্শনিকের প্রজ্ঞা ছাড়া এলিয়টের কাব্যার্থ অবোধগম্য।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই মূল্যবোধের বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে যে-শতকের শুরু তার দুটো বিকৃত প্রকাশই দেখেছিলেন এলিয়ট গভীর বেদনাসহ। য়েটস্-এর রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে যোগ ছিল না তাঁর যদিও যুদ্ধোত্তর কালের অর্থনৈতিক মন্দা এবং মানুষের অবমূল্যায়ন তাঁকে পীড়িত করেছিল বলেই তাঁর অন্তর্গত রক্তের ভিতর বয়ে যাওয়া বিপন্নতার বোধ তাঁকে গিজার কাছে উপস্থিত করে দিয়েছিল। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের যে-যোগ ঐতিহ্যের সূত্রে, তাকে এক ভিন্ন মাত্রাসহ বোধ ও বিশ্বাসের জগতে উন্নীত করে দিয়েছিলেন এলিয়ট। এলিয়ট অবশ্যই জানতেন নতুন সোভিয়েত রাশিয়ার কথা, অবশ্যই Four Quartets লেখার আগে তাঁর জানা ছিল ফ্যাসিবাদের কথা এবং লেনিন-স্টালিনের কথা। য়েটস্-এর মৃত্যু ১৯৩৯-এ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ না দেখলেও দুনিয়াব্যাপী বিপর্যয়ের লগ্ন যে সমাগত তা তাঁর জ্ঞানের মধ্যে ছিল। পৃথিবীর নাট্যক্ষেত্রে অভিনীত নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক দেখার সুযোগ মেলে নি তাঁর। এলিয়ট এবং জীবনানন্দ তা দেখেছিলেন এবং যাবতীয় যাতনাকে অন্তরের গভীরে সঞ্চারিত করে দিয়ে একই সঙ্গে বিপন্নতার কাতরতা ও নবীনতার স্বপ্ন দায়বদ্ধ শিল্পীর মত ক'রে প্রকাশ করেছিলেন। 'East Coker'-এর তৃতীয় অংশে অন্ধকারের একটি বর্ণনায় বারবার আছে একই শব্দের উচ্চারণ : 'dark dark dark' সবাই মিলে চলেছে একটি শব্দহীন শব্দাত্ম্য। কাকে কবর দেওয়া হবে? না বিশেষ কারুকে নয়। রঙ্গক্ষেত্রে দৃশ্যপট বদলানোর আগে যেমন নেমে আসে অন্ধকার; এও ঠিক সেইরকম, ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে নৈঃশব্দ্যে। প্রতিটি মুখের পিছনে আশাহীন শূন্যতার গভীরতা। কবি তাঁর হৃদয়কে বলেছেন আশা না-করতে, কারণ তা হবে ভুল জিনিসের জন্যে; প্রতীক্ষা না করতে, কারণ তা-ও তবে ভুল জিনিসের জন্যে। তা'হলে তাঁর প্রত্যাশাটা কী? 'So the darkness shall be he light, and the still the/dancing/whisper of running stream, and winter lightning'. 'The Dry Salvages'-এ এলিয়টের মনে পড়েছে অর্জুনের কথা, শ্রীকৃষ্ণের কথা এবং ঐদেরকে কেন্দ্র করে নিত্য অভিযাত্রার কথা : 'O voyagers, O seamen,/ you who came to port, and you whose bodies/will suffer the trial and judgement of the sea/or whatever event, this is your real destination. So Krishna, as when he admonished Arjuna/On the field of battle/Not fare well,/ But fare forward, Voyagers'. 'সাতটি তারার তিমির'-এ যুদ্ধ, যুদ্ধকালীন অবস্থায় আমাদের দেশের সংকট এমনভাবে এসেছে যা একমাত্র এলিয়টই তাঁর দেশের প্রেক্ষাপটে পেরেছিলেন

বোঝাতে 'dull', 'dry' এবং 'rubbish' প্রভৃতি শব্দে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালের 'Four Quartets' এ এই ধরনের উক্তিতে : 'O dark dark dark. They all go into the dark' এই 'they' 'কারা'? এলিয়টের স্পষ্ট কথা : 'The captains, merchant bankers, eminent men of letters./The generous patrons of art. The Statesmen and the rulers./Distinguished civil-servants, chairman of many committees,/Industrial lords and petty contractors, all go into the dark'. বিশ্বযুদ্ধ এলিয়টের দেশে এবং আমাদের দেশে একভাবে আসে নি। তবু জীবনানন্দ আঁকেন এদেশেরই বাস্তব ছবি এইভাবে: 'ফিরিস্জি যুবক কটি চলে যায় ছিমছাম।/যে থামে ঠেস দিয়ে এক লোল নিগ্রো হাসে; /হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিষ্কার করে/বুড়ো এক গরিলার মত বিশ্বাসে।/নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়/লিবিয়ার জঙ্গলের মতো/তবুও জঙ্গলগুলো আনুপূর্ব অতি বৈজ্ঞানিক/বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত ('রাত্রি') অথবা 'রিরংসা, অন্যায়, রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষো ভয়/চেয়েছে ভাবের ঘরে চুরি বিনে প্রজ্ঞা ও প্রণয়'? (বিভিন্ন কোরাস), 'বিশৃঙ্খল শতাব্দীর সর্বনাশ হয়ে গেছে যেন' ("সোনালি সিংহের গল্প")। 'তিমির বিলাসী' না হয়ে 'তিমির বিনাশী' হতে চাওয়া নিঃসন্দেহে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু কবি নিজে যে ঘন তিমিরে বাস করছেন, সেই তিমির আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় দুই ক্ষেত্রেই সত্য। জাতীয় ক্ষেত্রের অন্ধকার কবি দেখেছেন এক মরমীর ভূমিকা থেকে। নির্বিশেষ থেকে বিশেষ স্থান ও কালে কবির এই জীবনকে দেখা অন্য সব কবিতায় ততটা মেলে না বলে '১৯৪৬-৪৭' এ জীবনানন্দকে অন্য এক প্রান্তে যেন দেখি আমরা। প্রচলিত ধারণাতেও হেঁচট লাগে। 'বিশ্রান্ত কবি' এই বিশেষণ এই কালসচেতন কবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করি না। 'বহুকে বঞ্চিত ক'রে দুজন কি একজন কিনে নিতে পারে' পঙক্তিটি পড়তে গেলে 'The Waste Land' এর 'Smyrna merchant'-এর কথা মনে আসে যার পকেট 'full of currents/C.I.F. London, documents ay sight'. কিন্তু ১৯৪৬-৪৭-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মর্মবিদারী বর্ণনায় জীবনানন্দ যেন ছাড়িয়ে গিয়েছেন দেশ ও বিদেশের তাঁর সমকালীনদের। যে-সব মানুষ কিছুদিন আগে নবাত্মের উৎসবে মেতেছিল, তারা যদিও ছিল না তাদের প্রপিতামহদের আনন্দলোকে; তবু তারাও বেঁচে ছিল এমন এক স্পষ্ট জগতে যেখানে 'মম্বন্তরের দাঙ্গা দুঃখ ছিল না এত ভয়ঙ্কর ভাবে। এ এমন এক সময় যখন 'সকলেই আড়চোখে সকলকে দেখে'। দাঙ্গায় চলে গেল ইয়াসিন-হানিফ-মহম্মদ-মকবুল-করিম-আজিজ-গগন-বিপিন-শশীরা এবং সেই ক্ষণে 'কেউ নেই কিছু নেই সূর্য নিভে গেছে' এবং যান্ত্রিকের চোখের সামনে থেকে নিভে গেছে 'কান্তিময়' আলো', 'জ্ঞান নেই পৃথিবীতে' এবং 'জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই', তবুও এলিয়টের মত কবিও যখন লেখেন 'Love is the unfamiliar Name/Behind the hands that wove/The intolerable shirt of flame/which human power cannot remove ("Little Gidding IV") তখন 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব/থেকে যায়' এই বিশ্বাস যিনি তুলে ধরতে পারেন, সেই জীবনানন্দ তো লিখতেই পারেন, 'চারিদিকে নীল নরকে প্রবেশ করার চাবি/অসীম স্বর্ণ খুলে দিয়ে লক্ষ কোটি নরককীটের দাবি/জাগিয়ে তবু সে-কীট ধ্বংস করার মতো হয়ে/ইতিহাসের গভীরতর শক্তি ও প্রেম রেখেছে কিছু হয়তো হৃদয়ে' (অনন্দা)। একই কালে বাস করে জীবনানন্দ ও এলিয়ট সভ্যতার ক্রিষ্ট রূপের মধ্যেও প্রেম ও সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছিলেন তাঁদের মত করে এবং দু'জনেই প্রতিভার প্রেরণায় হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বনাগরিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে লেখা 'The Waste Land'-এ এলিয়ট লেখেন 'What is the City over the mountain/cracks and reforms and bursts in the violent air/Falling towers/Gerusalem Athens Alexandria/vienna London/Unreal'. আর জীবনানন্দের 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যের "রাত্রির কোরাস" কবিতায় পাচ্ছি 'পশ্চিমে প্রেতের

মতন ইউরোপ; /পূব দিকে প্রেতায়িত এশিয়ার মাথা; /আফ্রিকার দেবতাস্বা জঙ্গুর মতন ঘনঘটাচ্ছন্নতা এবং “সূর্য্যতামসী” কবিতায় পাই ‘ভোরের বদলে তবু সেইখানে রাত্রি করোজ্জ্বল’ হিয়েনা, টেকিও, রোম, মিউনিখ তুমি?/সার্থবাহ, সার্থবাহ,/ওই দিকে নীল/সমুদ্রের পরিবর্তে আটলান্টিক চার্টার নিখিল মরুভূমি’। সর্বত্রই সম্ভাবনার অপঘাত লক্ষ্য করে এলিয়ট ভূগোলের ‘real city’ কে বলেছিলেন ‘Unreal’। ভৌগোলিক অবস্থানগত ভিন্নত্বের মধ্যেও বিশেষ কারণে সব একাকার। জীবনানন্দ পূর্ব গোলাধ্বের বাসিন্দা হয়েও সংবেদনশীলতার জন্যই পশ্চিমের ভাঙনের বেদনা অনুভব করছেন। মনে প্রাণে তিনি বিশ্ব নাগরিক, এলিয়টের মতই। গ্রেটসের রবীন্দ্র-প্রীতি এবং রবীন্দ্রকাব্যে নিবিষ্ট থাকার সংবাদ সত্ত্বেও এলিয়টের পূর্ব মহাদেশের জীবন চর্যার প্রতি আকর্ষণ বুঝিবা গভীর গভীরতর। জীবনানন্দের কালের কবিতা প্রতীচ্যে অনুরাগী হয়েছিলেন, জীবনানন্দও ছিলেন তাঁদের অন্যতম। কিন্তু “The Waste Land” পরিক্রমার পর যখন বৃহদারণ্যকের শাস্তির বাণী কানে আসে, “Four Quartets”—এ সাক্ষাৎ মেলে অর্জুন ও কৃষ্ণের প্রসঙ্গ, তখন মনে হয় বিশ শতকের দুঃসময়ের কোলাহল রচনায় জীবনানন্দের পাঠকের মনে পড়বেই এলিয়টকে বাঙালি কবিদের বয়েসের বিচারে গেলে বিষ্ণু দে-কে মনে করতে হত পরে এবং সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে অমিয়চন্দ্রকে। আমরা সবশেষে স্মরণ করছি অমিয়চন্দ্রকে কারণ এলিয়টের “Four Quartets”—এর নিবিড় এবং একান্ত আলোচনা করছেন তিনি। অমিয়চন্দ্রের বক্তব্য সূত্রাকারে দেওয়া যায় না কারণ ‘এলিয়টের নতুন কবিতা’ প্রবন্ধটাই একখানা অখণ্ড কবিতা যেন, যার কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করতে করতে উপভোগ করা যেতে পারে। অমিয়চন্দ্র বলছেন ‘কিন্তু জ্ঞান চতুষ্পাণ হীরের মতো চারটি কবিতায় একক এই প্রকৃষ্ট রচনায় বিশেষ একটি নিগূঢ় তত্ত্বের আলো ঠিকরেছে। নিরবধি কাল এবং প্রতি মুহূর্ত, এই দুয়ের অবাঞ্ছমানসগোচর মর্ত্যযোগে আমরা আছি; এরই রহস্য এলিয়টকে এই নতুন বিচিত্র কাব্যদর্শনে প্রবৃত্ত করেছে। বোধ করি তাঁর বিশেষ নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠিত সৃষ্টির রহস্যময়তাকে অতিক্রম ক’রে স্থির দৃষ্টির সাক্ষ্য দিতে চায়; কাল ও মহাকালের দ্বন্দ্ব তিনি স্বীকার করেন না, অতএব রহস্যকেও নয়, কিন্তু তাঁর বাক্য যে-সংকল্পই প্রকাশ করুক, আমাদের কাছে আভ্যন্তরীণ বিশ্বায়টুকু উপভোগ্য। কালের পরমতত্ত্ব এই চারটি কবিতাকে ছেয়ে আছে। ছোটো-ছোটো গ্রামের নামে এই কবিতাগুলি রচিত—‘Burnt Norton, East Coker, The Dry Salvages, Little Gidding’। সবশেষে অমিয়চন্দ্র এলিয়টের কাছ থেকে পশুস্তির পর পশুস্তি গ্রহণ করে যখন চিত্রধ্বনিময় কয়েকটি ছিন্ন পদ উদ্ধারের আয়োজন করছেন তার আগে কেন আমরা আদৌ যাব টি. এস. এলিয়টের কাছে তার কারণ ব্যাখ্যা করলেন এইভাবে: ‘সময়ের বিশ্বয়মস্ত্রে আমরা সকলেই দীক্ষিত, কেননা এই যুগের বিজ্ঞান-দৃষ্টি লক্ষ কোটি বিগত বৎসরকে লুকোনো ভূ-স্তরে, কক্ষালের হারানো পুররাবিষ্কৃত যোগসূত্রে, আদিম তারা থেকে অণুতম কণিকার আকাশে ব্যস্ত করেছে—ইতিহাসের মানসিক মহাকালও চতুর্দিকে উদ্ঘাটিত হচ্ছে। এক হিসাবে যতই আমরা এগিয়ে চলেছি ততই পিছনেরও অতি কাছের খবর আমাদের কাছে ধরা পড়ল, পূর্বতর যুগের মানুষ পূর্বতমদের কাছ থেকে আরো দূরে ছিলেন। মনের কাল তাই আমাদের কাছে আরো ব্যাপক এবং একই কালে বৃহৎ বিশ্বের বৈচিত্র্য কতরাপে প্রকাশিত হয়ে চলেছে সে সম্বন্ধেও আমরা সচেতন। সুতরাং আমাদের কবিতায় গল্পে কালের নূতন দৃষ্টি এসে পৌঁছাল আপেক্ষিক কাল, প্রাণীদের মধ্যে চৈতন্যের ভিন্নতায়, কালের ভিন্নতা; ঘুমের কাল এবং জাগরণের কালের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিকদের প্রমাণিত পার্থক্য—এই সকল বিষয় আজ কাব্যের অন্তর্গত ...যে heroic discipline—এর শিল্পদক্ষতায় কবি এলিয়ট সময়ের ভাবনাকে কাব্যে চিরকালীন রূপ দিতে পেরেছেন তার তুলনা পশ্চিম-দেশের কোনো কাব্যেই পাওয়া যাবে না। অভিনব বিষয়বস্তু বা

আবেগের অসংস্কৃত বেগ, এর কোনোটিই কাব্যে যথার্থ নূতনত্ব অর্থাৎ প্রাণসঞ্চার করতে পারে না; এলিয়ট কবি, তাই কাব্যের উপকরণ বা শিল্পের বিজ্ঞানকে ছাড়িয়ে তিনি আধুনিক যুগের একটি অন্যতম মনোধারাকে এমন আশ্চর্য প্রকাশ করছেন। আধুনিক জীবনের অনেক দিক তাঁর কাব্যে অনভিব্যক্ত—তার জন্যে যেতে হবে অন্য কবির দরবারে, যাদের চিন্তের সঙ্গে আমাদের যোগ হয়তো নানাভাবে ঘনিষ্ঠতর—কিন্তু এলিয়টের এই নতুন কবিতাগুলি বিশেষ অর্থে এবং সাধারণ অর্থেও কালধর্মী এ-কথা স্বীকার করতে হবে। উক্তিটি যথেষ্ট দীর্ঘ হলেও পাঠক ক্লান্ত হবেন না, ভরসা করি।

সুতরাং কবি এলিয়টকে রবীন্দ্রনাথ যে ভাবেই লক্ষ্য করুন উত্তর-রৈবিক কয়েকজন বিশিষ্ট কবি—যাদের নাম উচ্চারিত হয় এক ঝোঁকে—এলিয়ট ও তাঁর কাব্য-কবিতাকে কখনো উল্লেখের দ্বারা কখনো তাঁর কবিতার পঙ্ক্তির দ্বারা অনুভাবিত হয়ে তাঁকে দিয়েছেন প্রাচ্যের সম্মান। পশ্চিমের কবি স্বস্তির সম্মান করেছিলেন (তাঁর 'The Waste Land'-এ) পূর্বমহাদেশে এবং পূর্বমহাদেশের বেশ কয়েকজন মাননীয় কবি পশ্চিমের এই কবির প্রতি জানিয়েছেন যথোচিত শ্রদ্ধা। শ্রেষ্ঠ রচয়িতারা চিরকালই দানে ও গ্রহণে উদার, নইলে তো সৃষ্টির স্রোতই বদ্ধ জলায় আঙ্গুরা হয়ে সভ্যতারই অস্তিম মুহূর্ত ঘোষণা করে দিত।

লোকসাহিত্য ও লোকশিক্ষা

মানস মজুমদার

....১....

লোকসাহিত্যের উদ্দেশ্য বিবিধ। প্রথম উদ্দেশ্য অবশ্যই আনন্দদান। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সংবাদ প্রদান। অর্থাৎ, লোকসাহিত্যের মাধ্যমে লোকসাংবাদিকতার কাজটি সাধিত হয়। তৃতীয়ত, প্রতিবাদ প্রবণতা। অন্যায়-অবিচার-শোষণ-পীড়ন-লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। চতুর্থত, শিক্ষাদান। লোকসাহিত্য শতাব্দী পরম্পরায় লোকসমাজকে শিক্ষাদান করে চলে। লোকসাহিত্য হলো লোকসমাজের মানসিক অন্ন-পানীয়ের জোগানদার।

লোকসমাজের অনেকেই অক্ষরজ্ঞানহীন। কেউ কেউ স্বাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন। কিন্তু তাদের অশিক্ষিত বলা চলে না। স্কুল-কলেজের কেতাবী বিদ্যায় তারা শিক্ষিত নয় ঠিকই, কিন্তু জীবনের পাঠশালায় শিক্ষিত। কথকতা, পাঁচালি, যাত্রাগান ইত্যাদির মাধ্যমে যেমন লোকসমাজ শিক্ষা পেয়ে থাকে, তেমনি লোকসাহিত্যও তাদের শিক্ষা দেয়। সে শিক্ষা লোকসমাজকে পুষ্ট করে, সমৃদ্ধ করে। সে শিক্ষা প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা অর্থাৎ Non-formal education.

....২....

লোকসাহিত্যের সমস্ত বর্গেই লোকশিক্ষাদানের অল্পবিস্তর প্রয়াস দেখা যায়। উদাহরণ সহায়তায় তা প্রমাণ করা যেতে পারে। ‘ষোল কই শুনিয়ে’ সুপরিচিত একটি খেলার ছড়া। খেলাটি অভিনয়ধর্মী। এ খেলায় এক বালক নেয় চাষির ভূমিকা। আর এক বালিকা হয় চাষি-বৌ। এর বিষয়টি হলো, চাষি ষোলটি কই মাছ এনেছে। কিন্তু খেতে বসে পাতে একটি মাত্র মাছ দেখতে পেয়ে অত্যন্ত হতাশ হলো। ক্ষুব্ধ চাষি ষোলটি কইয়ের হিসেব চাইলো। চাষি-বৌ সুকৌশলে তার হিসেব দিলো—

চাষি। ষোল কই শুনিয়ে।

চাষি-বৌ। দুটো গেল তবে পালিয়ে।।

চাষি। তবু তো রৈল চোদ্দ।

চাষি-বৌ। দুটো নিলো খোকার বৈদ্য।।

চাষি। তবু তো রৈল বারো।

চাষি-বৌ। পালিয়ে গেল দুটো আরও।।

চাষি। তবু তো রৈল দশ।

চাষি-বৌ। দুটো দিয়ে কিনেছি রস।।

চাষি। তবু তো রৈল আট।

চাষি-বৌ। দুটো দিয়ে কিনেছি কাঠ।।

চাষি। তবু তো রৈল ছয়।

চাষি-বৌ। ঘরে আছে রোগা ছেলে তার জন্যে দুটো রয়।।

চাষি। তবু তো রৈল চার।

চাষি-বৌ। পাশের বাড়ির গিমি এসে দুটো নিয়েছে খার।।

চাষি। তবু তো রৈল দুই।

চাষি-বৌ। মোর জন্যে একটা থুই ।।

চাষি। তবু তো রৈল এক।
 চাষি-বৌ। চক্ষু চেয়ে পাতের পানে দ্যাখ।।
 আমি হই বড়ো মানুষের ঝি।
 তাই একে একে তোকে হিসেব দি।।
 তুই যদি হোস্ বড়ো মানুষের পো।
 কাঁটাটুকু খেয়ে মাছটুকু আমার জন্যে খো।।

স্পষ্টতই এ ছড়ায় বিয়োগ শেখানো হয়েছে। খেলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের এই কৌশলটি নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। আনন্দের কমতি নেই, অথচ শিক্ষাও আছে। এ হলো প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা।

সদ্য বিবাহিতা কন্যা স্বামীগৃহে চলেছে। কন্যার জননী কাঁদছেন। কন্যা স্বামীগৃহে চলেছে পাঙ্কীতে চড়ে। পাঙ্কীবাহক অর্থাৎ বেহারার দল পাঙ্কী বহনে উদ্যত। এ অবস্থায় কন্যা বেহারাদের থামিয়ে জননীকে যে উপদেশ দেয় তাতে চিরন্তন সত্যের প্রতিফলন ঘটে—

আগে যায় রে বারো বেহারা
 পিছে যায় রে ডুলি।
 দাঁড়াও কাহার ভাই মাকে কিছু বলি।।
 মা বড়ো নিবুদ্দি কেঁদে কেন মর।
 আপনি ভাবিয়ে দেখ কার ঘর করো।।

আজ যিনি কন্যার জননী, একদিন তিনি সদ্য বিবাহিতা বধূ রূপে স্বামীগৃহে এসেছিলেন। মেয়েদের জীবনে এটাই তো সত্য। বিয়ের পর স্বামীগৃহই তার আপন গৃহ হয়ে ওঠে। বালিকা কন্যার আড়ালে সমগ্র লোকসমাজের উপস্থিতি যেন চোখে পড়ে। এও তো শিক্ষা, জীবনের শিক্ষা। সাহিত্যমূল্য ক্ষুণ্ণ হয় নি, অথচ শিক্ষাটুকু মর্মে গোঁধে যায়। মেয়েদের জীবনে এটাই সত্য। মেনে নাও এই সত্যকে।

....৩....

প্রবাদ ভালো-মন্দের নির্দেশক। দোষত্রুটির সমালোচক। কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারক। প্রবাদ শিক্ষা দেয়, কিন্তু গুরুশাশয়গিরি করে না। অন্তরঙ্গ আপনজনের ভঙ্গিতে কখনও কৌতুকের সঙ্গে, কখনও বৈদগ্ধ্য সহায়তায়, কখনও বিদ্রুপ-ভাষণে লোকসমাজকে সতর্ক সচেতন করে। সরসতার জন্যে সে শিক্ষা আকর্ষণীয় হয়।

সম্মান যেমন অর্জন করতে হয়, তেমনি সম্মান সতর্কতার সঙ্গে রক্ষাও করতে হয়। প্রবাদ তাই বলে—‘আপন মান আপন স্থান’।

নিজের বুদ্ধিতে ভরসা রাখাই ভালো। অন্যের বুদ্ধিতে নির্ভরশীল হয়ে অন্যের মুখাপেক্ষী না হওয়াই ভালো। তাতে আত্মবিশ্বাসের হানি হয়, অপরের দাসত্ব স্বীকার করতে হয়। প্রবাদ তাই নিজের বুদ্ধিতে আস্থাশীল হতে শেখায়—‘আপন বুদ্ধিতে ফকির হই, পর বুদ্ধিতে বাদশা নই’। সে বাদশাগিরি স্থায়ী হয় না।

অপাত্রে কন্যাদান বিধেয় নয়। তুলনামূলকতার সাহায্যে প্রবাদে তাই উপযুক্ত পাত্রে কন্যাদানের কথা বলা হয়—‘অন্ন দেখে দেবে ঘি, পাত্র দেখে দেবে ঝি’।

আতিশয্য ভালো নয়। অতি দর্পেই লঙ্কার পতন ঘটে, অতি মানে কৌরবদের বিনাশ ঘটে, অতি দানের জন্যে বামনরূপী বিষ্ণুর কৌশলে বালিকে স্বর্গ ও মর্ত্য রাজ্য হারাতে হয়, পাতালে

তার স্থান হয়। প্রবাদ তাই স্মরণ করিয়ে দেয়—‘অতি দানে বালির পাতালে হৈল ঠাই।’ দৈত্যরাজ বালি তাঁর হিতাহিতশূন্য দানশীলতার জন্যেই নিজের বিপদ ডেকে আনেন। দানশীলতা ভালো, কিন্তু তার আতিশয্য ভালো নয়।

বস্তুতপক্ষে দান, দয়া, ধর্ম, মান, অহংকার ইত্যাদির কোনও বিষয়েই বাড়াবাড়ি ভালো নয়—‘অতির কিছুই ভালো নয়’। স্মরণীয় ইংরেজি প্রবাদ—‘Too much of anything is bad.’

কেউ অতি ভক্তি দেখালে তার অভিপ্রায় সম্পর্কে সন্দেহ করা উচিত। অতি ভক্তি প্রায়শই প্রতারণার ছদ্মবেশ। ‘অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ’ প্রবাদে তাই সতর্ক করে দেওয়া হয়।

দীর্ঘজীবী হতে হলে মিতাহারী হতে হবে। প্রবাদ সেকথা স্মরণ করিয়ে দেয়—‘অনেক খাবে তো অল্প খাও’।

কুলোক কখনও তার কুপ্রবৃত্তি ত্যাগ করতে পারে না—‘কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না।’ একটি সংস্কৃত প্রবাদ সম্ভবত এ প্রবাদের উৎস—‘অঙ্গারঃ শতযৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।’

কারও কাছ থেকে টাকা পয়সা নেওয়ার সময় গুণে নিতে হয়, আর পথের কোথায় কী আছে জেনে নিয়ে পথ চলতে হয়। প্রবাদের শিক্ষাটি হলো ‘কড়ি নেবে গুণে, পথ চলবে জেনে’।

ভালো কোনও কিছু পেতে হলে কষ্ট করতে হবে—‘কষ্ট বই ইষ্ট নাই’। সংস্কৃত প্রবাদেও অনুরূপ মনোভাবের প্রতিফলন—‘ন হি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে’। ইংরেজি প্রবাদেও তার সমর্থন—‘No pain, no gain.’

পাকা বাঁশ নোয়ানো যায় না। বাঁশ কাঁচা অবস্থায় নোয়াতে হয়। আসলে বাল্যে সুশিক্ষা না দিলে সম্ভ্রান দুর্বিনীত হয়, উত্তরকালে তাকে আর সংশোধন করা যায় না। বাঁশের রূপকে তাই বলা হয়েছে—‘কাঁচাতে না নোয়ালে বাঁশ বাঁশ করে ঠাস ঠাস।’ তুলনীয় ইংরেজি প্রবাদ—‘strike the iron while it is hot.’

বয়সের ছোট-বড়োয় কিছু যায় আসে না, যে বুদ্ধিমান সেই শ্রেষ্ঠ—‘কিবা জ্যেষ্ঠ কিবা কনিষ্ঠ, যেই বুদ্ধিমান সেই শ্রেষ্ঠ’।

নীচকে অযথা প্রশংসা দিলে তাতে প্রশংসাদাতার অনিষ্ট হয়। কুকুরের রূপকে তাই বলা হয়—‘কুকুরকে নাই দিলে মাথায় ওঠে’।

কুমাশায় আমের মুকুল নষ্ট হয়, তাল বা তেঁতুলের কোনও ক্ষতি হয় না—‘কুয়ো হয়, আমের ভয়, তাল-তেঁতুলের কিছুই নয়’।

ভালো গোরু চেনার উপায়টি প্রবাদে নির্দেশিত—

‘আট কাজলা, বিছে নেজা।

পালের আগে চলে খোঁজা।।

ছয় মোটা, দুই সরু।

এই দেখে কিনবে গোরু।।

অর্থাৎ ভালো গোরুর শরীরের আট জায়গায় কাজলা কালো রঙ থাকবে। তার লেজ হবে বিছের মতো। দলের আগে আগে সে চলে। তার চার পা আর দুটি শিং হবে মোটা। গলা আর লেজ হবে সরু। এই লক্ষণগুলি দেখে গোরু কিনতে হয়।

যে চাষিকে দিয়ে চাষ করায় এবং নিজেও সেই সঙ্গে চাষ করে, সে যথার্থ লাভবান হয়। যে নিজে খাটে না, শুধু ছাতা মাথায় দিয়ে কাজ দেখে, সে তুলনায় অল্প লাভ করে। যে ক্ষেত্রে একেবারেই যায় না, শুধু ঘরে বসে চাষের সংবাদ নেয়, তাকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়, অম্মাভাব ঘটে—‘খাটে খাটায় লাভের গাঁতি, তার অর্ধেক মাথায় ছাতি, ঘরে বসে পুছে বাত, তার কপালে হা ভাত’।

গাই এবং বলদ কেনার আগে তাদের পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। গাই দুইয়ে দুধের পরিমাণ দেখে এবং বলদকে লাঙ্গলে বা গাড়িতে জুড়ে শক্তি সামর্থ্য দেখে কেনা উচিত—‘গাই নেবে দুয়ে, বলদ নেবে বেয়ে’।

চাষের কাজে বৃষ্টির জলই শ্রেষ্ঠ, সেচা জলে বেশিক্ষণ কাজ চলে না। যেমন নিজের বলই শ্রেষ্ঠ, অন্যের বলের ওপর নির্ভর করলে কাজ হয় না। আপন শক্তিতে আস্থাশীল হওয়াই ভালো। প্রবাদ সেই শিক্ষাই দিয়ে থাকে—‘জল জল ইন্দ্রের জল। বল বল বাঘ বল’।

প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, ফসল সম্পর্কিত খনার বচনগুলি—

১. আখ, আদা, পুই, এ তিন চৈতে রুই।
২. পটল বুনলে ফাণ্ডনে। ফল বাড়ে দ্বিগুণে।।
৩. খনা ডেকে বলে যান। রোদে ধান, ছায়ায় পান।।

লোকসমাজ প্রধানত কৃষিজীবী। এ সমস্ত শিক্ষার মূল্য সে সমাজে অপরিসীম।

উৎকৃষ্ট বস্তুর অল্পও কাম্য—‘ঘন দুধের ফোঁটা, বড়ো মাছের কাঁটা।’

যে চাক্ষুষ প্রমাণ গ্রাহ্য না করে শোনা কথায় বিশ্বাস করে, সে নিতান্তই নির্বোধ—‘চক্ষে দেখলে শুনতে চায়, এখন নির্বোধ আছে কোথায়’।

জীবনে কখনও দুঃখ, কখনও সুখ—‘চিরকাল সমান যায় না’। তুলনীয় সংস্কৃত প্রবাদ—‘চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ’।

খলের প্রীতি অল্পক্ষণস্থায়ী, জলের রেখার মতো। খলের প্রীতি তাই বিশ্বাসযোগ্য নয়—‘জলের রেখা খলের পিরীত’।

স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাথমিক কয়েকটি শিক্ষাও প্রবাদে লভ্য। যেমন—

১. ‘আগে পা পরে গা মাথায় দিয়ে নাইতে যা’। অর্থাৎ, স্নানের আগে তেল মাখলে শরীর সুস্থ থাকে। তেল মাখার নিয়ম হলো, আগে পায়ে, তারপর গায়ে, সবশেষে মাথায়।
২. ‘নিম নিশিন্দা যেথা, অসুখ থাকে না সেথা’। বাড়ির পাশে নিম ও নিশিন্দা গাছ থাকা ভালো, তাতে বাতাস বিশুদ্ধ থাকে। নিম নিশিন্দা জীবাণু নাশক। তাই একথা বলা হয়েছে।
৩. ‘ওঠা ধানের পথি হয় না’। রোগীর পথ্য হিসেবে পুরনো চালের ভাতই প্রশস্ত। কেন না, তা সহজপাচ্য। সদ্য ওঠা ধান থেকে যে চাল তৈরি হয়, তার ভাত রোগীকে খাওয়ানো উচিত নয়, কেননা তা ক্ষতিকর।
৪. ‘আলো-হাওয়া বেঁধো না, রোগ-ভোগ সেধো না’। ঘরে আলো-হাওয়ার অভাব থাকলে রোগ-ভোগ বৃদ্ধি পায়। তাই এ সতর্কতা।

অধিক দৃষ্টান্ত বাহুল্যমাত্র। প্রবাদ যে লোকশিক্ষার একটি শক্তিশালী মাধ্যম তা বেশ বোঝা যায়।

....৪....

প্রবাদের মতো ধাঁধাও লোকশিক্ষার শক্তিশালী মাধ্যম। ধাঁধায় বুদ্ধির যেমন চর্চা হয়, তেমনি পরীক্ষাও হয়। পৃথিবীর সব দেশেই ধাঁধার সামাজিক গুরুত্ব স্বীকৃত। প্রাচীন সাহিত্য-পুরাণে ধাঁধার উল্লেখ রয়েছে। মহাভারতের বন পর্বের ৩১২ সংখ্যক অধ্যায়ে দেখা যায়, যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে কয়েকটি ধাঁধা জিজ্ঞাসা করেছেন এবং যুধিষ্ঠির সেগুলির যথাযথ উত্তর দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, যক্ষ সম্ভট হয়ে মৃত চার পাণ্ডবকে পুনর্জীবিত করেছেন। উদাহরণ হিসেবে একটি ধাঁধার উল্লেখ করা

যাক। যক্ষের প্রশ্ন: ‘পৃথিবীতে সকলে যখন ঘুমায়, তখন কে একাকী জেগে থাকে?’ যুধিষ্ঠিরের উত্তর: ‘ন্যায়দণ্ড’। জাতকের কোনও কোনও গল্পে ধাঁধার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ‘গামনি চন্দ-জাতকে’ (২৫৭ সংখ্যক) রাজপুত্র ‘আদাস-মুখ’ অর্থাৎ আদর্শমুখকে রাজা করার আগে ১৪টি সমস্যা দেওয়া হয় পূরণের জন্যে। রাজমন্ত্রী বা রাজার পরামর্শদাতা নির্বাচনের জন্যেও যে ধাঁধা জিজ্ঞাসার রেওয়াজ ছিল তার প্রমাণ ‘মহাউষ্ম’ জাতকের গল্পটি (৫৪৬ সংখ্যক)। বিবিধ ধাঁধার যথাযথ উত্তর দিয়ে বোধিসত্ত্ব রাজার উপদেশক হয়েছেন। রাজায়-রাজায়, রাজায়-রানীতে বুদ্ধির পরীক্ষায় ধাঁধার সাহায্য নেওয়া হতো। বাইবেলে দেখি রাজা সলোমনের সঙ্গে ধাঁধা-যুদ্ধে হিরম পরাজিত হয়েছেন। শিবাদেশের রানীর সঙ্গে ধাঁধা-যুদ্ধে সলোমন জয়ী হয়েছেন। কথিত আছে, গ্রীসের কোনও রাজসভায় কোনও বিশেষ ধাঁধার উত্তরদানে অসমর্থ হওয়ায় কবি হোমার আত্মগ্লানিতে আত্মহত্যা করেছিলেন।

শুধু রাজসভায় নয়, প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের দেশে সামাজিক মজলিশে, চন্দ্রীমণ্ডপে, বারোয়ারীতলায় ধাঁধার চর্চা ছিল। ধাঁধা ছিল বুদ্ধি পরীক্ষার মাপকাঠি। সমাজের সকল স্তরেই, রাজসভা থেকে গ্রামসভায় তাই ধাঁধার চর্চা হতো। ধাঁধা ছিল শিক্ষার একটি মাধ্যম। বুদ্ধির অনুশীলন ও মানসিক আনন্দলাভের সহায়ক।

ধাঁধার বিষয়-তালিকায় কী নেই? মানুষ ও তার দেহ, আত্মীয় সম্পর্ক, প্রকৃতি জগৎ, ইত্যর প্রাণী, গৃহস্থালী দ্রব্য, খাদ্যবস্তু, আচার-আচরণ, দেবদেবী, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্র এসব কিছুই ধাঁধার উপকরণ। ধাঁধা এসব বিষয়ে লোকসমাজকে যুগপৎ কৌতূহলী ও সচেতন করে তোলে। শিক্ষাও দেয়। কয়েকটি উদাহরণ—

১. পা-পৃষ্ঠ মাথাটি,
কুড়ি আঙুল নাকটি,
তার চক্ষু কণ্ঠ নাই।

উত্তর : ‘মানুষ’। ‘নাই’ শব্দের অর্থ ‘নাভি’।

২. আগে যায়, পিছে যায়,
ওটি তোমার কে?
কিবা যাই কয়ে, বেলা যায় বয়ে।
ওর বাপ বিয়ে করেছে মোর বাপের মেয়ে।
ঘুইর্যা আইস বাক দুই।
বুইঝ্যা দেখ মাস দুই।

উত্তর: ভাগ্নে ও মামা। ভাগ্নের বাবা হলো মামার ভগ্নীপতি।

৩. গায়ে রোম নাই চারটে পা।
কথায় ফেরায় বাদশা।।

উত্তর: টিকিটিকি। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় টিকিটিকি ডাকলে ফিরে আসতে হয়। এ হলো ট্যাবু। রাজা-বাদশাও এ ট্যাবুর অধীন।

৪. দেয় তো আনিস নে,
না দেয় তো আনিস।

উত্তর: লাঙ্গল ও মই। যার কাছে লাঙ্গল ও মই চাইতে পাঠানো হচ্ছে, সে যদি নিজের জমিতে তা ‘দেয়’ অর্থাৎ ব্যবহার করতে থাকে তাহলে আনতে হবে না। কিন্তু যদি ‘না দেয়’ অর্থাৎ অব্যবহৃত থাকে তা হলে আনতে বলা হচ্ছে।

৫. দিই তো দিই, পথে ঘাটে দিই,
দিই তো দিই, পরপুরুষকে দিই,
তুমি আমার, আমি তোমার,
তোমায় দিব কি?

উত্তর: ঘোমটা দেওয়া।

৬. তিরি-পুরুষের বাইশটা কান।
এই কাথার দিয়া মান
তারপর খাও গুয়া পান।।

উত্তর: ‘তিরি-পুরুষের’ অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর। উত্তরটি হলো রাবণ ও তার পত্নী।
রাবণের দশটি মাথা, কুড়িটি কান। তার পত্নীর দুটি কান। মোট বাইশটি।

বাংলার লোকসমাজে বিবাহিতা স্ত্রীলোক স্বামীর নাম উচ্চারণ করে না। নিবেশ আছে। অর্থাৎ
ট্যাবু। ‘Uttering spouse's name’ সুপরিচিত একটি Motif। Motif সংখ্যাটি হলো C435.
স্বামীর নাম জানাতে হলে তাই কৌশলের সাহায্যে নেয়। যেমন—

১. আগে তার গোরু আছে, পরে পাল ঘেরা।
আগে গোরু, পরে স্বামী,- হন বর্ণ সেরা।।

উত্তর: গোপাল গোস্বামী।

২. তিন তের দিয়া বারো,
নয় দিয়া মিলানী করো।
আমার স্বামীর নামটি তাই,
পার করিয়া দাও বাড়িত যাই।

উত্তর: নৌকার মাঝি স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করলে জিজ্ঞাসিতা রমণী সুকৌশলে স্বামীর নাম
জানিয়েছে। ‘তিন তের’ অর্থাৎ ৩৯। ‘দিয়া বারো’ অর্থাৎ ৩৯ এর সঙ্গে ১২ যোগ
করে ৫১। ‘নয় দিয়া মিলানী করো’ অর্থাৎ ৯ যোগ দাও। তাতে হয় ৬০। স্বামীর
নাম ষাইট্যা বা ষষ্ঠী।

৩. তিন তের মধ্যে বারো,
চার দিয়া পূরণ করো।
এই আমার স্বামীর নাম
আমার বাড়ি নন্দীগ্রাম।

উত্তর: একই ধরনের ধাঁধা। একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত। ‘তিন তের’ হলো ৩৯। ‘মধ্যে বারো’
অর্থাৎ ৩৯-এর সঙ্গে ১২ যোগ করে হলো ৫১। ‘চার দিয়া পূরণ করো’ অর্থাৎ ৫১-এর
সঙ্গে ৪ যোগ দাও। হলো ৫৫। স্বামীর নাম পঞ্চানন।

উপরিউক্ত ধাঁধাগুলিতে গণিতের সাহায্যে নেওয়া হয়েছে। আবার অন্য ধরনের গাণিতিক
ধাঁধাও আছে। নিম্নের ধাঁধাটিতে বিয়োগ শেখানোর প্রয়াস দেখা যায়। যেমন—

শুভঙ্করের ফাঁকি।

চড়টি দিয়ে চিমটি পেলাম কত রইলো বাকি?

উত্তর: চড়ে ৫টি আঙুল ব্যবহৃত। চিমটিতে ২টি আঙুল। তা হলে বাকি থাকে ৩।

লোকসমাজকে সহজে হিসেব শেখানো হয়েছে এমন কয়েকটি গাণিতিক ধাঁধার দৃষ্টান্ত—

১. টাকায় গাই সিকায় ছাগল
পাঁচ টাকায় মোষ
বিশ টাকায় বিশটি জীব।

উত্তর: ১৬টি ছাগলের দাম ১৬ সিকা অর্থাৎ ৪ টাকা
১ টি গাই ১ টাকা
৩ টি মোষ ১৫ টাকা
২০টি জীব ২০ টাকা

২. চিড়ার সের পয়সা পয়সা
গুড়ের সের তিন পয়সা
চিনির সের ছ' আনা
আড়াই সের কিনো ভাই
চার আনায়।

উত্তর: ১ সের চিড়ার দাম ১ পয়সা
১ সের গুড়ের দাম ৩ পয়সা
মোট ৪ পয়সা অর্থাৎ ১ আনা।
আর $\frac{১}{২}$ সের চিনির দাম ৩ আনা।
অর্থাৎ $২\frac{১}{২}$ সের জিনিসের দাম ৪ আনা।

৩. সিকি আধুলি ন'টা।
টাকা হবে তিনটা।।

উত্তর: সিকি ৬টি আর আধুলি ৩টি—মোট ৯টি মুদ্রা।
৬টি সিকিতে দেড় টাকা আর ৩টি আধুলিতে দেড় টাকা। মোট ৩ টাকা।

৪. চন্দ্র পৃষ্ঠে চন্দ্র গিয়া গ্রহ যুক্ত করি।
ইহাতে যে অঙ্ক হয় লভ যত্ন করি।।
ইহার অর্ধেক ত্যজি পৃষ্ঠে পুষ্প দিয়া।
অবিলম্বে তত টাকা দিবেন পাঠাইয়া।।

উত্তর: 'চন্দ্র' মানে ১। 'চন্দ্র পৃষ্ঠে চন্দ্র' মানে ১১। তার সঙ্গে 'গ্রহ' অর্থাৎ ৯ যোগ করে
হয় ২০। তার অর্ধেক ত্যাগ করলে হয় ১০। তার 'পৃষ্ঠে পুষ্প দিয়া' অর্থাৎ শূন্য
দিলে হয় ১০০। অর্থাৎ, ১০০ টাকা পাঠাতে বলা হয়েছে।

অঙ্ক শেখানোর এই প্রয়াসটি যে চিত্তাকর্ষক তাতে সন্দেহ নেই। ধাঁধা যথার্থই লোকশিক্ষার বাহন।

....৫....

কোনও কোনও লোকগীতি লোকশিক্ষার উপাদানে পরিপূর্ণ। যেমন, পটুয়াগীতি। পটচিত্র সহযোগে
যে পটগীতি পরিবেশিত হয় তাতে বিবিধ পুরাণ-প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটে। লোকসমাজ সহজেই
এগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়, পুরাণের রাজ্যে প্রবেশাধিকার ঘটে। রামায়ণ কিংবা ভাগবতের বহু
প্রসঙ্গই পটচিত্র ও পটগীতে উপস্থাপিত। সিদ্ধুমুনি বধ-বৃত্তান্ত আশ্রয়ী পটগীতিতে অপূত্রক রাজা
দশরথকে লক্ষ্য করে যখন বলা হয়—

রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায়
গিল্লীর পাপে গৃহস্থ নষ্ট লক্ষ্মী উড়ে যায়।

তখন সহজেই তা লোকসমাজের মর্ম স্পর্শ করে। আবার, পুরাণবহির্ভূত গৌরান্দলীলায় গৌরান্দ-
জীবনের নানা প্রসঙ্গের উপস্থাপনা। এ সবই লোকশিক্ষার উপাদান। যমপট সংশ্লিষ্ট গীতিগুলিতে
রয়েছে পাপাচার ও ব্যভিচার সম্পর্কে লোকসমাজকে সতর্ককরণের প্রয়াস। ইহলোকে ব্যভিচারের
জন্য পরলোকে ভয়াবহ শাস্তি পেতে হয়, পটচিত্র ও পটগীতি সেকথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

মদন বাউলের গীতে শুনি: ‘তোমার পথ ঢেক্যছে মন্দিরে মসজিদে। ও তোর ডাক শুনে
সাই চলতে না পাই—আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে।’ ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে তিনি।
মালদহের একটি গম্ভীরা গীতেও ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখা
যায়—

কুণ্ঠে আল্লা ভগবান, কোথায় আছে আদ্যের ধান,
মন্দিরে কি মসজিদেতে পূজা সিমি খান,
তোমার নূরেতে কি টিকিতে ব্যোসা তসবীর কি মালা ঘুরায়।।

লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে এর আবেদন কম নয়।

একটি মুর্শীদা গীতে বলা হয়েছে—

নানান বরণ গাভীরে একই বরণ দুখ

পিরখিম ভইরা হইটারে হইটারে দেখলাম একই মায়ের পুত।

মিথ্যা জাত-পাতের সংস্কার। মিথ্যা মানুষে-মানুষে বিভেদ-বৈষম্য রচনা। এও তো লোকশিক্ষা।

লালন বলেছেন:

মনের মনে হল না এক দিনে।

ছিলাম কোথায়, এলাম হেথায়,

যাব কার সনে।।

পাকা দালান কোঠা দিব,

মহাসুখে বাস করিব,

ভাবলাম না কোন দিনে যাব

যাব শ্মশানে।।

আমার বাড়ি আমারই ঘর,

বলা কেবল বাকমারি সার,

কোন্ দিন পলকে হইবে সংহার,

হবে কোন দিনে।

জীবন আনিত্য, সংসার আনিত্য। এই সার সত্যটি লালন স্মরণ করিয়ে দেন। বিষয়ী মানুষকে
বিষয়-মগ্নতা থেকে নিরস্ত করেন।

যোগী গীতেও এই অনিত্যতার কথা—

ওরে ট্যাকা পইসা বউ বেটি

কেউ কারো নয়,

বাচারে কেউ কারো নয়।

ওরে হাটের হাটুয়া য্যামোন

পতের পরিচয়।

ওরে ঢাকা কড়ি জমিদারী
দুনিয়ারো খেলা,
বাচারে দুনিয়ারো খেলা।
সউগে ছাড়িয়া বাচা
যাইবেন এ্যাকৈলা।

বিষয়-বাসনা থেকে মুক্ত হতে বলে এ গীত। লোকসমাজ সংসারের অনিত্যতা সম্পর্কে সচেতন হয়।

....৬....

গীতিকাণ্ডলি গল্প-গীতি। এগুলিতেও লোকশিক্ষার উপাদান কম নেই। ‘মহুয়া’ গীতিকাটিকে আমরা রোমান্টিক হিসেবেই দেখে থাকি। কিন্তু এর মর্মগত সত্যটির কথা কি আমরা কোনওদিন ভেবেছি? সমাজবিচ্ছিন্ন যে প্রেম, সমাজ অননুমোদিত যে প্রেম, সে প্রেম কখনও কল্যাণকর হতে পারে না, মহুয়া-নদ্যারচাঁদের অকালবিনষ্টি কি সে কথাই প্রমাণ করে না? ‘চন্দ্রাবতী’ পালায় জয়ানন্দের যে ট্রাজিক পরিণতি, তার মূলে আছে তার প্রবৃত্তির প্রবল তাড়না। প্রবৃত্তিতাড়িত জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীর প্রেমের অপমান করেছিল, কুপিত প্রেম তাই জয়ানন্দের বিরুদ্ধে প্রতিশোধপ্রবণ হয়ে উঠেছে, আত্মহননে জয়ানন্দের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। ‘কঙ্ক ও লীলা’য় ব্রাহ্মণ সমাজের বিচারমুঢ়তা ও আচরণসর্বস্বতা লীলার অকালবিনষ্টির হেতু হয়েছে। আমরা এই বিচারমুঢ়তায় ক্ষুব্ধ হই, তার সর্বনাশা পরিণতি আমাদের মনের গভীরে দাগ কেটে যায়। ‘মলুয়া’ ও ‘দেওয়ানা মদিনা’ পতিব্রতো আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। আমরা বিনম্র হই। নাথগীতিকা ‘গোপীচন্দ্রের গান’ দেয় আত্মসংযমের শিক্ষা।

....৭....

লোককথাও কখনও কখনও শিক্ষাদায়ক হয়ে ওঠে। উদাহরণ দিই। এক বৃদ্ধ মৃত্যুর সময় ছেলেকে বলে গেল বাড়িতে হাট বসাতে, মধ্যপুকুরে জল খেতে আর তে-মাথার কাছে বুদ্ধি নিতে। বৃদ্ধের মৃত্যু ঘটলে ছেলে নিজের বাড়ি ভেঙে সেখানে হাট বসালো, পুকুরের মাঝখানে অবধি সাঁকো তৈরি করে সেখান থেকে জল খেতে লাগলো। তারপর চললো তে-মাথার খোঁজে। কিন্তু তিন মাথাওয়ালা লোক সে আর খুঁজে পায়না। শেষপর্যন্ত কোনও এক বুদ্ধিমান লোকের পরামর্শে সে চললো গ্রামের অতিবৃদ্ধ মোড়লের কাছে। মোড়লের প্রচুর বয়স হয়েছে। সে বসে আছে। তার মাথাটি নুয়ে পড়ে দুটি হাঁটুর ওপর ঠেকেছে। ছেলেটি বুঝলো এই হলো তেমাথা। মোড়লকে সে সব কথা খুলে বললো। মোড়ল সবকথা শুনে বললো, তোমার বাবার শেষ কথাটি আগে পালন করলে ভালো করতে। যাই হোক, বাড়িতে হাট বসানোর অর্থ হলো বাড়িতে সজির চাষ করা। তাহলে আর হাটে যেতে হবে না। আর মধ্যপুকুরের জল খাওয়ার অর্থ হলো খাওয়ার মাঝখানে জল খাওয়া, নতুবা শুকনো খাবার গলায় আটকে যেতে পারে। ছেলেটি খুশি হয়ে চলে গেল।

দ্বিতীয় গল্প। এক কৃষকের তিন ছেলে। ছেলেরা বিবাহিত। একদিন বড়ো ছেলের বৌ সম্মুখ দেখানোর সময় দেখা গেল কুপিটি নিভু নিভু করছে। মেজো ছেলের বৌ তাই দেখে বললো ‘তিনি তো চললেন।’ অর্থাৎ, কুপিটি তো নিভতে বসেছে। এদিকে একটি লোক বাড়ির পাশ দিয়ে তখন যাচ্ছিল। সে এই কথা শুনে থমকে দাঁড়ালো। বড়ো ছেলের বৌ মেজো ছেলের বৌকে বললো: ‘দিয়া কেন রাখো না।’ অর্থাৎ তেল দিয়ে কুপিটি ছেলে রাখো। পথচারী লোকটির কৌতূহল বৃদ্ধি পেলো। ছোট ছেলের বৌ তখন বললো: ‘দিলে যাবে না।’ অর্থাৎ, তেল দিলে কুপিটি নিভবে না। পথচারী লোকটি ভাবলো তাকে লক্ষ্য করেই বোধহয় এসব মন্তব্য হচ্ছে।

সে সেই বাড়িতে ঢুকলো। কথাগুলির অর্থ জানতে চাইলে বৌয়েরা জানালো নিভু নিভু কুপিতে তেল দেওয়ার কথা হচ্ছিল। পথিক তাদের ইঙ্গিত বুঝতে পারে নি।

তৃতীয় গল্প। এক ছিল তীরন্দাজ। তীর চালনায় সে এমনই দক্ষ যে বৌয়ের নাকের নোলকের ভেতর দিয়ে তার তীর ছুটে চলতো। এদিকে বৌ বেচারী তো ভয়েই অস্থির। অগত্যা সে শাশুড়ীর শরণাপন্ন হলো। শাশুড়ী বললো: তুমি আমার ছেলেকে বলবে যে তোমার মতো তীরন্দাজ এই পৃথিবীতে অনেক আছে। বৌ স্বামীকে সেকথা বললে তীরন্দাজ সেকথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে পৃথিবী ভ্রমণে বের হলো। ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে দেখলো একটা মাঠে কয়েকজন লাঙল দিচ্ছে। সে তাদের জিজ্ঞাসা করলো: 'তোমাদের এখানে কোনও বড়ো তীরন্দাজ আছে?' তারা জানালো তাদের গ্রামে এমন একজন তীরন্দাজ আছে যে বাড়ি থেকে তীর ছুঁড়লে তা তাদের মাঠে এসে পড়ে। আর তারা তখন বোঝে যে তাদের বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে। সেই তীরন্দাজের সঙ্গে প্রথমজনের দেখা হলো। দু'জনে পৃথিবী ভ্রমণে চললো। এমন সময় আর এক জনের সঙ্গে দেখা হলো যে ভাত খাওয়া হলেই এক দৌড়ে সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরে আসে। তাকেও তারা সঙ্গে নিলো। যাত্রা শুরু হলো। দেখা হলো এক অন্ধের সঙ্গে। সে অনেক দূরের দৃশ্য দেখতে পায়। সে তাদের সঙ্গী হলো। চারজনে পথ চলতে চলতে এক রাজ্যে উপস্থিত হলো। সে রাজ্যের রাজকন্যা অসুস্থ। যে কন্যাকে সুস্থ করতে পারবে তার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দেওয়া হবে। চার বন্ধু পরামর্শ করতে লাগলো। অন্ধ বললো, ওষুধ আছে যেখানে, সূর্য আছে সেখানে। যে দৌড়ে পৃথিবী ঘুরে আসে সে চললো ওষুধের সন্ধানে। ওষুধ নিয়ে ফিরে আসার সময় সে একটা জঙ্গলের বিশাল বটগাছের নীচে বিশ্রাম করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লো। এদিকে একটা সাপ তাকে গিলে খাওয়ার জন্যে এগোতে লাগলো। অন্ধ তা বহুদূর থেকেই দেখতে পেলো। যে নাকের নোলকের ভেতর দিয়ে তীর ছুঁড়তো সে তীর ছুড়লো। তীর গিয়ে লাগলো সাপের মাথায়। সাপটি যখন ছটফট করছে তখন অন্য তীরন্দাজের তীর গিয়ে লাগলো তার পেটে। সাপটি গোঙাতে লাগলো। বিশ্রামরত লোকটির ঘুম ভেঙে গেল এবং ওষুধ নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এলো। রাজকন্যাকে ওষুধ খাইয়ে দিলো। রাজকন্যা সুস্থ হয়ে উঠলো।

প্রশ্ন : রাজকন্যাকে কে পাবে?

উত্তর : যে মাথায় তীর ছুঁড়েছিল সে।

চতুর্থ গল্প। দু'জন বীরের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা কে শ্রেষ্ঠ তাই নিয়ে। এক বৃদ্ধা পথ চলছিল ছেলের জন্যে খাবার নিয়ে। তাকে তারা সমস্যার সমাধান করে দিতে বললে সে দু'জনকেই কাঁধে তুলে নিলো। হঠাৎ একটা চিল এসে তিনজনকেই ঠোটে তুলে নিয়ে উড়ে চললো। এক রাজকন্যা ছাদে চুল শুকোচ্ছিল, সে ওপর দিকে তাকাতেই বৃদ্ধা এবং দুই বীর চিলের ঠোঁট থেকে রাজকন্যার চোখে এসে পড়লো। রাজকন্যা দাসীকে জিজ্ঞাসা করলো 'দ্যাক তো চোখে কী পড়েছে?' দাসী কাপড়ের খুঁট দিয়ে তাদের বের করে আনলো।

প্রশ্ন : কে বেশি বীর?

উত্তর : দাসী।

গল্পগুলি ধাঁধামূলক। এগুলিকে বলে কুট কথানক অর্থাৎ কথা-গ্রহেলিকা। ইংরেজিতে Riddle Story. 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'-তে এধরনের গল্প পাওয়া যায়। এগুলিতে বুদ্ধির পরীক্ষা করা হয়েছে। কৌশলে শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে।

বোঝা গেল, লোকসাহিত্য লোকশিক্ষাও দিয়ে থাকে।

ধাণ স্বীকার :

ঘোষ প্রদ্যোত : গম্ভীরা : লোকসঙ্গীত ও উৎসব : একাল ও সেকাল (১৯৬৮)

দে সুশীলকুমার : বাংলা প্রবাদ (১৯৮৫)

বসাক শীলা : বাংলা ধাঁধার বিষয়বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয় (১৯৯৮)

ভট্টাচার্য আশুতোষ : বাংলার লোকসাহিত্য দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৬২।

তৃতীয় খণ্ড, ১৯৬৫। পঞ্চম খণ্ড, ১৯৭১।

ভৌমিক নির্মলেন্দু : বাংলা ধাঁধার ভূমিকা (১৯৮৮)।

বাঙালির নিজস্ব সভ্যতার প্রাচীনত্ব

মণিলাল খান

আলোচ্য ইতিহাস (সূচনা আনুমাঃ খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ সাল) রচনার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে একের পর এক পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কারের সংবাদ প্রকাশ্যে এসে পড়ায় এবং সাথে-সাথে খ্যাতনামা প্রত্নতাত্ত্বিকদের আবিষ্কারের ওপর কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় নতুন করে এই লেখাটি শুরু করতে হল। এই নতুন প্রবন্ধটির আলোচ্য বিষয় বঙ্গজনপদে বাঙালির নিজস্ব সভ্যতার প্রাচীনত্ব নির্ণয়।

বিগত পঞ্চাশ বছরের অধিক কাল পশ্চিমবঙ্গের পূব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণের নানা অঞ্চলে এমন একাধিক প্রাচীন সভ্যতার এবং প্রত্নবস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে, কালপর্বের বিচারে তাদের কোনো কোনোটা প্রাচীন আর্যাবর্তের সভ্য-জনপদগুলোর থেকে আধুনিক বা অবচীন বলা যাবে না। এমন কি বঙ্গ সভ্যতার এই প্রাচীনত্বের দিক থেকে বঙ্গজনপদে আর্যিকরণের বিষয়টিও নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। তার কারণ এখনো পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে প্রাচীন সভ্যতার সন্ধান যতখানি খনন করে আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে মনে করা যাচ্ছে বাঙালির নিজের সৃষ্ট সভ্যতার প্রাচীনত্ব আনুমানিক চার হাজার বছর স্পর্শ করেছে—তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। বিগত পঁচিশ-তিরিশ বছরের আর্কিওলজিক্যাল রিপোর্ট বা বাৎসরিক রিভিউগুলির প্রতি দৃষ্টি দিলেই আমাদের এই দাবির সমর্থন চোখে পড়বে।

বিগত পঞ্চাশ-পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এ রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কোনো না কোনো প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সাথে পূর্বাঞ্চলের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের যৌথ উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক অঞ্চলে উৎখনন কার্য সংঘটিত হয়, তাতে একের পর এক বাঙালির প্রাক-ঐতিহাসিক কালের একটা উজ্জ্বল চিত্র^১ আজ সবার সামনে এসে পড়েছে। তাতে জানা যায় যে, বাঙালির নিজের হাতে গড়া সভ্যতার ইতিহাস একটা নয়—একাধিক কেন্দ্রে গড়ে উঠেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অসংখ্য নদ-নদীর উপত্যকা বা তার আশেপাশে বিশেষ ভাবে ঐ সমস্ত প্রাচীন সভ্যতা বা প্রত্নস্থলগুলির সন্ধান পাওয়া গেছে। ময়ূরাক্ষী, বক্রেশ্বর, কোপাই, অজয়, কনুর, দামোদর প্রভৃতি নদ-নদীর উপত্যকায় পাণ্ডুরাজ্যের ঢিবি, বাণেশ্বরডাঙ্গা, মহিষদল, ভরতপুর; নিম্ন-গাঙ্গেয় বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় চন্দ্রকেতুগড়, তমলুক, ভাগীরথীতীর সংলগ্ন মুর্শিদাবাদের চিরুটি, তিস্তা তীরবর্তী জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণ বেরুবাড়ির নাউতারি মৌজায় পুরাণোক্ত একামপীঠের সন্ধান ইত্যাদি অকথিত ও হারিয়ে যাওয়া অতীত এখন বাস্তবের মুখোমুখি। বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের কাথাতেই শোনা যাক। তিনি বলেন ‘মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম এবং পুরুলিয়ার, উষর বনাঞ্চল ও পার্বত্য ভূমি যে দূর অতীতে মানবসংস্কৃতির যে লীলাভূমি ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।’^২

বিশিষ্ট পুরাতাত্ত্বিক কথিত এই ‘মানবসংস্কৃতি’ বা মানব-সভ্যতার সন্ধান নেবার আগে আমরা বুঝে নেবো প্রথমে, পশ্চিমবঙ্গের সংক্ষিপ্ত ভূতত্ত্বের ইতিহাস।

পশ্চিমবঙ্গের ভূতত্ত্ব সংক্রান্ত ইতিহাস

পশ্চিমবাংলা বা কোনো একটা অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিচয়, ভূ-চরিত্র ভূতত্ত্বীয় ইতিহাস গোটা বিশ্বের নিরিখেই বিচার্য। বিশ্বের নানা দেশের এই সংক্রান্ত বিজ্ঞানীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতামূলি তত্ত্বের আকারে প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি লাভ করেছে। পরবর্তীকালে অন্যান্য দেশেও

তার সুফল লক্ষ্য করা গেছে সেই সেই দেশের বিজ্ঞানীদের সক্রিয় ও নিরন্তর গবেষণার দ্বারা, ভারত বা পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞানীরাও তার বাইরে নন অথবা পেছনে পড়ে নেই।

ভূ-তত্ত্ব, আবহাওয়া, নদ-নদী, কঙ্করময় অঞ্চল, জলবায়ু, হিমপ্রবাহ, সমুদ্রতলের অবনমন, প্রস্তরীভূত অস্থি, দাঁত, তথ্য-বায়োস্ট্র্যাটিগ্রাফি, পেলিয়োক্লাইম্যাটোলজি, ইকোলজি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নিবিড় ও দীর্ঘস্থায়ী গবেষণায় উঠে এসেছে অসংখ্য বিশ্ববিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, আবিষ্কারক পরিবেশবিদ ইত্যাদি নানা বিষয়ের এক দীর্ঘ তালিকা। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন ডেসমণ্ড ক্লার্ক, নৃ-বিজ্ঞানী ব্যার্নেস জেন ভ্যান লাউইক শুভাল, অ্যালান হাউটন ব্রোড্রিক, কৌনিগস্‌ভলড, ড. রেমণ্ড ডার্ট, ড. রবার্ট ক্রম, ড. লুই লিকি, পতঙ্গবিদ (এনটোমোলজিস্ট) কাটভিংকেল, হাঙ্গেরক, ড. এভারডেন, ড. কার্টিস, ড. ফ্রেইশার, ড. ওয়াকার, ড. প্রাইস, অয়শেন দুবোয়া, ড. পিটার মার্কস, স্টুয়ার্ট পিগট, গান্নার এন্ডারসন, জন ওয়েচার, উইলিয়াম হাওয়েল প্রমুখ।^৩

অনুরূপ ভাবে বঙ্গীয় পটভূমিকায় প্রত্নতত্ত্বের উৎসনন, আবিষ্কার, প্রাচীন পুঁথিপাঠ-মুদ্রা-শিলালিপি-ভূমিদানপত্র, তাম্রশাসন প্রভৃতি প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার ও পাঠোদ্ধার দ্বারা বাংলা ও বাঙালির প্রাক-ঐতিহাসিক ও পরবর্তী ঐতিহাসিক কাল পর্বের ইতিহাসের উপদান সংগ্রহ ও রচনার দ্বারা আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি যাঁদের কাছ থেকে তাঁরা অনেকেই আজ প্রয়াত, যথা—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, অক্ষয়কুমার মৈত্র, নীহাররঞ্জন রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রমেশচন্দ্র মজুমদার, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত, রমেশচন্দ্র দত্ত (আর সি দে), সুকুমার সেন, দীনেশচন্দ্র সেন, পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, অমিতা রায়, ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি গবেষক ও পণ্ডিতবর্গের নাম সহজেই মনে আসে।

প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় নব্বই বছর আগে বাংলাদেশের ভূ-স্তর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, ‘বাঙ্গালাদেশ পলিমাটির দেশ; ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের তুলনায় ইহা বয়সে নবীন। কিন্তু এই দেশের উত্তর, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে অতিপ্রাচীন ভূমি আছে; এই সকল প্রদেশেই বাঙ্গালাদেশের প্রত্ন-প্রস্তর যুগের পাষাণনির্মিত আয়ুধ আবিষ্কৃত হইয়াছে’।^৪ পরবর্তী এই নব্বই বছরে সারা বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের মানচিত্রও আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। পুরাতত্ত্ববিদ পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের কথা দিয়েই শুরু করি। তিনি মন্তব্য করেছেন, ‘ক্রমাগত পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে আজ যে চিত্রটি আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে তার দ্বারা বিভিন্ন বিপ্লবাত্মক ধারণা প্রতিষ্ঠিত সত্যের মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম। বিজ্ঞানসম্মত ও পরিকল্পিত অভিযান, উৎসনন ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছে তাৎপর্যময় তথ্যাদি যা ইতিহাস রচনার অপরিহার্য উপাদান। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে নিম্ন-গাঙ্গেয় উপত্যকার গুরুত্ব যেমন অসাধারণ তেমন আর্কষণীয় পশ্চিম বাংলার পুরাতন পালনিক সংগঠন ও প্রস্তরাকীর্ণ প্রান্তরভূমি।’^৫ এই তাৎপর্যেই তিনি মন্তব্য করেন, ‘মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম এবং পুরুলিয়ার উষর বনাঞ্চল ও পার্বত্য ভূমি যে দূর অতীতে মানবসংস্কৃতির লীলাভূমি ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।’^৬

অতএব অনেকটা নবীন পলিমাটির পশ্চিমবঙ্গ বাঙালির নিজের হাতে গড়া সভ্যতা নবীন হবে—এমন মনে করার কোনো কারণ নেই, এমন তাৎপর্য-পূর্ণ ইঙ্গিত করেছেন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত। বরং এই বঙ্গের পার্বত্য কঙ্করময় কঠিন মৃত্তিকা-স্তর সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত শুগুনিয়া পাহাড়ের চারপাশে প্রসারিত এই রকম প্রস্তরাকীর্ণ সমাবেশেই আবিষ্কৃত হয়েছে আদি-প্রত্নাশ্মীয় কালের (লোয়ার পেলিওলিথিক) অসংখ্য হাতিয়ার এবং কোয়াটেনারির প্রাচীন অধ্যায়ে বিচরণশীল

প্রাণীকুলের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল। কতকটা তুলনীয় পারিস্থিতিকে দেখা গেছে মেদিনীপুর জেলার সুবর্ণরেখার দক্ষিণে প্রসারিত প্রস্তরাকীর্ণ ভূখণ্ডে।^{১৭} ক্রমান্বয়ে উৎখনন ও আবিষ্কারের অভিজ্ঞতায় নিয়েই পরেশবাবু তাই দৃঢ়তার সঙ্গে মন্তব্য করেছেন, ‘প্রকৃতপক্ষে, প্লাইস্টোসিন কালের একটি বিশিষ্ট সমাবেশ ও স্তর ছড়িয়ে আছে মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূম জেলায়। চব্বিশ পরগণার একটি স্থানের ভূগর্ভেও প্লাইস্টোসিন যুগের কোনো এক তুলনীয় স্তরের উপস্থিতি অনুমান করা যায় আবিষ্কৃত নানা নিদর্শনাবলীর ভিত্তিতে।’^{১৮} এখানে উল্লেখযোগ্য, উপরে কথিত প্লাইস্টোসিন পর্ব বলতে বিজ্ঞানীরা বিগত প্রায় দশ হাজার বছর থেকে দশলক্ষ (মতান্তরে ছ’লক্ষ) বছরের কালপর্বকেই বুঝিয়েছেন।^{১৯} নৃ-বিজ্ঞানী অ্যালান হাউটন বোল্ড্রিকের মতে প্লাইস্টোসিন অধ্যায়ের সূচনা এখন থেকে কুড়ি লক্ষ বছর আগে থেকে।^{২০}

বিভিন্ন ধরনের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ করে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া অঞ্চলে লক্ষাধিক কালের ভূতাত্ত্বিক-পরিবেশের প্রমাণ পেয়েছেন। ওই অঞ্চলে আবিষ্কৃত বিভিন্ন ধরনের জীবকুলের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পরীক্ষা করে জানতে পেরেছেন যে, সেই সমস্ত প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের বিচরণভূমি ছিল শুশুনিয়া পার্বত্য অঞ্চলের চারপাশে। বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বলেন, ‘প্রাগৈতিহাসিক কালে কতকটা আফ্রিকার মত একটি খণ্ড অরণ্য ও তৃণভূমি যে এখানে বিদ্যমান ছিল সন্দেহ নেই। আর্দ্রযুগের প্রভাবে স্বভাবতই এখানে সৃষ্টি হয়েছে গভীর বনানী, বিস্তৃত তৃণভূমি ও জলাশয়। বাঁকুড়া-পুরুলিয়া সীমান্তের উত্তরে প্রসারিত দেখা যায় ছবির মতো দাঁড়িয়ে থাকা এক পাহাড়-সমষ্টি। এদের ঢালু সানুদেশ অতীতের আর্দ্রযুগে হ্রদে রূপান্তরিত হওয়া একান্তই স্বাভাবিক।’^{২১} সেই অতীত বিস্তৃত তৃণাঞ্চল, জলাশয় ও গভীর অরণ্যে বিচরণ করতো বন্য হাতি, সিংহ, ঘোড়া, গবাদি পশু (বোস্ নেমাডিকাস), মহিষ, জিরাফ, শজারু, শূকর, হরিণ, কচ্ছপ, হায়না ও কুমীর।^{২২}

আবিষ্কৃত প্রাচীন প্রাণীদের জীবাশ্মগুলি পরীক্ষা করে পরেশবাবু মন্তব্য করেন, ‘শুশুনিয়া অঞ্চলে আবিষ্কৃত পোলিওডোন্সিন্ নেমাডিকাস্ গোষ্ঠীর হাতীর জীবাশ্মগুলি স্বভাবতই স্মরণ করিয়ে দেয় সুদূর অতীতের ম্যামথ-অধ্যুষিত ইয়োরোপের শেষ প্রত্নস্থর কালের গ্রাভেট্টীয় সংস্কৃতিকে এবং শিবাথেরিয়াম ও এলিফাস আটলান্টিকাস গোষ্ঠীর বন্য কুঞ্জর অধ্যুষিত উত্তর আফ্রিকা ও নীল উপত্যকায় বিভিন্ন প্রত্নশ্মীয় পর্বকে।’^{২৩} এই প্রেক্ষিতেই তিনি মন্তব্য করেন, ‘ভারতবর্ষে মধ্যাশ্মর অস্ত্রাদিকে সাধারণত খ্রিষ্টপূর্ব ৫০,০০০ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০০ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করা হয়। শুশুনিয়া পাহাড়ের সানুদেশে আবিষ্কৃত জীবাশ্মগুলি আরও বহু পূর্বকালের সাক্ষ্য দিতে পারে।’^{২৪}

কেবল উপরোক্ত প্রাণীকূলই নয়, শুশুনিয়া অঞ্চলে ও পশ্চিমবঙ্গের একাধিক স্থানে প্রাচীন মানুষের অধিবসতির প্রমাণও আজ আমাদের হাতের মধ্যে। আরও বিস্ময়ের কথা যে, পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় কংসাবতী নদীর বামতীরে সিঙ্গুরা নামক অঞ্চল থেকে ১৯৭৮ সালে ৫ জানুয়ারি প্রত্নতত্ত্ববিদ পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত একটি অতীত মানবের জীবাশ্ম তথা একটি ভগ্ন চোয়াল আবিষ্কার করেন। ওই চোয়ালটি দেখে ও পরীক্ষা করে তৎকালীন ভারতীয় ভূতত্ত্ব সর্বেক্ষণের অস্তর্গত প্রাচীন প্রাণীবিজ্ঞান ও স্তরতত্ত্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা শ্রী এম. ডি. এ. শাস্ত্রী একটি রিপোর্টে বর্তমান মানবগোষ্ঠী হোমো সেপিয়েন্স সেপিয়েন্স-এর প্রত্যঙ্গ রূপে বর্ণনা করেছেন। ‘সমগ্র বিবেচনায় ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এর প্রাচীনত্ব মোটামুটি দশ হাজার বছর। তুলনা করে দেখা গেছে এই চোয়ালটি মোহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পায় আবিষ্কৃত নরকঙ্কাল সমূহের চেয়েও প্রাচীনতর।’

‘শ্রী এম. ভি. এ. শাস্ত্রীয় লিখিত রিপোর্টের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে “The Present specimen was compared with those of Mohenjo-daro and Harappa period, dated approximately 5,000 years B. P. and appears to be older. It is surmised therefore on available evidence, that the age of this specimen could be of early Holocene (Approx 10,000 years B. P.). This also forms the records of earliest human fossil in India”’^{১৫}

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, B. P. বলতে Before past বোঝানো হয়েছে। ১৯৫০ সালকে সামনে রেখে, তার আগে দশহাজার বছর। এর কতটা প্রাগৈতিহাসিক পর্বে কতটা সময় আধুনিক, তা অস্পষ্ট।

ভূ-বিজ্ঞানীরা আরও জানিয়েছেন যে, মেদিনীপুর জেলার সিজুয়ায় প্রাপ্ত উক্ত আদিম মানবের আবিষ্কৃত চোয়ালটি যে ধরনের মৃষ্টিকা ও বালুকাস্তরের ওপর থেকে পাওয়া গিয়েছিল, সেই একই রকম মিল পাওয়া গেছে পাণ্ডুরাজার টিবি, ভরতপুর, বাণেশ্বরডাঙ্গা, মহিষদল ইত্যাদি প্রাচীন সভ্যতার উৎখনন কেন্দ্রগুলিতে।

কংসাবতী নদীর নিকটে সিজুয়ায় উক্ত চোয়ালটি ছিল এক রুক্ষ বালুস্তরের রক্তাভ স্তরের নিচে যেখানে ধূসর ও হলুদ রঙের এক ধরনের এঁটেল মাটি দেখা যায়। উপলাকীর্ণ লালচে বালুস্তরের ওপর ছড়িয়ে আছে লালছোপযুক্ত হলুদ বর্ণের বালির স্তর। দাবি করা হয়েছে যে, এই স্তরের উপরেই ছড়িয়ে আছে খ্রিষ্টপূর্ব দু-হাজার অব্দের এক বিলুপ্ত তাম্রাশ্মীয় অধিবসতির চিহ্নাবলী। পাণ্ডুরাজার টিবি, ভরতপুর, বাণেশ্বরডাঙ্গা, পোখমা প্রভৃতি এ রাজ্যের উৎখনন কেন্দ্রগুলিতেই বাঙালির নিজের তৈরি অধুনা বিলুপ্ত সভ্যতার কেন্দ্রগুলি প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ভূ-বিজ্ঞানীদের পরিশ্রম ও নিষ্ঠায় আজ আমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করেছে।^{১৬} সাথে সাথে, মনে রাখা জরুরি যে, সময় ও সুযোগ এসেছে বাংলা ও বাঙালির নতুন ইতিহাস রচনার।

বাংলা ও বাঙালির প্রাগৈতিহাসিক অধ্যায়

প্রাচীন বঙ্গ নামক জনপদ একেবারে অন্ধকার বা খুবই অস্পষ্ট ছিল যে কালপর্বে সেটাকে বলা হয় প্রাক-ঐতিহাসিক কাল। আজ সেই অতিদূর কালপর্বে আমাদের সামনে ইতিহাসের আলোর-রোশনাই গোটা বিশ্বকে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের উৎখনন ও আবিষ্কারের প্রকাশিত প্রাথমিক তথ্যের উপর নির্ভর করে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেছেন, ‘কিন্তু ইতিমধ্যেই যা পাঠক-সাধারণের এবং বিশেষজ্ঞদের গোচরে এসেছে তার যোগফল বাঙালির ইতিহাসে নূতন একটি অধ্যায় রচনার সূচনা করেছে, এমন একটি অধ্যায় যার শুরু খ্রিষ্টপূর্ব একহাজার বৎসরের আগে এবং যাকে বাঙালির বাস্তব ইতিহাসের প্রাক-উবা অধ্যায় বলে অভিহিত করা যেতে পারে।’^{১৭}

তবে, বাংলা ও বাঙালির এই তথাকথিত প্রাক-উবা অধ্যায় প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জনবাবু দৃঢ়তার সঙ্গে এটাও মনে করিয়ে দিতে ভোলেননি, ‘এ অধ্যায় পরম্পরাগত শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সাহিত্যধৃত অস্পষ্ট স্মৃতি বা কাহিনীর উপরও নয়; এ অধ্যায় প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বাঙালি কৃষি-সমাজের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব উপাদান-উপকরণের উপর।’^{১৮} বলা বাহুল্য, বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের উপরোক্ত দাবি এই জন্যই যে আমাদের দেশের ঐতিহাসিক কালের অনেকটা উপাদান প্রাচীন স্মৃতি-পুরাণ-কাব্য নির্ভর। আর, আজ আমাদের সামনে উপস্থিত হলো বাংলা ও বাঙালির প্রাক্ ও আদি ইতিহাস প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ও আবিষ্কারের দ্বারা যার একমাত্র কর্মকাণ্ডের নায়ক স্বয়ং পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত। নীহারবাবুর ভাষায়, ‘এ জানা সম্ভব হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে ও বিভাগীয় অধিকর্তা, আমার প্রাক্তন ছাত্রদের অন্যতম

পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের কৃতিত্বে। ...পরেশচন্দ্রই বাঙালির ইতিহাসে এই নতুন অধ্যায় যোজনার প্রথম ও প্রধান নায়ক।’^{১৯}

প্রত্নতত্ত্ববিদ পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের উপরোক্ত কৃতিত্ব ও আবিষ্কারের পথ গোড়ায় খুব একটা মসৃণ ছিল না। অনেক বিরূপ সমালোচনা ও বিতর্কর মুখোমুখি হতে হয়েছে পরেশবাবুকে। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের কলমেও তার স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। তিনি মন্তব্য করেছেন, ‘উৎখননের যত দোষক্রটি থাকুক, তাঁর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার সঙ্গে যত মত-পার্থক্যই পণ্ডিতদের থাকুক, পরেশচন্দ্রই বাঙালির ইতিহাসে এই নতুন অধ্যায় যোজনার প্রথম ও প্রধান নায়ক।’^{২০}

এই নায়ক পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে ‘প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা’—শীর্ষক একটি গ্রন্থে তিনি তাঁর আবিষ্কার এবং প্রতিষ্ঠিত ও পরীক্ষিত সত্যকে প্রকাশ করে যান। অল্পকালের মধ্যে গ্রন্থটি নিঃশেষিত হয়ে গেলে ২৩ বছর পরে দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের কলকাতা চক্রের বর্তমান অধিকর্তা ড. বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনি বলিষ্ঠ ভাষায় মন্তব্য করে বলেছেন, ‘পুস্তকটি একাধারে বাঙলার মানুষের প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগে উত্তরণের বিবরণ বহন করছে তেমনই বিশ্বের অন্যান্য স্থানে পাওয়া নিদর্শন সমূহের সঙ্গে এক তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা এখনকার আবিষ্কারগুলির তাৎপর্য নির্ণয়ে দিকনির্দেশ করেছে।’^{২১}

সুতরাং প্রাগৈতিহাসিক বাংলা ও বাঙালির নিজের কথা লিখতে ও জানতে আজ আর আমাদের সামনে এতটুকু অন্তরায় নেই। প্রত্নতত্ত্ববিদ পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের সাক্ষ্যের পথ ধরে আজ আমরা প্রাক-ঐতিহাসিক পর্ব থেকে ঐতিহাসিক যুগে উত্তরণকে তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করে দেখাতে পারি, যথা:

- ক) প্রাচীনতম পর্ব পাণ্ডুরাজ্যের টিবি : আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দ;
- খ) মধ্য-পর্ব পোখনা বা পুষ্করণা : আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ; এবং
- গ) অন্তিমপর্ব ভরতপুর : আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দ।

ক) পাণ্ডুরাজ্যের টিবি

বীরভূম জেলার রেলপথে বোলপুর শহরের মুখেই অজয়নদ বর্ধমান ও বীরভূম জেলাকে ভাগ করে দিয়ে প্রবাহিত। এরই তীরবর্তী বনকাটি গ্রাম এবং অদূরেই ইলামবাজার, একটু দূরেই পাণ্ডুরাজ্যের টিবি অবস্থিত। এখানেই ১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার কয়েকটি নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের দুজন অধীক্ষক ড. শ্যামচাঁদ মুখার্জি ও দেবকুমার চক্রবর্তী ওই টিবির ওপরে অংশ থেকে সংগ্রহ করে আনেন কৃষ্ণ-লোহিতবর্ণের কোঁলাল ও মনোরম রেখা-চিহ্নিত উজ্জ্বল লাল মৃৎপাত্রের কিছু ভাঙা টুকরো ও তার সাথে ক্ষুদ্রাশ্মীয় দৃষ্টান্ত ও সংশ্লিষ্ট পিণ্ড। নিদর্শনগুলি দেখে পরেশবাবুর মনে হয়েছিল যে, সেগুলি তাম্রযুগের।^{২২}

কয়েক মাস পরে পরেশবাবু নিজেই প্রত্নক্ষেত্র তথা পাণ্ডুরাজ্যের টিবি পরিদর্শন করেন। সে সময় তিনি সেখান থেকে কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্রের কিছু টুকরো, কোশীপাত্রের নিদর্শন, অঙ্গার কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত লোহিতোজ্জ্বল মৃৎপাত্রের অংশ তৈজসপত্র ইত্যাদি বেশ কিছু প্রত্নসামগ্রী সংগ্রহ করেন।

সেই বছর অর্থাৎ ১৯৬১ সালের ডিসেম্বরে দিল্লিতে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বক্ষেত্রের শতবার্ষিকী উৎসবে উপস্থিত পণ্ডিত সম্মেলনে পাণ্ডুরাজ্যের টিবির সংগৃহীত প্রত্ন-সামগ্রীগুলি সবার নজর কাড়ে। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন পুনার ডেকান কলেজ পোস্ট গ্রাজুয়েট রিসার্চ ইন্সটিটিউটের

তৎকালীন ডিরেক্টর বিশ্ববরেন্য পুরাতত্ত্ববিদ ড হ্যাসমুখ ধীরাজলাল সাক্ষালিয়া। সভায় উপস্থিত পণ্ডিতদের সাথে ড. সাক্ষালিয়াও পাণ্ডুরাজার টিবি থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি দেখে এবং পরীক্ষা করে সেগুলিকে তাম্রাশ্মীয় যুগের প্রত্নবস্তু বলে স্বীকৃতি জানানো হয়।^{২৩} এই মর্যাদা প্রত্নতত্ত্ববিদ পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তকে যথেষ্ট উৎসাহিত করে নিজের অভিস্ট লক্ষ্যে অবিচল থাকতে।

পাণ্ডুরাজার টিবিতে এরপর ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত পর পর মোট চারবার উৎখনন কার্য পরিচালিত হয়। রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের তত্ত্বাবধানে তখন উক্ত পদে ব্রতী ছিলেন স্বয়ং পরেশবাবু নিজেই। ক্রমান্বয়ে ওই খনন কার্যে প্রাগৈতিহাসিক বাংলার তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার পর্দা উন্মোচিত করেন প্রত্নতত্ত্ববিদ পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত। তিনি লিখেছেন, ‘এই সময়ে উন্মোচিত হল প্রাগৈতিহাসিক বাংলার বিভিন্ন মানব সমাধি। আবিষ্কৃত হল সে যুগের অধিবসতি স্তর সমূহের পরম্পরা, মনোরম মৃৎপাত্রের সম্ভার, তাম্রসামগ্রী ও অপরাপর নানা নিদর্শন। খ্রিষ্টপূর্ব, দ্বি-সহস্রকের শেষার্ধ্বে যে এদেশে এক উচ্চ মানের সভ্যতার উদয় হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রইল না।’^{২৪}

পাণ্ডুরাজার টিবিকে কেন্দ্র করে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে এক সময় মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। তথাপি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় ওই আবিষ্কারের পুরো কৃতিত্ব প্রত্নতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তকেই দিয়ে মন্তব্য করেছেন, ‘...পরেশচন্দ্রই বাঙালির ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যোজনার প্রথম ও প্রধান নায়ক।’^{২৫}

নীহারবাবু বাঙালির প্রাগৈতিহাসিক কালের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যোজনার দায়ভার পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তকে দেবার পরেও আরও স্পষ্ট করে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, ‘পাণ্ডুরাজার টিবির উৎখননের পদ্ধতি নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে কিছু মতবিরোধ যে আছে, সে সম্বন্ধে আমি একেবারে অনবহিত নয়। তবু, আমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আমার ধারণা হয়েছে, এই উৎখনন নির্গত প্রত্নতথ্যাদি মোটামুটি নির্ভর যোগ্য এবং তার আশ্রয়ে বাঙালির আদি-ইতিহাসের একটা কাঠামো দাঁড় করানো কঠিন নয়।’^{২৬}

নীহাররঞ্জনবাবু পরবর্তী কালে ১৯৮০ সালে ‘সাক্ষরতা’ সংস্করণের সময় উপরোক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও আবিষ্কারের পুরাতন তথ্য পরিমার্জন করেন এবং নতুন তথ্য সংযোজন করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ‘সাক্ষরতা’ সংস্করণে গ্রন্থকার ‘বাঙালির ইতিহাস’ আদিপর্বের মূলগ্রন্থকে দুটি খণ্ডে ভাগ করেন এবং সেখানে দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে ‘সংযোজন’ অংশে পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের আবিষ্কৃত নতুন তথ্য চলিত ভাষায় স্থান করে দেন।^{২৭}

বলা বাহুল্য বাঙালির ইতিহাসে নতুন এই প্রাক-ঐতিহাসিক কালকে ঐতিহাসিক নীহারবাবু ‘প্রাক-উষা’ অধ্যায় বা ‘আদি-ইতিহাস’ বলে উল্লেখ করেন।^{২৮} পাণ্ডুরাজার টিবির অধিবসতির কাল থেকে বাংলা এবং বাঙালির প্রাক-ঐতিহাসিক যুগের সূচনা।

এখানে আরও একটি ঐতিহাসিক তথ্য পাঠককে অবগত করা প্রয়োজন বোধ করছি তা এই যে, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’ বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী থেকে বাংলা ১৩২১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। ৯ বছর বাদে গ্রন্থকারের জীবিতকালে আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৩০ সালে। ইংরাজি ১৯৩০ সালে রাখালদাসবাবুর প্রয়াণ ঘটে। পরবর্তী কালে অথবা বর্তমান দৈর্ঘ্য সংস্করণ ১৪০২ ও ১৪০৫ বঙ্গাব্দে পশ্চিমবঙ্গের নানা অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক আধিকারের বিষয় গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয় দিল্লির জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়। তাতে নবাবিষ্কৃত তথ্য সংযোজিত হওয়ার সব দায় মূল গ্রন্থকারের উপর বর্তায় না সেটা মনে রাখা ভাল।

তবু বিষয়টা আর একদিক থেকে ভাবা যায় যে, প্রত্নতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ও আবিষ্কার যে ঐতিহাসিকদের নিকট গুরুত্ব পেয়েছিল, তার প্রমাণ পাই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণের বহু বছর পরে ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সেগুলি সংযোজনের মাধ্যমে। পাণ্ডুরাজ্যের টিবির আবিষ্কার সেই রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মোট চারবার ওই প্রত্নস্থলে উৎখনন পরিচালিত হয়। তার থেকে বাংলা ও বাঙালির নিজের তৈরি সভ্যতার যে ছবি আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে তা নিম্নরূপ।

পাণ্ডুরাজ্যের টিবির অধিবসতির প্রাচীনতম পর্যায়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ অন্যরকম ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক পরেশবাবুর কথায়: ‘মনে হয় তখন অজয় নদ কিংবা তার একটি শাখা টিবির কিছুটা উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত হত। আরেকটি স্রোতধারা সম্ভবত: এর সঙ্গে একদা মিলিত হয়েছে পূর্ব দিকে।’^{১২৯} তিনি আরও জানিয়েছেন যে, অধিবসতির প্রথমপর্বে স্থানটির উপর তলে প্রসারিত ছিল এখনকার ভূ-নিম্নে দৃশ্যমান রক্তাভ বিন্দু-সমন্বিত বালি ও পলিস্তর। ‘মোটিন্ড স্যান্ড সিণ্ট’বে এর আগে দামোদর তীরে বীরভানপুরে ক্ষুদ্রাশ্মীর আয়ুধ চিহ্নিত স্তরের তলায়। এই স্তর আসলে বেলে পাথরের এক রূপান্তর। ওই রূপান্তরিত পর্বে ‘আবহাওয়াজনিত’ কারণে স্থানীয় বালুকা-প্রস্তর মাকড়া বা ল্যাটেরাইটে পরিণত হয়েছে। মাকড়ার দানা মেশানো এই রক্তাভ ভূমিতে প্রথম স্থাপিত হয় তাম্রযুগের অধিবসতি।^{১৩০} এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। পরেশবাবু জানিয়েছেন যে, প্রথম পর্বের স্তরগুলোতে দেখা গেছে নানা প্রকার কুটারের ধ্বংসাবশেষ, মানব-সমাধি, হাতে তৈরি মৃৎপাত্র; কুমোরের চাকে তৈরি মৃৎপাত্রের অংশ প্রভৃতি।^{১৩১} পাওয়া গেছে ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধও। কুটারগুলো ছিল ছোটো ছোটো, মেঝে ছিল মাকড়ার দানা বা কাঁকরপেটা, বাঁশ ও কাঠকুটো দিয়ে কাদার আস্তরণ যুক্ত প্রকার। গোল এবং আয়তাকার ঘরের মেঝেতে খুঁটির গর্ত দেখে অনুমান করা হয়েছে যে, কুঁড়েঘরগুলোর চাল ছিল পাতা বা ঝড় দিয়ে বানানো। পাণ্ডুরাজ্যের টিবির পরবর্তী স্তরগুলোতেও দেখতে পাওয়া গেছে আগুনে পোড়া বাঁশ-খুঁটি, মাটির আস্তরণ। এই রকম পোড়া নজির প্রাচীন অপর্যাপ্ত অধিবসতি গুলোতেও দেখা যায় তার কারণ সভ্যতার উবালগ্ন থেকেই মাটির কুঁড়েঘর আজও চলে আসছে।^{১৩২} পরেশবাবুর কথায়, ‘কারণ, এই শ্রেণীর মাটির ঘর কিংবা সংশ্লিষ্ট তৃণকুটার তো আবহমান কাল থেকেই বাংলা তথা ভারতের গ্রামীণ অধিবসতির সাক্ষ্যস্বরূপ। এই কুটারের মধ্য দিয়েই উদ্ভাসিত হয়েছে ভারতীয় সভ্যতার শাস্বত জ্যোতি।’^{১৩৩}

জানা গেছে টিবির প্রথম যুগে বিভিন্ন মানব-সমাধি সর্ব ক্ষেত্রে মস্তকবিহীন শায়িত নর-কঙ্কাল। ‘প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই কবরগুলিকে খোঁড়া হয়েছে লালচে বিন্দু ও ছোপ সমন্বিত বালুস্তরে যার উপর প্রথম সূচিত হয়েছে এখানকার তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতি’।^{১৩৪} ওই সময়ে প্রাপ্ত মাটির পাত্রের টুকরো পাওয়া গেছে, সেগুলির বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ —

- ১। কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণের কৌলাল।
- ২। হালকা বাদামী রং-এর কলস।
- ৩। অপ্রচূর্ণ-মিশ্রিত বালুকাময় মৃস্তিকায় গঠিত হাঁড়ি-কলস।
- ৪। লালচে অথবা ধূসর বর্ণের হাতে তৈরি মৃৎপাত্র।^{১৩৫}

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পরেশবাবু উপরোক্ত কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্র সম্বন্ধে জানিয়েছেন যে, এই শ্রেণীর মাটির পাত্রের ভিতরের দিকে কালো রঙ এবং বাইরের অংশ লাল, কমলা প্রভৃতি বর্ণের। তার কারণ হিসাবে উল্টো করে পোড়ানোর কথা বলা হয়েছে। আরও অনুমান করা হয়েছে যে, রঙের বৈপরীত্যকে উজ্জ্বল করতে মুৎশিল্লীরা অন্য রঙের প্রলেপও ব্যবহার করতো।



নবাত্মীয় পর্বে প্রাচীন মিশরেও কৃষ্ণ-লোহিতবর্ণের কৌলালের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। ভারতে সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত লোথালে আবিষ্কৃত হরপ্পা যুগের নৌবন্দরের ধ্বংসাবশেষে, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, মধ্যভারত, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গে ওই কৌলালের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে সুপ্রাচীন নানা সভ্যতার পটভূমিকায়।^{৩৬}

প্রত্নতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছেন, ‘মধ্য ভারতের উজ্জয়িনীর অদূরে অবস্থিত কায়াথায় এই মৃৎপাত্রের প্রচলন ছিল সম্ভবতঃ এমন এক অতীত যুগে যে সময়ে সিঙ্কু-উপত্যকায় হরপ্পা সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছে কি ঘটেনি। কায়াথায় পরিলক্ষিত সভ্যতার উত্তরাধিকার হয়ত রাজস্থানের অন্তর্গত আহাড় এবং মধ্যভারতে প্রবাহিত নর্মদা তীরে অবস্থিত নাভদা-টোলীয় তাম্রাত্মীয় সংস্কৃতি। দক্ষিণ ভারতে কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্রের উপস্থিতি বিশেষ ভাবে পর্যবেক্ষিত হয় মহাত্মীয় (মেগালিথিক) সমাধিসমূহের বৃন্তে। দাক্ষিণাত্যে প্রাপ্ত এই শ্রেণীর কৌলালের গুরুত্বও অবিসংবাদী রূপে স্বীকৃত।’^{৩৭}

উপরে বর্ণিত কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্র ও কৌলালের উপস্থিতি পাণ্ডুরাজ্যের টিবির্ প্রথমপর্বে ও পরবর্তীকালে লক্ষ্য করা গেছে এবং এই সভ্যতার প্রাচীনত্বের দিক থেকে তার গুরুত্ব সন্দেহাতীত। এখানে এক শ্রেণীর ফিকে লাল রং-এর কিংবা ধূসর বর্ণের মৃৎপাত্রের গায়ে ধান, ধানের খোসা ও ধানের শিসের ছাপা দেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন বোটানিস্ট বিজ্ঞানী এ. কে. পাল পরীক্ষা করে জানিয়েছেন যে, মৃৎপাত্রের গায়ে ছাপা ধান-ই। ‘এই আবিষ্কারের দ্বারা প্রমাণিত হল পাণ্ডুরাজ্যের টিবির্ প্রাচীনতম অধিবাসিত পর্বে এখানকার কৃষি-জীবনের মূল ভিত্তি ছিল ধান-চাষ।’^{৩৮} সেজন্য পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মন্তব্য করেন, ‘বঙ্গোপসাগরের সান্নিধ্যেই যে প্রথম ধান্য উৎপাদিত হয়েছে এ বিষয়ে একটি ধারণা প্রচলিত আছে।’^{৩৯}

পরেশবাবু আরও জানিয়েছেন যে, প্রাকৃতিক কোনো এক প্রাবনের ফলে প্রাচীন যুগের তাম্রাত্মীয় সভ্যতার অধিবাসিত আবৃত হয়ে থাকতে পারে। শতাব্দী কালের উপর পাণ্ডুরাজ্যের টিবি পরিভ্রান্ত ছিল, কোনো গ্রাম কিংবা কুটার গড়ে ওঠেনি।^{৪০}

তারপর আসে পাণ্ডুরাজ্যের টিবিতে অধিবাসিতের দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বেই তাম্রাত্মীয় সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ ঘটায় কথা বলা হয়েছে। তার কারণ এই পর্বে যে সব প্রত্নবস্তুগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে তার গুরুত্ব অপরিমিত। বিশেষ করে বঙ্গনামক প্রাচীন জনপদের ক্ষেত্রে। এই পর্বের মৃৎপাত্রগুলি কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণের ও কালো রং-এ চিত্রিত লোহিতোজ্জ্বল কৌলাল। আবার কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণের মৃৎপাত্রগুলির ভিতর দিক স্বেতাভ বর্ণের চিত্রণ দেখা যায়। তার সঙ্গে বৃত্তাংশ, বিন্দু, কৌণিক চিহ্ন ইত্যাদির সারি অথবা সমাবেশ দেখানো হয়েছে। আরও অনেক রকম বৈচিত্র্যের কথা বলা হয়েছে প্রাপ্ত মৃৎভাণ্ডগুলিতে। প্রাপ্ত কোশীপাত্রগুলির নল মনে করিয়ে দেয় প্রাগৈতিহাসিক কালে মিশর, ক্রীট দ্বীপ, এশিয়া মাইনর, ইরান, চীন এবং ভারতের নানা অঞ্চলে প্রচলিত নলসমূহকে।^{৪১} প্রত্নতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মন্তব্য করেন যে, ওই সব নলগুলি ‘চ্যানেল স্পাউট’, ‘ব্রিজ স্পাউট’, ‘টী-পটস্পাউট’ ইত্যাদি নামে পরিচিত এই প্রণালগুলি মূলতঃ তাম্র কিংবা ব্রোঞ্জ যুগের পরিচায়ক।^{৪২} প্রাগৈতিহাসিক চীন, ভারতের রাজস্থানের খুরদি, ইরানের তেপগিয়ানে প্রাপ্ত তাম্র বা ব্রোঞ্জ নির্মিত কোশীপাত্রের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেও মিল পাওয়া যায়।^{৪৩}

পাণ্ডুরাজ্যের টিবিতে অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত মাটির কলস বা ঝারি (‘পারফোরেটেড পট্টারী’) আবিষ্কৃত হয়েছে। সাধারণত আঙ্গকাল নানা ধাতব ঝারি হরেক কাজে ব্যবহৃত হয়। চাল ধোয়ার কাজে অথবা কাঁচা আনাজ ধোয়ার কাজে এই ঝারিগুলি রান্নার সময় মহিলারা ব্যবহার করে থাকেন। ‘সিঙ্কু-উপত্যকা এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে তাম্র কিংবা ব্রোঞ্জ সভ্যতার পরিমণ্ডলে

আবিষ্কৃত হয়েছে বহু ছিদ্র-সম্বিত মুন্সয় পাত্রে নানা নিদর্শন। অথর্ববেদে নিহিত অস্ত্যোষ্টি-সম্বন্ধীয় বর্ণনার উপর ভিত্তি করে পুরাতাত্ত্বিক রমাশ্রীচন্দ্র একদা ধারণা করেছিলেন যে, এই শ্রেণীর মৃৎপাত্রের প্রয়োজন হত পারলৌকিক কৃত্যে মৃতের দেহাবশেষকে শতধারায় কিংবা সহস্রধারায় স্নান করাবার উদ্দেশ্যে।^{৪৪} এই সূত্রেই প্রত্নতাত্ত্বিক পরেশবাবু জানিয়েছেন যে পাণ্ডুরাজ্যের টিবির দ্বিতীয় যুগের একটি মানব সমাধির পরিমণ্ডলে এই রকম একটি মাটির খারি বা কলসের ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হয়েছে যা থেকে মনে হতে পারে যে, অস্ত্যোষ্টি রীতি মেনেই কবরের পাশেই সেটি রাখা হয়েছে।^{৪৫}

পাণ্ডুরাজ্যের টিবির উৎখননে দ্বিতীয় যুগে অধিবাসীদের ব্যবহৃত ক্ষুদ্রাশ্মীয় হাতিয়ার ও তামার সামগ্রী তথা চারট, অ্যামেথিস্ট, জ্যাম্পার প্রভৃতি প্রস্তর নির্মিত জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে। তামার জিনিসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাধারণ কিংবা ঘেরানো চুড়ি, কাজলকাঠি (অঞ্জনশলাকা), পুঁতি, মাছধারার বঁড়শি ও অন্যান্য খুঁটিনাটি ব্যবহার্য সামগ্রী।^{৪৬} তা ছাড়া একটি তামার তৈরি পাতার মতো দেখতে বর্ষাফলক পাওয়া গেছে। মধ্যবর্তী শিরাবিহীন এই অস্ত্রটি মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত তাম্রবস্তুর কথা মনে করায় এবং এর উপস্থিতি বাংলার তাম্রাশ্মীয় সভ্যতাকে চিহ্নিত করেছে।^{৪৭}

তাছাড়া পাণ্ডুরাজ্যের টিবির দ্বিতীয় যুগে উৎখনন থেকে আরও আবিষ্কৃত হয়েছে হাড়ের তৈরি বিভিন্ন বর্ষাফলক, তীর ইত্যাদি অস্ত্র ও বস্তু। তীর নির্মিতির ব্যাপারে পরেশবাবু বলেন যে, একটি লম্বা হাড়কে দু-ভাগ করে চিরে তীর বানানো হয়েছিল। ফলাটি পত্রাকৃতি ও চওড়া ডাঁটিযুক্ত। তিনি আরও বলেছেন, ‘হাড় ও মৃগশঙ্কে নির্মিত বস্তুগুলির সঙ্গে উল্লেখযোগ্য একটি অমূল্য নিদর্শন, কোনো তরুণ জলহস্তীর সূক্ষ্মাঙ্গ ছেদক দস্তে (‘ইনসাইজার টুথ’) সৃষ্ট একটি ধারণযোগ্য অলঙ্কার।’^{৪৮} ওই জলহস্তীর দাঁতটি আবিষ্কৃত হয়েছে টিবির পশ্চিমপ্রান্তে ‘9C পরিখায়’।^{৪৯}

এই ‘টিবির’ দ্বিতীয় যুগে আবিষ্কৃত হয়েছে বস্ত্র-বয়ন তথ্য। ‘মোরামপেটা একটি গৃহতলের নিচে জমাট পরিবেশে আবিষ্কৃত হয়েছে শিমূল তুলার সরু সুতোয় বোনা শ্বেত বস্ত্রের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অংশ। শিমূল তুলা অথবা ‘সিঙ্ক-কটন’-এ বোনা বস্ত্রের এই নমুনা ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার রূপে গণ্য হবে’।^{৫০} এ ব্যাপারে আরও নিশ্চিত হওয়া গেছে টিবির দ্বিতীয় যুগের ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত নকশা করা পোড়ামাটির সুতো-কাটা গোলাকার তক্‌লি। প্রত্নতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক ট্রয় ও আনাতোলিয়ায় আবিষ্কৃত নকশা করা মাটির তক্‌লির সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন।^{৫১} সেজন্য তিনি মন্তব্য করেছেন, ‘....এখানকার সংস্কৃতি যে এক উৎকর্ষ উপনীত হয়েছিল সন্দেহ নেই।’^{৫২}

পাণ্ডুরাজ্যের টিবির দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগের অধিবাসীদের পশুপালনের কথা জানা গেছে। আহাৰ্য হিসাবে মাছ ও পশুমাংস ব্যবহারের কথাও অনুমিত হয়েছে।^{৫৩} পাণ্ডুরাজ্যের টিবির প্রথম যুগে ছয়টি ও দ্বিতীয় যুগে আটটি মানব সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে। তিন ধরনের সমাধির পরিচয় পাওয়া যায়। যথা— প্রাথমিক (প্রাইমারি), দ্বিতীয় পর্যায় (সেকেন্ডারি) এবং কলসের মধ্যে (আব্‌ন বেরিয়াল)। প্রাথমিক পর্যায়ের কবরে মৃতদেহ শোয়ানো অবস্থায় পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আংশিক কঙ্কাল বা অস্থিমাত্র প্রোথিত হয়েছে। তৃতীয় পর্যায় বা বেরিয়ালপর্বে মাটির কলস বা কুস্তের মধ্যে স্থাপন করে সমাহিত করা হয়েছে। প্রথম যুগের কঙ্কালগুলি মস্তকহীন এবং দেহ পূর্ব হতে পশ্চিমে অর্থাৎ পা দুটি পশ্চিমে স্থাপিত। দ্বিতীয় যুগের একটি কঙ্কালের পায়ের নিচের অংশ ছিন্নকৃত। প্রত্নতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মানবদেহের সমাধি সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য উদ্ধার করেন।^{৫৪} যেমন, দ্বিতীয় পর্বের একটি নর-কঙ্কালের অবস্থান প্রসারিত দেখা যায় অপরাপর

অনেকগুলি সমাধির সঙ্গে। তাতে কঙ্কালের মাথা পায়ের দিকে বসানো ছিল এবং দেহের অস্থিগুলি দুটি বড় মাটির কলসে রাখা।

পূর্বদিকেব কলসে অস্থির সংখ্যা বেশি এবং সেটি কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণের একটি বড় গামলা দিয়ে ঢাকা দেওয়া। কঙ্কালের দেহে দুটি পুঁতি দেখা যায়। এর একটি তামার অন্যটি অ্যাগেট পাথরের। একটি সমাধিতে লোহিতবর্ণের সহিদ্র মাটির কলসের ভাঙা অংশ।^{৫৫}

পাণ্ডুরাজ্যের টিবিতে মানব-সমাধিগুলির আবিষ্কার এবং তার জন্য প্রাগৈতিহাসিক বাংলার হারানো সভ্যতার ভাবরূপকে উজ্জ্বল করতে যঁৱভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ, তিনি হচ্ছেন প্রত্নতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, তিনি সেইকালে রাজ্য প্রত্নতাত্ত্বিক অধিকারে উচ্চপদে বৃত্ত ছিলেন।

টিবির তৃতীয় যুগের স্তরে নবাস্থীয় কুঠার আবিষ্কৃত হয়েছে। এই যুগের শেষদিকে অঙ্গার মিশ্রিত লোহার অস্ত্রাদি, মসৃণ কৃষ্ণবর্ণের মৃৎপাত্র, কৌলালে নির্মিত সস্তস্ত থালির ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হয়েছে। মানব সমাধিও এই যুগে মিলেছে।

পাণ্ডুরাজ্যের টিবির দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগে একটি নিজস্ব ও প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। বহু শতাব্দী অতিক্রান্ত হবার এই আবিষ্কার এক উজ্জ্বল সভ্যতার নির্দেশ করে। যেখানে একদা শিল্প ও কৃষি-নির্ভর উন্নত গ্রামীণ জীবন প্রতিফলিত হয়েছিল।^{৫৬}

উপরোক্ত যুগের অধিবসতির শিল্পকৃতির পরিচয় পাই নানা দিক থেকে। যেমন, কারুকার্যময় কোশীপাত্রে নানান নকশা। খোদাই করা একটি মাটির থালির টুকরো, যার একদিকে আঁকা লম্বা ঠোঁট-যুক্ত পাখি এবং আর এক পিঠে আঁকা একটা গাছের পাতা।^{৫৭} প্রত্নতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মন্তব্য করেন, ‘বিহঙ্গটি সম্ভবত ময়ূর, তার চঞ্চুতে বিধৃত আছে কৌণিক ভাবে রচিত একটি আঁকা-বাঁকা রেখা। রেখাটি সর্পের প্রতিক্রম হতে পারে অথবা হতে পারে জলপ্রবাহ।’^{৫৮} তিনি আরও বলেন যে থালির ভাঙা টুকরোর অঙ্কন-চাতুর্যে প্রাচীন মিশরের চিত্রাঙ্কর লিপির বৈশিষ্ট্যের কথা মনে করায়।^{৫৯}

আবার ওই টিবির ধ্বংসাবশেষে ভগ্ন কুঁড়েঘরগুলির বিন্যাস ও নির্মাণে যেমন স্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশিত তেমন বিশিষ্ট প্রযত্নে নির্মিত হয়েছে কৌলাল-আদি তাম্রের অলঙ্কার, রত্ন-প্রস্তরের পুঁতি ইত্যাদি। কুঁড়েগুলোর দেয়ালে কাদার আস্তরণ দেওয়া, মোরামপেটা ঘরের মেঝে, পোড়ামাটির টুকরোয় বাঁধানো অথবা মসৃণ ভাবে চূণ লেপা। তৃতীয় যুগের স্তরে একটি প্রশস্ত কঙ্কের চূণলেপা মেঝের সন্ধান মিলেছে। কুঁড়েঘরগুলির আশে-পাশে গোলাকার বা ডিমের মতো আকার উনুনের সারি আবিষ্কৃত হয়েছে।^{৬০}

তৃতীয় পর্বের সমাপ্তি পর্যায়ে প্রাপ্ত একটি প্রত্ন বস্তুর উপর খোদিত আছে রুইমাছের সারি। কালো রঙের মাটির কলসের গায়ে নানা প্রকার অলঙ্করণ বা নকশা সাক্ষ্য দেয় অতীত ‘শিল্পচেতনা ও ধর্ম বিশ্বাসের’। বাংলার লোক-উৎসবে বা ব্রতকথায় যে ধরনের আল্পনা ও চেতনা কাজ করে, প্রাগৈতিহাসিক এই সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারাই যেন আমরা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বহন করে চলেছি।^{৬১}

দ্বিতীয় যুগের আবিষ্কৃত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, আধুনিক কালের গ্রাম-বাংলায় এ বাড়ি-সেবাড়ির মাঝ দিয়ে বা ধার দিয়ে যেমন মানুষের পায়ে চলার সরু পথ তৈরি হয়, পাণ্ডুরাজ্যের টিবির ধ্বংসাবশেষে এমনই এক গলিপথ কুঁড়েঘরগুলোর মধ্যে পারস্পারিক সান্নিধ্যের প্রমাণ দেয়।

পাণ্ডুরাজ্যের টিবির নানা পর্ব থেকে কিছু কিছু ব্যবহারিক অন্ত্রসন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য টিবির গভীরে ক্ষুদ্রাশ্মীয় প্রত্নদ্রব্য। যথা—প্রায় সমান্তরাল ধার-সমন্বিত ছুরিকা,

‘বুরিন’ (Burin) গোত্রীয় সচঞ্চু অসম চতুষ্কোণ বস্তু, চূড়ায়ুক্ত ছুরি, চাঁচবার অস্ত্র ইত্যাদি। পাওয়া গেছে বাঁকা তীক্ষ্ণাকৃতি ফলা, প্রস্তর-পিণ্ড প্রভৃতি।^{৬২}

এই ঢিবির গভীরে আবিস্কৃত হয়েছে রত্নপ্রস্তর এবং গলার মালায় ব্যবহৃত পুঁতি। আগেই বলা হয়েছে যে দ্বিতীয় যুগের একটি মানব সমাধিতে কঙ্কালের কাছে একটি তামার ও একটি পাথরের পুঁতি আবিস্কৃত হয়েছে। গভীরে প্রাপ্ত পুঁতি সুবজ্রাভ ফায়োস-এ নির্মিত। পাথরের পুঁতিগুলি ডোরাকাটা অ্যাগেট, লাল কনেলিয়ান ও শ্বেতাভ চ্যালসেডোনিতে নির্মিত। ‘উৎখননের ফলে স্পষ্টীকৃত হয়েছে এইসব পুঁতির প্রচলন ছিল তাম্রযুগেই।’^{৬৩}

এই প্রাগৈতিহাসিক বস্তু সভ্যতার একটি আবিস্কৃত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নদ্রব্য হচ্ছে কালো রঙের স্টিয়াটাইট পাথরে খোদিত একটি শীলমোহর। গোলাকার এই বস্তুটির উপর খোদিত একটি মাছ এবং তার সঙ্গে ঢেউ খেলানো রেখা। এগুলোর তলায় গোলচিহ্ন ও অঁচড়ে উৎকীর্ণ কয়েকটি রেখা।^{৬৪} এই শীলমোহরটিকে নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক দেখা দেয়। এমন কি প্রত্নতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত যে স্পষ্ট কোনো ধারণা দিয়েছেন তা নয়। তবে তার মধ্যে ইংরেজ গবেষক মাইকেল রিডলের একটি মন্তব্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন : ‘The cecipherment of the seal of Aetea has in itself already resulted in the falling into place of a great deal of evidence which points to the possibility that the inhabitants of Crete found their way to India 35000 years ago and traded with the people of Bengal.’^{৬৫} অর্থাৎ Aetea-র মোহরাঙ্কিত অংশ থেকে মনে হয় যে, ৩৫০০০ হাজার বছর আগে ক্রীট দ্বীপের মানুষ বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের একটি পথ সম্ভবত সম্ভান করেছিল। Aetea তেমনই একজন নাবিক যাকে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে বাংলায় আসতে হয়।

রিডলে সাহেবের এটুকু অভিমতকে মেনে নেওয়া যায়, আর সব বিষয়গুলোকে নয়। যেমন, ‘শীলমোহরে উৎকীর্ণ জলচরপ্রাণী দুটি কে (?) কয়েকজন জীব-বিজ্ঞানী একমত হয়ে একটি ‘হাতুড়ি-মুখ হাঙ্গড়’ (Hammer-head Shark, Sphyrna Zygnaea), বলে দাবি করেছেন। আরও দাবি করা হয়েছে যে, প্রাচীন মিশরে প্রাপ্ত একটি নলাকৃতি শীলমোহরে (Cylinder Seal) অঙ্কিত মীন চিহ্নের কথাও মনে করায়।^{৬৬}

ভারতে এবং পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে এই রকম অনেকগুলি শীল আবিস্কৃত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত একটি পোড়ামাটির শীলের একপিঠে অঙ্কিত একটি বাঁড়ের উপর উল্লম্বনরত দুটো মানুষ, অন্যপিঠে আদিম রীতিতে চিহ্নিত একজোড়া গাছ। মহেঞ্জো-দারোতেও এই রকম অনেকগুলি শীলমোহর আবিস্কৃত হয়েছে। রিডলে সাহেব এগুলির শিল্পরীতিতে প্রাগৈতিহাসিক ক্রীট দ্বীপের মিনোয়ান শিল্পশৈলীর সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক পরেশবাবুও রিডলের ধারণাকে উড়িয়ে দেন নি, বরং মেনেই নেন।^{৬৭}

আরও মজার ব্যাপার যে পাণ্ডুরাজ্যের ঢিবিতে প্রাপ্ত শীলমোহরে চিত্রিত রেখাগুলিকে রিডলে সাহেব ক্রীট দ্বীপের প্রাগৈতিহাসিক কালে ব্যবহৃত লিনীয়ার-এ লিপির সাদৃশ্যের কথা তুলেছেন। পরেশবাবু রিডলের মতামতকে অস্বীকার করেননি, মন্তব্য করেছেন, ‘তবে শীলমোহরে স্রোতপ্রবাহ এবং জলচর প্রাণীটির রূপায়ণ সন্দেহাতীত। এখানে রিডলের কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না।’^{৬৮}

বিস্ময়ের ব্যাপার রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সর্বৈক্ষণের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বার্ষিক রিপোর্টে পাণ্ডুরাজ্যের ঢিবিতে প্রাপ্ত শীলটিতে রিডলে কথিত লিনীয়ার-এ লিপি বা প্রাগৈতিহাসিক মিনোয়ান অক্ষরের কোনো নামগন্ধের কথা নেই, সেখানে একটি পৃষ্ঠায় চারটি প্রত্নবস্তুর চিত্র ছাপা হয়। এগুলির একটি চিত্র পাণ্ডুরাজ্যের ঢিবিতে প্রাপ্ত ওই শীলমোহরের। চিত্রের উপরে লিখিত আছে ‘A stone(?)

seal engraved with a Kharoshti inscription'। আরও বলা হয়েছে যে রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব দপ্তরে শীলটি রক্ষিত আছে।^{৬৯}

বলা বাহুল্য যে ১৯৮৪-৮৫ সালের দিকে রাজ্য প্রত্নতাত্ত্বিক দপ্তরের সহায়তায় উক্ত টিবিতে আরও একবার খননকার্য পরিচালনা করা হয়। সম্ভবত তার পরই শীল সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পুরোনো মত বদল করে বার্ষিক রিপোর্টের চিত্রে নতুন ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে।

আর ওই শীলে খোদিত জলচর প্রাণী—যাকে হাতুড়ি-মুখ-হাঙ্গর বলে দাবি করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে বর্তমান প্রাবন্ধিকেরও নিজস্ব একটা মতামত রয়েছে।

প্রথমত, খরোষ্টি লিপি খোদিত শীলটিকে ভারতীয় অথবা বাঙালি শিল্পীর তৈরি ভাবা যায়। প্রাচীন বাংলায় চন্দ্রকেতুগড়, তমলুকের নিকট পার্বতীপুর, হাদিপুর প্রভৃতি উৎখনন কেন্দ্রগুলিতে প্রাপ্ত বেশ কিছু পোড়ামাটির শীল ও মাটির কলস বা পাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলির গায়ে খরোষ্ঠিলিপি খোদিত দেখা যায়।

দ্বিতীয়ত, প্রাচীন কালে ভারতীয় বা বাঙালি শিল্পীরা হাঙ্গর নয় মকরবাহিনী দেবী গঙ্গার বাহন 'মকর' বা কুমীরের কথাই বার বার শিল্প সৃষ্টির মাধ্যমে স্মরণ করেছেন। পাণ্ডুরাজ্যের টিবিতে প্রাপ্ত শীলেও ভাল করে নজর করলে বোঝা যাবে—মুখোমুখি মকর-যুগল উৎকীর্ণ রয়েছে।

পরবর্তীকালে হিন্দু বা মুসলমান অধিকারের কালেও শিল্পের সেই একই ধারা শিল্পীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে এসেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় মহিলাদের হাতের, সোনার বালায় মকরের মুখ, তাছাড়া মেদিনীপুর জেলার একটি টেরাকোটায় ফুটে উঠেছে একটি নৌকায় পসরা নিয়ে দণ্ডায়মান কয়েকজন মহিলা যাত্রী, নৌকার তলদেশে লম্বালম্বি নৌকা-প্রমাণ একটি মকর বা কুমীর।^{৭০}

মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যে অসংখ্য নৌকা বা জলযানের সংবাদ পাই। কবি মুকুন্দ চন্দ্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে বেশ-কিছু নৌকার নাম ও নির্মাণ-পদ্ধতির বিবরণ মেলে। সিংহলে পিতা ধনপতির সম্মান করতে সমুদ্র-যান বা বড় আকারের সাতটি নৌকা নির্মাণ করাতে শ্রীপতি শিল্পীর সম্মান করে। তখন দেবী চণ্ডীর নির্দেশ পেয়ে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা, পুত্র দারুব্রহ্ম এবং মহাবীর হনুমান মনুষ্যবেশ ধারণ করে সাতটি নৌকা নির্মাণ করেন। কবি বলেছেন—

হনুমন্ত মহাবীর নখে করে দুই চির
কাঁঠাল পিয়াল তাল সাল
গাঁস্তারি তমাল ডহ নখে চির্যা রাখে বহ
দারুব্রহ্মে জোগায় গজাল।
শিলায় সানায়্যা বাশি পাটি চাঁছে রাশি রাশি
নানা ফুলে বিচিত্র কলস
পিতাপুত্রে দৌহে আঁটি গঁজালে গাঁথিয়া পাটি
গড়ে ডিঙ্গা দেখিতে রূপস।
প্রথমে করিল সজ দিঘে ডিঙ্গা শত গজ
আড়ে গজ বিংশতি প্রমাণ
মকর-আকার মাথা গজেক অন্তরে বাতা
মানিকে করিল চক্ষুদান।^{৭১}

এই বাণিজ্যতরী 'মধুকর ডিঙ্গা'র মাপজোক ও নির্মাণকলাও উল্লেখ করা হয়েছে। ডিঙ্গার মাথা 'মকর-আকার' আর মণি-মাণিক্য বসিয়ে নৌকার 'চক্ষুদান' করার কথাও বলা হয়েছে।

আবার বাংলায় মুসলমান অধিকারের সময় নির্মিত লোহা ও পিতলের কামানের গায়ে নয়ন-লোভন নকশা চোখে পড়ে। ‘এ ছাড়া কামানটির মুখের দিকে লম্বা টিকলো সরু নাসিকায়ুস্ত এক মানুষ বা দৈত্যের মুখমণ্ডল। অন্যদিকে সে মুখমণ্ডলটি আবার কুমিরের মুখের মতো দাঁতালো মুখব্যাধন করা’^{৭২}।

তারপরেও যদি কারও মনে হয় শীলটি ভারতীয় বা বাঙালি শিল্পীর সৃষ্টি নয়, ক্রীট দ্বীপবাসী শিল্পীর খোদিত, তখন আমাদের হাতের পাঁচ বিশ্বের প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থ ঋগ্বেদের কথা পাড়তে চাই। সেখানেই শিল্প ও বিজ্ঞানের দেবতা বিশ্বকর্মার প্রশংসা ও শিল্পদ্রব্য বা অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের প্রসঙ্গ উচ্চারিত হয়েছে। পরবর্তীকালে সেই দেবতার পুত্র-বংশ থেকেই শিল্পবিদ্যা দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক উপরোক্ত বস্ত্রব্যের প্রতিধ্বনি শুনতে পেলাম ভাস্কর মীরা মুখোপাধ্যায়ের মুখে।^{৭৩}

মীরা দেবী ভারতীয় শিল্প ও শিল্পীদের সম্পর্কে ক্ষেত্র অনুসন্ধান করতে গোটা ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য ঘুরে এসে নিজে অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান দ্বারা রচনা করলেন ‘বিশ্বকর্মার সন্ধান’ শীর্ষক একটি গ্রন্থ। গ্রন্থের সূচনায় তিনি বলেছেন যে, পুরাণে কথিত সমুদ্রমহুনের কালে মন্দরপর্বতকে পাকে-পাকে জড়িয়ে অমৃত, লক্ষ্মী, ধন্বন্তরি, ঐরাবত প্রভৃতি মানুষের অশেষ কল্যাণকর বহু ধনসম্পদ উত্তোলনের কাজে যিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন, তিনি ছিলেন অনন্তনাগরূপী স্বয়ং বিশ্বকর্মা। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন যে, এই বিশ্বকর্মা নানা রূপে নানা দেশে ভ্রমণ করেন এবং সমুদ্রকে শাসন করেন। মীরা দেবী মন্তব্য করেছেন, ‘চীন, জাপান, ভূটান প্রভৃতি দেশে সমস্ত বৌদ্ধ উৎসবে ড্রাগন এক বিশিষ্ট চরিত্র। আমাদের দেশে গঙ্গার বাহন যে মকর বা মগর, তার অর্থ যদিও কুস্তীর, তবু ছবি ও ভাস্কর্যে কোথাও মকরের মাথা ঠিক কুমীরের মতো নয়, মুখটি উপরে ওঠানো, দেখতে অনেকটা ড্রাগনের মতো। চীনা ভাষায় ড্রাগন মানে একজন অতিশয় ভাল লোক, বিশেষ গুণী লোক, যিনি সব রকমের হাতের কাজে অত্যন্ত নিপুণ ও পারদর্শী ছিলেন। মানুষের কল্যাণের জন্যই তিনি সতত কাজ করে গেছেন।’^{৭৪}

মীরা দেবী এই প্রসঙ্গে আরও মন্তব্য করেন, ‘আবার সর্প, মৎস্য বা কুমীরের খোলসে ঢাকা তাঁকেই দেখতে পাওয়া যায় সুমের, মিস্রিকো বা ভারতবর্ষের প্রাচীন ও লৌকিক শিল্পকর্মে।’^{৭৫}

এরপরেও মনে করা যেতে পারে, পাণ্ডুরাজ্যের টিবিতে প্রাপ্ত শীলে উৎকীর্ণ জলচর প্রাণীদুটি হাতুড়ি মুখ হাড় না মকর বা কুমীর তা পাঠককে বোঝানোর আর প্রয়োজন নেই।

প্রাগৈতিহাসিক পাণ্ডুরাজ্যের টিবির বিভিন্ন পর্বে নানা ভঙ্গিমায় পোড়ামাটির বেশ কিছু মূর্তি পাওয়া যায়। এর মধ্যে নারীমূর্তির মাধ্যমে দেবীকল্পনার পরিচয় মেলে। দ্বিতীয় পর্বে প্রাপ্ত একটি ভগ্ন পুরুষমূর্তিতে ফুটে উঠেছে ব্যায়াম অথবা নৃত্য। তৃতীয় পর্বে প্রাপ্ত দুটি পুরুষ মূর্তি মুখের ভঙ্গী, টানা টানা চোখ, দীর্ঘ নাক, বিস্তৃত কর্ণ ও সুস্পষ্ট চিবুক। ‘একটি মূর্তি কৌণিক শিরস্ত্রাণ পরিহিত।’ মূর্তি দুটিকে পাওয়া গেছে যে স্তরে সেখানে ছোট একটা দুধার তরবারিও পাওয়া যায়।^{৭৬}

সব মিলিয়ে পাণ্ডুরাজ্যের টিবিতে প্রাগৈতিহাসিক পর্বে বাঙালির নিজের হাতে গড়া এক উজ্জ্বল অধ্যায় বা ইতিহাস মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। প্রাচীনত্বের প্রশ্নে খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক দু-হাজার অব্দে বঙ্গনামক জনপদে এক উচ্চমানের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায় : ‘...সে রূপের প্রধান লক্ষণ চাষের প্রবর্তনা, স্থায়ী বসতি ও বাস্তুনির্মাণ, গৃহপশু পালন, সমাজ নির্মাণ। এই নূতন রূপটি প্রথম ধরা পড়েছে পাণ্ডুরাজ্যের টিবি উৎখননের ফলে। এই রূপই বাঙালীর আদি—ইতিহাসের রূপ।’^{৭৭}

বাঙালির ইতিহাসের এই প্রাগৈতিহাসিক পর্ব ইতিহাসের আলোয় তুলে আনার সমস্ত কৃতিত্ব বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নীহারবাবু পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তকেই দিয়েছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, ‘উৎখননের যত দোযত্রটি থাকুক, তাঁর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার সঙ্গে যত মত-পার্থক্যই পণ্ডিতদের থাকুক, পরেশচন্দ্রই বাঙালীর ইতিহাসে এই নূতন অধ্যায় যোজনার প্রথম ও প্রধান নায়ক’।^{৭৮}

খ) বঙ্গসভ্যতার আর নাম পোখমা

পাণ্ডুরাজ্যের ঢিবিতে গড়ে ওঠা বাঙালির সভ্যতার আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব চার-পাঁচশো বছর পরে প্রাগৈতিহাসিক পর্বে আর একটি পুরাতন সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গেছে বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড় থেকে প্রায় পঁচিশ-তিরিশ কিলোমিটার উত্তরপূর্বে দামোদর নদের দক্ষিণতীরে বড়জোড়া থানার অদূরে পোখমায়।

পোখমা বা পখমার প্রাচীন উচ্চারণ পুঙ্করণ। ১৯২৭-২৮ সালে প্রথম পুরাতাত্ত্বিকদের নজরে আসে; তবে সেই সময় এই কেন্দ্রে প্রাচীন বঙ্গসভ্যতা সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায়নি। ১৯২৭ সালে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের কে এল. দীক্ষিত শুশুনিয়া পাহাড়ের শিলালিপির প্রামাণ্য নিদর্শনকে প্রথম জনসমক্ষে আনেন। পরের বছর ১৯২৮ সালে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এখানে আসেন এবং এখান থেকে একটি যক্ষ্মণীমূর্তি সংগ্রহ করে নিয়ে যান। বর্তমানে সেটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে স্থান পেয়েছে।

সূত্রাং স্বাভাবিক ভাবেই পোখমার কথা বলতে গিয়ে শুশুনিয়ার কথা আসেই; তেমনি শুশুনিয়ার প্রসঙ্গে পোখমার সভ্যতার আলোচনাও গুরুত্বপূর্ণ। তাই ওই অঞ্চল সম্বন্ধে কেবল প্রত্নতত্ত্ব নয় ভূতাত্ত্বিক আলোচনাও প্রয়োজন।

বাংলাদেশের প্রত্নাত্ত্বিক অথবা প্রত্নর যুগের সব চেয়ে বেশি ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গেছে শুশুনিয়া পাহাড়ে এবং ওই পাহাড়ের আশপাশে, ঐতিহাসিকরা এমনই মনে করেন। এই প্রসঙ্গে কোনো কোনো ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের প্রসঙ্গ তুলে বলেছেন: ‘আবিষ্কারক শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের মতে অন্তত প্রায় এক লক্ষ বৎসর পূর্বে শুশুনিয়া গিরির পাদদেশে এবং সম্মিকটবর্তী স্থানসমূহে আদিম মানবের জীবনযাত্রার লীলাভূমি ছিল। যাহাদের সংস্কৃতি এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকার বিভিন্ন সুপরিচিত প্রত্ন-প্রস্তর যুগের জীবনধারার সঙ্গে তুলনীয় এমন কি মস্তিষ্কক্ষমতা (Brain Capacity) ক্ষমতা সম্বন্ধেও অনুমান করিবার চেষ্টা হইয়াছে।’^{৭৯} সময় বা কালপর্ব নিয়ে যত বিতর্ক থাকুক শেষ পর্যন্ত স্বীকার করা হয়েছে, ‘তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, অজ্ঞ উপত্যকার সাতকাহলীর অরণ্য হইতে এবং বনমাটির ক্ষুয়িষ্ণু প্রান্তর এককালে প্রত্ন-প্রস্তর-যুগের মানবের অশ্মীভূত কাষ্ঠ এবং শঙ্ক ও আয়ুধ নির্মাণের ক্ষেত্র ছিল।’^{৮০} শুশুনিয়া পাহাড়ের সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিচরণশীল আদিম হস্তী, মহিষ, অশ্ব ও গবাদি পশুর ফসিল বা জীবাশ্ম।

সূত্রাং নানা দিক থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিকদের কাছে শুশুনিয়া এবং তার অদূরে অবস্থিত পোখমায় পাণ্ডুরাজ্যের ঢিবির নিকটতর আর একটি বাঙালির নিজের তৈরি সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। উক্ত শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে ও বিষ্ণুচক্রের নিচে নিম্নলিখিত কটি ছত্র উৎকীর্ণ দেখা যায়

পুঙ্করণাধিপতে মহারাজ শ্রীসিদ্ধবর্মণঃ পুত্রস্য

মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্মণঃ কৃতিঃ চক্রস্বামিনঃ দোসগ্রেণাতিসৃষ্টঃ

শ্রদ্ধেয় ভাষাতত্ত্ববিদ সুকুমার সেন এর অর্থ করেছেন: ‘পুঙ্করণার রাজা মহারাজ সিংহবর্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মার কৃতি। চক্রস্বামীর অর্থাৎ বিষ্ণুর হস্তাগ্র হইতে বিনির্গত।’^{৮১}

অর্থাৎ বাঁকুড়ার অনতিদূরে শুশুনিয়া পাহাড়ের বিধ্বস্ত গুহার গায়ে বিয়ুচক্রের নিচে ও পাশে ব্রাহ্মী অক্ষরে সংস্কৃত গদ্য ভাষায় উৎকীর্ণ। ‘পুষ্করগাধিপতে মহারাজ শ্রীসিদ্ধবর্মণঃ পুত্রস্য’ ইত্যাদি। বলা হয়েছে ‘শুশুনিয়া পাহাড়ের কয়েক ক্রোশ দূরে উত্তর-পূর্বে দামোদর তীরে পোখরগা গ্রাম আছে। ইহাই সিংহবর্মার রাজধানী পুষ্করগা ইহতে পারে।’^{৮২}

এই শিলালিপির সময়কাল সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক। এই পরিপেক্ষিতে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, অপরাপর শিল্পী সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রাচীন পোখমা বা বঙ্গ জনপদে শিলাশিল্পী বঙ্গ-সন্তানরাও বাস করতেন।

পরবর্তী কালে ১৯৯৬ সালে পোখমায় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়। তারপর ১৯৯৭ সাল থেকে সাত বছর একটানা ধারাবাহিক ভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগের পাঁচ সদস্যের একটি গবেষকদল পোখমায় অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যান। তাঁরা সংগৃহীত প্রত্নদ্রব্য থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একমত হন। গবেষকদলের অভিমতে জানা যায়, দামোদরের দক্ষিণ-উপকূল বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কৃষি-নির্ভর এক নগর-সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। প্রাচীনত্বের দিক থেকে এই অবস্থান “চালকোলিক পিরিয়ড”। অর্থাৎ যখন তামার ব্যবহার বহুল প্রচলিত; আবার লোহার ব্যবহারও সদ্য শুরু হয়েছে। গবেষকদল মনে করেন আজ থেকে আড়াই তিন হাজার বছরের পুরাতন এই সভ্যতার অধিকাংশ নিদর্শনই নদীগর্ভে চলে গেছে।

এই অঞ্চলে উৎখানের ফলে মাটির বিভিন্ন স্তরে যে ব্যাপক সংখ্যায় পোড়া মাটির তৈরি গৃহস্থালী বাসন, খেলনা ইত্যাদি পাওয়া গেছে তার কার্বন আইসোটোপ (C-14) পরীক্ষার দ্বারা এই সভ্যতার দীর্ঘ স্থায়িত্ব ও প্রাচীনত্ব সম্পর্কে তাঁরা নিশ্চিত হয়েছেন। তাঁরা এও বলেছেন যে, কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সভ্যতার বিকাশে নদী উপত্যকায় নগর-সভ্যতার পুঙ্কন ঘটায়। ১৯৯৭ সালে খননকার্যে নদীর পাড় বরাবর আবিষ্কৃত হয় অসংখ্য পাতকুয়া এবং এগুলি নগর-সভ্যতার নিদর্শন। নদীর ভাঙনে এগুলি আজ নিশ্চিহ্ন।

অন্যান্য প্রত্ন সামগ্রী থেকে ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে আদান-প্রদানের ব্যাপারে অনেক তথ্যই আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রীর মধ্যে শীলমোহর, হাড়ের তৈরি অস্ত্র ও অলঙ্কার, টেরাকোটার সামগ্রী, তামার চতুষ্কোণ মুদ্রা ইত্যাদির সঙ্গে মগধ ও পাটলিপুত্র প্রভৃতি জায়গায় প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের অনেক সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য থেকে গবেষকদল প্রাচীন বঙ্গ ও আর্যাবর্তের নিকটতর জনপদগুলির সমসাময়িক সভ্যতাগুলির মধ্যে আদান-প্রদানের কথা অনুমান করেছেন। খননে প্রাপ্ত মসৃণ পাথরের যন্ত্রগুলির উন্নত উৎপাদন প্রণালীর সাক্ষ্য বহন করে। ভৈরবভাঙ্গায় খননের ফলে ১.২২ মিটার এবং ১.৪৩ মিটার গভীরতায় দুটি পরপর মেঝের সমতল ভূমি, অগ্নিকুণ্ডের (উনানের) চিহ্ন, ছাই, কাঠকয়লা, কয়েকটা ধাতুমলের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর আগের স্তরে একটা ধাতুর তৈরি (তামা এবং লোহা) মেঝের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

গবেষকরা ধারণা করেছেন যে ব্যবসা বাণিজ্য নদীপথেই চলতো। সামুদ্রিক কচ্ছপের একটি কঙ্কাল (ফসিল) খননে উদ্ধার হয়। এ থেকে মনে করা হয়েছে যে, তৎকালীন পূর্ব-ভারতের সমুদ্র-বন্দরগুলির সঙ্গে নদীপদে এখানে নাগরিকদের ও বণিকদের যোগাযোগ ছিল। লাল, কালো, চকচকে নকশাযুক্ত যে সমস্ত পোড়ামাটির সামগ্রী উদ্ধার করা গেছে তা উন্নত মৃৎশিল্পের বিকাশের স্বাক্ষর বহন করে। পোখমার পশ্চিমপ্রান্তে ভৈরবভাঙ্গায়, ভাদুটেভাঙ্গায় এখনও সভ্যতার কিছু অবশিষ্টাংশ রয়েছে।^{৮৩}

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলিপুর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সংগ্রহশালায় বেশ কিছু চতুষ্কোণ তাম্রমুদ্রাও আছে। আছে একটি অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত পোড়ামাটির কলস, যা চাল ধোওয়ার কাজে

ব্যবহৃত হোত। এর থেকে তৎকালীন নাগরিকদের উন্নত নগর সভ্যতার পরিচয় মেলে। তবে এটি শবদেহের পাশে রাখার কথা বলা হয়েছে, হয়তো পারলৌকিক কোনো চিহ্ন হিসাবে।

পোখন্মায় মহারাজ সিংহবর্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মার প্রাচীন সমৃদ্ধ এক রাজ্য ছিল। বাঁকুড়ার গুপ্তনিয়া পর্বতগাত্রে এই পুষ্করণা বা পোখন্মার কথা উৎকীর্ণ আছে, ঠিক তেমনি ভাবে টুসু গানের উৎস বাঁকুড়ার কয়েকটি সংগৃহীত টুসুগানে লোকমুখে পোখন্মার কথা, সমৃদ্ধির কথা উঠে এসেছে। যথা :

টুসালু গো রাই।

তুমার দৌলতে আমরা ছব্ড়ি পিঠা খাই।

দুব্ড়ি লো লব্ড়ি গাঙ সিনানে যাই।

গাঙের জল রাঁধিবাড়ি মকরের জল খাই।।

চার মাস বর্ষা পোখন্মা যাই।

পোখন্মাতে দেইখে আইলম্ দুয়ারে মরাই।।

(টুসু, শান্তি সিংহ)

টুসুগানের ব্যাপ্তি দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার—মূলত বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, হুগলীর কিছু অংশ, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পাশের রাজ্য ঝাড়খণ্ডের ছোটনাগপুর অঞ্চলের ধানবাদ, সাঁওতাল পরগণা, রাঁচি, হাজারিবাগ প্রভৃতি অঞ্চল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

টুসু গানটির আরও পাঠান্তর পাওয়া গেছে, তাতে কোথাও পোখন্মা=পুকুর না=পইখর্ না শব্দ মিলেছে। আর একটিতে দেখি—

‘চার মাস বর্ষা পোখন্মা যাই

পোখন্মায় দেখে এলাম দুয়ারে মরাই।

বড় মরাই-এ পা দিয়ে ছোট মরাই-এ, পা দিয়ে।

রাই এসো গো ঝলমলিয়ে।

(গণশক্তি, ২৩ অক্টোবর, ২০০৪)

উপরোক্ত দুটি টুসুগানের মধ্যে প্রাচীন পোখন্মায় মানুষের সুখে শান্তিতে বাস করার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। টুসু উৎসব পৌষমাসে হয়, তখন ঘরে ঘরে পিঠে আর নতুন ধানের গোলা বা মরাই আনন্দের বার্তা এনে দেয়।

সভ্যতার উষালগ্ন থেকে মানুষ কৃষিকর্ম করছে। তাই কৃষিকর্মের সঙ্গেই নানা ব্রতভাবনা জড়িত। বেদ ও পুরাণের কাল থেকেই ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে কৃষিকর্মের অবসরের সময় নানা ব্রত বা মাস্তুলিক অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। বাংলার টুসু-ভাদুও তাই। আচার্য সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন “তোসলা বা পোসলা পরব এ দেশের খুব প্রাচীন প্রথা, অশোকের কলিঙ্গ অনুশাসনে ইহার ইঙ্গিত আছে। অশোক বলিয়াছেন, আমার নীতি অনুশাসন যেন প্রজারা তিষ্য নক্ষত্রে (অর্থাৎ পৌষালি উৎসবের সময়) শোনে এবং অন্য সময়েও ইচ্ছামত শুনিতে পায়।”^{৮৪}

এ থেকে এখানে একটা প্রশ্ন উঠে আসতে পারে যে, বাংলার ব্রত-পার্বণের সঙ্গে অনার্য-অনুষঙ্গ কতটা জড়িত? প্রাচীন যুগের কৃষিভিত্তিক জীবনে পালনকর্তা বিষ্ণুর শক্তি হলেন লক্ষ্মী—তিনি শ্রীরূপা কৃষিলক্ষ্মী। প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে লক্ষ্মীর উল্লেখ ও তাঁর পূজার উল্লেখ থাকলেও গুপ্ত সাম্রাজ্যের কাল থেকেই এই দেবীর পূজার প্রচলন হয়েছিল। বিষ্ণু শক্তিরূপ বা বিষ্ণু-পত্নীরূপেই তাঁর মুখ্য পরিচয় নয়, ‘তিনি শস্য, সৌন্দর্য, সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে আপন স্বতন্ত্র মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত।’^{৮৫}

এহেন শক্তিরূপা লক্ষ্মীর স্বামী—বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন মহারাজ চন্দ্রবর্মা। পুরাতাত্ত্বিক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন : ‘The Susunia inscription also furnishes the earliest

record to Vishnu worship in Bengal'. বাংলায় বিষ্ণুপূজা প্রচলনের শুশুনিয়া লিপিই হচ্ছে পুরাতন প্রমাণ। পাহাড় উৎকীর্ণ চক্র বিষ্ণুর প্রতীক, তাই তিনি চক্রস্বামী। অমিয়বাবু আরও বলেন, ‘...that king ChandraVarmana who has been mentioned as the chief of the servants of Chakraswami who was a worshipper of Vishnu’. আগেই বলেছি যে তাঁর সময় থেকে বাঁকুড়া অঞ্চলে বিষ্ণুপূজার চল হয়েছিল। এখানে অর্থাৎ পোখমায় খনন করে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ‘প্রাক্ মৌর্য, মৌর্য ও শুঙ্গ-কুষাণকালের পোড়ামাটির মূর্তি ও উত্তরদেশীয় কৃষ্ণাঙ্কুর কৌলাল (Northan Black Polished Work)। এখানে সংগৃহীত মৌর্যযুগের একটি অনন্য নারীমূর্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। অপরাপর কয়েকটি মূল্যবান পুরাবস্তু রক্ষিত আছে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব গ্যালারীতে।’^{৮৬}

বিষ্ণুর উপাসক মহারাজ চন্দ্রবর্মা প্রাগৈতিহাসিক কালেই গোটা আর্যাবর্তের অধীশ্বর হতে পেরেছিলেন এমন অনুমান অসংগত নয়। কারণ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আর্যাবর্তের নানা স্থানে চন্দ্র নামে জনৈক রাজার নাম খোদিত লিপিতে সন্ধান পান। অনেকে ওই অভিমত সমর্থন করেন না। কেননা রাজপুতানার অভ্যন্তরীণ পোখরনা ও পশ্চিমবঙ্গের শুশুনিয়া পাহাড়ের অদূরে পোখমা বা পুষ্করণা এক নয়। মহারাজ সিংহবর্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মার কথা শুশুনিয়া পাহাড় গায়েই উৎকীর্ণ দেখা যায়। অন্যত্র নয়।

প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বঙ্গদ্বার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে’ নিজ যুক্তির পক্ষে এই সম্পর্কে যা বলেছেন তা এই যে, খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে কুষাণ সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, বঙ্গে বা মগধে কোন জাতীয় রাজ-বংশের অধিকারে ছিল তা জানা যায়নি। ‘এই সময়ে রাজপুতানার মরুপ্রদেশের পুষ্করণা নগরের অধিপতি চন্দ্রবর্মা সপ্তসিঙ্ঘুর মুখ ও বাহ্লিক হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত সমস্ত আর্যাবর্ত জয় করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে বাঁকুড়া জেলায়, শুশুনিয়া পর্বতগায়ে চন্দ্রবর্মার যে শিলালিপি আছে, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার পিতার নাম সিংহবর্মা এবং তিনি চক্রস্বামী বা বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। পুরাতন দিল্লির ধ্বংসাবশেষ মধ্যে কুতুবমিনারের নিকটে মসজিদ কুতুব-উল-ইসলামের অঙ্গনে একটি বৃহৎ লৌহস্তম্ভ আছে। ইহার গায়ে যে প্রাচীন খোদিত লিপি আছে তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, চন্দ্র নামে জনৈক রাজা বিষ্ণুপাদ গিরিতে বিষ্ণুর ধ্বজ স্থাপন করিয়াছিলেন। এবং বঙ্গে সিঙ্ঘুর সপ্তমুখের পারে ও বাহ্লিক দেশে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মালবদেশে, প্রাচীন দশপুরের (বর্তমান মন্দশোর) ধ্বংসাবশেষ মধ্যে একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, চন্দ্রবর্মার ভ্রাতার নাম নরবর্মা এবং তিনি ৪৬১ বিক্রমাব্দে (৪০৪-৫ খ্রিঃ) জীবিত ছিলেন, এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় নির্ণয় করিয়াছেন, যে শুশুনিয়া পর্বতলিপিতে চন্দ্রবর্মা ও দিল্লির লৌহস্তম্ভ লিপির চন্দ্র একই ব্যক্তি এবং দশপুর বা মন্দশোরের শিলালিপির নরবর্মা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। চন্দ্রবর্মা সমুদ্রগুপ্তের দ্বিধ্বিজয় যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে, বঙ্গদেশে হইতে বাহ্লিক দেশে পর্যন্ত সমগ্র আর্যাবর্ত জয় করিয়াছিলেন। এলাহাবাদের দুর্গ মধ্যে অশোকের শিলাস্তম্ভে সমুদ্রগুপ্তের যে প্রশস্তি আছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমুদ্রগুপ্ত জনৈক আর্যাবর্তরাজকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তির ও শুশুনিয়া শিলালিপির চন্দ্রবর্মা এবং দিল্লির স্তম্ভলিপির চন্দ্র যে অভিন্ন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।’^{৮৭}

কিন্তু রাখালদাসবাবুর উপরোক্ত মন্তব্যের সবটাই সত্য, একমাত্র রাজপুতানার মরুপ্রদেশের

পুষ্করণা নগরের অধিপতি চন্দ্রবর্মার তথ্যটি ছাড়া। তার কারণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একটানা কয়েক বছর খনন কার্যের দ্বারা শুশুনিয়ার অদূরে পোখন্মায় তিন হাজার-সাদে তিন হাজার বছরের একটি প্রাচীন সভ্যতার সন্ধান পাওয়া যায়। সে কথা আমি আগেই বলেছি এবং শুশুনিয়া পর্বতলিপির উক্ত প্রমাণের পর আর কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই পোখন্মার ধ্বংসাবশেষই রাজা চন্দ্রবর্মার রাজধানী ছিল। বস্তুত এই পোখন্মায় যে একদা সমৃদ্ধ জনপদ ছিল, পিঠে পুলি খেয়ে সুখে লোকে বাস করতো এই অঞ্চলে প্রাপ্ত টুসুগানে তার পাথুরে প্রমাণ উঠে এসেছে।^{১৮}

পরিশেষে বলতে চাই রাজপুতানার পুষ্করণা বর্তমানে পরিত্যক্ত একটি মরু অঞ্চল, যেখানে প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী অটলবিহারী রাজপেয়ীর আমলে পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা করা হয়েছিল, সংবাদের শিরোনাম লাভ করেছিল ওই মরুপ্রদেশের ‘পোখন্মা’ নয়—‘পোখরাণ’। প্রত্নতাত্ত্বিক-গবেষকদের অভিমত যে, পোখন্মা মহারাজ চন্দ্রবর্মার রাজধানী যা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার অদূরে শুশুনিয়া পাহাড় ও তার দক্ষিণে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। সমগ্র আর্যাবর্ত জুড়েই এক সময় তাঁর রাজ্যসীমা প্রসারিত হয়েছিল। চন্দ্রবর্মার রাজ্যে প্রজারা সুখে-শান্তিতে বাস করত। গবেষকরা এও মনে করেন যে, শুশুনিয়া লিপি ব্রাহ্মী অক্ষরে সংস্কৃতভাষা যা এক প্রাচীন সমৃদ্ধ জনপদের প্রমাণ দেয়। সাথে সাথে তাঁরা সতর্ক করেছেন যে, আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব দেড় হাজার বছরের বঙ্গ সভ্যতা কি নদীগর্ভে হারিয়ে যাবে?

বঙ্গসভ্যতার অপর এক নাম ভারতপুর : সূচনা খ্রিঃ পূঃ আনুমাঃ ১০০০ অব্দ

ভারতপুর একই রকম আর একটি কেন্দ্র যেখানে খ্রিষ্টজন্মের আনুমানিক এক হাজার বছর আগে বাঙালির নিজস্ব সভ্যতার আর এক বনিয়াদ গড়ে উঠেছিল। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের ১৯৭৩-৭৪ সালের বাৎসরিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে : ‘This period is datable to first millennium B.C., on the basis of pottery and antiquities.’

ভারতপুরের অবস্থান বর্ধমান জেলার বর্তমান পানাগড় রেল স্টেশনের প্রায় সাত কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে দামোদরের বামতীরে। এই কেন্দ্রে উৎখনন কার্য শুরু হয়েছিল ১৯৭০-৭১ সাল থেকে। খনন প্রক্রিয়ায় যৌথভাবে যুক্ত থেকেছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগ এবং ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের পূর্বাঞ্চলীয় দপ্তর। এই খনন কার্য চারটি পর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

প্রথম পর্যায়ে লক্ষ্য করা গেছে, সাদামাটা মাটির পাত্র, রঙ করা মাটির উপকরণগুলি, বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে তা নিয়লিখিক-চালকোলিখিক স্বভাবের বা নব্যপ্রস্তর যুগের—তামা ও পিতলের উপরে খোদিত প্রকৃতিকেই উন্মোচিত করে। এখানকার প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির আকার এবং আঁকা নকশার ধরনের সঙ্গে বীরভানপুর, পাণ্ডুরাজার ঢিবি এবং মহিষদল-এ প্রাপ্ত টুকরো পাথরে মৌলিক কাজ, নব্যপ্রস্তর যুগীয় উপজাতিদের ব্যবহৃত বস্তুর ধরন, সাজিমাটির জপের মালার ছোট ছোট গুটি, তামার তৈরি জিনিষপত্রের মিল লক্ষ করা গেছে। এই পর্বে পোড়ামটিতে নলখাগড়ার ইত্যাদির ছাপ থেকে ধারণা করা যায় যে পচনশীল বস্তু, যেমন বাঁশ খড় নলখাগড়া ইত্যাদি দ্বারা বাড়িগুলি বানানো হয়েছিল। এই কেন্দ্রে খনন কাজ খুবই সীমিত হওয়ায় বাড়ির পুরোপুরি কোনো ছক পাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে উনুনসহ মেঝের আঁচ পাওয়া যায়। মাটির পাত্র ও অন্যান্য প্রাচীন নিদর্শন থেকে অনুমান করা যায় যে, এই যুগের কাল ছিল মোটামুটি এক হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দ।

ভারতপুরের দ্বিতীয় পর্যায়ে যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে তা হচ্ছে যে, এই পর্যায় পূর্ববর্তী সভ্যতাকে অতিক্রম করে লৌহ যুগেরই যেন প্রতিনিধিত্ব করে। এর অব্যবহিত পূর্বযুগের মাটির তৈরি পাত্রাদির নির্মাণ-কলা এ যুগেও চালু থেকেছে। কিন্তু তবু এই শিল্প ছিল অনেকটাই ন্নান বা মর্যাদাচ্যুত।

এবড়ো-খেবড়ো অযন্তসিদ্ধ শস্ত পাত্রই তার প্রমাণ। এই পর্বে উন্নত সম্প্রদায় অল্প কিছু কালোরঙা তারের টুকরোর দ্বারা পালিশ করা জিনিষ উৎপন্ন করেছিল।

তৃতীয় পর্বে ভরতপুর পাকা ইটের কাঠামো অথবা গঠনের জন্য চিহ্নিত, তার সামান্যই আঙ্গ রক্ষা পেয়েছে। সম্ভবত এই পর্যায়ের কালসীমা গুপ্ত অধিকারের অন্তর্গত। কিন্তু এই পর্বে সুগঠনযুক্ত ইট লক্ষ্য করা যায়। এ থেকে বোঝা যায় এই পর্বে মানুষ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে ও আরামে বসবাসের জন্য পাকা ইট ব্যবহার করতে শিখেছিল।

এভাবে কেবল পশ্চিমবঙ্গেই একের পর এক উত্তর দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম একাধিক প্রত্নক্ষেত্র অন্ধকারে আচ্ছন্ন প্রাগৈতিহাসিক যুগকে আলোকোজ্জ্বল ও বর্ণময় করে তোলে এবং ইতিহাসের কালকে যুক্ত করে, সমৃদ্ধ করে বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসকে। চন্দ্রকেতুগড়, জটার দেউল, তাম্রলিপ্ত, কংসাবতীর সংলগ্ন সিঁজুয়া, শুশুনিয়া পাহাড়, পোখমা, পাণ্ডুরাজার টিবি, ভরতপুর প্রভৃতি আরও অনেক প্রত্নক্ষেত্র প্রাচীন বাংলা ও বাঙালির সভ্যতার বিস্তৃতি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তেই থাকে। যুক্ত হয় বর্ধমান জেলার বাণেশ্বরডাঙ্গা, বীরভূমের চণ্ডীদাস টিবি, মহিষদল প্রভৃতি প্রত্নক্ষেত্রে হারিয়ে যাওয়া বাঙালির নিজের তৈরি সভ্যতাকে ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধ-সভ্যতার অনুরূপ গাঙ্গেয় সভ্যতা রূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন।

২০০৫ সালের ২১ ডিসেম্বরের ‘দৈনিক গণশক্তি’ পত্রিকায় লাভপুরের অদূরে সেখমপুরের খোয়াই অঞ্চলে প্রস্তর যুগের প্রত্ননির্দেশনের সংবাদ প্রকাশিত হয়।

এই সব কারণে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে যে, গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডার ও তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী কী শেষ পর্যন্ত অভিযান বন্ধ করেন পূর্বভারতে দুটি শক্তিশালী বঙ্গরাষ্ট্র ‘প্রাচ্য’ ও ‘গান্ধারিডি’র সংবাদ পেয়ে? প্রত্নতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের কথা দিয়েই শেষ করছি। তিনি বলেন, ‘প্রাগৈতিহাসিক বাংলার আশ্চর্য সভ্যতার কাহিনী সমুদয়ই কি একদা ভূমধ্যসাগরীয় বৃন্তে উপনীত হয়েছিল এবং গ্রীক ও রোমান সাহিত্যে বিকীর্ণ করেছিল ‘গান্ধারিডি’র তুলনাহীন বর্ণচ্ছটা। আদি-ঐতিহাসিক পর্বেও এই গৌরব পরিচয়যোগ্য ছিল নিঃসন্দেহে।’^{১০}

উপরোক্ত প্রাগৈতিহাসিক ও ইতিহাস পর্বে বাঙালির সভ্যতায় দেখতে পাই কিছু কিছু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন যাঁরা মাটির হাঁড়ি-কুড়ি কলস, প্রস্তর নির্মিত কুঠার, তামা ও বোজ, লোহানির্মিত অস্ত্র ও গৃহস্থলী দ্রব্য নির্মাণ করেন বাসগৃহ রচনা, সভ্যতার গোড়া পত্তা করেন, তাঁরা কারা? তাঁরা লোকশিল্পী, কিন্তু আর্য না অনার্য বংশোদ্ভূত তা পরবর্তীকালে প্রকাশ পাবে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ

১. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, ১ম খণ্ড, দেজ সং ২০০১
২. পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রাগৈতিহাসিক বাংলা, ২০০৪ সংস্করণ।
৩. পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রাগৈতিহাসিক বাংলা, ২০০৪।
৪. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, দেজ সংস্করণ।
৫. পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রাগৈতিহাসিক বাংলা, ২০০৪ সংস্করণ, ১৮ পৃ।
৬. তদেব।
৭. তদেব।
৮. তদেব।
৯. তদেব।
১০. অ্যালান হাউটন বোড্রিক, ‘ম্যান এন্ড হিজ অ্যানসেস্টার্স’।

১১. পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রাগৈতিহাসিক বাংলা, ২০০৪ সংস্করণ।
১২. তদেব।
১৩. প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া।
১৪. তদেব।
১৫. প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা, ৫৯ পৃঃ দ্রঃ।
১৬. পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, 'প্রাগৈতিহাসিক বাংলা', এবং 'প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া' দ্রঃ।
১৭. বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব।
১৮. তদেব, ৬০ পৃঃ দ্রঃ।
১৯. তদেব, ৬১ পৃঃ দ্রঃ।
২০. তদেব।
২১. প্রাগৈতিহাসিক বাংলা, মুখবন্ধ দ্রঃ।
২২. প্রাগৈতিহাসিক বাংলা, ৮০ পৃঃ দ্রঃ।
২৩. তদেব, ৮০-৮১ পৃঃ দ্রঃ।
২৪. তদেব, ৮১ পৃঃ।
২৫. বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, দ্বিতীয় সংস্করণ ৬১ পৃঃ।
২৬. তদেব।
২৭. তদেব, নিবেদন, দ্রঃ।
২৮. তদেব, ৬০-৬১ পৃঃ।
২৯. তদেব।
৩০. প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা, ৮২ পৃঃ।
৩১. তদেব, ৮২, পৃঃ।
৩২. তদেব ৮২, পৃঃ।
৩৩. প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা, ৮২ পৃঃ।
৩৪. তদেব পৃঃ ৮২।
৩৫. তদেব পৃঃ ৮২।
৩৬. তদেব পৃঃ ৮৩।
৩৭. তদেব পৃঃ ৮৩।
৩৮. তদেব পৃঃ ৮৩।
৩৯. তদেব পৃঃ ৮৩।
৪০. তদেব পৃঃ ৮৪।
৪১. তদেব পৃঃ ৮৪।
৪২. তদেব পৃঃ ৮৪।
৪৩. তদেব পৃঃ ৮৪।
৪৪. তদেব পৃঃ ৮৬।
৪৫. তদেব।
৪৬. তদেব পৃঃ ৮৬-৮৭।
৪৭. তদেব।
৪৮. তদেব পৃঃ ৮৭।

৪৯. তদেব পৃঃ ৮৮।
৫০. তদেব।
৫১. তদেব।
৫২. তদেব।
৫৩. তদেব।
৫৪. তদেব।
৫৫. তদেব পৃঃ ৯৪ দ্রঃ।
৫৬. তদেব।
৫৭. তদেব।
৫৮. তদেব পৃঃ ৯৬।
৫৯. তদেব।
৬০. তদেব, ৯৪ পৃঃ দ্রঃ।
৬১. তদেব, ৯৫ পৃঃ দ্রঃ।
৬২. তদেব।
৬৩. তদেব, ৯৬ পৃঃ।
৬৪. The seal of Aetea And the Minoan scripts.
৬৫. তদেব, ৯৭ পৃঃ দ্রঃ।
৬৬. তদেব, ৯৭ পৃঃ দ্রঃ।
৬৭. প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা, ৯৮ পৃঃ দ্রঃ।
৬৮. রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী সুধীন দেব কাছ থেকে ওই রিপোর্টের জেরসঙ্গ সংগৃহীত হয় যাতে ওই চিত্রটি ছাপা হয়েছে।
৬৯. কৌশিকী ১৯৯৮, সম্পাদক তারাপদ সঁতরা।
৭০. সুকুমার সেন সম্পাদিত 'চণ্ডীমঙ্গল', সাহিত্য অকাদেমি, নয়াদিল্লী।
৭১. কৌশিকী ১৯৯৮, ২১৪ পৃঃ দ্রঃ।
৭২. মীরা মুখোপাধ্যায়, বিশ্বকর্মার সন্ধান।
৭৩. মীরা মুখোপাধ্যায়, বিশ্বকর্মার সন্ধান, ১-২ পৃঃ দ্রঃ।
৭৪. পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রাগৈতিহাসিক বাংলা ৯৮-৯৯ পৃঃ।
৭৫. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, (দে'জ সংস্করণ, ২০০১ ডিসেম্বর), পৃঃ ৬০-৬১ দ্রঃ।
৭৬. তদেব, ৬১ পৃঃ দ্রঃ।
৭৭. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড (দে'জ সংস্করণ, ১৪০৫)।
৭৮. তদেব, পৃঃ ৯ দ্রঃ।
৭৯. তদেব।
৮০. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৯ পৃঃ দ্রঃ (আনন্দ সংস্করণ)।
৮১. ড. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (আনন্দ), ১ম খণ্ড।
৮২. প্রদীপ ব্যানার্জী, পঞ্চমার প্রাচীনত্ব, গণশক্তি, ২৩ অক্টোবর ২০০৪।
৮৩. ড. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, (আনন্দ)। পৃঃ ১৩-১৪ দ্রঃ।
৮৪. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং (৩য় সং) দ্রঃ।

৮৫. West Bengal District Gazetteers, BANKURA, Ed., AmiyaKumar Banerjee, 1968, pp. 68.
৮৬. পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রাগৈতিহাসিক গুপ্তনিয়া, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৬৮, ৩৬ পৃঃ।
৮৭. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড (দে'জ)।
৮৮. শাস্তি সিংহ, টুসু।
৮৯. Indian Archaeology 1973-74, A Review. Edited by B. K. Thapar, D., G. A. S. of India, New Delhi 1979.
৯০. পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা, ১০৮ পৃঃ দ্রঃ।

কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীকার ।।

- রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস (দে'জ)।
- নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব (দে'জ)।
- পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা, (২০০৪ সংস্করণ)।
- কৌশিকী ১৯৯৮, সম্পাদক তারাপদ সঁতরা।
- মীরা মুখোপাধ্যায়, বিশ্বকর্মার সন্মানে, দীপায়ন ১৯৯৩ সাল।
- সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (আনন্দ), ১ম খণ্ড।
- গণশক্তি, ২৩ অক্টোবর ২০০৪, প্রদীপ ব্যানার্জীর 'পঞ্চমার প্রাচীনত্ব'।

রবীন্দ্রকাব্যে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য : সঙ্ক্যাসংগীত থেকে গীতালি

বিশ্বনাথ রায়

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ছিল মূলত ‘গ্রাম্য সাহিত্য’, লোক-সাধারণের অভিমুখী পল্লীজীবন সঞ্জাত। ‘কবিকঙ্কণচণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, মনসার ভাসান, সত্যপীরের কথা সমস্তই গ্রাম্য কাহিনী অবলম্বনে রচিত।’^১—বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রাগাধুনিক সাহিত্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে তিনি আরও জানিয়েছেন, ‘মুকুন্দরামের চণ্ডী, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, কেতকাদাস প্রভৃতির মনসার ভাসান, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এইরূপ শ্রেণীর কাব্য; তাহা বাংলার ছোট ছোট পল্লীসাহিত্যকে বৃহৎ সাহিত্যে বাঁধিবার প্রয়াস।’^২ বস্তুত বাংলা রামায়ণ-মহাভারত পাঁচালী কথকতা ব্রতকথা সংকীর্তন যাত্রা-পালা-গান মঙ্গলকাব্য বৈষ্ণব-শাক্তপদাবলী প্রভৃতি পল্লীসাহিত্যের মধ্যেই পুরাকালে নিহিত ছিল সর্বজনীন বাঙালির মানস পুষ্টির উপাদান। অপরদিকে ডাক ও খনার বচন, অজ্ঞপ্রবাদ-প্রবচন, শুভঙ্করের আরা প্রভৃতির মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে প্রাচীন বাঙালির জ্ঞানচর্চার সম্পদগুলি। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন বাংলার গ্রামীণ জীবনযাত্রার বিচিত্রতার মধ্যেই ‘একটা সাহিত্যের গঠন কার্যও চলিতেছে।’ বৈষ্ণবী ভিক্ষুক মাঝি-মাল্লা, আউল-বাউলের গানে, ঠাকুরমা-দিদিমার মুখে রূপকথা-ছড়ায় সাহিত্যের সেই গোপন স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে সর্বদাই। এক নতুন মনোভাব নতুন অনুরাগ নতুন আন্তরিকতা নিয়ে তিনি দেখলেন পল্লীর চলমান জীবনেরই প্রতিফলন ঘটেছে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে। এর মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করলেন জীবনের রসময়তাকে, জীবন স্রোতের ধারাকে পেলেন বিশেষ মূল্যে। বিশুদ্ধ শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতায় সেই সাহিত্যকে গ্রহণ করলেন নিজের সৃষ্টি কলায় বিচিত্র প্রয়োগ-প্রযুক্তির সাহায্যে।

বিপরীত পক্ষে নবজাগরণ যুগে অধিকাংশ সাহিত্য-সাধক ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির মন এবং মনন নিয়ে দেশীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির মূল্যায়নে ব্রতী হয়েছিলেন। মধুসূদনের ‘মিসেস রাধা’ তারই ফলশ্রুতি। তা না হলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠসম্পদ বৈষ্ণব পদাবলীকে ব্যঙ্গকরে নবীনচন্দ্র সেন কেন ‘অবকাশ রঞ্জিনী’ তে লিখবেন—‘মহাজন পদাবলী/রাধাকৃষ্ণ ঢলাঢলি/ললিত লবঙ্গলতা/গোস্থামী খুড়োর মাথা’।

দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। উনিশ শতকে ঔপনিবেশিকতার কালে কলকাতা নগর ও পল্লীগ্রামের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়েছিল চূড়ান্ত। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বক্ষিম-মধুসূদন নবজাগরণের ঐতিহ্য প্রীতির সূত্রে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যকে অল্প বিস্তর গ্রহণ করলেও তার মধ্যে পল্লী-প্রাণস্পন্দন তেমন ছিল না। আধুনিক সাহিত্যের পীঠভূমি কলকাতার নাগরিকতাত্ত্বিক এলিট পরিবারের সন্তান হয়েও রবীন্দ্রনাথ হাঁটলেন সম্পূর্ণ বিপরীত পথে। পল্লী নির্ভর পুরাতন সাহিত্যকে নিজের জীবনরসে জারিয়ে নিয়ে গড়ে তুললেন নিজের সৃষ্টিজগৎ। নগর ও গ্রামের বিচ্ছেদ কিছুটা হলেও মোচন হল রবীন্দ্রসাহিত্যের মাধ্যমে। তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি : ‘এক কালে প্রাচীন বাংলা আমি মন দিয়ে এবং আনন্দের সঙ্গেই পড়েছিলুম।’^৩ কিংবা “আমি যে বাল্যকালে যুরোপীয়সাহিত্য পড়বার ভালো সুযোগ পাইনি এবং তার পরিবর্তে বৈষ্ণবপদাবলী পড়েছিলুম ও তার থেকে আমার লিরিকের ভঙ্গী ও ভাষা গ্রহণ করবার সুযোগ পেয়েছিলেম এটা আমার পক্ষে একটা বাঁচোয়া। নইলে আমি হয়ত নবীন সেন প্রভৃতির মত বাইরনী ছাঁচে লেখবার চেষ্টা করতুম।”^৪

এই শেষোক্ত উক্তির সত্যতা যে কত ব্যাপক বক্ষমান আলোচনায় তা দেখে বিস্মিত হবেন পাঠক। কেবল বৈষ্ণব পদাবলী নয়, লোকসাহিত্য, গ্রাম্যসাহিত্যে যে রবীন্দ্রনাথের মনে কত গভীর,

কত স্থায়ীভাবে দাগ কেটেছিল তা দেখে চমকে উঠতে হয়। লিখেছেন, “ছেলেবেলায় যদি রূপকথা না শুনতুম, তাহলে নিশ্চয় বলতে পারি ঐ নদীতীরের এবং মাঠের প্রান্তের দূর দৃশ্য দেখে ঠিক এমন ভাব মনে উদয় হত না—সমস্ত পৃথিবীর চেহারা আমার পক্ষে আর একরকম হয়ে যেত।” (ছিন্নপত্র-৫৮) কিংবা “এই ছড়ার রাজ্যে ভ্রমণ করতে করতে আমি কত রকমের ছবি এবং কতরকমের সুখদুঃখ ও হৃদয়বৃত্তির ভিতর দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যাচ্ছি তার আর ঠিকানা নেই”। (ছিন্নপত্র-১৫১)

বাউল এবং বিভিন্ন লোকসংগীত রবীন্দ্রসাহিত্যকে ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে বলা যায়। কবির স্বীকারোক্তি : “আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং বাউলের সুর ও বাণী কোন্ এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে”।^৭

রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রাচীন বাংলা কাব্যের প্রযুক্তি-বৈচিত্র্য ও বিস্তার বিস্ময়কর। গল্প-উপন্যাসে-নাটকে উক্ত সাহিত্যের সাদৃশ্যকরণ^৮ কীভাবে কতটা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সে আলোচনা করেছি অন্যত্র। রবীন্দ্রকাব্য-কবিতায় সেই প্রভাব বা আত্মীকরণ কীভাবে ঘটেছে তার অনুসন্ধানেই বর্তমান আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে। তাও রবীন্দ্র কবি-প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশ পর্ব অর্থাৎ গীতাঞ্জলি পর্বের ইতি ঘটাতে চাই তার।

দুই

‘সম্ভ্যাসংগীত’ পূর্ব নিজের লেখা কবিতা-সম্ভার অচলিত সংগ্রহ রূপে বর্জন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনুসরণ ও প্রভাব ছিল^৯ স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ। এ বিষয়ে কবির স্বীকৃতি—“কাঁচা বয়সে পরের লেখা মক্শ করে আমরা অক্ষর ফেঁদে থাকি বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার মধ্যেও নিজের স্বাভাবিক ছাঁদ একটা প্রকাশ হতে থাকে। অবশেষে পরিণতিক্রমে সেইটাই বইরের নকল খোলসটাকে বিদীর্ণ করে স্বরূপকে প্রকাশ করে দেয়। ...সেই কপিবুকের চৌকাঠ পেরিয়েই প্রথম দেখা দিল সম্ভ্যাসংগীত।”^{১০} বস্তুত ‘সম্ভ্যাসংগীত’ থেকেই কবিতায় রবীন্দ্রপ্রতিভার উন্মেষ ধরা হয়ে থাকে। প্রভাবের যে দিকটা প্রত্যক্ষ অনুকরণমুখী তার সমাপ্তি এখান থেকেই।

‘সম্ভ্যাসংগীত’-এর (১৮৮২) ‘চিন্তা চাঞ্চল্যের আবেগে বাঁধা ছন্দের শিকল ভাঙা’ কবিতাগুলির কোন কোনটিতে পাশ্চাত্য কাব্যের প্রভাব যত স্পষ্ট, তুলনায় দেশীয় পুরাতন সাহিত্যের অনুসৃতি কম; যেটুকু আছে তা কেবল বৈষ্ণব পদাবলীর সুরাংকার ও ভাবাবেগ। ‘বুঝেছি গো বুঝেছি সজ্জনি/কী ভাবে তোমার মনে জাগে’ (অসহ্য ভালবাসা), ‘সবাই আমার সখা, সবাই আমার বঁধু (আবার), কিংবা ‘বাঁশরি বাজছে দূরদূর’ (সুখের বিলাপ) ইত্যাদি পংক্তিগুলি বৈষ্ণব কবিতাকেই স্মরণ করায়। পরবর্তী কাব্য ‘প্রভাতসংগীত’-এর (১৮৮৩) প্রথম কবিতাটিতেও বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসঙ্গ : ‘জগৎ বাহিরে যমুনা পুলিনে/কে যেন বাজায় বাঁশি/স্বপন-সমান পশিতেছে কানে/ভেদিয়া নিশীথ রাশি।’ (আহুান সংগীত)

তাছাড়া কোন কোন কবিতায় পদাবলীর শব্দাংকার নৃত্যছন্দে চলেছে যেন—‘থেকে থেকে ঘন ঘন/ঘন বাজে-বরিষণ/থেকে থেকে বিজলীর চমকিত চকমকি।/বহিতেছে পূরব বায়,’ (পুনর্মিলন)

‘পুনর্মিলন’ নামক দীর্ঘ কবিতাটিতে বাল্য স্মৃতির স্মরণে রূপকথার প্রসঙ্গও এসেছে—

‘কোন সমুদ্রের কাছে/মায়াময় রাজ্য আছে,/সেথা হতে উড়ে আসে পাখির ঝাঁকের মত/কত মায়া, কত পরী, রূপকথা কত শত।’

‘সমাপন’ কবিতাটিতেও বৈষ্ণব পদাবলীর আমেজ আছে।

‘প্রভাতসংগীত’ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই শুরু হয়ে গিয়েছিল ‘ছবি ও গান’ (১৮৮৪) পর্ব। এরও বেশ কয়েকটি কবিতায় (‘গ্রামে’ ‘খেলা’ প্রভৃতি) পদাবলীর বাল্যলীলা ও গোষ্ঠের ছবি প্রতিফলিত। বর্তমান আলোচনায় ‘ছবি ও গানে’র উল্লেখযোগ্য কবিতাটি হল ‘পাগল’; রবীন্দ্ররচনায় বাউল চরিত্র-ভাবনার প্রথম প্রকাশ ঘটল এই লেখাটিতে। কবি নানা প্রসঙ্গে স্বীকার করেছেন, কলকাতা শহরেই শিলাইদহ অঞ্চলের এক বাউল-ভিখারীর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন প্রথম— তখন তাঁর ‘নবীন বয়স’^{১০}। তাছাড়া ১২৮৯ সালের শেষ দিকেই তাঁর হাতে পড়ে ‘বাউলের গান/সঙ্গীত সংগ্রহ’। ‘বাউলের গাথা’। গ্রন্থটির রবীন্দ্রনাথ-কৃত সমালোচনা প্রকাশিত হয় ‘ভারতী’ পত্রিকায় ১২৯০ সালের বৈশাখ মাসে। বাউল চরিত্র এবং বাউল গানের সঙ্গে প্রথম সংযোগের এই অভিঘাতেই সম্ভবত ‘পাগল’ কবিতাটি রচিত হয়েছিল অব্যবহিত পরেই। কবিতাটির ‘পাগল’ নামের বদলে ‘বাউল’ নাম দিলেও কোন ক্ষতি ছিল না (বাউল < বাতুল = পাগল)। কেননা বাউলের ভাব, ভাষা, ভঙ্গির প্রভাব লেখাটির সর্বাস্ত্রে—

আপন মনে বেড়ায় গান গেয়ে
গান কেউ শোনে কেউ শোনে না।
ঘুরে বেড়ায় জগৎ পানে চেয়ে,
তারে কেউ দেখে কেউ দেখে না।
সে যেন গানের মতো প্রাণের মতো শুধু
সৌরভের মতো উড়ছে বাতাসেতে,
আপনারে আপনি সে জানে না,
তবু আপনাতে আপনি আছে মেতে।

বাউল সম্প্রদায় এবং তাদের রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গভীর পরিচয় হয় শিলাইদহ পর্বে। নিজের লেখায় বাউলের ‘সুর ও বাণী’র প্রভাব কবি নিজেই স্বীকার করেছেন।^{১০} কিন্তু সেই প্রভাব ১৩১২ সালে ‘বাউল’ পুস্তিকাটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই বেশি করে চোখে পড়ে— সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রকবিপ্রতিভার উন্মেষ-পর্বে ‘পাগল’ কবিতাটি এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম বলেই মনে হয়। অবশ্য এর মাঝখানে ‘গোড়ায় গলদ’ (১৮৯২) গ্রন্থসনের শেষ গানটিতে (যার অদৃষ্টে যেমনি জুটুক তোমরা সবাই ভাল) বাউলের সুর ও সহজ ভঙ্গি চোখে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের ‘নবযৌবনের রচনা’ ‘কড়ি ও কোমল’ (১৮৮৬) কাব্যগ্রন্থে ‘একটা স্পষ্ট সৃষ্টির ধারা অবলম্বনে বিচিত্র বিষয়ক কবিতার সম্মিশ্র লক্ষ্য করা যায়।’^{১১} এর মধ্যে আছে বেশ কিছু ‘শিশু কবিতা’। যেগুলি ছড়ার ছন্দে লেখা তা বটেই, বিষয়ের দিক থেকেও পুরাতন রূপকথা ও ছেলেভুলানো ছড়ার স্মৃতি হয়েছিল কবির অবলম্বন।^{১২} রবীন্দ্রনাথের বেশির ভাগ শিশু কবিতাই পরিণত বয়সে লেখা, কিন্তু তার সূচনা হয়েছিল ঠাকুরবাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য প্রকাশিত (১২৯২) জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর ‘বালক’ পত্রিকায়। নিজের জীবনের শিশুকালে যে ছড়াটিকে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন তাঁর ‘শৈশবের মেঘদূত’, ‘বালক’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ) সেই ছড়াটি অবলম্বনেই শিশু মনের উপযোগী করে লিখলেন ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর’ শীর্ষক আশ্চর্য সুন্দর কবিতাটি। ‘বাংলার বর্ষাঝর দিনের আদি ছড়া’টি আধুনিক কবির হাতে নতুন রূপ পেল:

তারি সঙ্গে মনে পড়ে
 মেঘলা দিনের গান—
 'বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর
 নদী এল বান'।
 কবে বৃষ্টি পড়েছিল
 বান এল সে কোথা
 শিব ঠাকুরের বিয়ে হল
 কবেকার সে কথা;
 * * * *

তিন কন্যে বিয়ে ক'রে
 কী হল তার শেষে।
 না জানি কোন্ নদীর ধারে
 না জানি কোন্ দেশে।

দীর্ঘ কবিতাটিতে রূপকথার প্রসঙ্গও এসে পড়েছে:

মনে পড়ে সুয়োরানী
 দুয়োরানীর কথা,
 মনে পড়ে অভিমানী
 কঙ্কাবতীর ব্যথা।

কবিতাটি সম্পর্কে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—“এক মেঘ-মেদুর অন্তমেঘ রঞ্জিত বর্ষা-সন্ধ্যা একটি গ্রাম্যছড়ার একটি পংক্তিকে অবলম্বন করিয়া মনে এক নানাউপাদান গঠিত নিবিড় ভাব মোহ ঘনাইয়া তুলিয়াছে”।^{১৩}

রূপকথার সম্ভব-অসম্ভবের রাজ্য বাল্যস্মৃতির অনুবঙ্গে ফুটে উঠেছে ‘উপকথা’ কবিতাটিতেও:

বসিয়া আঁধার ঘরে বরষার ঝর ঝরে
 মনে পড়ে কত উপকথা।
 * * * * *
 রাজপুত্র অবহেলে কোন্ দেশে যেত চলে
 কত নদী কত সিঙ্খুপার
 সরোবর ঘাটে আলা মণি হাতে নাগবালা
 বসিয়া বাঁধিত কেশভার
 সিঙ্খু তারে কত দূরে কোন্ রাক্ষসের পুরে
 ঘুমাইত রাজার ঝিয়ারি।
 হাসি তার মণিকণা কেহ তাহা দেখিত না,
 মুকুতা ঢালিত অশ্রুবারি
 সাত ভাই একসত্তরে চাঁপা হয়ে ফুটিতরে
 এক বোন ফুটিত পারুল।

‘সাত ভাই চম্পা’ (বালক, আষাঢ় ১২৯২) কবিতাটির অবলম্বনও বাংলা দেশের অতি পরিচিত সেই রূপকথা—‘গল্প বলো পারুল দিদি’/ সাতটি চাঁপা ডাকে।’ রূপকথার ‘অস্তুনিহিত চিত্রধর্মিতা

ও আবেগ বাঞ্ছনা'র সার্থক উন্মোচন ঘটেছে লেখাটিতে। শিশু মনের গভীরে প্রবেশ করে তার অনুভবকে কাব্যরূপ দিয়েছেন কবি। বালক-কালের কল্প-ভাবনা 'বাৎসল্যের পথে' এবার ডানা মেলেতে শুরু করল পরিণত মনের 'আত্মভাবনার অবগাহনে'। 'খেলা' কবিতাটিতেও 'পরীর দেশে'র 'মায়া-দ্বীপে' মনোরপে ধাওয়ার অনুষ্ণ লক্ষ্য করা যায়।

লোকসাহিত্যের আলোচনায় ছড়া-রূপকথাকে বাংলাদেশের 'মাতৃস্নেহের অনন্ত প্রসবণ হইতে স্বতঃ উৎসারিত অমৃত ধারা'^{১৫} বলে অভিহিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলা ১৩০০ সালের কাছাকাছি সময়ে সেগুলির সংগ্রহ-সংকলনে ব্রতী হন নিজেই। কিন্তু এ বিষয়ে সচেতন হয়েছিলেন তিনি আরও আগে। 'বালক' পত্রিকায় আলোচ্য কবিতাগুলি লেখার সময়ে। বাংলার চিরন্তন শিশু-সাহিত্যগুলি যে মোটেই ফেলনা নয়, এবং সেগুলি অবলম্বনে আধুনিক কবির কলম সফলতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছাতে পারে, নবীন কবি তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কবি মনে ছড়া-রূপকথার এই প্রভাব সচেতন হলেও স্বতঃস্ফূর্ত। 'হাসিরাশি' (বালক, শ্রাবণ ১২৯২) কবিতাটিতে 'চলি চলি পা পা/টলি টলি যায়' কিংবা 'পুরানো বট' কবিতায় 'ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি' বা চাঁদ ও শিশু বিষয়ক অতি পরিচিত ছড়াংশ গুলি অনিবার্য ভাবেই এসে পড়েছে কবির কলমে। সমসাময়িক গদ্যরচনাতেও^{১৬} 'আয় বৃষ্টি হেনে, ছাগল দেব মেনে' ইত্যাদি ছড়ার পংক্তিকে সার্থকভাবে ব্যবহার করতে দেখা গেছে তাঁকে।^{১৭} এই ধরনের কবিতায় একদিকে 'শিশুর অবোধমুগ্ধতা স্মৃতির সমাধি' হইতে নতুন ভাবাসঙ্গে, অনুরূপ নানা অনুভূতিকণা সমবায়ে এক বিস্তৃত রূপকথা রাজ্যের অস্তঃসঙ্গতিতে ও ইঙ্গিতময়তায় সংহত হইয়াছে', অপর পক্ষে 'শিশু চিন্তে যাহা বিচ্ছিন্ন বিষয়টিহু রূপে উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা এক অখন্ড আবহ সৃষ্টির উপাদান রূপে অকম্পিত অর্থ ব্যঞ্জনায় সংসক্তি লাভ করিয়াছে'।^{১৮}

'কড়ি ও কোমলে'র বেশির ভাগ কবিতাই ১২৯০-৯৩ সালে লেখা। এই কয় বছর বৈষ্ণব কবিতার চর্চায় গভীরভাবে মগ্ন হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১২৯২ সালে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহায়তায় প্রকাশ করেন বৈষ্ণবপদের সংকলন 'পদরত্নাবলী'। পরের বছর বিদ্যাপতির পদ সংকলন করে প্রকাশ করার উদ্যোগও নেন। কবিতার ক্ষেত্রে এই অভিনিবেশের প্রকাশ দেখা গেল 'কড়ি ও কোমলে'র কবি মানসিকতায়; বৈষ্ণব পদাবলীর প্রত্যক্ষ প্রভাবে লিখিত বেশ কয়েকটি কবিতা এই কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। মথুর-বিরহে রাধার অন্তর্বেদনার কথাই বেশি করে প্রকাশ করেছেন মধ্যযুগের কবিরা, রবীন্দ্রনাথের 'মথুরায়' কবিতায় সে ক্ষেত্রে কৃষ্ণের বিরহ-ব্যথাই প্রকাশিত হয়েছে। সমালোচক লিখেছেন—“জয়দেবের গীতগোবিন্দে রাধিকার প্রতি কৃষ্ণের বিরহোক্তি সূচক গান আছে। সুতরাং 'মথুরায়' কবিতাটির অনুভাবনা জয়দেবের গীতগোবিন্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে অনুমান করি”।^{১৯}

বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই?
একবার রাখে রাখে ডাক বাঁশি মনোসাথে,
আজি এ মধুর চাঁদে মধুর যামিনী ভায়।
কোথা সে বিধুরা বাল্য, মলিন মালতী মালা,
হৃদয়ে বিরহ-জ্বালা, নিশি পোহায়, হয়। ('মথুরায়')

অপরূপ নিসর্গ সৌন্দর্যের পটভূমিতে রাধাকৃষ্ণের বিরহ ব্যাকুলতার প্রকাশে বৈষ্ণব পদাবলী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রেমকবিতা হয়ে উঠতে পেরেছে। আধ্যাত্মিক পরিমন্ডলের কথা বাদ দিলে বৈষ্ণব কবিদের রচনা বহিরঙ্গে নিছক প্রেমকবিতাই। সেই হিসেবেই রবীন্দ্রনাথ আত্মস্থ করেছিলেন পদগুলিকে, যার ফলে তাঁর নিজের প্রণয় কবিতাগুলিতেও ঘটেছিল বৈচিত্র্যের

সমাগম। ‘কড়ি ও কোমলে’র ‘বসন্ত অবসান’ ‘বাঁশি’ ‘বিরহ’ প্রভৃতি কবিতা বৈষ্ণব পদাবলীর মাধুর্য পেয়েছে রাধা-কৃষ্ণলীলার বিরহ ব্যথাতুর ভাবের কোমল স্পর্শে:

‘কত শারদ যামিনী হইবে বিফল,/বসন্ত যাবে চলিয়া/কত উদিবে তপন আশার স্বপন/প্রভাতে যাইবে ছলিয়া।/এই যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া/মরিব কাঁদিয়া রে।/সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব/সাধিয়া সাধিয়া রে।’ (বিরহ)

জ্ঞানদাসের ‘শেজ বিছাইয়া রহিনু বসিয়া/পথ পানে নিরখিয়া’ ইত্যাদি পংক্তির সঙ্গে ‘বিরহে’র ‘আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন/আকুল নয়ন রে’ ইত্যাদির মিলও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার মত। এই বিরহবিলাপ বৈষ্ণব পদাবলীর আরও নৈকট্য পেয়েছে ‘বিলাপ’ কবিতায়:

আর নিয়ে যা রাধার বিরহের ভার
কত আর রেখে ঢাকি বল
আর পারিস যদি তো আনিস হরিয়ে
এক ফোঁটা তার আঁখিজল।

এ যেন ‘রাধাবিরহের’-ই আধুনিক রূপ। এত স্পষ্টভাবে না হলেও ‘সারাবেলা’, ‘আকাঙ্ক্ষা’ ‘তুমি’ ‘গান’ ‘কেন’ ‘পুনর্মিলন’ ‘পবিত্রপ্রেম’ প্রভৃতি কবিতায় পদাবলীর প্রশয়মাধুর্যের প্রভাব অল্পবিস্তর লক্ষ্য করা যায়। এইসব কবিতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছেন—“বৈষ্ণব পদাবলী প্রভাবিত, রাধা বিরহ স্মৃতিবাহী ভাবাসঙ্গের সহিত কবি হৃদয়ের অনির্দেশ্য প্রশয়াকৃতি এক মিশ্র সুরগুঞ্জন তুলিয়াছে।”^{২০}

‘পুরাতন’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

‘সুদূরে বাজিছে বাঁশি তুমি কেন ঢাল আসি
তারি মাঝে বিলাপ উচ্ছ্বাস’।

এর সঙ্গে তুলনা করা যাক বিদ্যাপতির পদ। কৃষ্ণের বাঁশি শুনে বিরহ-ব্যাকুল রাধার অশ্রুপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করেছে সখি।

রাধা উত্তর দিচ্ছে— কি কহব রে সখি ইহ দুখ ওর
বাঁশি নিশাস-গরলে তনু ভোর।

‘পবিত্র প্রেম’ কবিতাটিতে ‘খন্ডিতা’ ভাবের ছবি—

ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ওরে দাঁড়াও সরিয়া।
ম্লান করিয়োনা আর মলিন পরশে।
ওই দেখো তিলে তিলে যেতেছে মরিয়া,
বাসনা নিশ্বাস তব গরল বরষে।

‘বনের ছায়া’ কবিতার ‘হাসি, বাঁশি, পরিহাস বিমল সুখের শ্বাস’ ইত্যাদি পংক্তিতে বৈষ্ণবপদাবলীর গোষ্ঠচিত্রের আংশিক ছায়াপাত ঘটেছে।

‘যৌবন স্বপ্ন’ ‘ক্ষণিক মিলন’ ‘গীতোচ্ছ্বাস’ ‘চুম্বন’ প্রভৃতি কবিতায় রাধা-কৃষ্ণের বিরহমিলনের অনুশঙ্গে তরুণ কবির নিজের হৃদয়-উচ্ছ্বাস-ই প্রকাশিত। এর কোন কোনটি ‘যৌবন উত্তাপে’ দেহ-কেন্দ্রিক হলেও দেহকে অতিক্রম করার প্রশাসও লক্ষণীয়। সেদিক থেকে ‘দেহের মিলন’ কবিতাটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য; বৈষ্ণব পদাবলীর প্রত্যক্ষপ্রভাব এতে চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে বলা যায়। জ্ঞানদাসের ‘রূপলাগি আঁখি বুঝে গুণে মন ভোর।/প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর’। ইত্যাদি পদের ভাব, ভাষার সচেতন অনুসরণ করে আধুনিক কবি লিখলেন :

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।

প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন

হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে

মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ 'পরে।

* * * *

আমার এ দেহমন চির রাত্রি দিন

তোমার সর্বঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।

কবিতাটিতে রাধা-হৃদয়ের ব্যাকুলতা ইন্দ্রিয়জ্ঞ ভাবের উর্ধ্বে এক অতীন্দ্রিয় লোকে প্রবেশ করেছে। রসতত্ত্বের বিচারে বৈষ্ণব ভাবের অনুকূল না হলেও জ্ঞানদাসের পদের নব মূল্যায়ন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। বস্তুত বৈষ্ণব পদাবলীর বা জয়দেবের কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের দেহচর্চার যে ছবি, তার কোন চিহ্নই রবীন্দ্র-কবিতায় নেই।

রবীন্দ্রকাব্যধারার বিভিন্ন সময়ে বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাবের তারতম্য নির্দেশ প্রসঙ্গে বিমানবিহারী মজুমদার “১২৮৭ সাল হইতে ১৩১২ সাল পর্যন্ত এই পঁচিশ বৎসর” রবীন্দ্রকবিতায় পদাবলীর প্রত্যক্ষ প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন।^{২১} কিন্তু এই কালসীমায় প্রত্যক্ষ প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে নিজেকে মুক্ত করে একটা নিজস্ব স্বাধীন ভাবধারা সৃষ্টির প্রয়াসও লক্ষ্য করা গেছে। রবীন্দ্রকাব্যপ্রতিভার প্রথম পরিণতি ‘মানসী’ (১৮৯০) তে তার সূচনা বলা যেতে পারে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে তাকে আপন অনুভূতির মাধুর্যে রসিয়ে দিয়ে নতুন সৃষ্টির পথ পরিষ্কার করেছেন কবি। এই আত্মীকরণের ফলেই বাহ্য প্রভাব হয়েছে আত্মস্থ। এর মূলটুকুই হচ্ছে সত্যিকারের গভীরতর প্রভাব বা ‘গোপন প্রভাব’। ‘মানসী’র কোন কোন কবিতায় বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবরূপ এত সূক্ষ্মভাবে অন্তর্লীন যে, সাহিত্যিক প্রমাণ (Literary evidence) দিয়ে তার বিচার বিশ্লেষণ করা যায় না। কবিতার দু’ একটি পংক্তি থেকেই বুঝে নিতে হবে আহত ভাবের স্পর্শটুকু। রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন ‘বাজিবে তার চরণ ধ্বনি/বুকের শিরে শিরে,... দৌহার মাঝে ঘুচিয়া যাবে/আলোর ব্যবধান’ (অপেক্ষা) কিংবা ‘সেই মুকুল-আকুল বকুল কুঞ্জ/ভবনে,/সেই কুহু কুহুরিত বিরহ রোদন/থেকে থেকে পশে শ্রবণে’ (‘ভৈরবী গান’) তখন বাইরে থেকে মনে হয় পংক্তিগুলির সঙ্গে বৈষ্ণবকবিতার যেন কোথায় একটি মিল আছে। কিন্তু সত্যি কি তাই? কেননা পর মুহূর্তেই মনে হয়, এতো প্রভাব নয় যেন নতুন সৃষ্টি। ‘গুপ্তপ্রেম’ ‘বধূ’ ‘ব্যক্তপ্রেম’ ‘অনন্তপ্রেম’ ‘আশঙ্কা’ ‘ভাল করে বলে যাও’ ‘উচ্ছ্বল’ ‘আমার সুখ’ ‘ধ্যান’ ‘হৃদয়ের ধন’ প্রভৃতি কবিতাতেও বৈষ্ণব পদাবলীর সুখ-দুঃখ-বিরহ-বেদনার এক ধরনের ‘গোপন প্রভাব’ অন্বেষণ করা যেতে পারে। যেমন বৈষ্ণবীয় প্রেমবৈচিত্র্যের ক্ষীণ সুর অন্তর্লীন হয়ে আছে ‘পূর্ব-কালে’ কবিতায়: ‘সে অসীম ব্যথা অসীম সুখের/হৃদয়ে হৃদয়ে রহে/তাইতো আমার মিলনের মাঝে/নয়নে সলিল বহে’।

অন্যপক্ষে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেম ও প্রকৃতি বর্ণনার যে অনুভাবনা ধীরে ধীরে কবির মনে দানা বেঁধেছে, তারই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে ‘মানসী’র বেশ কয়েকটি কবিতায়। এ ক্ষেত্রে প্রভাব প্রত্যক্ষ হলেও কবি তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পেরেছেন, বস্তুবিষয়ের দিক থেকেও প্রাচীন কবিতার নবমূল্যায়ন হয়েছে আধুনিক কবির কলমে:

আজও আছে বৃন্দাবন মানবের মনে

শরতের পূর্ণিমায়

শ্রাবণের বরিষায়

উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।

এখনও সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে।

এখনো প্রেমের খেলা

সারাদিন সারাবেলা

এখনো কাঁদছে রাধা হৃদয় কুটিরে। (একাল ও সেকাল)

কবিতাটি পাগলিনী রাধিকার দিবা অভিসারের চিত্র স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের।

‘পত্র’ ‘শ্রাবণের পত্র’ ‘বর্ষার দিনে’ প্রভৃতি কবিতায় বর্ষণমুখর দিনের হৃদয়াবেগমখিত পুরোনো স্মৃতির খেয়ায় বৈষ্ণব পদাবলীর প্রসঙ্গ আপনা থেকেই এসে পড়েছে:

পড়ে মনে বরিষার বৃন্দাবন অভিসার

একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ—

শ্যামল তমাল তল, নীল যমুনার জল,

আর দুটি ছল ছল নলিন নয়ন।

এ ভরা বাদর দিনে কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে,

কাননের পথ চিনে মন যেতে চায়।

বিজ্ঞান যমুনাকূলে বিকশিত নীপমূলে

কাঁদিয়া পরাণ বলে বিরহ ব্যথায়। (পত্র)

কবিতাটি সম্পর্কে সুকুমার সেন লিখেছেন—‘রবীন্দ্রকাব্যে বর্ষা বিশ্বঋতুরঙ্গে জীবলীলা নাটের মাথুর পালায় মতো। বৈষ্ণব কবিতার রসটুকু রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবির হাঁদে ধরিয়া দিয়াছেন।’^{২২}

আবার ‘মেঘদূত’ কবিতায় নিসর্গময় কবি লিখছেন:

ভারতের পূর্ব শেষে

আমি বসে আছি; যে শ্যামল বঙ্গদেশে

জয়দেব কবি, আর এক বর্ষা দিনে

দেখেছিলো দিগন্তের তমাল বিপিনে

শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর।

বর্ষার কাব্য হিসেবেই ‘গীতগোবিন্দ’ রবীন্দ্রনাথের হৃদয় হরণ করেছিল—বিশেষ করে এই কাব্যের প্রথম শ্লোক “মেঘৈর্মদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালকমৈঃ” থেকে তাঁর অনেক কবিতার প্রেরণা পেয়েছেন।

বৈষ্ণব কবির ভাব-ভাষার বহিরঙ্গীয় রূপের সচেতন ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে ‘নব বঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ’ শীর্ষক ব্যঙ্গ কবিতাটিতে। সমসাময়িক বিতর্কিত ঘটনার অভিঘাতে (‘বালিকা বিবাহ’ প্রথার বিকলতা) রচিত হলেও বৈষ্ণবকবিতার প্রেমাবেগের আলতো স্পর্শ একালের কবির হাতে সরস ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে।

‘মানসী’ কাব্যে রবীন্দ্রনাথের কবি-ব্যক্তিত্ব বিচিত্র ভাবে অসীমাভিমুখী হয়ে উঠেছে। ‘অহল্যার প্রতি’ কবিতায় সেই অসীমানুভূতিকে ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের অবলম্বন হয়েছিল রামায়ণের আদিকান্ডে স্বামী গৌতমের অভিশাপে অহল্যার পাষণ হয়ে যাওয়ার কাহিনী-অঙ্কুর।

অহল্যার আগে শাপ দিলা মুনিবর

পাষণ হইয়া থাক বনের ভিতর।

অহল্যা পাষণ হইল গৌতমের শাপে,

* *

পাষণ হইয়া অহল্যা তিনশত বৎসর আছে।

(কুন্তিবাসী রামায়ণ, আদিকাণ্ড)

কিন্তু এই অহল্যা রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য কবিপ্রতিভায় নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে। সমালোচকের ভাষায়—‘এ অহল্যা কামাতুরা, রূপ বিভ্রান্তা অসতী পত্নী নহে, পৃথিবীর বিচিত্র প্রাণপ্রবাহ, জীবধাত্রীর মাতৃস্নেহ কম্পিত হৃৎস্পন্দনের সহিত একাত্মীভূতা, অতিমানব চেতনার সূক্ষ্মঅনুভূতিময়ী শক্তি।’^{২৩}

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় রামায়ণ মহাভারতের প্রভাব প্রসঙ্গে যে কথাটা স্মরণ রাখা দরকার তা হল, ছেলেবেলায় কৃষ্ণিবাস-কাশীরাম দাসের গ্রন্থপাঠ এবং শ্রবণের ফলে কাহিনী-উপকাহিনীগুলি রবীন্দ্রনাথের মস্তিষ্কগত হয়েছিল। পরবর্তী জীবনে মহাকাব্য দুটির সংস্কৃত মূল এবং তার আধুনিক বাংলা রূপান্তরের সংস্পর্শে এলেও অল্পবয়সে মনে গঁথে যাওয়া কাহিনীগুলিই ছিল প্রেরণার প্রধান উৎস। স্বাভাবিকভাবেই নবীন বয়সে মনের গভীরে মুদ্রিত হয়ে যাওয়া ভাবনাই সৃষ্টির গহনে প্রথম উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—আর এইজন্যই বক্ষ্যমাণ আলোচনায় কৃষ্ণিবাস-কাশীরাম দাসের রচনাকে মোটেই লঘু করে দেখা উচিত নয়। এঁদের কাব্য পাঠের স্মৃতি থেকে বীজ আকারে যা পাওয়া যেত, তাকে স্পষ্টরূপ দেওয়ার জন্য সংস্কৃত মূলের আশ্রয় নিয়েছেন কবি কখনো সখনো।

‘মানসী’র ‘দেশের উন্নতি’ কবিতায় সমসাময়িক তথাকথিত দেশহিতৈষীদের ব্যঙ্গ করতে মহাভারতের প্রধান দুটি চরিত্রের উল্লেখ করতে দেখা গেছে রবীন্দ্রনাথকে—

‘অন্ধকারে ওই রে শোন,/ভারতমাতা করেন ‘গ্রোন্’/এ হেন কালে ভীষ্ম দ্রোণ/গেলেন কোনখানে?’

রূপকথার অনুসঙ্গও আছে বেশ কয়েকটি কবিতায়। ‘ভৈরবী গানে’ রূপকথার রূপকল্প সার্থক ভাবে ব্যবহার করেছেন কবি। ‘পথে রাক্ষসী সেই তিমির রজনী’ কিংবা ‘দূরে মায়াময়পুরে দিতেছে দৈত্য পাহারা’র মত পংক্তি বোধহয় রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই এমন অবলীলায় লেখা সম্ভব। ‘পত্র’ এবং ‘বধূ’ কবিতায় প্রসঙ্গক্রমে ‘আষাঢ় গল্প’ ও রূপকথা শোনার ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। ‘নিখিল বঙ্গ দেশের চিরপুরাতন’ সাহিত্য রূপকথার গল্পগুলি পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির অভিঘাতে হারিয়ে যেতে বসেছে। তাই কবির আক্ষেপ :

‘আষাঢ়গল্প’^{২৪} সে কই! সেও বুঝি গেল ওই

আমাদের নিতান্তই দেশের জিনিষ। (পত্র)

কিন্তু এই ‘নিতান্তই দেশের জিনিষ’গুলিকে হারিয়ে যেতে দেন নি রবীন্দ্রনাথ। রূপকথা সংগ্রহে তিনি ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছিলেন—সময়ের দিক থেকে কবির সাহিত্যজীবনে তখন চলছে ‘সাধনা’ পত্রিকা-পর্ব। ‘মানসী’র পরবর্তী ‘সোনার তরী’ (১৮৯৪) কাব্যে রূপকথা অবলম্বনে রচিত চারটি কবিতার মধ্যে ‘বিশ্ববতী’ (বৈশাখ ১২৯৯) এবং ‘রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে’ (আষাঢ় ১২৯৯) ‘রূপকথা’ নামেই ‘সাধনা’য় প্রকাশিত হয়। ‘বিশ্ববতী’^{২৫} লেখা হয়েছিল শিলাইদহে ১২৯৮ সালের ফাল্গুন মাসে। এই সময়ে ‘রূপকথা’ চর্চায় কবি মগ্ন ছিলেন, এ বিষয়ে তাঁর একান্ত আগ্রহের প্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে ‘ছিন্নপত্রাবলী’র সমকালীন একটি চিঠিতে (৮ এপ্রিল ১৮৯২)। শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—“বাংলার যদি কতগুলি ভালো ভালো মেয়েলি রূপকথা জানতুম এবং সরল ছন্দে সুন্দর করে ছেলেবেলাকার যোরা স্মৃতি দিয়ে সরস করে লিখতে পারতুম তাহলে ঠিক এখানকার উপযুক্ত হোত।”

‘বিশ্ববতী’র মাসখানেক পরে কলকাতায় বসে লিখেছিলেন (চৈত্র ১২৯৮) ‘রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে’। দু’মাস পরে শান্তিনিকেতনে বসে পরপর দু’দিনে (১৪ ও ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯)

দুটি কবিতা লিখলেন—‘নিদ্রিতা’ ও ‘সুপ্তোখিতা’। এই যুগ্মক কবিতা দুটি যেন একটি রূপকথারই দু’টি অংশ—পরস্পরের পরিপূরক।

ছড়া ও রূপকথা শিশু রবীন্দ্রনাথের মন আকর্ষণ করে নিয়েছিল এবং বাল্যকালে বাড়ির দাসীদের কাছে রূপকথা শ্রবণের ঘটনা রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তাহলেও রূপকথার গল্প রবীন্দ্রনাথের মনের ভাঁড়ারে খুব বেশি ছিল বলে মনে হয় না—ইতিপূর্বে উদ্ধৃত ‘ছিন্নপত্রাবলী’র স্বীকৃতিতেই তা বোঝা যায়। এক সময়ে ‘বালক’ পত্রিকায় লিখেছিলেন ‘সাতভাইচম্পা’ তার পর দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ‘সোনার তরী’তে ‘বিশ্ববতী’ দিয়ে শুরু। ‘বিশ্ববতী’র কাহিনী রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন ভ্রাতুষ্পুত্রী অভিজ্ঞার কাছ থেকে। এর সৃষ্টি ইতিহাস জানাতে গিয়ে নলিনী দেবীকে একটি চিঠিতে লিখেছেন—“অভি বলে আমার একটি ভাইঝি ছিল, তার গলা ছিল খুব মিষ্টি। তারই মুখে রূপকথা শুনে আমি ‘সোনার তরী’তে বিশ্ববতীর গল্প লিখেছিলাম।”^{২৬} যে ভাবেই রবীন্দ্রনাথ শুনে থাকুন না কেন ‘বিশ্ববতী’র গল্পের সঙ্গে আমাদের দেশে প্রচলিত রূপকথার যতটা মিল তার চেয়ে বেশি মিল ইয়োরোপে প্রচলিত সিভারেলার (Cinderella) কাহিনীর সঙ্গে। আশুতোষ ভট্টাচার্য রূপকথাটির পাশ্চাত্য উৎস এবং তার দ্বারাই রবীন্দ্রনাথের প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেন নি।^{২৭} বাংলাদেশে প্রচলিত কোনো রূপকথার নায়িকার নাম বিশ্ববতী নয়—নামটি কবির নিজস্ব দেওয়া হলেও রূপকথার নাম হিসেবে তা সার্থক। একালের পাঠকের উপযোগী করে মূলের কাহিনী বজায় রেখে ছোট্ট একটি কবিতায় রূপকথার সবটুকু ধরে দেওয়ার কঠিন ব্রতে রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধিলাভ করেছেন বলা যায়।

‘রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে’ কবিতাটি প্রচলিত একটি রূপকথা ‘পুষ্পমালা’র^{২৮} কাহিনীর প্রথমাংশ অবলম্বনে রচিত। চার ভাগে বিভক্ত (প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, নিশীথে) কবিতাটিতে রূপকথার মোহমদির রসাস্বাদ ‘বিশ্ববতী’র চেয়ে অনেক গভীরভাবে পাওয়া যায়। ‘প্রভাতে’ গল্পের সূচনা এইভাবে: ‘রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,/রাজার মেয়ে যেত তথা।/দুজনে দেখা হত পথের মাঝে,/কে জানে কবেকার কথা।’ আর ‘নিশীথে’ রূপকথা শেষ হতে চলেছে: ‘রাজার মেয়ে শোয় সোনার খাটে/স্বপন দেখে রূপরশি।/রূপের খাটে শুয়ে রাজার ছেলে/দেখিছে কার সুধাহাসি।’

ভাষা এখানে অনেক সহজ সরল হয়ে রূপকথার নৈকট্য লাভ করেছে। তাহলেও বলতে হয়, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ কবিতাই রচনা করতে চেয়েছেন, তাই খাঁটি রূপকথার লৌকিক-অলৌকিক ঘটনার মিশ্রণে যে বিচিত্র রস, তা এখানে অনুপস্থিত।

কবিতার স্বার্থে মূলের অল্পবিস্তর পরিবর্তন সাধনও অবশ্যম্ভাবী হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মূল রূপকথার ঘোড়ায় চড়ার কাহিনী যেমন নেই, তেমনি কোটালের ছেলে রবীন্দ্রনাথের হাতে হয়েছে রাজার ছেলে। ‘নিদ্রিতা’ ও ‘সুপ্তোখিতা’ কবিতা দুটি সেদিক থেকে তাই নির্দিষ্ট কোন রূপকথা অবলম্বনে রচিত হয় নি। ‘সোনার তরী’ কাব্যে ‘রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে’র পরেই এ দুটি সংকলিত হলেও রূপকথার চেয়ে গীতি কবিতা লেখার দিকেই রবীন্দ্রনাথের কলম বেশি তৎপর হয়েছে। ‘নিদ্রিতা’য় ‘পাতালপুরীর বন্দিনী রাজকন্যার নিদ্রিত সৌন্দর্য বর্ণনা’ই যেন কবির প্রধান লক্ষ্য; সেক্ষেত্রে আমাদের জানা রূপকথার বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করে রাজপুত্র কর্তৃক তাকে লাভ করার প্রচেষ্টার যে কাহিনী তা এখানে অনুপস্থিত। যদিও পরবর্তী কালে ‘ঠাকুর-মার ঝুলি’তে সংকলিত ‘ঘুমন্তপুরী’ নামক রূপকথার সঙ্গে কবিতাটির বিষয়গত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। আগেই বলেছি ‘নিদ্রিতা’র যুগ্মক হয়ে পরের দিন লিখিত হয়েছিল হয়েছিল ‘সুপ্তোখিতা’। অনেকটা আগের কবিতার পরিপূরক হলেও প্রচলিত কোন রূপকথার সঙ্গে এর মিল খুঁজে পাওয়া

দুষ্কর। আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন—“রূপকথার পরিবেশের মধ্যে এটি একটি পূর্বরাগের কবিতা। এর মধ্যে রূপকথার ভাব কিছু নেই, কেবলমাত্র তার বাইরের রূপটিই একটু একটু প্রকাশ পেয়েছে মাত্র”।^{১২} বস্তুত রূপকথার স্পর্শটুকু বজায় রেখে ‘অপূর্ব রহস্য মধুর রোমাঞ্চরস’, পরিবেশনে রবীন্দ্রনাথের কবি-কলম স্বাধীন হয়ে উঠেছে ‘সুপ্রোখিতা’য়।

‘সোনার তরী’ কাব্যে রবীন্দ্রকবিমানস ‘রূপকথা রসাতুরতায়’ যতটা গভীরভাবে মগ্ন, অন্য কোন কাব্যে ততটা নয়। আরও পরিণত বয়সে লেখা ‘দ্রষ্টলগ্ন’ (কল্পনা), ‘সবপেয়েছির দেশ’ (খেয়া), ‘খেলনার মুক্তি’ (পুনশ্চ) প্রভৃতি কবিতায়, কিংবা ‘লিপিকা’ ‘সে’ বা ‘গল্পসল্পে’র মত গদ্য রচনায় রূপকথার অনুষ্ঙ্গ থাকলেও ‘সোনার তরী’ পর্বের কবি-ব্যক্তি জীবনের প্রবর্তনা সেখানে অনুপস্থিত। রূপকথা জগতের অপার বিস্ময়বোধ নিয়েই পদ্মা-বিধৌত বৃহত্তর মানবজীবনকে অবলোকন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সমসাময়িককালে ‘ছিন্নপ্রত্নাবলী’র একটি চিঠিতে লিখেছেন (১৬জুন ১৮৯১)—“এই নদীর উপরে, মাঠের উপরে, গ্রামের উপরে সম্ভ্রোটা কী চমৎকার, কী প্রকাশ, কী প্রশান্ত, কী অগাধ সে কেবল স্তব্ধ হয়ে অনুভব করা যায় ...ঠিক মনে হচ্ছিল এ সমস্তটা যেন ছেলেবেলাকার রূপকথার জগৎ।”^{১৩}

‘সোনার তরী’র কবিমানসে রূপকথা চৈতন্য কত গভীর ছিল চিঠিটির আন্তরিকতা-নিবিড় দীর্ঘ বিবরণ থেকে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। আর এই কারণেই আলোচ্য কাব্যের এক তৃতীয়াংশ কবিতা, রূপকথা অবলম্বনে কিংবা ‘রূপকের স্বপ্নবন্ধন মোহাবেশে মগ্ন’। ‘সোনার তরী’ কাব্য নাম ও ‘সোনার তরী’ কবিতা সম্পর্কে সুকুমার সেন বলেছেন—“রূপক এবং রূপকথা দুইয়েরই আশ্রিত”।^{১৪} বিশেষজ্ঞের এই মতকে স্বীকার করে নিয়ে বলা যায় রবীন্দ্রকবিতায় উপলব্ধির অমূর্ত জগৎ ‘রূপকে’র (সিঞ্চল) মধ্য দিয়ে দানা বাঁধতে শুরু করেছে এই সময় থেকেই এবং সেক্ষেত্রে কবির প্রাথমিক অবলম্বন হয়েছিল রূপকথার ভারহীন ব্যঙ্গনাময় জগৎ। তাছাড়া রূপকথাও যে অনেক সময়ে রূপকাক্রান্ত কথা এমন কথাও তো বলেছেন বিশিষ্ট সমালোচক।^{১৫} তাই কেবল মাত্র প্রথম কবিতা ‘সোনার-তরী’ বা শেষ কবিতা ‘নিরুদ্দেশ যাত্রা’-ই নয়, ‘হিং-টিং ছুট’ ‘পরশপাথর’ ‘দুই পাখি’ ‘আকাশের চাঁদ’ ‘অনাদৃত’ ‘দেউল’ ‘ঝুলন’ ‘হৃদয়যমুনা’ ‘মানস সুন্দরী’—এই সব কবিতার ব্যঙ্গনায় রূপকাবরণের সঙ্গে রূপকথার অস্বুট উপস্থাপনাও লক্ষ্য করা গেছে—বিশেষজ্ঞের ভাষায়—“রূপকথার গুটি ধরিয়েছে ও রূপকের ছেঁয়া লাগিয়েছে।”^{১৬} উদাহরণ হিসেবে, ‘হিং-টিং ছুট’ নামক প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গ কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রচলিত রূপকথার কোন গল্প না থাকলেও এবং সমসাময়িক ঘটনার (নব্য হিন্দুত্বের প্রচার আতিশয্য) প্রক্ষেপণে রচিত হলেও কবিতাটি ‘রূপকথা মন্দির রূপকরসে’ ভরপুর। আশুতোষ ভট্টাচার্য আরও একথাপ এগিয়ে বলেছেন—“রূপকথার প্রত্যক্ষ প্রভাবে” রচিত।^{১৭} এর কারণ বোধহয় একটাই, কবিতাটিতে রূপকথার স্বপ্নময় জগতের পরোক্ষ স্বীকৃতি:

জগতে সকলি মিথ্যা, সব মায়াময়

স্বপ্ন শুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়।

কিংবা ‘দেউল’ কবিতার অভিধানে রূপকথার আবরণ: “স্তম্ভগুলি জড়িয়ে শতপাকে/নাগ বালিকা ফনা তুলিয়া থাকে।/উপরে ঘিরি চারিটি ধার/দৈত্যগুলি বিকটাকার/পাষণময় ছাদের ভার/মাথায় ধরি রাখে।/নাগ বালিকা ফনা তুলিয়া থাকে।/সৃষ্টি ছাড়া সৃজন কত-মতো/পক্ষীরাজ উড়িছে কতশত।”

পূর্ববর্তী ‘হিং-টিং ছুট’ কবিতাটি সম্পর্কে আর একটা বলার কথা হল এই যে, কবিতাটির দ্বিতীয় নাম ‘স্বপ্নমঙ্গল’, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যগুলির নামকরণের প্রতি

ইঙ্গিতবাহী। মঙ্গলকাব্যের অধিকাংশ কবি-ই দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে কাব্য-রচনায় হাত দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথের কাছে আদ্ভুত মনে হয়েছিল। ‘মালিনী’ নাটকের ‘সূচনায়’, কবিকঙ্কনের দেবী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তাঁর গুণকীর্তন করার তির্যক উল্লেখই তা বোঝা যায়। আলোচ্য কবিতার ‘স্বপ্নমঙ্গল’ নামকরণেও তেমনি একটি লঘু ইঙ্গিত রয়েছে বলে অনুমান করি। মঙ্গলকাব্য পাঠ বা শ্রবণে শ্রোতা ও পাঠকের যাবতীয় মঙ্গল হওয়ার কথা যেমন মঙ্গলকাব্যের কবিরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতেন, রবীন্দ্রনাথকেও তেমনি অভয় বাণী বর্ষণ করতে শোনা গেছে—

যে শুনিবে এই স্বপ্নমঙ্গলের কথা
সর্বদ্রুম ঘুচে যাবে, নহিবে অন্যথা।

তাছাড়া কবিতাটিতে দুটি পংক্তি ধ্রুবপদের মতো বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে—

স্বপ্ন মঙ্গলের কথা অমৃত সমান;
গৌড়ানন্দ কবি ভণে শুনে পুণ্যবান।^{৩৫}

একি কাশীরাম দাসের সেই বিখ্যাত ভণিতার কথাই মনে করিয়ে দেয় না আমাদের।

মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।

‘সোনার তরী’ কাব্যে প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের প্রভাব বলতে কেবলমাত্র রূপকথাই নয়; প্রেম-সৌন্দর্যে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথের ‘মিষ্টিক’ কবিমন রূপকথার রহস্যময় জগতে বিচরণ করতে করতে, বৈষ্ণব সাহিত্যের শাস্ত্র প্রেমের রহস্যকেও আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছে কোন কোন কবিতায়। সমকালীন ‘ছিন্নপত্রাবলী’তে (৫০ সংখ্যক পত্র, ১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯) দেখা যাচ্ছে বৈষ্ণব কবিদের রচনা নিয়ে যেমন তিনি ভাবনাচিন্তা করছেন তেমনি তাঁদের ‘বই’ সঙ্গে নেই বলে তার অবশ্যকতা বেশি করে অনুভব করছেন।^{৩৬} বিচিত্র স্বত্বপ্রকৃতির সঙ্গে বৈষ্ণবকবিতার সম্পর্ক যে কত নিবিড় ‘মানসী’র ‘পত্র’ কবিতাটি আলোচনা করতে গিয়ে তা দেখেছি। ‘সোনার তরী’র ‘বর্ষাযাপন’ও রবীন্দ্রনাথের কবি মনের সঙ্গে সেই একই সূত্রে বাঁধা:

“বর্ষা আসে ঘোর রোলে, যত্নে টেনে লই কোলে/গোবিন্দ দাসের পদাবলী।/সুর করি বার বার পড়ি বর্ষা-অভিসার—/অঙ্ককার যমুনার তীর,/নিশীথে নবীনা রাধা নাহি মানে কোন বাধা,/খুঁজিতেছে নিকুঞ্জ-কুটির।/ ...আষাঢ় হতেছে শেষ মিশায়ে মন্ডার দেশ/রচি ‘ভরাবাদরের’ সুর।/ খুলিয়া প্রথমপাতা, গীত গোবিন্দের গাথা/গাহি ‘মেঘে অম্বর মেদুর’।/ স্তব্ধ রাত্রি দ্বিপ্রহরে রূপ রূপ বৃষ্টি পড়ে—/শুয়ে শুয়ে সুখ-অনিদ্রায়/‘রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন’/সেই গান মনে পড়ে যায়।/‘পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে’/মনসুখে নিদ্রায় মগন-/সেই ছবি জাগে মনে পুরাতন বৃন্দাবনে/রাধিকার নির্জন স্বপন।”

বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে গভীর আত্মীয়তার এত সার্থক কাব্যরূপ আর কি হতে পারে। কবিতার ভাব-পরিমণ্ডলে পদাংশগুলির উদ্ধৃতি ব্যবহার যথোপযুক্ত হয়েছে বললে কম বলা হবে, কাব্যরসকে নিবিড় করতে এর প্রয়োজন ছিল অবশ্যস্বাভাবিক। ‘ব্যর্থযৌবন’ ‘প্রত্যাখ্যান’ ‘লজ্জা’ কবিতায় বৈষ্ণবপদাবলীর রাধা-অনুভাবনার বিরহ-মধুর অনুভূতি আরও তীব্র—

আজি যে রজনী যায় ফিরিহিবে তায়
কেমনে?
কেন নয়নের জল ঝরিছে বিফলে
নয়নে।

এ বেশ ভূষণ লহ সখী, লহো,
এ কুসুমমালা হয়েছে অসহ—
এমন যামিনী কাটিল, বিরহ—শয়নে।

(ব্যর্থ যৌবন)

কবিতাটি সম্পর্কে সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন—‘বৈষ্ণব কবিতার রাধার মতো আপনাকে বিরহিনী নারীরূপে কল্পনা প্রথম দেখা গেল ‘ব্যর্থ যৌবন’ কবিতায়। অতএব এই কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসরগিতে একটি মার্গ চিহ্ন বলিতে পারি’।^{৩৭}

সেদিক থেকে ‘প্রত্যাখ্যান’ কবিতায় রাধাভাবের অনুসরণ আরও প্রত্যক্ষ:

সকাল বেলায় সকল কাজে
আসিতে যেতে পথের মাঝে
আমারি এই আঙিনা দিয়ে
যেয়ো না।
অমন দীন নয়নে তুমি
চেয়ো না।

এর পাশাপাশি মেলানো যেতে পারে চণ্ডীদাসের ‘আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়/আমার আগ্নি দিয়া’ ইত্যাদি পংক্তির বহিরঙ্গীয় ভাবকল্পনা। ‘ভরাভাদরে’ কবিতার নামেই যেমন বৈষ্ণবীয় নিসর্গ চেতনার প্রকাশ (স্মরণীয় বিদ্যাপতির ‘এ ভরা ভাদর মাহ বাদর’ ইত্যাদি পংক্তি) তেমনি ‘হৃদয় যমুনা’ কবিতায় রূপকের আবরণে বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গের সার্থক প্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বৈষ্ণবপদাবলীর বাতাবরণ এমন ঘনীভূত হওয়ার কারণ আর কিছুই নয়, বৈষ্ণব পদাবলীর রসে মজে আছেন কবি, অভিসিদ্ধি করেছেন নিজেই মধ্যযুগের কাব্যকলায়। বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে পদাবলীর প্রেমব্যাকুলতার দিকটি গ্রহণ করেছেন স্বাভাবিক প্রবণতায়।

কিন্তু এই সবকিছুকেই রবীন্দ্রনাথ ছাড়িয়ে গেছেন বিখ্যাত ‘বৈষ্ণব কবিতা’য়। বৈষ্ণব ধর্মকে নিয়েই বৈষ্ণব সাহিত্য, তাকে বাদ দিয়ে নয়;—এরকম তত্ত্ব-সংস্কার প্রচলিত থাকলেও, বৈষ্ণব পদাবলীর বৃহত্তর পাঠক সম্প্রদায়ের চোখে তার প্রাকৃত প্রেমের দিকটা যত বেশি করে ধরা পড়ে, ধর্ম, দর্শন বা অলৌকিক ভক্তিরস ততটা নয় মোটেই। সেদিক থেকে বরং মনে হওয়াই স্বাভাবিক নিছক মানবিক প্রেমকেই ভক্তিভাবে ছদ্ম আবরণে মুড়ে দেওয়া হয়েছে যেন। তাছাড়া মহাজন পদাবলীর রচয়িতারা সকলেই যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রেক্ষাপটে কবিতা রচনা করেছেন এমন নয়, চৈতন্য-পূর্ববর্তী বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস তো আছেন-ই, পরবর্তী কালের সব কবি-ই যে দৈবীপ্রেরণা নিয়ে ভক্তিরসাপ্লুত চিন্তে পদরচনা করেছেন তা বলা যায় না। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের অনেক বৈষ্ণব কবিতাই গতানুগতিক ভাবে লেখা।^{৩৮} রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলাই তাদের প্রধান আলম্বন হয়েছিল। চৈতন্য উত্তর কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের পরিমণ্ডলে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবি পদরচনা করলেও তাঁদের কবিমনের অবচেতনায় ব্যক্তিগত প্রেম-ভাবনার সংমিশ্রণ ছিল অবশ্যই; তা না হলে প্রেমকাব্য রূপে বৈষ্ণব পদাবলীর চিরন্তন আবেদন সাধারণ পাঠকের কাছে গ্রাহ্য হোত না কখনই।

বৈষ্ণব ধর্মের মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যকে আত্মদান করার পক্ষপাতী ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। তাই বৈষ্ণব পদাবলীর অতীন্দ্রিয় প্রেমকল্পনার মধ্যে মানব-মানবীর চিরন্তন প্রেমলীলাকেই প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি। পদাবলীর প্রকৃতিচেতনা তাঁর সৌন্দর্যব্যাকুল কবিমানসকে একদিকে যেমন উত্তলা

করেছে, অপরদিকে ধর্মীয় সংস্কারের গণ্ডী ছাড়িয়ে রাধার বিরহ বেদনা নতুন তাৎপর্যলাভ করেছে তাঁর হাতে। বৃন্দাবন গাথার প্রেমামৃত রসধারা ভক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে বৃহত্তর মানবসমাজকে বঞ্চিত করল না তিনি কখনই চান নি। আর এই জন্যই তাঁর প্রশ্ন:

“শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান।/পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান,/অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ-মিলন,/বৃন্দাবন গাথা—এই প্রণয়-স্বপন/শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কুলে,/চারি চক্ষু চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে/শরমে সম্মে—একি শুধু দেবতার।/এ সংগীত রসধারা নহে মিটাবার/দীন মর্ত্যবাসী এই নরনারীদের/প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের/তপ্ত প্রেমতৃষা?”

মর্ত্যের মানবীয় প্রেম-ই পরিস্রুত কবিভাবনায় লোকোত্তর অপ্রাকৃত প্রেমের সাধন রূপ লাভ করেছে। একালের কবি যিনি মানুষী প্রেমের মধ্যেই ভগবানের প্রেমকে উপলব্ধি করেন, অপ্রাকৃত প্রেমের বিমূর্ত তত্ত্বকে মানবিক অনুভবের রূপমধুরিমায় ভরে তোলেন তিনি,—যেন সীমার রহস্য-গভীরে অসীমের সন্ধান। বৈষ্ণব কবিদের কাছে তাই রবীন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসা—

“সত্য করে কহো মোরে হে বৈষ্ণব কবি,/কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,/কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান/বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান,/রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।/এত প্রেমকথা—/রাধিকার চিন্তাশীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা/চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার/আঁখি হতে। আজ তার নাহি অধিকার/ সে সংগীতে।”

মানুষের মধ্যে দেবতাকে নামিয়ে আনতে পেরেছিল বৈষ্ণব ধর্ম। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা

নরবপু তাহার স্বরূপ।

(চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা। ২১-পরিচ্ছেদ)

তারই নবতর ভাষ্য রচনা করে একালের কবি বৈষ্ণব কবিতা সম্পর্কে বলেন—

“এই প্রেম গীতহার/গাঁথা হয় নরনারীর মিলন মেলায়,/কেহ দেয় তারে, কেহ বধুর গলায়।/দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই/প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই,/তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা।/দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।” বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্যের মধ্যে মানবলীলার চিরন্তন প্রেমের যে রহস্যময় উৎসার, ‘বৈষ্ণবকবিতা’য় তাকেই নতুনভাবে উপলব্ধি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সমসাময়িক কালে লেখা ‘পঞ্চভূতের’ ‘মনুষ্য’ প্রবন্ধে এই ভাবটিকে স্পষ্ট করলেও, ‘চৈতালি’র ‘পুষ্পের হিসাব’ কবিতায় আসল কথাটি ব্যক্ত করেছেন—

বড় শক্ত বুঝা

যারে বলে ভালবাসা, তারে বলে পূজা।

আর গোটা তিনেক কবিতার উল্লেখ করে ‘সোনার তরী’ কাব্য প্রসঙ্গ শেষ করব। প্রথমতঃ ‘গানভঙ্গ’কবিতাটিতে ‘গেয়েছে আগমনী শরৎ প্রাতে গেয়েছে বিজয়ীর গান’ ইত্যাদি পংক্তিতে রবীন্দ্রনাথ ‘আগমনী বিজয়া’ গানের সশব্দ উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ ‘পুরস্কার’ কবিতায় পুরস্কৃত ‘কবি’র মাধ্যমে রামায়ণ-মহাভারতের ‘শাস্ত করুণ রস ও বৈরাগ্যময় বিষাদ’ সম্পর্কে নিজস্ব কাব্য উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া কবিতাটিতে দাশরথি রায়ের প্রভাব আছে বলে অনুমান করে রবীন্দ্রনাথের কাছে চিঠি লিখেছিলেন (২৬ শ্রাবণ ১৩০৩) কথাসাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। কবি সেই চিঠির উত্তরে কি লিখেছিলেন তা জানা না গেলেও প্রভাতকুমারের জিজ্ঞাসাটি ছিল কৌতুহলজনক—তাই তাঁর চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্ধৃত করছি: “সোনার তরীতে পুরস্কার কবিতার গল্পাংশ কি আপনি দাশরায় হইতে লইয়াছেন? ‘শ্রীশ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণ

বিরহান্তর কুরুক্ষেত্র যাত্রায় মিলন' পালায় বর্ণিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ এক যন্ত্র করিতেছেন। তাহার দান ধ্যানের সোর গোল শুনিয়া—

কায় ক্রেশে যোগে যোগে যত্নে যন্ত্রেশ্বর আগে
উপনীত দরিদ্র ব্রাহ্মণ।

কৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া আলাপ করিয়া, ভারী খুশী হইলেন।

হেথা ভাবিছেন মনে কি দান দিব এ ব্রাহ্মণে
রাজ্য দিলে গুণের শোধ নয়।

কহেন মাধব রঙ্গে এস হে দ্বিজ তোমার সঙ্গে
কোলাকুলি করি মহাশয়।

কৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে কোল দিয়াই বিদায় করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ অনেক বিলাপ পরিতাপ করিতে করিতে বাড়ি ফিরিলেন। শেষ অংশটি অবশ্য আপনার সঙ্গে মিলিল না।^{১০} শুধু শেষ অংশই নয়, সমগ্র কবিতায় দাশুরায়ের সঙ্গে মিল অতি ক্ষীণ—যোগসূত্র যেটুকু অনুমান করা যেতে পারে তা কাহিনী কাঠামোয়।

‘সোনার তরী’ কাব্যের নাম-কবিতার সঙ্গে চর্যাগীতির ৮ সংখ্যক পদ ‘সোনে ভরিতী করুণা নাবী/রূপা থেই নাহিক ঠাবী’ ইত্যাদি পদের ভাবানুভূতির সাদৃশ্য কল্পনা করেছেন মনীন্দ্রমোহন বসু।^{১০} রবীন্দ্রনাথ যখন ‘সোনার তরী’ লেখেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক চর্যাপদের পুথি আবিষ্কৃত হয়েছিল তার অনেক পরে। আর এই আপাত সাদৃশ্য উল্লেখ্য কোনো সাধর্মেরও সূচক নয়। তাহলেও এই প্রসঙ্গেই আর একটি কৌতূহলপ্রদ ঘটনা মনে পড়ে:—আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ‘চর্যাপদ’কে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বলে অভিহিত করে, ‘বাংলা ভাষার উৎপত্তি আর বিকাশের গতি’ পথ দেখাবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের জীবিত কালেই ‘সোনার তরী’ কবিতা থেকে আধুনিক বাংলার নিদর্শন হিসেবে দুটি ছত্র উদ্ধার করে, বাংলা ভাষার আদি-যুগ পর্যন্ত সেই দুই ছত্রের প্রতিরূপ কি রকম ছিল বা থাকা সম্ভব ছিল, তা দেখাবার প্রয়াস করেছিলেন একটি প্রবন্ধে।^{১১} এই লেখা পড়ে রবীন্দ্রনাথের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা অবশ্য জানা যায় না।

বাংলা দেশের মধ্যযুগের ইতিহাসে দেখা গেছে ছোট-বড় ভূস্বামী রাজাদের সম্মান ও পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত হয়েছেন অজস্র পাঁচালিকার কবি—সম্ভবত এরকম-ই এক কবির রাজপুরুষার লাভের কল্পকথাই ব্যক্ত হয়েছে ইতিপূর্বে উল্লেখিত ‘পুরুষার’ কবিতায়। আদি-মধ্যযুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি কৃষ্ণিবাস ওঝা তাঁর আত্মবিবরণীতে রাজসম্মান লাভের কথা জানিয়ে গেছেন—খনী-দরিদ্র নির্বিশেষে আত্মদান করত তাঁর কাব্যের করুণমধুর গার্হস্থ্যরস। কৃষ্ণিবাসী রামায়ণ আপামর বাঙালির জীবনে মিশে যেতে পেরেছিল বলেই জাতীয় কাব্যরূপে তার স্বীকৃতি। পল্লীবাংলার নাড়ীর চলাচলে রামায়ণ পাঠের সেই চিরন্তন ধারাকেই রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন ‘নদী’ (১৩০২) কবিতায়।

মুদি দোকানেতে সারাখণ
বসে পড়িতেছে রামায়ণ।

মুদির দোকানে বংশ পরম্পরায় কৃষ্ণিবাসী রামায়ণ পাঠের বাস্তব ঘটনা অভিভূত করেছিল এস. ওয়াজেদ আলিকেও। আর সেই সূত্রেই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল প্রবাদপ্রতিম বাক্যটি—সেই ট্রাডিসন সমানে চলছে।

পরবর্তী কাব্য ‘চিত্রা’র (১৩০২) ‘নগরসঙ্গীত’ কবিতাতেও রামায়ণের স্বর্ণযুগের চিত্রকল্প উপস্থাপিত হয়েছে দেখতে পাই—

‘কোন মায়াযুগ কোথায় নিত্য/স্বর্ণবালকে করিছে নৃত্য,/তাহারে বাঁধিতে লোলুপ চিন্ত/ছুটিছে বৃদ্ধ বালকে।’

‘নদী’ সোনার তরী- চিত্রা যুগের ফসল; নদীকে কেন্দ্র করে নদীবিধৌত বাংলাদেশের ছবি ফুটে উঠেছে কবিতাটিতে। নদীর বর্ণনায় নদীবক্ষে মাঝিদের গানের উল্লেখ করতেও ভোলেন নি কবি: ‘সুখে সারি গান গায় দাঁড়ি/কত খেয়া-তরী দেয় পাড়ি’। নৌকার মাঝিদের মধ্যে প্রচলিত লোকসঙ্গীতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল অল্প বয়সেই। ‘ছিন্নপত্রাবলী’র একটি চিঠিতে (৩২ সংখ্যক পত্র) সেই স্মৃতি স্মরণ করে লিখেছেন (২০ আশ্বিন ১২৯৮)—“বোটের জানলার কাছে চুপ করে বসে আছি, একটা জেলে ডিঙিতে একজন মাঝি গান গাইতে গাইতে চলে গেল—খুব যে সুর তা নয়—হঠাৎ মনে পড়ে গেল বহুকাল হল ছেলেবেলায় বাবা মশায়ের সঙ্গে বোটে করে পদ্মায় আসছিলুম—একদিন রাত্রি প্রায় দু’টোর সময় ঘুম ভেঙে যেতেই বোটের জানালাটা তুলে ধরে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম নিম্বরঙ্গ নদীর উপরে ফুটফুটে জোৎস্না হয়েছে, একটা ছোট ডিঙিতে একজন ছোকরা একলা দাঁড় বেয়ে চলেছে, এমনি মিষ্টি গলায় গান ধরেছে—গান তার পূর্বে তেমন মিষ্টি কখনো শুনিনি”।

সারিগান যদিও নৌকা বাওয়ার ছন্দে, মিলিত কণ্ঠের গান,^{৪২} তথাপি বাল্যকালের স্মৃতি থেকেই তা রবীন্দ্রনাথের কাছে ‘একলা কণ্ঠের গান’ রূপকল্পে চিত্রিত হয়েছে বিভিন্ন লেখায়। ‘গীতবিতানে’র অন্তত তিনটি গানে কবিমনের অবচেতনায় সারি গানের প্রসঙ্গ এসে পড়েছে যেন আপনা থেকেই—

তারি সুদূর সারি গানে

বিদায় স্মৃতি জাগায় প্রাণে (প্রেমপর্যায় ২৮০। পৃ: ৩৮৩)

আবার

‘তাই তোমারি সারি গানে, সেই আঁখি তার মনে আনে,

আকাশ ভরা বেদনাতে রোদন ওঠে বাজি।

(প্রকৃতিপর্যায় ৩৮। পৃ: ৪৪৩)

কিংবা

ওই দেখো কতবার

হল খেয়া পারাপার

সারি গান উঠিল অশ্বরে

(বিচিত্র পর্যায় ১০৯। পৃ: ৫৯২)

লক্ষ্য করা যায় বিচ্ছেদ-বেদনার স্মৃতিতেই সারি গানের রূপকল্পগুলি গড়ে উঠেছে। এর পেছনে অপরিশ্রুত বয়সের অভিজ্ঞতাই কাজ করেছে বলে উল্লেখ করেছেন সমালোচক। নির্দিষ্ট উদাহরণ দিয়ে লিখেছেন—“ছেলেবেলায় পাওয়া এই অভিজ্ঞতাই কর্ণধার, সারিগান, নিশান্তের নিদ্রাভাঙা এবং গান গাওয়া ও বশ করার উপাদানগুলিকে একসঙ্গে গ্রথিত করে ‘কতবার তারি সারি গানে/নিশান্তে নিদ্রা ভেঙে ব্যথায় বেজেছে মোর প্রাণে/অজানা পথের ডাক’। এই আশ্চর্য রূপকল্পটির জন্ম দিয়েছে।”^{৪৩} রবীন্দ্রনাথের আরো অনেক লেখায় সারি গানের প্রসঙ্গ আছে—যথাস্থানে তার উল্লেখ করব।

‘সোনার তরী’র পর ‘শিশু’ (১৩১০) কাব্যের পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রকবিতায় ছড়া, রূপকথা, লোকসংগীত প্রভৃতি লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখাগুলির উপাদানগত প্রয়োগ-ব্যবহার বা প্রভাব খুব বেশি চোখে পড়ে না। ‘চিত্রা’ (১৩০২) থেকেই রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাব অনেকটা অন্তর্মুখী হয়ে পড়ে, তাই সামান্য যেটুকু প্রভাব আছে তা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। লোকসাহিত্যের ব্যাপারে কবি স্বভাবের এই বন্ধ ঢাকনা আবার খুলে গিয়েছিল ‘শিশু’ কাব্য থেকে এবং পরিণত বয়সে ক্রমশ তার প্রকাশ দেখা দেয় বিচিত্রভাবে।

‘চিত্রা’র ‘উর্বশী’ কবিতায় রূপকথার কল্পচিত্র টুকরো টুকরো ভাবে আভাসিত হয়েছে। ‘স্বর্গ হইতে বিদায়’ কবিতার কয়েকটি পংক্তিতে মেয়েলি ব্রতের কিছু আচার আচরণের চিত্রও আছে: “শিশুকালে/নদীকূলে শিব মূর্তি গড়িয়া সকালে/আমারে মাগিয়া লবে বর। সম্মা হলে/জ্বলন্ত প্রদীপখানি ভাসাইয়া জলে/শঙ্কিত কম্পিত বক্ষ চাহি একমনা/করিবে সে আপনার সৌভাগ্য গণনা/একাকী দাঁড়ায়ে ঘাটে।”—এই উদ্ধৃতির মধ্যে যে দুটি কুমারী ব্রতের বিবরণ আছে, আশুতোষ ভট্টাচার্য ‘তাদের মধ্যে একটি শিবের ব্রত, আর একটি পশ্চিমবঙ্গের সুপরিচিত ‘ইতু ব্রত’ বলে নির্দেশ করেছেন।^{৪৩} বিশেষজ্ঞের এই ধারণা অযৌক্তিক নয়। কেননা কবিতাটি রচনার (অগ্রহায়ণ ১৩০২) সমসাময়িক কালেই অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গের মেয়েলি ব্রতগুলি সংগ্রহ করে ‘সাধনা’ পত্রিকায় প্রকাশ করছিলেন (১৩০১-২) রবীন্দ্রনাথ। সেই মানসিক অভিঘাতেই উদ্ধৃত পংক্তিগুলি রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

চিত্রা-চৈতালি পর্বে রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনায় বৈষ্ণব পদাবলীর প্রত্যক্ষ প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। ‘শেষ উপহার’ কিংবা ‘রাত্রে ও প্রভাতে’ কবিতায় সুস্পষ্টভাবে পদাবলীর ভাব ও ভাষার আহরণ লক্ষিত হলেও ‘গৃহশত্রু’ কবিতায় তা অনেকটাই প্রকট:

শুধু আমার নুপুর আমারি চরণে
ঝিমরি ঝিমরি বাজে
অধীর মুখর শুনিয়া সে স্বর
পদে পদে মরি লাজে। (গৃহশত্রু)

একাকিনীর অভিসার চিত্রই শুধু নয়, সমগ্র কবিতাটিতেই রাধা ভাবের প্রকাশ। অন্যপক্ষে বিমানবিহারী মজুমদার ‘আবেদন’ কবিতার ভাবের সঙ্গে নরোত্তমদাস বর্গিত মঞ্জরী ভাবের সেবা অভিলাষের কিছু সাদৃশ্য দেখেছেন।^{৪৪} সেদিক থেকে ‘শীতে ও বসন্তে’ ব্যঙ্গ কবিতায় বৈষ্ণবপদের দুটি পংক্তি সচেতন ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে:

এস এস বঁধু এস
আধেক আঁচরে বোসো
অবাক অধরে হাসো
ভুলাও সকল তত্ত্ব।

এর সঙ্গে মেলানো যাক দীনদাসের এবং লোচনদাসের নামে প্রচলিত পদ:

আইস আইস বন্ধু, আধ আঁচরে আসি বৈস
নয়ান ভরিয়া তোমা দেখি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, পদটি নবদ্বীপের জনৈক বৈষ্ণব গায়কের মুখে শুনে ‘পদরত্নাবলী’ (১২৯২) -তে সংকলন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ (পৃ. ৬৯ দ্র.) এবং এর প্রথম কয়েকটি পংক্তি তাঁর এতই প্রিয় ছিল যে বিভিন্ন প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করেছেন।

‘চিত্রা’র পরে ‘চৈতালী’ (১৩০৩)তেই রবীন্দ্রকব্য প্রতিভার একটা পর্বশেষ হয়েছে। অবশ্য পরবর্তী ‘নৈবেদ্য’ পর্বের ‘ভারত প্রেম ভাবনা’র সূচনা-স্বাক্ষর এই কাব্যেই। ‘চৈতালী’র বেশ কিছু কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত সাহিত্য-মনস্কতার প্রতিফলন যতটা স্পষ্ট, সেই তুলনায় প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের প্রভাব প্রায় নেই বললেই চলে। রামায়ণ-কথার বেদনাময় সমাপ্তি স্বরণে ‘বনে ও রাজ্যে’ সনেটটি লেখা। কবিতাটি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ লিখেছেন—“রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের সমস্ত ঘটনা সংঘাত ও নিরুদ্ধ হৃদয়াবেগ, পঞ্চবটীর সানন্দ বনযাত্রা ও সীতাহীন অযোধ্যার নিরানন্দ রাজ্য ভোগের মর্মান্তিক পার্থক্য এই চতুর্দশপদীর পংক্তিগুলির মধ্যে সংহত রূপ লইয়াছে।”^{৪৫}

‘স্বপ্ন’ কবিতায় বৈষ্ণব পদাবলীর স্বপ্ন অনুযজ্ঞের পরোক্ষ প্রভাব থাকলেও, চণ্ডীদাসের ‘কি মোহিনী জ্ঞান বঁধু, কি মোহিনী জ্ঞান’ ইত্যাদি পংক্তির বহিরঙ্গীয় অনুসরণে ‘অভিমান’ কবিতার—
‘কারে দিব দোষ বন্ধু কারে দিব দোষ

বৃথা কর আশ্বালন বৃথা কর রোষ’—পংক্তিদ্বয় রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। অন্যপক্ষে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনের এক ঘরোয়া সভায় ‘চেতালি’ কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে ‘ক্ষণমিলন’ ও ‘প্রেম’ কবিতা দু’টি সম্পর্কে কবি নিজেই মন্তব্য করেছিলেন—“ক্ষণ মিলনের সঙ্গে তুলনীয় জ্ঞানদাসের, ক্ষণ কে লগ্ন করে প্রেম। বাউলের গোলকে গোলকে মিল এক ঠাই।”^{৪৭} মন্তব্যটি খুবই অস্পষ্ট;—রবীন্দ্রনাথ ঠিক কি বলতে চেয়েছেন তা বোঝা যায় না। আলোচনার অনুলিখন নিয়েছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন—এখানে অনুলেখকের ত্রুটিও থাকতে পারে।

তিন

রবীন্দ্রকাব্যের ‘বিকাশকালে’র সূচনা ‘চেতালি’র পর থেকেই। আগেই বলেছি ‘নৈবেদ্য’ পর্বে প্রাচীন ভারতবর্ষের শাস্ত্রতত্ত্ব কর্মময় জীবনভাবনার কিছু কিছু চিহ্ন ‘চেতালি’ থেকেই প্রত্যক্ষ হচ্ছিল। ‘চেতালি’-উত্তর এবং ‘নৈবেদ্য’-পূর্ব অন্যান্য কাব্যগুলিতে সেই ধ্যান-কর্মের অধ্যাত্মচেতনায় পৌঁছবার দ্বন্দ্ব—‘কবি-প্রাণের স্বত্বসজ্জি’। এই পর্বে ‘ভারতাত্মা’কে নতুন করে আবিষ্কারের চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ কেবল সংস্কৃত সাহিত্যের গভীরেই প্রবেশ করেন নি, অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সাহিত্য-ইতিহাসেও তাঁর পদচারণ ঘটেছিল;—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যও তার বাইরে ছিলনা। বরং বলা যায় এই কালসীমায় সংস্কৃত সাহিত্য, মূলত কালিদাসের পরই তাঁকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল বৈষ্ণব কবিদের রচনা। স্বাভাবিক কারণেই এই সময়কার লেখায় লোকসাহিত্যের প্রভাব খুব কম;—ইতস্তত বিচ্ছিন্ন যেটুকু আছে তার আলোচনাই প্রথমে করবো।

‘কণিকা’, ‘কথা’ এবং ‘কাহিনী’ একই বছর ১৩১০ সালে প্রকাশিত হয়—যদিও এই কাব্যত্রয়ের কবিতাগুলি রচিত হতে শুরু করেছিল ‘চেতালি’র পরেই ১৩০৪ সাল থেকে। ‘কাহিনী’কে রবীন্দ্রনাথ ‘নাট্যকাব্য’ বলে অভিহিত করেছিলেন; তার আলোচনা করেছি অন্যত্র।^{৪৮} ‘কথা’র ঐতিহাসিক কাহিনীগুলিতে লোকসাহিত্যের প্রবেশ অসম্ভব। ‘কণিকা’র^{৪৯} একটি মাত্র কবিতায় রূপকথার অতিপরিচিত তিনটি চরিত্রের (রাজা, সুয়োরানী এবং দুয়োরানী) মাধ্যমে ব্যঞ্জনাময় অথচ তির্যক বস্তুব্য উপস্থাপন করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

সুয়োরানী কহে, রাজা দুয়োরানীটার
কত মতলব আছে বুঝে ওঠা ভার।
গোয়াল ঘরের কোণে দিলে ওরে বাসা,
তবু দেখো অভাগীর মেটে নাই আশা।
তোমারে ভুলায়ে শুধু মুখের কথায়
কালো গরুটিরে তব দুয়ে নিতে চায়।
রাজা বলে ঠিক ঠিক বিষম চাতুরী
এখন কি ক’রে ও’র ঠেকাইব চুরি।
সুয়ো বলে একমাত্র রয়েছে ওষুধ,
গোরুটা আমারে দাও, আমি খাই দুধ। (চুরি নিবারণ)

রূপকথার বাহ্য আবরণে ‘কল্পনা’র (১৩০৭) দু’টি মাত্র কবিতা লেখা হয়েছিল;—তার মধ্যে ‘ব্রহ্মলগ্ন’ কবিতায় ‘সোনার তরী’র ‘প্রত্যাখ্যান’ কবিতার রূপক দেখা দিয়েছে বলে সুকুমার সেন যদিও উল্লেখ করেছেন^{৫০}, তথাপি কবিতাটির বহিরাবরণেও রূপকথার আমেজ ও ইমেজ দুর্লভ্য

নয়: “গোধূলি বেলায় তখনো জ্বালেনি দীপ,/পরিতেছিলাম কপালে সোনার টিপ—/কনক মুকুর
হাতে লয়ে বাতায়নে /বঁধিতে ছিলাম কবরী আপন মনে।/হেন কালে এল সন্ধ্যা-ধূসর পথে/করুণ
নয়ন তরুণ পথিক রথে।/ফেনায় ঘর্মে আকুল অশ্বগুলি/বসনে ভূষণে ভরিয়া গিয়াছে ধূলি।/শুধাল
কাতরে, ‘সে কোথায়, সে কোথায়’।” বস্তুত যত বেশি পরিণত-মনস্ক হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা,
রূপকথার উপস্থাপনা ভঙ্গি ততই গভীর ইঙ্গিতবাহী ও ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে ক্রমশ। রূপকথার
সহজ সরল গল্প অবলম্বনে কবিতা লেখার পর্ব শেষ হয়েছে। ‘সোনার তরী’র ‘হিং টিং ছট্’
কবিতাটির ধাঁচে লেখা ‘কল্পনা’র ‘জ্বুতা আবিষ্কারে’ও সমসাময়িক ঘটনার অভিঘাত রয়েছে।
হবুরাজা এবং গবুমস্ত্রীর কথায় কবিতাটি আগাগোড়া রূপকথার সুরে বাঁধা।^{৫১}

আলোচ্য পর্বের কাব্যকলায় লোকসাহিত্যের প্রেরণা এতই অল্প ছিল যে একমাত্র ‘ক্ষণিকা’
ছাড়া লৌকিক ছন্দ ব্যবহারেও রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট সংযত হয়েছেন। বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি কবিতায়^{৫২}
অবশ্য রথযাত্রা-স্নানযাত্রা ইত্যাদি লোকউৎসবের চিত্ররূপ পাওয়া যায়।

‘কথা’ কাব্যের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক এবার। রবীন্দ্রনাথের কবিমন এক সময়ে
ঐতিহ্যগৌরবময় তথ্যের সন্ধানে গিয়ে পড়েছিল প্রাচীন ভারত ইতিহাসের রাজ্যে—‘কথা’য় তারই
প্রবর্তনা। এই কাব্যের কাহিনীগুলি যেসব আকর গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে
এবং অনেক কবিতার শিরোনামের পাশে তার উল্লেখ আছে। তার মধ্যে কেবলমাত্র বৈষ্ণব
জীবনীগ্রন্থ ‘ভক্তমাল’ থেকে নেওয়া কাহিনী-কবিতাগুলিই বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। ‘অপমান-
বর’ ‘স্বামীলাভ’ এবং ‘স্পর্শমণি’ কবিতা তিনটির শিরোনামে ‘ভক্তমাল’ কথাটি লেখা থাকায়
চিনে নিতে অসুবিধে হয় না এই কবিতাগুলির বস্তু-উৎস। তাছাড়া গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের
‘বিজ্ঞাপনে’ও রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন—‘ভক্তমাল হইতে বৈষ্ণব গল্পগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। মূলের
সহিত এই কবিতাগুলির কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইবে।’

নাভাজী-কৃত হিন্দী ‘ভক্তমাল’ (১৫৬০ খ্রী:) অবলম্বনে কৃষ্ণদাস বাংলায় ‘ভক্তমাল’ রচনা
করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে সম্ভবত গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়। ছাপা
বই শুধু নয়, তরুণ রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহে ভক্তমালের একটি বাংলা পুঁথিও ছিল।^{৫৩} ‘মানসী’ কাব্যের
‘সুরদাসের প্রার্থনা’ শীর্ষক করুণ রসমিশ্রিত রোমান্টিক কবিতাটির গল্প কিংবদন্তী-রূপে সুরদাসের
নামে প্রচলিত থাকলেও ‘ভক্তমাল’ গ্রন্থে কাহিনীটি আছে বিশ্বমঙ্গল সম্পর্কে। মনে হয় ভক্তমালের
সাহায্য নিলেও প্রচলিত জনশ্রুতিকে মোটেই লঘু করে দেখেন নি রবীন্দ্রনাথ।

অন্যপক্ষে ‘কথা’র কবিতা তিনটির উপাখ্যান সম্পূর্ণতই ‘ভক্তমাল’ থেকে সংগৃহীত।^{৫৪}
কবিতাগুলির সঙ্গে মূল কাহিনীর কিছু-কিছু প্রভেদের কথা রবীন্দ্রনাথ ‘বিজ্ঞাপনে’ই বলেছেন।
বলা বাহুল্য আধুনিক কবির কলমে সমসাময়িক যুগাদর্শ এবং নতুন মূল্যবোধের ফলে এই পার্থক্য
অনিবার্য। মূলকাহিনীর সঙ্গে^{৫৫} সেদিক থেকে পার্থক্য বেশি ‘অপমানবর’ কবিতাটির; —ভক্ত
কবীরের মাহাত্ম্য প্রকাশে অতিপ্রাকৃত প্রসঙ্গগুলি বাদ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ‘স্বামীলাভ’-এ কবি
তুলসীদাস এবং স্বামীহারা রমণীর চরিত্রচিত্রণে যথাসম্ভব মূলকাহিনীকেই অনুসরণ করা হয়েছে।
অবশ্য সবচেয়ে বেশি মূলানুগ হয়েছে ‘স্পর্শমণি’ কবিতাটি। প্রধান চরিত্র ভক্ত সনাতন চৈতন্যশিষ্য,
বৃন্দাবনের ষড়্গোস্থামীর অন্যতম। কবিতাটির কোন কোন পংক্তির সঙ্গে ‘ভক্তমালে’র ছব্ব মিল
লক্ষ্য করা যায়:

জীবন আমার নাম, মানকরে মোর ধাম,
জিলা বর্ধমানে
এত বড় ভাগ্যহত দীনহীন মোর মতো
নাই কোনখানে। (স্পর্শমণি)

এর সঙ্গে মেলানো যাক কৃষ্ণদাসের রচনা—

দৈবযোগে গৌড়দেশের এক ব্রাহ্মণ।

বর্ধমানে মানকরেতে ভবন।।

জীবন তাহার নাম বহুত কটুঘ।

সুদরিদ্র কিছুমাত্র নাহি অবলম্ব।। (চরিত্র : শ্রী রূপ সনাতন, ভক্তমাল)

সমকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে স্বাদেশিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ কবি প্রাচীন ভারতবর্ষের ঐতিহ্য অনুসন্ধান করে তুলে এনেছেন ‘কথা’র এক-একটি কবিতায়। ‘অপমানবর’ ‘স্বামীলাভ’ বা ‘স্পর্শমণি’র কাব্যগুণ মধ্যযুগের তিন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব যথাক্রমে কবীর, তুলসীদাস, এবং সনাতন গোস্বামীর মহিমাময় জীবনাদর্শের নবমূল্যায়ন।

‘নৈবেদ্য-পূর্ব’ সঙ্কলনের কাব্য হিসেবে ‘কল্পনা’র (১৩০৭) শ্রেষ্ঠতা অপরূপ সৌন্দর্য-রহস্য চেননায়; —প্রাচীন এক কল্পলোকে প্রবেশ করে রবীন্দ্রনাথের অতীতচরিতা এখানে তীব্রমধুর রূপলাভ করেছে। এক্ষেত্রে প্রাচীন সংস্কৃত, মূলত কালিদাসের সাহিত্য অবলম্বন হলেও সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে বিচরণ করেছেন তিনি বৈষ্ণব কবিদের মানস জগতেও। ‘কল্পনা’য় বৈষ্ণব কবিতা এবং কালিদাসের কাব্যের প্রেম-বিরহ নিবিড় একাত্মতা লাভ করেছে বলা যায়। ‘বর্ষামঙ্গল’ ‘স্বপ্ন’ প্রভৃতি কবিতায় যুগ্ম ভাবসমারোহেরই সমন্বিত প্রকাশ।

‘কল্পনা’র বেশ কয়েকটি কবিতা বৈষ্ণব পদাবলীর প্রত্যক্ষ উপাদানে গঠিত। ‘স্পর্ধা’ কবিতার নায়িকার সঙ্গে শ্রীরাধার রসোদগারের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন বিমানবিহারী মজুমদার।^{৫৬} “সে আসি কহিল ‘প্রিয়ে মুখ তুলে চাও’।/দুখিয়া তাহারে কুখিয়া কহিনু ‘যাও’।/সখী ওলো সখী, সত্য করিয়া বলি,/তবু সে গেলনা চলি।.../আমার মালাটি চলিল গলায় লয়ে/চাহি তার পানে রহিনু অবাক হয়ে।/সখী ওলো সখী, ভাসিতেছি আঁধি নীরে,/কেন সে এলনা ফিরে।” (স্পর্ধা)

কবিতাটির প্রথম অংশের সঙ্গে স্তানদাসের ‘যব কানু আওল মন্দির মাঝে/আঁচরে বদন ঝাঁপায়লু লাজে’ ইত্যাদি পদের এবং শেষ অংশের সঙ্গে গোবিন্দ দাসের ‘এই ত মাধবী তলে আমার লাগিয়া পিয়া’ ইত্যাদি পদের ভাবগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

‘পসারিনী’ কবিতার উৎস বৈষ্ণব কবি বংশীবদনের একটি পদ (শ্রীকৃষ্ণের উক্তি):—^{৫৭}

হেদে লো বিনোদিনী

এ পথে কেমনে যাবে তুমি।

শীতল কদম্ব তলে

বৈসহ আমার বোলে

সকলি কিনিয়া নিব আমি।

এ ভর দুপুর বেলা

তাতিল পথের ধূলা

কমল জিনিয়া পদ তোরি— ইত্যাদি পদের অনুপ্রেরণায়

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন:

ওগো পসারিনী, দেখি আয়

কী রয়েছে তব পসরায়।

এত ভার মরি মরি

কেমনে রয়েছে ধরি

কোমল কক্শ ক্লাস্ত কায়।

কোথা কোন্ রাজপুরে

যাবে আরো কতদূরে

কিসের দুঃস্বপ্ন দুঃশায়।

সম্মুখে দেখো তো চাহি, পথের যে সীমা নাহি,
 তপ্তবালু অগ্নি বাণ হানে।
 পসারিণী কথা রাখো, দূর পথে যেয়োনা কো
 ক্ষণেক দাঁড়াও এইখানে। (পসারিণী)

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ‘কল্পনার’ কবিতাটি লেখা হয়েছিল শিলাইদহের বোটে ১৩০৪ সালের ২৫ জ্যৈষ্ঠ। দীর্ঘদিন পরে এই ভাবকেই আরও সংহত ও ভিন্নরূপে প্রকাশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ‘বিচিত্রিতা’র (১৩৪০) ‘পসারিণী’ কবিতায়। উভয় কবিতার তুলনামূলক আলোচনা করলে ‘রবীন্দ্রনাথের কবি জীবনের দুই প্রান্তের দৃষ্টি-বিভেদ বোঝা যায়।’^{৫৮}

‘লজ্জিতা’ কবিতায় রাধার কুঞ্জভঙ্গের ছবি। রবীন্দ্রজীবনীকার মন্তব্য করেছেন—‘একেবারে বৈষ্ণবীয় গান, গীতগোবিন্দের কুঞ্জ ইহতে নির্গতা রাধার কথা।’

যামিনী না যেতে জাগালেনা কেন
 বেলা হল মরি লাজে
 শরমে জড়িত চরণে কেমনে
 চলিব পথের মাঝে।

* * *

আমি এ আকুল কবরী আবারি

কেমনে যাইব কাজে। —কবিতাটিতে বসু রামানন্দের নিম্ন উদ্ধৃত পদটির ছায়াপাত ঘটেছে বলে বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেছেন।^{৫৯}

প্রাণনাথ কি আঙ্ঘু হইল।
 কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল।।
 মুগমদচন্দন বেশ গেল দূর।
 নয়ানের কাজর গেল সিঁথার সিন্দূর।।

তাহলেও বলতে হয় রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় গোবিন্দদাস ও বলরামদাসের ‘কুঞ্জভঙ্গ’ পর্যায়ের পদের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

এগুলি ছাড়াও ‘কল্পনা’র বেশ কয়েকটি কবিতা/গানে^{৬১} বৈষ্ণব ভাবানুশঙ্গে রাধা-কৃষ্ণ ও বৃন্দাবনের গোপীদের ছায়াচিত্রের প্রকাশ ঘটেছে। ‘মার্জনা’ (ওগো প্রিয়তম, আমি তোমারে যে ভালবেসেছি), ‘যাচনা’ (ভালবেসে সখী, নিভৃত যতনে), ‘লীলা’ (কেন বাজাও কাঁকন কন কন, কত ছলভরে), ‘নববিরহ’ (হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে), ‘পূর্ণকাম’ (সংসারে মন দিয়েছি) প্রভৃতি এই শ্রেণীর কবিতা।

‘কল্পনা’র কবি মানস বিরহ-মিলন, পূর্বরাগ-অনুরাগকে অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করেছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে পার্থিব প্রেমের যেটুকু দীনতা প্রকাশ পেয়েছে, আবেগ অনুভূতির তীব্র প্রকাশে তা চাপা পড়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। ‘পিয়াসী’ (আমি তো চাহিনি কিছু), ‘সংকোচ’ (যদি বারণ কর, তবে গাহিব না) কিংবা ‘সকল্লণা’ (সখী, প্রতিদিন হয় এসে ফিরে যায় কে) সাধারণ প্রেমের কবিতা নয়, বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণ প্রেম-অনুভবের মতই অমূর্ত প্রেমের অবচেতন প্রকাশ যেন। বৈষ্ণব কবিতা থেকে প্রণয়-লীলার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব আহরণ ও তার অনুপুঙ্খ অভিব্যক্তির ফলেই রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় এত বৈচিত্র্য। অবশ্য একথা মানতেই হয় বৈষ্ণবীয় প্রেমের মধ্যে যে সীমাবদ্ধতা, রবীন্দ্রনাথের হাতে তা ব্যাপ্ত হয়েছে এক সর্বকালীন আবেদনে। রাধার

বর্ষাভিসারের চিত্র রবীন্দ্রনাথের কবি মনকে যে কত বেশি উদ্বেলিত করেছিল ছিন্নপত্রাবলীতে তার পরিচয় আছে।^{৬২} ‘কল্পনা’র ‘ঝড়ের দিনে’ কবিতায় সেই ভাব-ই কাব্যরূপ লাভ করেছে বলা যায়:—

আজিকার এমন ঝঞ্ঝায়
নূপুর বাঁধে কি কেহ পায়?
যদি আজি বৃষ্টিজল ধুয়ে দেয় নীলাঞ্চল
গ্রামপথে যাবে কি লঙ্জায়
আজিকার এমন ঝঞ্ঝায়?

‘মদনভস্মের পূর্বে’ এবং ‘মদনভস্মের পর’ কবিতা দুটিতে জয়দেবের ‘বদসি যদি কিঞ্চিদপি’ এবং ‘অহহ কলয়ামি বলয়াদি-মণি ভূষণম্’ ইত্যাদি ছন্দের দোলা স্পষ্ট।^{৬৩}

‘কল্পনা’র ‘চৌর পঞ্চাশিকা’ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন বিদ্যাসুন্দরের প্রণয় কাহিনীর সূত্র অবলম্বনে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক বাঙালী কবি-ই (হিন্দু মুসলমান-নির্বিশেষে) বিদ্যাসুন্দরের আদিসাম্ব্যক প্রণয় গাথা নিয়ে কাব্য রচনা করেছিলেন। সমসাময়িক নাগরিক সমাজে তো বটেই ঊনবিংশ শতাব্দীতেও এই কাহিনীর জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ সেনের মত কবির কলমও এই কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনায় তৎপর হয়েছিল। বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর মূলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন প্রণয় উপাখ্যানের প্রভাবের কথা আজ স্বীকৃত।^{৬৪} অবশ্য বররুচির সংস্কৃত ‘বিদ্যাসুন্দরম্’ এবং কাশ্মীরি কবি বিল্হনের ‘চৌরপঞ্চাশৎ’-এর কাহিনী বহিরাগত উপাদান হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে। বাংলা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্যের (বিদ্যাসুন্দর/কালিকামঙ্গল) সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের মাধ্যমেই এই প্রণয়কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অবশ্য কিশোর বয়সে ‘হেবরলীনের কাব্যসংগ্রহে’ সংকলিত বিল্হনের মূল ‘চৌরপঞ্চাশিকা’ও যে তিনি পড়েছিলেন, তার প্রমাণ আছে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত, রবীন্দ্রনাথ-পঠিত উক্ত গ্রন্থের পৃষ্ঠায়। বিদ্যা ও সুন্দরের আদিসাম্ব্যক প্রণয় উপাখ্যান কোনদিনই কবির মনের আনুকূল্য লাভ করেনি— নানা প্রসঙ্গে কাব্যটি সম্পর্কে নিজের বিরাগ ব্যক্ত করেছেন তিনি। তরুণ বয়সে লেখেন— “ভারতচন্দ্রের কথা উল্লেখ করাই বাঙ্ল্য। তাহার মালিনী মাসী, তাহার বিদ্যা, তাহার সুন্দর, তাহার রাজা ও কোটালকে মহাকাব্যের বা প্রথম শ্রেণীর কাব্যের পাত্র বলিয়া কাহারো ভ্রম হইবে না। বিদ্যাসুন্দর পড়িয়া কাহারো মনে কখনো মহান্ ভাব বা যথার্থ সুন্দর ভাবের উদয় হয় নাই। কিন্তু এই গ্রন্থটি বাঙ্গালী পাঠকদের রুচির এমন উপযোগী করিয়া রচিত হইয়াছে, যে, বঙ্গীয় অবালবৃদ্ধবণিতার ইহা অতি উপাদেয় হইয়াছে।”^{৬৫}

এই লেখার প্রায় সতের বছর পরে রচিত হয়েছিল (বৈশাখে ১৩০৪) ‘চৌরপঞ্চাশিকা’ কবিতাটি। মাঝে ১২৯৪ (শ্রাবণ)এ লেখা ‘সাহিত্য’ গ্রন্থের ‘আলস্য ও সাহিত্য’ প্রবন্ধে বিল্হনের ‘চৌরপঞ্চাশিকা’ ভারতচন্দ্রের হাতে আলস্যের সাহিত্য হিসেবে কিভাবে ‘বঙ্কিম কথা-কৌশলে’ পরিণত হয়েছে, উভয়ের রচনা থেকে পাশাপাশি উদ্ধৃতি দিয়ে তা দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতে চৌরপঞ্চাশিকার সতেজ শ্লোকগুলি ‘বিদ্যাসুন্দরে’ সাহিত্যের ‘বামনমূর্তি’ ধারণ করেছে। ‘চৌরপঞ্চাশিকা’ কবিতায় বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কথা যাবতীয় আবিলতা মুক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথের হাতে নতুন রূপ পেল—যৌবন লালসা রূপান্তরিত হল চিরন্তন প্রেম-কথায়। পঞ্চাশটি শ্লোক বিশ্বের সর্বকালের প্রণয়-প্রণয়ীর অন্তরের ভাষা হয়ে উঠল আধুনিক কবির পুনর্নির্মাণে: ‘...তবু সুন্দর চোর/মৃত্যু হারায় কেঁদে কেঁদে ঘুরে/পঞ্চাশ শ্লোক তোর।/পঞ্চাশবার ফিরিয়া ফিরিয়া/বিদ্যার নাম ঘিরিয়া ঘিরিয়া,/তীব্র ব্যথায় মর্ম চিরিয়া/ওগো সুন্দর চোর,/যুগে যুগে তারা কাঁদিয়া মরিছে/মৃত্যু আবেগে ভোর।’ (‘চৌরপঞ্চাশিকা’)

কবিতার নামকরণ থেকেই বোঝা যায় বিল্হনের ‘চৌরপঞ্চাশৎ’ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট অবহিত ছিলেন; এমন কি কবিতাটির ‘ভারতী’ পত্রিকার পাঠে (অগ্রহায়ণ ১৩০৬) বিল্হনের নামও উল্লিখিত হয়েছিল।^{৬৬}

ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্য জীবনের বিভিন্ন পর্বে একাধিকবার পাঠ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অথচ অন্ত্যমধ্যযুগের এই বিখ্যাত কবির প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁর কবিতায় খুবই অল্প। নিজের অলক্ষ্যে মর্মের গভীর অতলে চিহ্নিত হয়ে যাওয়া কোন কোন ভাব অবশ্য অবচেতন ভাবেই প্রকাশ পেয়ে গেছে। ‘অন্নদামঙ্গল’ের প্রথম খণ্ডে ‘অন্নদার ভরানন্দ ভবনে যাত্রা’ অধ্যায়ে দেবী অন্নপূর্ণাকে ঈশ্বরীপাটনীর নৌকা পারাবারের ছবিতে আছে :—

পাটুনী বলিছে মাগো শুন নিবেদন।
সেঁউতী উপরে রাখ ও রাসাচরণ॥
পাটুনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতি উপরে॥
* * *
সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতী হইল সোনা দেখিতে দেখিতে॥
সোনার সেঁউতী দেখি পাটুনীর ভয়।
এ তো মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়॥^{৬৭}

ভারতচন্দ্রের এই বর্ণনার ভাবচিত্র ‘ক্ষণিকা’ (১৩০৭) কাব্যের ‘যৌবনবিদায়’ কবিতায় রূপকল্প হয়ে ধরা পড়েছে—

‘ভেবেছিলাম ঘাটে ঘাটে
করতে আনাগোনা
এমন চরণ পড়বে নায়ে
নৌকা হবে সোনা।
এতবারের পারাপারে—
এত লোকের ভিড়ে
সোনা-করা দুটি চরণ
দেয়নি পরশ কি রে?

প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন—“তিনি ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটুনীর মতো বিস্মিত হইলেন। ...কবির যৌবন তরী শুধু স্বর্ণময় হয় নাই, সেই তরীর ক্ষণিকের যামিনীটি দেবময় হইয়া উঠিয়াছে।”^{৬৮}

মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রায় নেই বললেই চলে, যদিও এগুলির সঙ্গে কবির পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। ‘স্বপ্নমঙ্গল’ (সোনার তরী), ‘মশকমঙ্গল গীতিকা’ ‘পরিণয় মঙ্গল’ (প্রহাসিনী) প্রভৃতি কবিতার নামকরণে (এর মধ্যে দুটি ব্যঙ্গকবিতা) ‘মঙ্গল’ শব্দটির ব্যবহার পাঁচালী আকারে গীত বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যকেই স্মরণ করায়। মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য-যাত্রার যে ছবি, ‘ক্ষণিকা’র ‘বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ’ কবিতার কোন কোন পংক্তিতে তার ক্ষীণ আভাস আছে: “সাজিয়ে নিয়ে, জাহাজ খানি,/বসিয়ে হাজার দাঁড়ি/কোন নগরে যাব, দিয়ে/কোন সাগরে পাড়ি।”

পূর্ববর্তী কাব্য ‘কল্পনা’র তুলনায় ‘ক্ষণিকা’য় বৈষ্ণবপদাবলীর প্রত্যক্ষ প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। দীর্ঘ দিনের চর্চা এবং অভিজ্ঞতায় বৈষ্ণব কবিতার একটা সামগ্রিক ভাবরূপ প্রতিভার সঙ্গে সহজে

মিশে যাওয়ার ফলে কবির অবচেতন মনে হলেও তার আনাগোনা সাবলীল, স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে এত দিনে। তাই ‘শুধু অকারণ পুলকে’ ‘ক্ষণিক দিনের আলোকে’ ‘ক্ষণিকের গান’ গাওয়ার ফাঁকে ফাঁকেই কবিচেতনায় বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবচিত্রের ক্ষণিক স্পর্শও লক্ষ্য করা গেছে। শাস্ত্রগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত পড়ে সময় নষ্ট না করে, অমর প্রেম-কাব্য গীতগোবিন্দের রসে নিমজ্জিত হয়ে স্বপ্নবৎ ক্ষণিক জীবনে এক বেলার তরেও ‘দৌহে অমর’ হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন কবি ‘যুগল’ কবিতায়। উল্টো করে বক্তব্য উপস্থাপনার এই ভঙ্গি ‘জন্মান্তর’ কবিতাতেও: “যদি পরজন্মে পাইরে হতে/ব্রজের রাখাল বালক।/তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে/সুসভ্যতার আলোক।”

সমগ্র কবিতাটিতে ব্রজের মাদুর্যময় অপরূপ পরিবেশ বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ একালের বৈষ্ণব কবি হয়ে উঠেছেন; কবির আকাঙ্ক্ষা বৃন্দাবনের রাখাল বালকদের অকৃত্রিম জীবনচর্যার প্রতি:

যারা নিত্য কেবল ধেনুচরায়
বংশীবটের তলে,
যারা গুঞ্জাফুলের মালা গোঁথে
পরে পরায় গলে,
যারা বৃন্দাবনের বনে
সদাই শ্যামের বাঁশি শোনে,
যারা যমুনাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে
শীতল কালো জলে। (জন্মান্তর)

এই কবিতাটি লেখার বেশ কিছু দিন পরে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে (১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭) কবি জানিয়েছিলেন—“দৃষ্টিকে সর্বতোভাবে নিজের দিক থেকে ফিরিয়ে দিতে পারলেই সভ্য দৃষ্টি পাওয়া যায়—অনন্তের আনন্দরূপ অমৃতরূপ তখন চারিদিকে প্রকাশিত হয়ে ওঠে। সেই রূপটিকে আমি চোখ মেলে দেখে যাব—এরই জন্যে আমার সমস্ত জীবনের সমস্ত ব্রন্দন। এই কথাটাকেই সুস্পষ্ট ভাবে না বুঝেও কৌতূকের ছন্দে আমি লিখেছিলুম—

আমি চাইনে হতে নবযুগের/নববঙ্গের চালক/যদি পরজন্মে পাইরে হতে/ব্রজের রাখাল বালক।

ব্রজের বালকের সেই সরল দৃষ্টি আছে যাতে না বুঝে না জেনও সমস্ত সুন্দর করে দেখতে পাওয়া যায়—যে দৃষ্টির কাছে অনন্ত আপনিই দিনে রাতে কাজে খেলায় অতি সহজ হয়ে আপন হয়ে ধবা দেন।

“কিন্তু রাখাল বালকটাকে গুরুমশায়ের আসনে কে বসালে! এ কৌতুক তার সঙ্গে কে করচে। এ কৌতুক চিরদিন কখনই চলতে পারেনা!—সে যে রাখাল একথাটা কখনই চিরদিন চাপা থাকবে না—ধরা পড়বেই—তার গুরুগিরি একদিন সমস্ত ভেঙে যাবে। এ গুরুগিরি তার ভালও লাগবে না। বাঁশের বাঁশিই তার পক্ষে ভাল, আর ভাল যমুনার ধার। ঈশ্বর কবে তার সব অহংকার ভেঙে দিয়ে সব আসবাব কেড়ে নিয়ে তাকে তাঁর সেই বনের ছায়ায় ডাক দিয়ে নিয়ে যাবেন! সেইখানেই তো, তাকে নিয়ে তিনি বরাবর খেলা করেছেন—এ আবার তাকে কোন্ মুহুর্তে এনে ফেলেছেন! সেই ডাকের অপেক্ষায় বসে আছি।”^{৬৬} এই দীর্ঘ পত্রাংশ উদ্ধৃত করার কারণ আর কিছুই নয়, নিজের লেখা কবিতা অবলম্বনে নিজের জীবনদর্শন ব্যাখ্যায় রবীন্দ্র-ভাবনা কোন প্রান্তিক সীমায় পৌঁছাতে পারে তাই নির্দেশ করা।

রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় ঘনবর্ষার যে সব ছবি দেখা যায় তার কোন কোনটির অব্যবহিত প্রেরণা এসেছিল বৈষ্ণব পদাবলীর বর্ষাচিত্র থেকে। ‘ক্ষণিকা’র ‘নববর্ষা’ কবিতার পাণ্ডুলিপিখত

একাধিক পাঠ উদ্ধৃত করে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন কবিতাটির অনেক চিত্রকল্পই রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন বৈষ্ণব কবি শিশিশেখরের ‘তুঙ্গমণি মন্দিরে ঘন বিজুরি সঞ্চরে/মেহরুচি বসন পরিধানা’। ইত্যাদি পদ থেকে।^{৭০}

পদাবলীর প্রকৃতি বর্ণনার ছায়াপাত ‘আবির্ভাব’ কবিতাতেও। এই ধরনের প্রভাব প্রত্যক্ষ হলেও, আহরিত ভাবচিত্র কবিমনে জারিত হয়ে নব কলেবর ধারণ করার ফলে পুরানো খোলশটাকে খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন বৈষ্ণব পদাবলীতে বৃন্দাবনের গোপীগণের অসম্পূর্ণ আলুথালু বেশবাসের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়; আবার সেই ভাবেরই ক্ষীণ আভাস ধরা পড়েছে রবীন্দ্রনাথের কোন কোন কবিতায়, গানে। ‘চিরায়মানা’য় কবির সহজ আহ্বান: “যেমন আছ তেমনি এসো/আর কোরোনা সাজ।/কৌণী না হয় এলিয়ে রবে,/সিঁথে না হয় বাঁকা হবে,/নাই বা হল পত্র লেখায়/সকল কারু কাজ।/কাঁচল যদি শিথিল থাকে/নাই কো তাহে লাভ। .../ভয় করোনা, অলস্করাগ/মোছে যদি মুছিয়া যাক, /নুপুর যদি খুলে পড়ে/ না হয় রেখে এলে।/খেদ করোনা, মালা হতে/ মুস্তা খসে গেলে।/...কে দেখতে পায় চোখের কাছে/কাজল আছে কিনা আছে?”

কবিতাটির সঙ্গে গোবিন্দদাসের ‘রাসলীলা’র ‘শরদচন্দ্র পবন মন্দ’ এবং ‘শ্রীরাধার রূপ’ রস-পর্যায়ের ‘এ ধনি না করু পসাহন আন’ পদ দুটির আশ্চর্য সাদৃশ্য বর্তমান।

আমরা আগেই বলেছি রবীন্দ্রকবিতায় বৈষ্ণব পদাবলীর প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা গেছে ১৩১২ সাল পর্যন্ত। বিশেষজ্ঞ বলেছেন পরবর্তী “১৩১৩ হইতে ১৩২১ পর্যন্ত সময়ে তিনি পদাবলীর ভারমাধুর্যকে স্বকীয় অননুকরণীয় ভঙ্গীতে ‘গীতাঞ্জলি-গীতিমালা-গীতাসিতে’ প্রকাশ করেন। কাল হিসেবে সংক্ষিপ্ত হলেও এই নয় বৎসর তাঁহার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সুকর্ণময় যুগ। এই যুগের রচনায় পদাবলীর প্রভাব আর চোখের সামনে ধরা দেয় না, কিন্তু পিছন হইতে অনুপ্রেরণা যোগায়।”^{৭১} বস্তুতপক্ষে বৈষ্ণব কবিতার এই গোপন বা গভীরতর প্রভাব বেশি করে দেখা যেতে থাকে ‘ক্ষণিকা’র (১৩০৭) পরেই। অন্যপক্ষে এই সময় থেকেই পদাবলীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগও ক্রমশ শিথিল হতে থাকে; যদিও কবির গভীর চেতনার প্রতিটি তন্ত্রীতে ততদিনে মিশে গেছে উক্ত কাব্যকলার রসরূপ। মহাজন পদাবলীর সংগ্রহ-সংকলনের চর্চায় রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ভাটার টান পড়ে ১৩০৩-১৩০৪ সাল থেকে, ১৩১০ সালে ‘পদরত্নাবলী’র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রচেষ্টাতেই এর সাময়িক সমাপ্তি।^{৭২} এই কালসীমায় (১৩০৭-১২) যে পাঁচটি কাব্য রচিত হয়েছিল (‘নৈবেদ্য’ ‘স্মরণ’ ‘শিশু’ ‘উৎসর্গ’ ও ‘খেয়া’) তার মধ্যে একমাত্র ‘শিশু’ (১৩১০, কাব্যগ্রন্থাবলী) কাব্যের কয়েকটি কবিতায় গোষ্ঠলীলা ও বাৎসল্যরসের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়; বাদবাকি কাব্যগুলির সঙ্গে বৈষ্ণব সাহিত্যের যোগ ক্ষীণ এবং প্রভাব যদি সত্যি-ই কিছু থাকে বাইরে থেকে তা বোঝার উপায় নেই।

‘নৈবেদ্য’^{৭৩} (১৩০৮) রবীন্দ্রনাথের কবিমন সনাতন ভারতাত্মার আধ্যাত্মিক আর্দ্রশের প্রতি উৎসুক। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি যোগের এক অখণ্ড, সত্যসাধনায় মগ্ন কবি অঙ্গীকার করেছেন—‘বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়’। এর-ই ক্ষীণ পদধ্বনি শোনা গিয়েছিল পূর্ববর্তী কাব্য ‘ক্ষণিকা’র ‘প্রতিজ্ঞা’ কবিতায়। সহজিয়া বৈষ্ণবদের মত সহজ ভঙ্গিতে বলেছিলেন—‘আমি হব না তাপস, হব না, যদি না/পাই গো তপস্বিনী’, ‘নৈবেদ্য’র কবি জীবন-কর্মবিমুখ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হতে চাননি। স্বদেশপ্রেম তথা বিশ্বমানবপ্রেমে উদ্ভুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ এই সময়কার ব্যক্তিগত কর্মজর্গতেও শাস্ত্রত ভারতধর্মকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছিলেন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মার্চ্য আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

তাহলেও ‘নৈবেদ্য’ কাব্যের নামকরণে এবং কোন কোন কবিতায় (১০, ১৩, ৭৫, ৮২ সংখ্যক) ভক্তি মিশ্রিত যে প্রার্থনার সূর^{৭৪} তাতে এক ধরনের ঈশ্বর ভাবুকতাই (প্রচলিত কোন ধর্মসংস্কার নয় অবশ্যই) প্রকাশ পেয়েছে—“আমার সকল অঙ্গে তোমার পরশ/লগ্ন হয়ে রহিয়াছে রজনী-দিবস/প্রাণেশ্বর, এই কথা নিত্যমনে আনি/রাখিব পবিত্র করি মোর তনু খানি।...” (৭৫ সংখ্যক কবিতা) ভগবান বা পরমাত্মার সঙ্গে কবি ব্যক্তিত্বের এই নিত্য সম্বন্ধলীলা বৈষ্ণবের ভক্তি-মিশ্রিত প্রেমের কথা স্মরণ করালেও বস্তুত তা বৈষ্ণব রসতত্ত্বের বিপরীত কোটিতে প্রতিষ্ঠিত শক্তি ও বীর্যের সাধনা। কবিমনের অবচেতনায় বৈষ্ণবীয় প্রেমভক্তি অনুরণিত হলেও প্রকাশে তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বরং সচেতনভাবে জ্ঞান-কর্ম বিচ্ছিন্ন বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসের ভাবোন্মত্ততা পরিহার করতে চেয়েছেন তিনি—

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহুল হয় নৃত্যগীত গানে
ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্ভ্রান্ত উচ্ছল ফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি নাথ। (৪৫ সংখ্যক কবিতা)

বৈষ্ণবের প্রচলিত ভক্তিসাধনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনচরণে ভক্তির পার্থক্য এখানেই। ঈশ্বরকে খেলনা করে ‘ভাবাবেশ ভরে রসপানে হতজ্ঞান’ ভক্তদের ধিকার দিয়েছেন ৫২ সংখ্যক কবিতায়। আর এই কাব্য প্রকাশের আরও কয়েক বছর পরে চতুরঙ্গ (সবুজপত্র ১৩২১) উপন্যাসে লীলানন্দ স্বামীর জীবন-বিচ্ছিন্ন রসতত্ত্বচর্চার নিষ্ফলতায় বৈষ্ণবীয় ভক্তি সাধনের দুর্বলতার দিকটি আরও স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলেছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়েও কবি বুঝেছিলেন ভাবরসের সাধনা তাঁর পথ নয়। হেমন্তবালা দেবীকে একটি চিঠিতে লিখেছেন (২১ এপ্রিল ১৯৩১)—“আমিও এক সয়ে স্বভাবতই যে সাধনাকে অবলম্বন করেছিলুম তার মধ্যে ভাবরসের অংশই ছিল প্রধান—সংসার থেকে হৃদয়ের যে তৃপ্তি যথেষ্ট পাওয়া যায় নি সেইটেকেই অন্তরের মধ্যে মগ্ন করে তোলবার চেষ্টায় ছিলাম। বৈষ্ণব কবির আমার এই আত্মভোগের নৈবেদ্য ভরে তোলবার সহায়তা করেছিলেন। কিছুদিন এই রসস্রোত গা-ঢালান দিয়েছি। কিন্তু সত্য তো কেবলি রসো বৈ স: নন তাই এক সময় আমার ধিকার এলো—সেই নিমজ্জন দশা থেকে তীরে ওঠাকেই মুক্তি বলে বুঝলুম।”^{৭৫}

‘নৈবেদ্য’র পরেই প্রকাশিত হয় ‘স্মরণ’ (কাব্যগ্রন্থাবলী ১৩১০)। ‘কবিপ্রিয়া’ মৃণালিনী দেবীর অকাল মৃত্যু-ই এই কাব্যের অব্যবহিত প্রেরণা। কবির স্মৃতি ভারাক্রান্ত বিরহী হৃদয়ের প্রকাশে তাই কোন কোন কবিতায় পড়েছে পদাবলীর মিলন-বেদনা মিশ্রিত ব্যাকুলতার অস্ফুট ছায়া। ‘তোমারি পূজার থালায় ধরিনু/আজি সে প্রেমের হার’ (২-সংখ্যক কবিতা) কিংবা ‘দৌহার মিলনে মোরা পূর্ণ হব দৌহে/বহু যুগ আসিয়াছি এই আশাবহে’ (১৫-সংখ্যক কবিতা) ধরনের পংক্তি কবিচেতনার সঙ্গে মিশে থাকা বৈষ্ণব কবিতারই গোপন প্রভাবের ফল। ‘কাব্যগ্রন্থ’তে কবিতাগুলির নামকরণেও (‘সন্ভোগ’ ‘মিলন’ ‘বসন্ত’ ইত্যাদি) রাধাকৃষ্ণলীলার এক একটি পর্যায়কে স্মরণ করায়।

‘নৈবেদ্য’ থেকে ‘খেয়া’র মধ্যবর্তী পর্বে ‘স্মরণ’ এবং ‘উৎসর্গ’ অনেকটা এক ধারার হলেও ‘শিশু’কে সেখানে স্বতন্ত্র একটি বিচ্ছিন্ন কাব্য বলেই মনে হয়—ভাব এবং রীতি উভয় ক্ষেত্রেই। তাই ‘শিশু’র কবিতাগুলি ‘উৎসর্গের’ পরে আলোচনা করব। মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ (১৩১০) এর এক একটি পর্যায়ের প্রবেশক কবিতাগুলি সংকলিত হয়ে ‘উৎসর্গ’ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

হয় বাংলা ১৩২১ সালে। বিশেষ কোন কবি-মনোমুগ্ধতার ফসল না হলেও এর কবিতাগুলি অনেকটা ‘নৈবেদ্য’রই ভাবানুসরণ।^{৭৬} পূর্বেই বলেছি ‘গীতাঞ্জলি’-পূর্ব এই কাব্য ধারায় বৈষ্ণব কবিতার প্রভাব খুবই অল্প; কোন কোন কবিতার দু’একটি পংক্তিতে তার মৃদু ছোঁয়া আছে মাত্র। ‘গরব যদি টুটে গো লাঞ্জে’। (২-সংখ্যক কবিতা) ‘খনে খনে তুমি উঁকি মারি চাও,/খনে খনে যাও ছিলি’^{৭৭} (৬-সংখ্যক কবিতা), ‘তুমি যে/বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি/কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার/সে কথা যে যাই পাসরি’ (৮-সংখ্যক কবিতা), ‘রজনী জাগিয়া ব্যজন করিনু/চন্দন ভিজা বায়ে’ (১০ সংখ্যক কবিতা), ‘সে সকল লাজ তেয়াগিব আজ’ (সংযোজন-৭) ইত্যাদি এই ধরনের পংক্তিতে বৈষ্ণব কবিতার যে ভাবানুসঙ্গ, তাকে প্রত্যক্ষ প্রভাব না বলে কবিচেতনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ বলাই ভাল। সে ক্ষেত্রে বরং কুঞ্জমিলনের পর নিদ্রিতা রাধাকে পরিত্যাগ করে যাওয়ার ছবির ইঙ্গিত পাওয়া যায় ৪১-সংখ্যক কবিতার একটি স্তবকে: “তার পরে হায় জানিনে কখন/ঘুম এল মোর নয়নে/উঠিনু যখন জেগে/ঢেকেছে গগন মেঘে,/তরলতলে আছি একেলা পড়িয়া/দলিত পত্র-শয়নে।”

রবীন্দ্রকাব্যে মাঝে মাঝেই সারি গানের রূপকল্প হঠাৎ হঠাৎ এসে পড়েছে—পূর্বেই এ নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা। ‘উৎসর্গ’ কাব্যের সংযোজন অংশে ৩-সংখ্যক কবিতায় সারি গানের প্রসঙ্গ আছে। অন্যপক্ষে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বিস্তারিত অধ্যয়নের ফলে বিচিত্র সব পুরাকাহিনী ও জনপ্রিয় কথাগুচ্ছ রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতায় চলে আসে। ২৩ সংখ্যক কবিতায় পুরাণ শোনার স্মৃতিতে যেমন রাজহংস-দময়ন্তীর রূপচিত্র, তেমনি ৪৭ সংখ্যক কবিতায় যখন লেখা হয়:

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন

* * *

ছিল কতশত উপকরণ।

তার লট পট করে বাঘছাল

তার বৃষ রহি রহি গরজে,

তার বেষ্টন করি জটাজাল

যত ভুজঙ্গদল তরজে।

তার ববম্ ববম্ বাজে গাল

দোলে গলায় কপালাভরণ

তার বিষণ্ণে ফুকরি উঠে তান

ওগো মরণ, হে মোর মরণ। —তখন ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের

১ম খণ্ডে হরের বিবাহ-যাত্রার শব্দচিত্রই কানে বাজে। কিন্তু কেবল শব্দচিত্রই। শিবকে মরণ বলে আবাহন করার মতো মন ছিলনা ভারতচন্দ্রের। কবিতাটির পরের স্তবকে হর-গৌরীর বিবাহ, এবং শ্রাশানবাসী বর দেখে গৌরীর পিতামাতার স্ফোভের ছবিও আছে—যেমনটি আমরা ‘অন্নদামঙ্গলে’ পাই। কিন্তু এ-সব কবিতার বহিরাবরণ, মূলভাবে উদ্দীপ্ত করেছে মাত্র।

‘শিশু’র (১৩১০ কাব্যগ্রন্থাবলী) কবিতাগুলিতে বাৎসল্য রসের প্রকাশ; যৌবন-উত্তীর্ণ কবি নিজের শিশু-সত্তাকে নতুন করে খুঁজে পেতে ছড়া-রূপকধার সম্ভব-অসম্ভবের রাজ্যে যেমন ডুব দিয়েছেন তেমনি বৈষ্ণব পদাবলীর শিশু-কৃষ্ণের বাল্য ও গোষ্ঠীলীলার সুমধুর চিত্র অবলম্বনে বেশ কিছু শিশুবিষয়ক কবিতা লিখেছেন। শিশুদের মনোরাজ্যের রহস্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ ছিল আজীবন, তরুণ বয়সে ঠাকুর বাড়ির ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য ছড়া-রূপকথা অবলম্বনে কবিতা লিখেছিলেন বালক পত্রিকায়—সেকথা পূর্বেই বলেছি। কয়েক বছর সাময়িক বিরতির পর

আমাদের দেশে প্রচলিত চিরন্তন শিশুসাহিত্যের ভাণ্ডার রবীন্দ্রনাথের কবি চেতনায় পুনরায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এর অব্যবহিত কারণ পারিবারিক সুখস্মৃতি অবলম্বনে সদ্য-মাতৃহারা নিজের শিশুসন্তানদের জীবনে নতুন রসের সঞ্চার করে দেওয়া। ‘শিশু’ কবিতা শুচ্ছে তাই কবি রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা একাধারে ‘খোকা’ এবং ‘খোকা’র বাবা ও মা’র।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা-বিষয়ক বৈষ্ণবপদগুলি রবীন্দ্রনাথের একান্ত প্রিয় ছিল। এক সময়ে ‘পদরত্নাবলী’তে এই শ্রেণীর বাছাই কিছু পদ যেমন সংকলন করেছিলেন, তেমনি পরবর্তীকালে কেবলমাত্র শিশুদের জন্য বাৎসল্য-বিষয়ক পদগুলির একটি স্বতন্ত্র সংকলনও প্রকাশ করতে ব্রতী হয়েছিলেন।^{৭৮} ‘শিশু’র বেশ কয়েকটি কবিতায় (‘খেলা’ ‘অপযশ’ ‘বিচার’ ‘নির্লিপ্ত’ ‘কেন মধুর’ প্রভৃতি) বৈষ্ণব পদাবলীর বাল্যলীলার প্রত্যক্ষ ছায়াপাত ঘটেছে। —“কোমল গায়ে দিল পরায়ে/রাঙিন আঙিয়া/বিহান বেলা আঙিনা তলে/এসেছ তুমি কী খেলা ছলে,/চরণ দুটি চলিতে ছুটি/পড়িছে ভাঙিয়া/তোমার কটি-তটের ধটি/কে দিল রাঙিয়া।/কিসের সুখে সহাস মুখে/নাচিছ বাছনি,/দুয়ার-পাশে জননী হাসে/হেরিয়া নাচনি।/তা থেই থেই তালির সাথে/কাঁকন বাজে মায়ের হাতে/রাখাল-বেশে ধরেছ হেসে/বেনুর পাঁচনি।” (খেলা)

‘পদরত্নাবলী’ ২, ৩, ৪ সংখ্যক পদে মা যশোদা ও গোপালের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার সঙ্গে ভাব এবং ভাষায় কবিতাটির সাদৃশ্য লক্ষ্য করার মত। বৈষ্ণব ধর্মে পঞ্চরসের মধ্যে বাৎসল্য রসের সাধনার কথাও আছে। তাই ঈশ্বরকে শিশুরূপেও ভজনা করেছেন বৈষ্ণব কবিরা। রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন—“বৈষ্ণব ধর্ম সমস্ত প্রেমসম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাকুরটিকে সম্পূর্ণ বেঁটন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে।”^{৭৯} আর এই জন্যই খোকাকার জন্মকথায় মায়ের উত্তর:

তুই আমার ঠাকুরের সনে

ছিল পূজার সিংহাসনে

তারি পূজায় তোমার পূজা করেছি। (জন্মকথা)

কবিতাটিতে ঘনরাম দাসের—‘ও মোর সোনার চাঁদ—কি তোর মায়ের নাম/কার ঘরে হৈলা উৎপতি’ ইত্যাদি পদটির ভাবগত প্রভাব বর্তমান। কৌতূহলের বিষয় পদটি রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে ‘পদরত্নাবলী’র দ্বিতীয় সংস্করণের পাণ্ডুলিপিতে লেখা আছে।^{৮০}

ইতিপূর্বে উদ্ধৃত ‘খেলা’ কবিতায় বাৎসল্যরসের সমাপ্তি হয়েছিল ছেলেভুলানো ছড়ার সুর ও অনুসঙ্গে:

ঘুমের বুড়ি আসিছে উড়ি

নয়ন-ঢুলানী।

—রবীন্দ্রনাথ জানতেন বাংলা দেশের মাতৃহৃদয়ের চিরন্তন সাহিত্য হিসেবে ছড়া-রূপকথা কেবলমাত্র শিশুদের হৃদয়কে সরস করে না, তাদের শিক্ষার পথকেও সুন্দর করে তোলে। তাই লোকসাহিত্যের এই দুটি শাখার সংগ্রহ-সংকলন করেই ক্ষান্ত হন নি তিনি, সাহিত্যের সৃজনকলাতেও তার রসরূপকে তুলে ধরেছেন সযত্নে। বয়স্কদের কাছে প্রত্যক্ষ জগৎ যেমন সত্য, ছড়া-রূপকথার স্বপ্নজগৎ ‘নিত্যস্বপ্নদর্শী বালকের’ কাছে ঠিক ততটাই সত্য। বাস্তব জীবনে শিশুর বাধানিষেধ প্রচুর, তাই কল্পলোকেই তার বিচরণ। সেই জন্যই রূপকথার রাজপুত্র-রাজকন্যা,

দুর্যোরাণী-সুয়োরানী, পক্ষীরাজ ঘোড়া সবকিছুর সঙ্গেই সে একাত্ম হতে পারে। বিশিষ্ট সমালোচক লিখেছেন—“শিশু শুধু রূপকথা বিশ্বাস করে না, সে রূপকথা সৃষ্টিও করে; সে রূপকথা সৃষ্টি করিতে পারে বলিয়াই তাহার জন্য রূপকথা রচিত হয়। তাহার কাছে রূপকথা আবাড়ে গল্প নয়, রূপক নয়, সত্য, জীবন্ত।”^{৮১} ‘শিশু’র কবিতাগুলিতে তাই মা’ ও শোকার কল্পরাজ্যে সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা হয়েছে লুপ্ত। ছড়া-কবিতা ও রূপকথার গল্প রবীন্দ্রনাথের হাতে নতুন ভাব-রূপ পেয়েছে আধুনিক কালের উপযোগী হয়ে। শিশুদের জগৎ চিরন্তন—বিরট কোন পরিবর্তন সেখানে চলে না। তাই ‘শিশু’র কবিতায় (‘জন্মকথা’ ‘খোকা’ ‘ঘুমচোরা’ ‘প্রশ্ন’ ‘সমব্যথী’ ‘বীরপুরুষ’ ‘মাঝি’ ‘নৌকাযাত্রা’ ‘মাতৃবৎসল’ ‘লুকোচুরি’ ‘বিদায়’ প্রভৃতি) রবীন্দ্রনাথের কবিমন বিচরণ করেছে—‘সকল উদ্দেশ হারা/সকল-ভুগোল ছাড়া/অপরূপ অসম্ভব দেশে’।

শিশুদের ঘুমপাড়াবার জন্য আমাদের দেশের মায়েরা চিরদিন-ই ছেলেভুলানো ছড়ার আশ্রয় নিতেন। ‘ছড়া’র সেই মেঘরাজ্যের নবরূপায়ণ ‘ঘুমচোরা’ কবিতায়। কবিতাটি সম্পর্কে সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন—“ঘুমচোরায় ঘুমপাড়ানি ছড়ার সমস্ত রূপরসের রহস্য যেন দিগ্বিদিকে ঝলক দিয়েছে। রূপ ও ধ্বনি সমন্বয়ে কবিতাটি অত্যন্ত মনোরম।”^{৮২} ‘জীবনস্মৃতি’ ও ‘ছেলেবেলা’য় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব শৈবস্মৃতির যে বিবরণ পাই, তার ছায়া অবলম্বনে লেখা হয়েছে ‘রাজার বাড়ি’ ‘ছুটির দিনে’ ‘বনবাস’ প্রভৃতি কবিতা। ছুটির দিনে পড়াশোনা বন্ধ রেখে মায়ের কাছে রূপকথার গল্প শুনতে চাইছে শিশু:

বল আমারে কোথায় আছে

তেপান্তরের মাঠ।

* * *

এমনি তরো মেঘ করেছে

সারা আকাশ ব্যেপে

রাজপুত্রের যাচ্ছে মাঠে

একলা ঘোড়ায় চেপে

গজমোতির মালাটি তার

বুকের প’রে নাচে—

রাজকন্যা কোথায় আছে

খোঁজ পেলে কার কাছে।

প্রচলিত রূপকথার অংশবিশেষ ‘শিশু’র আরও কয়েকটি কবিতায় (‘রাজার বাড়ি’ ‘নৌকাযাত্রা’ ‘দুঃখহারী’) এরকমভাবে জায়গা করে নিয়েছে। ‘নৌকাযাত্রা’ কবিতাটি বিশ্লেষণ করে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—“মধু মাঝির পাট-বহার ছেলেখেলাকে নস্যাৎ করিয়া সাত সমুদ্র তের নদীর পারে রত্ন আহরণের ও তেপান্তরের মাঠদর্শনের অত্যাশ্চর্য্যীয় যাত্রার সঙ্কল্প স্থির করিয়াছে। বর্ষা-সঙ্ক্যার মেঘগর্জন ও বিদ্যুৎ বিলাস তাকে অভ্যস্ত পড়াশুনার প্রতি উন্মনা করিয়া একদিকে মায়ের স্নেহ নিবিড় কোলে আশ্রয় প্রার্থী করিয়াছে, অপর দিকে রূপকথা মোহ ঘনীভূত করিয়া, তেপান্তরের মাঠের ও রাজকন্যার খোঁজে বাহির রাজপুত্রের নিরুদ্দেশ যাত্রার প্রতি তাহার প্রশ্ন পরম্পরা চিহ্নিত কৌতূহল জাগাইয়াছে। এই রূপকথা আবহের উদ্বোধন শিশু কল্পনার পক্ষে স্বাভাবিকতার সীমা অতিক্রম করে নাই। কেননা ইহার আর্ট লোকগাথার আর্টের সমগোত্রীয়।”^{৮৩}

‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর’, ‘ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি’, ইত্যাদি ছড়ার প্রসঙ্গ এসেছে ‘বিচ্ছেদ’ ‘কাগজের নৌকা’ প্রভৃতি কবিতায়। যার ফলে একালের কবির কলমে লিখিত হলেও শিশু কল্পনার

মেঘরাজো ছড়া-রূপকথার পরিবেশন হয়েছে গাঢ়। তাছাড়া নিজের বাল্যকালে রামায়ণ-মহাভারত পাঠ ও শ্রবণের স্মৃতি চলে এসেছে দু'একটি কবিতায়। 'দুপুর বেলা মহাভারত হাতে' বসা মায়ের চিত্রকল্প 'লুকোচুরি' কবিতায় যতটা প্রাসঙ্গিক হয়েছে, তার চেয়ে বেশি সরস ও সার্থক হয়েছে 'বনবাস' কবিতায় কৃষ্ণিবাসী রামায়ণ পাঠে নিজের বাল্যকালে যে কল্পলোক তৈরি হয়েছিল তার বর্ণনা: "ঠাকুর দাদার মতো বনে/আছেন ঋষি মুনি,/তাদের পায়ে প্রণাম করে/গল্প অনেক শুনি।/রাক্ষসেরে ভয় করিনে,/আছে গুহক মিতা—/রাবণ আমার কী করবে মা,/নেই তো আমার সীতা।/হনুমানকে যত্ন করে/খাওয়াই দুধে-ভাত্রে/লক্ষণ ভাই যদি আমার/থাকত সাথে সাথে।" 'শিশু' কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করতে রামায়ণ পাঁচালির এই নবরূপায়ণ বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব।

'খেয়া' (১৯০৬) প্রকাশিত হওয়ার ঠিক আগের বছর 'বাউল' (১৯০৫) নামে স্বদেশী সঙ্গীতের ছোট্ট একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সমসাময়িক বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের (১৯০৫) সঙ্গে কবির সর্বাঙ্গিক যোগ আজ ঐতিহাসিক সত্য। দেশপ্রেমের অপ্রতিরোধ্য উদ্দীপনায় স্বদেশবাসীর মনে উৎসাহের জোয়ার এনে দিয়েছিল 'বাউল' এর গানগুলি।^{৮৪} এই সংকলনের মোট কুড়িটি গানের মধ্যে অধিকাংশই বাউলের সুর ও ঢঙে রচিত, ছ'টি গান 'বাউল' শিরোনামেই প্রকাশিত হয়। একটি গানে রয়েছে সারি গানের সুর। 'বাউল', 'কীর্তন' প্রভৃতি দেশীসঙ্গীতের সুরে রচিত রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা কম নয়। এক্ষেত্রে বলার কথা এইটুকুই, রবীন্দ্ররচনায় বাউল গানের প্রত্যক্ষ প্রভাবের সূচনা এই সময় থেকেই। পদ্মাপারের জীবনযাত্রায় বাউল গান ও বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়।^{৮৫}—পরিচিত হন লালন শিষ্যধারার একাধিক বাউলের সঙ্গে। বাউলের গান সংগ্রহে ব্রতী হন ১৩০২ সালের কাছাকাছি সময় থেকেই—পরবর্তীকালেও এই উদ্যম বজায় ছিল ষোল আনা। লালনের গান ছাড়াও গগন হরকরা, হাসনরাজা ঈশানযুগী পদ্মলোচন প্রমুখ বিখ্যাত বাউলদের রচনাও রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করে। সর্বোপরি বাউল তত্ত্বজ্ঞ ক্ষিতিমোহন সেনের সাহচর্যে অভিসিদ্ধিত হয়েছিলেন কবি। এ সবার ফলেই নিরঙ্কর এই মরমী সম্প্রদায়ের রচনার ভাব ভাষা প্রকাশভঙ্গি, সুরের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মে হয়েছিল ওতপ্রোত। বৈষ্ণব পদাবলীর মতোই বাউল গানের সঙ্গে আত্মিক সংযোগ সাধন হয়েছিল। বাউল পদাবলী এবং বাউলদের জীবন দর্শন তাঁর কবিচেতনায় এমন গভীরভাবে মিশে গিয়েছিল যে বাইরে থেকে সব সময় তার প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয় না। এসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি এইরকম—“আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হ'ত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগ-রাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিলন ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন্ এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হ'য়ে মিশে গেছে।”^{৮৬}

জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে কেবল বাউল গানের সুরগ্রহণের কথাই রবীন্দ্রনাথ এখানে বলেছেন। কিন্তু বাউলের 'বাণী' অর্থাৎ ভাবকেও নিজস্ব মানসিকতায় গ্রহণ করে নিজের লেখায় প্রকাশ করেছিলেন তিনি। বাউলের সহজ সংস্কারহীন ভাবুকতার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল তাঁর উপলব্ধির জগৎ; যদিও তাদের ধর্মীয় সংস্কার রবীন্দ্রনাথের কবি মনে বিশেষ স্থান পায় নি। তাছাড়া সাধন-ভজনের কথা থাকলেও বাউল পদাবলী সব সময়েই স্বাভাবিক কাব্যরসে ভরপুর; মধ্যযুগের নাথ-যোগী সম্প্রদায়ের রচনা কিংবা বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের চর্চাগীতির মত তা নীরস নয় মোটেই। বাউল

গান রচয়িতাদের স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি, এবং ধর্মীয় বাধা নিষেধহীন এক সহজ ‘মনের মানুষের’ প্রত্যাশাকে অবলম্বন করে মরমী রবীন্দ্রনাথের কাব্যকল্পনা সুদূর বিস্তৃত হয়েছিল ‘খেয়া’ কাব্য থেকেই। কেবল সুরের প্রত্যক্ষ প্রভাবই নয়, এই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের একটি ধারা ‘বাউল-সংক্রমিত’ হয়ে উঠতে থাকে। বাউলের চণ্ড অর্থাৎ ভাষা বা ভঙ্গির প্রয়োগে রবীন্দ্রকবিতা লাভ করে এক ‘মর্মমুখী ও সাংকেতিক রূপ। ‘ক্ষণিকা’ কাব্যের মত সহজ-সরল প্রকাশ রীতি অথচ ভাবের দিক থেকে ইঙ্গিতময়। সর্বোপরি বাউলের মত সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে পথের মধ্যেই জীবনের সত্যকে খুঁজে পাবার আকাঙ্ক্ষায় এক ‘মনের মানুষের’ সন্ধানে ব্রতী হন কবি।

পরবর্তী কালে ‘ভারতবর্ষীয় দার্শনিক সংঘের সভাপতির অভিভাষণে’ কিংবা ‘মানুষের ধর্ম’ বা ‘Creative Unity’ কিংবা ‘Religion of Man’-প্রবন্ধাবলীতে বাউলদের এই ‘মনের মানুষ’ রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ব্যাপক মাত্রা পেয়ে দাঁড়ায় ‘মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ’।

‘খেয়া’র কবিতাগুলিতে বাউল গানের প্রভাব যতটা স্পষ্ট, রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কাব্যে ততটা নয়। অথচ রবীন্দ্রকাব্য-ধারার ‘সবচেয়ে অমূল্য’ সম্পদ বলে এটিকে উল্লেখ করেছেন আবু সয়ীদ আইয়ুব।^{৮৭} ‘নৈবেদ্য’ ও ‘গীতাঞ্জলি’ পর্বের মধ্যবর্তী আধ্যাত্মিক মানসিকতাই শুধু প্রকাশ পায় নি এতে, ভাব ভাষা হৃদের এক আশ্চর্য সৌন্দর্যে ‘খেয়ার’ কবিতাগুলি অনন্য। স্বদেশী আপোলনের ‘কর্মাক্তার গতিবন্ধন’ থেকে এক বৃহত্তর সত্য উপলব্ধির জগতের প্রতি উন্মুখ মিস্টিক কবি-মানস দ্বিধাধ্বস্তে দোলায়িত। এক্ষেত্রে কবিচিন্তার প্রকাশ-আলম্বন হয়েছে বাউল ধর্মিতা,—যার ফলে এক বিশুদ্ধ কাব্যরসে ভরপুর হয়ে উঠেছে খোয়ার কবিতাগুলি।

কাব্যের প্রথম কবিতা ‘শেষ খেয়া’ এবং সমাপ্তি কবিতা ‘খেয়া’য় বাউল গানের ভাষা, ভঙ্গি, রূপকল্পের ছায়াপাতে যে বিষাদ-করুণ বৈরাগ্যের সুর ধ্বনিত, তাই যেন সমগ্র কাব্যটিকে একটি তারে বেঁধে রেখেছে। এই দুটি কবিতার কোন কোন শব্দ, পদ বা পংক্তি বাউলের কল্পনা ভঙ্গির পরিচয়-বহ। যেমন ‘সোনার কূলে আঁধারমূলে’, ‘চুকিয়ে সুখ যাবার মুখে’, ‘সাঁজের বেলা ভাঁটার স্রোতে’, ‘ঘরেও নহে, পারেও নহে’, ‘দিনের আলো যার ফুরালো’, ‘সাঁজের আলো জ্বলল না’, ‘শেষ খেয়া’); ‘ভাঙিলে হাট দলে দলে/সবাই যবে ঘাটে চলে’, ‘গুপার হতে সোনার আভা’, ‘তোমার চোখে লেখা আছে’ (‘খেয়া’) ইত্যাদি। ক্ষুদিরাম দাস ‘খেয়া’ কাব্যের বাউলধর্মিতা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করে ‘শেষ খেয়া’ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—“কবিতাটি রবীন্দ্রচিন্তে বাউল সঙ্গীতের আসামান্য প্রভাব নির্দেশ করে।”^{৮৮} বাউলদের অন্তর্নিহিত জীবনরহস্য, জন্ম-মৃত্যু বা ভবের হাটে যাওয়া-আসার সে সংকেত সংগীত মাধ্যমে প্রকাশিত; সোজাসুজি আভিধানিক অর্থে তাকে ধরা যায় না। তা অধরা কিন্তু অনুভববেদ্য; কেবলমাত্র উপলব্ধির দ্বারা হৃদয়ঙ্গম হয় মরমীদের কাছে। ‘খেয়া’র অনেক কবিতাই প্রকাশ ভঙ্গিতে বাউল গানের মত সহজ অথচ ইঙ্গিতময়। ‘ঘাটের পথে’ ‘ঘাটে’^{৮৯} ‘প্রভাতে’ ‘দান’ ‘অनावশ্যক’ ‘অবারিত’ ‘গোধুলি লগ্ন’ ‘মেঘ’ ‘ফুল ফোটানো’ ‘হার’ ‘বিকার’ ‘সীমা’ ‘প্রতীক্ষা’ ‘নয়ন’ ‘হারাধন’ ‘বৈশাখে’ ‘কুমার ধারে’ ‘পথের শেষ’ ‘সমুদ্রে’ ‘সমাপ্তি’ ‘দীঘি’ ‘সার্থক নৈরাশ্য’ প্রভৃতি কবিতার কোনো কোনো স্তবক বা পংক্তি বাউল গানের মতই। রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন—

ওরে মন, খুলে দে মন,

যা আছে তোর খুলে দে—

অস্তরে যা ডুবে আছে

আলোক পানে তুলে দে।

(বিকাশ)

—তখন বাউল সঙ্গীতের ভাব ভাষা ভঙ্গি তাঁর কবিচেতনার কত গভীরে গিয়ে মিশেছিল তা বোঝা যায়। এই ধরনের প্রভাবকে বলা যায় প্রত্যক্ষ অথচ স্বতঃস্ফূর্ত। ‘রবীন্দ্র বাউলে’র রচনা বলে যদি নির্দেশ করা না হয়, তবে খেয়ার অনেক কবিতাই সত্যিকারের বাউল গান বলে ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়।—

মোদের হারের দলে বসিয়ে দিলে
জানি আমরা পারব না
হারাও যদি হারব খেলায়,
তোমার খেলা ছাড়ব না। (হার)

কিংবা—
সেটুকু তোর অনেক আছে
যেটুকু তোর আছে ঝাঁটি
তার চেয়ে লোভ করিস যদি
সকলি তোর হবে মাটি। (সীমা)

আবার—
তোরা কেউ পারবিনে গো,
পারবি নে ফুল ফোটাতে।
* * *

ব্যগ্র হয়ে রজনী দিন
আঘাত করি বোঁটাতে
* * *

যে পারে সে আপনি পারে
পারে সে ফুল ফোটাতে। (ফুল ফোটানো)

এই ধরনের কবিতাকে ঝাঁটি বাউল গান থেকে পৃথক করা মুশ্কিল। তাছাড়া রূপায়ণের দিক থেকেও ‘খেয়া’র কবিতাগুলির সঙ্গে বাউল গানের মিল যথেষ্ট। স্ববকের আগে কিংবা শেষে ‘ওরা’ ‘আমি’ ‘ওগো’ ‘একি’ ‘মোর’ ‘যবে’ ‘ওরে’ প্রভৃতি উপপর্ব যোগ ‘খেয়া’র কবিতার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য—এই রীতি বাউল গানেও লক্ষ্য করা যায়। সমাজ জীবনের অতিপ্রচলিত শব্দ দিয়ে চিত্রকল্প তৈরীর যে ভঙ্গি বাউলদের মধ্যে আছে, খেয়ার কবি তারও অনুসরণ করেছেন—

‘হাটের সাথে ঘাটের সাথে আজি/ব্যবসা তোর বন্ধ হয়ে গেল।/এখন ঘরে আয়রে ফিরে মাঝি,/আঙিনাতে আসন খানি মেদো।’ (সমাপ্তি)

কিংবা—‘ওগো, তোরা বলতো এরে/ঘর বলি কোন মতে।/এরে কে বেঁধেছে হাটের মাঝে/আনা গোনার পথে।’ (অবারিত)

‘খেয়া’র রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকল্পনা এত গভীরভাবে বাউল সঙ্গীত সংশ্লিষ্ট ছিল যে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবরূপ তাঁর কবিচেতনাকে বিশেষ স্পর্শ করতে পারেনি। অল্প কয়েকটি মাত্র কবিতায় বিক্ষিপ্তভাবে বৈষ্ণব পদের বহিরঙ্গীয় ছায়াপাত ঘটেছে মাত্র। ‘ঘাটের পথে’ ‘মুক্তিপাশ’ ‘প্রভাতে’ ‘বালিকাবধু’ ‘মিলন’ ‘বাঁশি’ কবিতায় রাধাভাবের অনুষ্ণ লক্ষ্য করা যায়—

আজ ভরা হয়ে গেছে বারি।
আঙিনার ধারে চাহি পথপানে
ঘর ছেড়ে যেতে নারি। (ঘাটের পথে)

সমগ্র কবিতাটিতে বিরহিনী রাধার মিলন-উন্মুখ প্রেমব্যাকুলতা আধুনিক কবির হাতে নতুন তাৎপর্য পেয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীর বংশীশিখার যে চিত্র আমরা পাই, তারই আদলে যেন ‘বাঁশি’

কবিতাটি লেখা। বিশিষ্ট সমালোচক মন্তব্য করেছেন—“মনে হয় বৈষ্ণব কবিতার ‘বংশীশিক্ষা’ রবীন্দ্রনাথের অপৌত্তলিক মনে খানিকটা অজ্ঞাত প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিবে। ভগবানের ওষ্ঠে যে বাঁশী বিশ্বজগৎকে সম্মোহিত করেও প্রেমিকার চিন্ত জয় করে, ভক্ত তাহাকে লইয়া শৈশব খেলার সাধ মিটাইতে চাহিয়াছে।”৯০

আগেই বলেছি রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা যতই পরিণত-মনস্ক হয়েছে, রূপকথা অনুশীলন এবং কবিতায় তার উপস্থাপনা হয়েছে আরও গভীর ব্যঞ্জনাময়। এখন আর শিশুকল্পনাকে উদ্দীপ্ত করার জন্য রূপকথার অনুষ্ণ আসছে না, রূপকথার প্রসঙ্গে বা রূপচিত্রে ভিন্নতর এক মাত্রায় কবিতাকে পৌঁছে দিতে চাইছেন কবি। ‘খেয়া’ এবং ‘গীতাঞ্জলি’ পর্বের কাব্যগুলিতে সেই নতুন ধরনের প্রভাবই লক্ষ্য করা যায়; রূপকথার সিঁহলিঙ্গম-ই প্রধান হয়ে ধরা পড়ে তখন। ‘খেয়া’র ‘শুভক্ষণ’ কবিতার দ্বিতীয়াংশে (‘ত্যাগ’) রূপকথার রূপচিত্রের সেই সিঁহলিঙ্গম গভীর বস্তুব্য বহন করে আনে—

রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখ পথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার
স্বর্ণশিখর রথে।
ঘোমটা খসায় বাতায়ন থেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি মা দেখে,
ছিড়ি মণি হার ফেলেছি তাহার
পথের ধূলার’ পরে।

এই রূপক ব্যঞ্জনা পরমাপরিণতি পেয়েছে ‘সব-পেয়েছি’র দেশ’ কবিতায়। ‘খেয়া’র দ্বিধাগ্রস্ত কবিতাস্তর রূপকথার স্বপ্নময় সবপেয়েছির দেশে-ই তাঁর নির্জন ‘কুটিরখানি’ তুলতে চেয়েছে শেষ পর্যন্ত—যেখানে সবকিছুই ইঁা, না বলে কিছু নেই। —“সব পেয়েছির দেশে কারো/নাইরে কোঠা বাড়ি/দুয়ার খোলা পড়ে আছে,/কোথায় গেল দ্বারী।/অশ্বশালায় অশ্বকোথায়/হস্তীশালায় হাতি,/স্ফটিক দীপে গন্ধ তৈলে,/জ্বালায় না কেউ বাতি।/রমণীরা মোতির সিঁথি/পরে না কেউ কেশে,/ দেউলে নেই সোনার চূড়া/সব পেয়েছির দেশে/...আঙিনাতে দুপুর বেলা/মৃদু কঙ্কণ গেয়ে/বকুলতলায় ছায়ায় ব’সে/চরকা কাটে মেয়ে।”

এই স্বপ্নজগতে— নাই কো পথে ঠেলাঠেলি
নাই কো হাটে গোল,
ওরে কবি, এইখানে তোর
কুটিরখানি তোলা।
ধুয়ে ফেলরে পথের ধুলো
নামিয়ে দে রে বোঝা,
বেঁধে নে তোর সেতার খানা
রেখে দে তোর খোঁজা।

সহজ সরল ছড়ার ছন্দে রূপকথার ছদ্ম আবরণে এমন গভীর কথা বলা বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। সুসমালোচক লিখেছেন—“ইহা নিছক রূপকথার কল্পনা বিলাস নয়, রূপক-শক্তির অন্তঃসঞ্চিত প্রত্যয়মুক্তাবিন্দু, খেয়া কাব্যের ভাবভিসারের ইঙ্গিততম যাত্রাশেষ। নদীর ঘাটে খেয়া নৌকার দো-মনা প্রতীক্ষায় যাহার আরম্ভ, ‘সব পেয়েছির দেশ’-এর আকাঙ্ক্ষার হিত, পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও প্রসন্নতায় তাহার পরিসমাপ্তি। কবি ঘুরিয়া ফিরিয়া রূপকথার রাজ্যেই তাঁহার আশ্রয়

পাইয়াছেন, কিন্তু এই রূপকথার জগৎ শিশুমনের সৃষ্টি নয়, শ্রৌঢ় সাধনার পরিণত ফল, পরপার যাত্রার পূর্ণ ঐহিক প্রস্তুতি”।^{১১}

‘অনাহত’ এবং ‘কোকিল’ কবিতায় পিতামহীর মুখে ছড়া-রূপকথা শোনার অনুযুগ যেমন প্রাসঙ্গিক ভাবেই এসেছে, তেমনি ‘আগমন’ ‘কৃপণ’ ‘বালিকাবধূ’ ‘জাগরণ’ প্রভৃতি কবিতায় রূপকথার রূপচিহ্ন কবির সৃষ্টি-কল্পনায় যেন চকিতে উকি মেরে গেছে—

শব্দ কোথাও শুনতে কি পাস

মাঠে তেপান্তরে।

মাটি কোথাও উঠছে কেঁপে

ঘোড়ার পদভরে? (জাগরণ)

‘খেয়া’-উত্তর ‘গীতাঞ্জলি’ পর্বের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর ভাবুকতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল বলা যায়। তাহলেও ‘গীতাঞ্জলি’, ‘গীতামাল্য’র কোন কোন কবিতায় সহজ ভাবে ছড়ার ছন্দকে যেমন গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তেমনি রূপকথার রূপকচিহ্ন আপনা থেকেই উঠে এসেছিল কবির চেতনার গহনলোক থেকে। সেক্ষেত্রে অধ্যাত্মভাব প্রকাশে তা বিন্দুমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি—

সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে

অরুণ-বরণ পারিজাত লয়ে হাতে

নিদ্রিত পুরী, পথিক ছিলনা পথে,

একা চলি গেলে তোমার সোনার রথে,

বারেক থামিয়া মোর বাতায়ন পানে

চেয়েছিলে তব করুণ নয়ন পাতে। (গীতাঞ্জলি-৬৭)

কিংবা: “আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি/তাই ভোরে উঠেছি।/...আজ পারুল দিদির বনে/মোরা চলব নিমন্ত্রণে,/আজ চাঁপা ভায়ের শাখা-ছায়ের তলে/মোরা সবাই জুটেছি। (গীতিমাল্য-২)।^{১২}

‘খেয়া’র পরবর্তী ‘গীতাঞ্জলি’ (১৯১০), ‘গীতিমাল্য’ (১৯১৪) ‘গীতালি’^{১৩} (১৯১৪)—এই ‘গীতাখ্যাকব্য’ত্রয়ের কবিকে অনেকেই ‘ঈশ্বর-সন্ধানী’ বলে অভিহিত করেছেন;^{১৪} কেউ বলেছেন ‘ঐশ্বরিক বোধের’^{১৫} কাব্য। আর তা বলার কারণ এই পর্বের কবিতাগুলি ঈশ্বর ভাবুকতায় পরিপূর্ণ এক অনিবার্য আধ্যাত্মিক ভক্তিরসের সুরে বাঁধা। ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্য ঋতুর প্রেক্ষাপট নির্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন—‘জীবনে এমন একদিন এসেছিল, যখন বেদনার আঘাতে মনে হয়েছিল, জীবনের কাজ বুঝি সব সারা হয়ে গেছে; এমন ভজন, পূজন, সাধন—আরাধনার মধ্যে জীবনের শান্তি খুঁজতে হবে’।^{১৬} এই বেদনা ব্যক্তি-জীবনে একের পর এক মৃত্যুর আঘাত—সেই হিসেবে ‘ভজন-পূজন-সাধন আরাধনা’র ধ্যানলোকে কবি বিচরণ করতে শুরু করে ছিলেন ‘স্মরণ’-‘নৈবেদ্য’ কাব্য থেকেই। কিন্তু ‘গীতাঞ্জলি’র অন্তরে বাহিরে ভক্তির পরাকাষ্ঠা অতি স্পষ্ট দেখে, আলোচনায় কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নিষ্ঠাবান ভক্ত-বৈষ্ণবের স্বরূপটি খুঁজে দেখার প্রয়াস পেয়েছেন। পরম ভাগবত ও বৈষ্ণব শাস্ত্রে পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ ‘গীতাঞ্জলি’র কবির বৈষ্ণবীয় নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন—‘আপনি আমাদেরই মানুষ’। গীতাঞ্জলির কবিতায় বৈষ্ণব তত্ত্ব কত গভীরভাবে অনুসৃত হয়েছে চৈতন্য চরিতামৃত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বুঝিয়েছিলেন তিনি। উভয়ের আলোচনার দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন।^{১৭}

বিপরীত পক্ষে গোঁড়া বৈষ্ণবেরা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করতেও ছাড়েন নি কবিকে।

২০ চৈত্র ১৩৩২ সালে ‘গৌড়ীয়’ পত্রিকায় নগেন্দ্রকুমার রায় নামে জনৈক বৈষ্ণব ঢাকা থেকে ‘প্রেরিত পত্রে’ লেখেন—“....মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ও তৎ প্রণীত ‘বৈষ্ণব কবিতা’য় পদ্যছন্দে বৈষ্ণব কবির মর্মকথা প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলা ভাব ব্যাধিগ্রস্ত দেখিয়া আজ তাহার ভাগ্যে যে দুইজন ডাক্তার (অপর জন ড. দীনেশচন্দ্র সেন) চিকিৎসার্থে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাহাতে সহজিয়া প্রেম-সাধনা ও সহজিয়া প্রেমের লীলা আবার বাংলার ঘরে ঘরে চলিবে? আমাদের উপাস্য নিয়া এই রূপ বিদ্রুপ করায়, বাংলার প্রসিদ্ধ দুইজন ডাক্তার একজন গদ্যে আর একজন পদ্যে-গদ্যে, কেবল আপনাদের রুচির পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু ডাক্তার দ্বয়ের সুমতি দিউন। ভাগ্যে থাকিলে জাতি আপনি-ই বাঁচিবে। কথায় বলে ‘মুখ বৈদ্য যমের স্বরূপ’।”^{৯৮}

তাহলেও একথা অনস্বীকার্য কেবলমাত্র গীতাঞ্জলি পর্বেই নয় রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক কবি কল্পনায় বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবধারা ছিল ওতপ্রোত এবং বিচিত্র ভঙ্গিতে ও মাত্রায় তাঁর লেখায় প্রকাশিত। কিন্তু প্রশ্ন হল, কতটা গভীর ছিল সেই বৈষ্ণবতা? আর যেহেতু ‘বৈষ্ণব ধর্মকে নিয়ে বৈষ্ণব সাহিত্য’ তাই দেখতে হবে বৈষ্ণব-তত্ত্ব-দর্শন কতটা অনুপ্রাণিত করেছিল রবীন্দ্রনাথকে।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে লিখিত একটি পত্রে (১৬ কার্তিক ১৩২৮) রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি ছিল এইরকম—“বৈষ্ণব সাহিত্য এবং উপনিষৎ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈরি করিয়াছে। নাইট্রোজেনে এবং অক্সিজেনে যেমন মেশে তেমনি করিয়াই তাহারা মিশিয়াছে। আমার রচনায় সীমা অসীমের দ্বন্দ্ব নাই, মিলন আছে, তাহার কারণটি কেবল মাত্র আমার ব্যক্তিগত প্রকৃতিতে নাই, আমার চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া আছে; সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির বেড়ার ভিতর দিয়া ইহা বুঝা যায় না।”^{৯৯} উপনিষদের আনন্দবাদকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই আনন্দবাদের-ই আর একটি রূপ আমরা দেখতে পাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে, সেখানে উপনিষদের মতবাদকেই এক অর্থে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে—

“সৎ চিং আনন্দময় ঈশ্বর স্বরূপ
তিন অংশে চিহ্নিত হয় তিনরূপ।
আনন্দাংশে হ্রাদিনী সদাংশে সন্ধিনী
চিদংশে সম্বিত যারে জ্ঞান করি মানি।

* * * *

সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আনন্দ
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্রাদিনী কারণ।
হ্রাদিনীর সার অংশ ধরে প্রেমনাম
আনন্দ বিশ্বয়রস প্রেমের আখ্যান”

(চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

আনন্দের জন্যই সবকিছু। উপনিষদ ও বৈষ্ণব সাহিত্যের আনন্দবাদকে মিলিয়েই মনের মত করে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। অন্যপক্ষে ঔপনিষদিক প্রভাব বা ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে সংযুক্তি সত্ত্বেও ধর্মশাস্ত্র (Scripture) বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝি, রবীন্দ্রনাথ তার প্রভাবে কখনই একান্তবদ্ধ হন নি। ব্রাহ্মধর্মকেও যাবতীয় সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন তিনি ‘তত্ত্ববোধিনী’র সম্পাদক থাকাকালীন। বৈষ্ণব ধর্মের তথাকথিত ভক্তিবিশ্ব রসতত্ত্বের প্রতি তাঁর বিরূপতাও প্রকাশ করেছেন নানা প্রসঙ্গে।^{১০০} আসলে ‘বৈষ্ণব কবিতার ধর্মনীতি-প্রবৃত্তি (ethical) ভাবাদর্শকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বাধীন কল্পনা বশে নৈতিক (moral) তথা বিশ্বজনীন এক নব মূল্যমানে অভিষিক্ত

করেছিলেন।^{১০১} বৈষ্ণবপদাবলী তাঁর কবিকল্পনায় ‘সাম্প্রদায়িক ধর্ম চৈতন্যনিরপেক্ষ’ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এক প্রেরণা যে যুগিয়েছে, হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একটি চিঠি (১৫ মে ১৯৩৬) থেকেই তা বোঝা যায়। —“প্রথম বয়সে বৈষ্ণব সাহিত্যে আমি ছিলাম নিমগ্ন। ওর আন্তরিক রস মাধুর্যের গভীরতায় আমি প্রবেশ করেছি। চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যভাগবত পড়েছি বার বার। পদকর্তাদের সঙ্গে ছিল আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। অসীমের আনন্দ এবং আহান যে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যেও মানব প্রকৃতির বিচিত্র মধুরতায় আমাদের অন্তর বাসিনী রাধিকাকে কুলত্যাগিনী করে উতলা করছে প্রতিনিয়ত, তার তত্ত্ব আমাকে বিস্মিত করেছে। কিন্তু আমার কাছে এই তত্ত্ব ছিল নিখিল দেশকালের—কোনো বিশেষ দেশে বিশেষ কালে বিশেষ পাত্রের কতগুলি বিশেষ আখ্যায়িকায় আবদ্ধ করে একে আমি সংকীর্ণ ও অবিশ্বাস্য করে তুলতে পারিনি—আজও পারিনি নিক্সন সাহেবের দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও। আমি মানি রস স্বরূপকে, যাঁর পরমানন্দের মাত্রা জীব জীব। আমি সেই আনন্দকে উপলব্ধি করতে চাই বিশ্বের সর্বত্র—বিশ্ব প্রকৃতিতে বিশ্বমানবে। সত্যকে প্রত্যক্ষ দেখার সাধনা আমার; রূপকে সত্য বলে কল্পনা করা কেবল যে আমার পক্ষে অনাবশ্যক তা নয় কিন্তু তা বাধাজনক।”^{১০২}

বস্তুত এক আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বৃহত্তর বিশ্বপ্রকৃতি এবং বিশ্বমানব ধর্মকেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সে ক্ষেত্রে জীবাত্মার পূর্ণতা পরমাত্মায় নয়। বলা যায় মানবাত্মার পূর্ণতা। একেই বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের ‘সর্বেশ্বরবাদ’। সেইজন্য রাধাকৃষ্ণ লীলার রূপকল্পনাকে রবীন্দ্রনাথ সত্য বলে গ্রহণ করতে পারেননি।

অজিতকুমার চক্রবর্তীকে যদিও লিখেছেন (২০ আষাঢ় ১৩১৭) ‘অস্ফুট রকমেও বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের মধ্যে আমি প্রবেশ লাভ করেছিলাম’;^{১০৩} তা সত্ত্বেও কথাসাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে যখন তিনি ‘বৈষ্ণব ধর্মের মূলতত্ত্ব’ টি বোঝান,^{১০৪} তখন দেখা যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ধারণার পার্থক্যটুকু। দীনেশচন্দ্র সেনের ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ গ্রন্থের সমালোচনায় শাস্ত্রধর্মের সঙ্গে পার্থক্য নির্ণয় করে কবি লিখেছিলেন—“বৈষ্ণব ধর্মের শক্তি হুাদিনী শক্তি, সে শক্তি বল রূপিনী নহে, প্রেম রূপিনী। তাহাতে ভগবানের সহিত জগতের যে দ্বৈতবিভাগ স্বীকার করে তাহা প্রেমের বিভাগ, আনন্দের বিভাগ। তিনি বল ও ঐশ্বর্য বিস্তার করিবার জন্য শক্তি প্রয়োগ করেন নহি; তাঁহার শক্তি সৃষ্টির মধ্যে নিজেতে নিজে আনন্দিত হইতেছে, এই বিভাগের মধ্যে তাঁহার আনন্দ নিয়ত মিলন রূপে প্রতিষ্ঠিত।.... শাস্ত্র ধর্ম ভেদকেই প্রাধান্য দিয়াছে; বৈষ্ণব ধর্ম এই ভেদকে নিত্য মিলনের নিত্য উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।”^{১০৫} এই বিচার-বিশ্লেষণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের পক্ষে কতটা যথোচিত সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। বরং বলা যায়, এ এক স্বতন্ত্র মূল্যবোধে বৈষ্ণব প্রেমবাদের পরিশ্ক্লিষ্টরূপ—যার সঙ্গে উপনিষদের আনন্দবাদ সূক্ষ্মভাবে মিশে গিয়ে এক নতুন জীবনানুভবের প্রকাশ ঘটিয়েছে। ‘গীতাঞ্জলি’ পর্বের কবিতায় বৈষ্ণব প্রভাব অনুসন্ধান করতে গেলে এই পটভূমিকাতেই তার বিচার করতে হবে আমাদের।

‘গীতাঞ্জলি’^{১০৬} নিয়ে বিতর্কের একটা বড় কারণ এই কাব্যের ডাইমেনসন (Dimension) বহুমুখী; বিশেষ কোন নির্দিষ্ট রীতিতে বদ্ধ নয়—যে কোন পাঠক যে ভাবে খুশি তা গ্রহণ করতে পারে। ভগবানের কাছে ভক্তের যাওয়া কিংবা ভক্তের কাছে ভগবানের আসা — উভয়ের লীলা; বৈষ্ণব পদাবলীর দ্বৈতবাদের এই তত্ত্ব যেমন ‘গীতাঞ্জলি’ ঋতুর কবিতায় পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় পূর্ণ-অপূর্ণের লীলা; অর্থাৎ পূর্ণতার প্রতি অপূর্ণ মানবাত্মার একটা আকৃতি, একটা আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ। সেক্ষেত্রে আনন্দেই পূর্ণতার চূড়ান্ত অবস্থা, কিন্তু ‘তা গড়ে ওঠে বেদনার মধ্য দিয়ে, দুঃখের মধ্য দিয়ে। আর এই জন্যই ‘গীতাঞ্জলি’র গানে একটা বেদনার সাক্ষর সুর।

বৈষ্ণব পদাবলীর মত করে বলা যায় বিপ্রলম্বের রস কবিতাগুলিকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থ থেকে কয়েকটি উদাহরণ দিলে, ভক্ত-ভগবান, পূর্ণ-অপূর্ণের উভয়পক্ষীয় লীলার স্বরূপ বোঝা যাবে—

বেদনাদূতী গাহিছে ওরে প্রাণ,
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।
নিশীথে ঘন অন্ধকারে
ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে,
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান। (গীতাঞ্জলি-১৭)

কবিতাটি সম্পর্কে সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন—‘প্রাণের বেদনাকে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতার দূতীর মতো উৎপ্রেক্ষিত করিয়াছেন।’^{১০৭} বস্তুত রবীন্দ্রনাথের কবিচিন্তে রাধার বিরহ ভাবনা নতুন রূপ পেয়েছিল। ‘নিজেকে নায়িকা রূপে কল্পনা’ করে অন্তর্ভাবিত রূপকে কবিতা রচনা বৈষ্ণব পদাবলীর প্রত্যক্ষ প্রভাব ছাড়া আর কি হতে পারে! বক্ষ্যমাণ পর্যায়ের কবিতাগুলিতে এই ধরনের কল্পনাই প্রশ্রয় পেয়েছে:

- ক) “আমার মিলন লাগি তুমি/আসছ কবে থেকে/ তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়/রাখবে কোথায় ঢেকে।/কতকালের সকাল-সাঁঝে/ তোমার চরণ ধ্বনি বাজে,/গোপনে দূত হৃদয় মাঝে/ গেছে আমায় ডেকে।” (গীতাঞ্জলি-৩৪)
- খ) “দয়া দিয়ে হবে গো মোর/জীবন ধুতে—/নইলে কি আর পারব তোমার/চরণ ছুঁতে।” (গীতাঞ্জলি-৭৫)
- গ) “লুকিয়ে আস আঁধার রাতে/তুমি-ই আমার বন্ধু/জও যে টেনে কঠিন হাতে/তুমি আমার আনন্দ।” (গীতিমালা-৪৭)
- ঘ) “তোমায় আমায় মিলন হবে বলে/আলোয় আকাশভরা।” (ঐ-৫২)
- ঙ) “তোমায় ছেড়ে দূরে চলার/নানা ছলে/তোমার মাঝে পড়ি এসে/দ্বিগুণ বলে/নানান পথে আনা গোনা/মিলনের-ই জাল সে বোনা,/যতই চলি ধরা পড়ি/পলে পলে।” (গীতালি-১০২)

সীমাবদ্ধ মানুষের অনন্তাভিমুখী হতে চাওয়া; পূর্ণ-অপূর্ণের পারস্পরিক মিলনাকাঙ্ক্ষা আনন্দের মধ্য দিয়েই। ‘পুনশ্চ’র ‘বিচ্ছেদ’ কবিতাতেও তার প্রকাশ:

অপূর্ণ চলেছে পূর্ণের দিকে
তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে
আনন্দের নব নব পর্যায়।

বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে একটা মানবিক আবেদনও রবীন্দ্রনাথের চাখে ধরা পড়েছে।^{১০৮} রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমলীলার রূপকে মানুষী প্রেমের পূর্ণতার একটি ছবি কবিকে যেমন বিস্মিত করেছে, তেমনি প্রকৃতি সৌন্দর্যের একটা বিরাট দিকও মুগ্ধ করেছে অবিরত; স্বীকার করেছেন, “প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই আমার মনে বৈষ্ণব কবির ছন্দোবৎকার এনে দেয়”।^{১০৯} এই ভাবে এক অখণ্ড চৈতন্যে উপলব্ধি করেছেন সবকিছু—একেই বলা যেতে পারে কবির সর্বানুভূতি বা বিশ্ববোধ। আর তাই বিশ্বপ্রকৃতিও মানব জীবনের বিচিত্র রূপের মধ্যদিয়ে অনন্তের যে বাঁশি বাজছে, ‘গীতাঞ্জলি’র কবির কাছে সেই পথেই ভক্ত ও ভগবানের লীলা। বৈষ্ণব কবিতার ব্যাখ্যা এই কথাই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ—‘The Vision’-প্রবন্ধে: “I was sure that these poets were speaking about the supreme Lover, whose touch we experience in all our relations of love—

the love of nature's beauty, of the animal, the child, the comrade, the beloved, the love that illuminates our consciousness of reality. They sang of love that ever flows through numerous obstacles between men and Man the Divine, the eternal relation which has the relationship of mutual dependence for a fulfillment that needs perfect union of individuals and the Universal.

"The Vaishnava poet sings of the Lover who has his flute which, with its different stops, gives out the varied notes of beauty and love that are in Nature and Man. These notes bring to us our message of invitation. They eternally urge us to come out from the seclusion of our self-centred life into the realm of love and truth."^{১১০}

বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গি গীতাঞ্জলি পর্বের কবিতায় ভক্তি-প্রেম-প্রকৃতি প্রীতির অপরূপ সমন্বয়ে প্রকাশিত —

মেঘের পরে মেঘ জমেছে,

আঁধার করে আসে

আমায় কেন বসিয়ে রাখ

একা দ্বারের পাশে.....।

(গীতাঞ্জলি-১৬)

কিংবা—

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার

পরাণ সখা বন্ধু হে আমার....।

(গীতাঞ্জলি-২০)

ইত্যাদি কবিতায় একদিকে যেমন প্রেমের রহস্যময় গভীরচারিতায় পদাবলীর রাধা-ব্যকুলতা এবং অভিসার চিত্র মনে করিয়ে দেয়, অন্যদিকে প্রকৃতিসৌন্দর্যের মধ্যে যে চিরন্তন প্রেমের ডাক, বৈষ্ণব কবির ভাবাকুলতা রবীন্দ্রনাথের চৈতন্যের আড়াল থেকে যেন ফুটে উঠেছে। ‘গীতাঞ্জলি’র ১৮ (‘আজি শ্রাবণ-ঘন-গহন-মেহে / গোপন তব চরণ ফেলে’), ১৯ (‘আঘাট সন্ধ্যা ঘনিজে এল,/গেলরে দিন বয়ে’) ২৭, (‘আজি বারি ঝরে ঝর ঝর/ভরাবাদরে’), ৩৫ (‘এসো হে এসো, সজল ঘন,/বাদল বরিষণে’) ইত্যাদি কবিতায় প্রকৃতির নিবিড় বর্ণনা দীর্ঘ দিনের বৈষ্ণব পদাবলী চর্চা ও অনুক্রমের ফল। অন্তরের দিক থেকেই হোক বা বহিরঙ্গীয় ভাবেই হোক ‘গীতাঞ্জলি’ পর্বে রবীন্দ্রনাথ যে কিছুটা ‘বৈষ্ণবপন্থী’ হয়ে উঠেছিলেন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কবির অবচেতনায় কিংবা অলক্ষ্যেই পদাবলীর আত্মনিবেদন ও প্রেমভক্তির সুর বৈষ্ণবীয় ভঙ্গির আমেজ এনে দিয়েছে কবিতাগুলিতে। এই ভাবসায়ুজ্য প্রকৃতিগত বা পরিমাপগত ততটা নয়, যতটা কাব্যরসের সমতায়। বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবোন্মাদে অনন্ত বিরহের যে ধ্বনি, তাই যেন কবিতা গুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। পদাবলীর বাতাবরণ এমন ভাবে ঘনীভূত হয়েছে, মনে হয় যে বৈষ্ণব সাহিত্যের রসে মজে আছেন কবি। সেক্ষেত্রে আলোচ্য পর্বের কবিতাগুলি কারো কারো কাছে বৈষ্ণব পদাবলীর নব মূল্যায়নও মনে হতে পারে। ‘ওদের সাথে মেলাও, যারা/চরায় তোমার ধেনু’ (গীতিমালা-৮৭) কবিতাটি সম্পর্কে অজিতকুমার চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন—“এ গান কোনো ভক্ত বৈষ্ণবের রচনা হইতে পারিত।”^{১১১} কিন্তু রূপের দিক থেকে কিংবা আত্মদানে যতই সাদৃশ্য থাক এ কবিতা একান্তই রাবীন্দ্রিক — কবির নিজস্বতাই এতে সমধিক প্রকাশিত। বস্তুত বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে এই ধরনের স্থূল সাদৃশ্য বা বহিরঙ্গীয় মিল ‘গীতাঞ্জলি’ ‘গীতিমালা’ ‘গীতালি’র অনেক কবিতাতেই আছে। রবীন্দ্রকবিতার পাশাপাশি বিভিন্ন রসপর্যায় থেকে পদ উদ্ধৃত করে সেই সাদৃশ্য দেখিয়েছেন অনেকেই।^{১১২} এই তুলনা নিতান্তই বহিরাবরণে। যেমন ‘গীতালি’র ৩১ সংখ্যক কবিতায়—‘কোন গুণী আজ উদাস প্রাতে/মীড় দিয়েছে কোন্ বীণাতে গো:/ঘরে যে আর রইতে পারিনে।’ এর সঙ্গে পূর্বরাগের পদাংশ—‘নিতি নিতি ডাকে বাঁশি রহিতে নারি ঘরে’ ইত্যাদি পংক্তির মিল লক্ষ্য করা যায়।

‘গীতাঞ্জলি’র ১২৭ সংখ্যক কবিতায় (‘রাজার মতো বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে’) বাংসল্য বিষয়ক পদের ছায়াপাত যেমন ঘটেছে,^{১১০} ১৪১ সংখ্যক কবিতায় তেমনি ঈশ্বরকে সরাসরি ‘হরি’ বলেই উল্লেখ করেছেন (‘লাজে মরি, লও গো হরি’) কবি। চৈতন্যদেবের প্রেমঘন রূপচিহ্নটি অনন্ত দেশকালের পটভূমিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে ‘গীতিমাল্যে’র ১০৮ সংখ্যক কবিতায়—‘আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ওকে’। ঈশ্বরকে দেবতার ঐশ্বর্য জ্ঞানে না দেখে প্রেমভক্তির সম্পর্কে দেখার যে বৈষ্ণবতত্ত্ব (দ্র. চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্য লীলা, অষ্টম ও উনবিংশ পরিচ্ছেদ) ‘গীতাঞ্জলি’র ৯২ সংখ্যক কবিতায় (‘দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়/আপন জেনে আদর করিনে’) তা যেন আভাসিত হয়েছে। বৈষ্ণব কবিতা স্বামী পুত্র সখা রূপে ঈশ্বরের ভজনা করেছেন; সশ্রদ্ধে প্রচলিত ছাঁদ গ্রহণ না করে, যাবতীয় প্রয়োজনের উর্ধ্বে এক অন্তত দেশ কালের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর প্রত্যয় বন্ধু সখা প্রিয় নাথ প্রভুর মধ্যেই ব্যাপ্ত হয়ে গেছে। ধর্মীয় গণ্ডিতে আবদ্ধ বৈষ্ণব কবিতার বিশেষ (Particular) প্রেমভাবনাকে একটা নির্বিশেষ (Universal) রূপ দিয়েছেন তিনি। তাছাড়া রোমান্টিক প্রেমের কবিতা হিসেবেও বৈষ্ণব পদাবলীর তুলনা নেই। এর মধ্যে প্রেমের যে চিরন্তন হাহাকার, সেই চেতনাই সঞ্চারিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথে, তাই গীতাঞ্জলি পর্বের কবিতাকে আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের বাইরে থেকে, তন্ময়ের একবারে কাছ না ঘেঁষে নিতান্তই প্রেম ও প্রকৃতির কবিতা হিসেবেও মনের চাওয়াটুকু পেয়ে যেতে পারে যে কোন পাঠক।^{১১৪} ‘গীতাঞ্জলি’র কবিতায় নির্দিষ্ট করে বৈষ্ণব প্রভাব অন্বেষণ বৃথা। অজিতকুমার চক্রবর্তী ঠিকই বলেছেন—“রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র উপনিষদের অধ্যাত্ম যোগতত্ত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত নন, এবং কেবলমাত্র বৈষ্ণবের লীলা তত্ত্বের দ্বারাও অনুপ্রাণিত নন। এই দুই তত্ত্বই তাঁহার জীবনের সাধনায় জৈব মিলনে মিলিত হইয়া এক অপরূপ নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাঁহার ভক্তি কাব্যের এই নবরূপকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার কি পরিমাণ অংশ উপনিষদের এবং কি পরিমাণ অংশ বৈষ্ণব ভক্তিতত্ত্বের তাহা নির্দেশ করিতে যাওয়া ব্যর্থ চেষ্টামাত্র।”^{১১৫} এই বক্তব্য কেবল ‘গীতাঞ্জলি’ সম্পর্কেই নয়, ‘গীতিমাল্য ও ‘গীতালি’ সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

ফলকথা এই, ‘গীতাঞ্জলি’ পর্বের কবিতা ‘বৈষ্ণবভাবাপন্ন’ হলেও বৈষ্ণবীয় গণ্ডিতে বদ্ধ নয়। বৈষ্ণব দর্শনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য যতটা, অমিল বা বিরোধ তার চেয়ে অনেক বেশি।^{১১৬} ইতিপূর্বে ‘সোনার তরী’র ‘বৈষ্ণব কবিতা’ এবং ‘নৈবেদ্য’ কাব্যের আলোচনায় তা আমরা দেখেছি। ভগবানের কৃপায় আত্মজ্ঞান জন্মে, ভক্তির পথ প্রশস্ত হয়; —বৈষ্ণব ভক্তদের এই মতের বিপরীত কথাও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন দেখতে পাই:

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ

এ নহে মোর প্রার্থনা।

(গীতাঞ্জলি-৪)

বস্তুত কবিতার রূপনির্মাণে বৈষ্ণবীয় ভাব-ভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের লেখায় মিশে গেছে—এছাড়া কবির আত্মপ্রকাশের পথও ছিলনা। ক্ষুদিরাম দাস লিখেছেন—“রবীন্দ্রনাথ ভাববাদী হলেও জীবন বর্জিত বৈষ্ণবীয় ভাব সাধনার পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রকাশভঙ্গির সহায়তার জন্য কাব্যে পদাবলীর রূপকল্প গ্রহণ করেছিলেন মাত্র।”^{১১৭} বরং বলা যায় বৈষ্ণব কবিতাকে আত্মসাৎ করে যুগোপযোগী নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা/গানে বৈষ্ণব পদাবলীর অনেক শব্দ রূপকের আবরণে এসেছে। ‘গীতাঞ্জলি’ পর্বের কবিতায় সেই সিন্থলের আধার হয়েছে বৈষ্ণব কবিদের বিশেষ কয়েকটি শব্দ, যেমন ‘বাঁশি’ (‘কত মায়ার বাঁশির সুরে’—গীতাঞ্জলি-৬৩) ‘নাম’ ইত্যাদি। ‘কেবা শুনাইল শ্যামনাম, কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো’ পদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকগুলি গান রচিত হয়েছিল।

বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছেন—“বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবের প্রসঙ্গে রবীন্দ্ররচনায় ‘নাম’ এর তাৎপর্য বিচার আবশ্যিক। ...চৈতন্য ধর্মে ভক্তি সাধনায় নামের যে মাহাত্ম্য স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার মহৎ তাৎপর্য রবীন্দ্রভাবনায় উপেক্ষিত হয় নাই।”^{১১৮} যেমন ‘গীতিমাল্যে’র ৩২ সংখ্যক কবিতাটি:

তোমারি নাম বলব নানা ছলে
বলব একা বসে আপন মনের ছায়াতলে।
বলব বিনা ভাষায়,
বলব বিনা আশায়,
বলব মুখের হাসি দিয়ে বলব চোখের জ্বলে।

কিংবা ‘গীতবিতানে’র গানে:

বলো সখী বলো তারি নাম আমার কানে কানে
যে নাম বাজে তোমার প্রাণের বীণার তানে তানে।

আমাদের দেশের চিরায়ত ঐতিহ্যের দুই শ্রেষ্ঠ ধারা উপনিষদ ও বৈষ্ণব সাহিত্য ভাবনায় জারিত রবীন্দ্রনাথের কবি কল্পনাকে ‘গীতাঞ্জলি’ পর্বে আরও একধাপ এগিয়ে দিয়েছিল মধ্যযুগের সমস্ত কবিদের বাণী ও বাউল গান। উচ্চ-ভাবসম্পন্ন পক্ষীসংগীত হিসেবে বাউল পদাবলী রবীন্দ্রনাথের কবিমানসকে বহুল পরিমাণে পুষ্ট করেছিল, ইতিপূর্বে ‘খেয়া’র আলোচনায় আমরা তা দেখেছি। বাউলদের অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন চেতনায় যাবতীয় লোকাচারের বন্ধনমুক্ত ঈশ্বর প্রেম-মত্ততা রবীন্দ্রনাথের মনোজগতে যে আলোড়ন আনে, ‘গীতাঞ্জলি’ ‘গীতিমাল্য’ ‘গীতালি’র কবিতায় তারই ছায়াপাত ঘটেছে। সেই সূত্রেই রবীন্দ্রকাব্য ধারার এই পর্বকে ‘মরমীয়া পর্ব’ বলে উল্লেখ করেছেন আবু সয়ীদ আইয়ুব।^{১১৯} বাউলের অনুসৃত পন্থায় ‘মানবসত্য’ ও ‘মানুষের ধর্ম’কে চিনে নিতে পেরেছিলেন কবি। ‘গীতাঞ্জলি’ পর্বের সমকালীন নাটকগুলিতে (‘প্রায়শ্চিত্ত’ ‘রাজা’ ‘অচলায়তন’ ‘ডাকঘর’ প্রভৃতি) ধনঞ্জয় বৈরাগী বা ঠাকুরদা শ্রেণীর চরিত্রগুলি তাই বাউল জীবনদর্শণে রচিত। পরবর্তী কালে ‘পুত্রপুট’ এর ১৫ সংখ্যক কবিতায় মরমী কবি বাউলদের সঙ্গে স্বাক্ষাত্য বোধে উদ্দীপ্ত হয়েছেন।

বাউলেরা বৈষ্ণবদের থেকে এক ধাপ এগিয়ে মানবীয় সম্পর্কের মধ্যেই আরাধ্যকে খুঁজতে চেয়েছে। তাদের জীবনমুখী প্রেমসাধনার পথটি দেখতে পাওয়ার পর আলোচ্য পর্বে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা এক বিস্তৃত পটভূমিকায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলা যায়। ক্ষুদিরাম দাস লিখেছেন—“পার্থিব আনন্দ সম্পর্কের শ্রেষ্ঠ বস্তু যে প্রেম, তারই দেহবাসনা মুক্ত অমানুষী রসাস্বাদ তাঁদের লক্ষ্য। বাউলদের গানে যা বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত তাই রবীন্দ্রনাথে একটি সামঞ্জস্যমীভূত পরিপূর্ণ রূপলাভ করেছে।”^{১২০}

গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির অনেক কবিতাতেই বাউল গানের বাহ্য প্রভাব অর্থাৎ বহিরঙ্গীয় মিল তো আছেই অন্তঃপ্রভাবও যথেষ্ট। ‘গীতালি’তে এই প্রভাব এতই আক্ষরিক যে, কোন কোন কবিতাকে আসল বাউল গান বলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। বিশেষজ্ঞ অবশ্য মন্তব্য করেছেন—“বাউল গানের ধাতুকে গ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রগীতি গীতালিতে সম্পূর্ণভাবে নিজস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত।”^{১২১} তাহলেও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সংগ্রহে অতি পরিচিত যে সব বাউল গান ছিল (যেমন, ‘আমার ঘরের চাবি পরেরি হাতে’ কিংবা ‘সে লীলা বুঝবি খেপা কেমন করে’ প্রভৃতি) সেই সব গানের অংশবিশেষ ছব্ব চলে এসেছে আলোচ্য পর্বের কোন কোন কবিতায়:

ফিরায়ে দিনু ঘরের চাবি
রাখিনা আর ঘরের দাবি।

(গীতিমাল্য-২৬)

আবার— মনকে হেথায় বসিয়ে রাখিসনে
 তোর ফাটলধরা ভাঙা ঘরে
 ধুলার 'পরে পড়ে থাকিসনে।
 ওরে অবশ, ওরে খেপা,
 মাটির 'পরে ফেলবিরে পা,
 তারে নিয়ে গায়ে মাখিসনে। (গীতালি—৪০)

কিংবা— গেয়েছি গান যখন যত
 আপন মনে খ্যাপার মত। (গীতাঞ্জলি—৬২)

এসব কবিতাংশ থেকেই বোঝা যায় বাউল ভঙ্গি ও ভাব রবীন্দ্রনাথ কত গভীরভাবে অনুসরণ করেছিলেন।^{১২২} তাহলেও রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি তো মানতেই হবে—“আমার অনেক গান বাউলের ছাঁচের কিন্তু জাল করতে চেষ্টাও করি নি। সেগুলো স্পষ্টত রবীন্দ্র-বাউলের রচনা।”^{১২৩} সেই ‘বাউলছাঁচের’ রূপকল্প কয়েকটি কবিতায় আলাদা আমেজ এনে দিয়েছে—

রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি
 অরূপ রতন আশাকরি
 ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর
 ভাসিয়ে আমার জীর্ণতরী। (গীতাঞ্জলি-৪৭)

কিংবা ‘গীতালি’র ৭৮ সংখ্যক কবিতায় ‘বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেড়েছে /কেমনে দিই ফাঁকি’ ইত্যাদি পংক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বৈষ্ণব-বাউল-সহজিয়া-সুফী-মরমীয়া সাধনায় সহজ উপলব্ধির মধ্যে যে পরম উপলব্ধির তত্ত্ব, সেই তত্ত্বেরই মীমাংসা লক্ষ্য করেছেন সুকুমার সেন প্রথম গানটিতে এবং দ্বিতীয় গানটির সঙ্গে একটি অপরিচিত বাউল গানের (‘তোরা পালাবি আর কোন পথে/রসিক জেলে জাল ফেলেছে জগতে’) ভাবসাদৃশ্য অনুভব করেছেন।^{১২৪} বাউল গানের শব্দচিত্রও বিশ্বলের আকারে এসেছে অনেক পংক্তিতে। আলোচ্য কাব্যত্রয়ী থেকে কিছু নমুনা উদ্ধৃত করলে স্পষ্ট হবে—

গীতাঞ্জলি: ‘দুঃখ আমার ঘরের জিনিস/খাটি রতন তুই তো চিনিস’ (১০), ‘এ সংসার হাটে /আমার যতই দিবস কাটে’ (২৪), ‘ওরে প্রেম নদীতে উঠেছে ঢেউ/উতল হাওয়া’(২৬), ‘ডাকে তোমার হাটের মাঝে/চলছে যেথায় বেচাকেনা’ (৯৩), ‘জীবনে তুই যা নিয়েছিস /মরণে সব নিতে হবে।’ (১১২), ইত্যাদি।

গীতিমাল্য: ‘ওদের কথায় ধাঁধা লাগে/তোমার কথা আমি বুঝি’ (৭৩), ‘হাওয়া লাগে গানের পালে/মাঝি আমার বসো হালে’ (৭৬), ‘ব্যবসা মোর তোমার সাথে/চলবে বেড়ে দিনে রাত্রে/আপনা নিয়ে করব যতই/বেচাকেনা’ (৮৪) ‘আমায় বাঁধবে যদি কাজের ডোরে/কেন পাগল কর এমন করে’ (৯০), ‘ওরে তোর নিবিয়ে দিয়ে ঘরের বাত্মি/কি লাগি ফিরিস পথে দিবারাতি’ (৯৩) প্রভৃতি।

গীতালি: ‘আলো যে যায়রে দেখা—/হৃদয়ের পূব গগনে/সোনার রেখা’(৫), ‘একথাটা ধরে রাখিস/মুক্তি তোরে পেতেই হবে’ (৪৭), ‘চোখে দেখিস, প্রাণে কানা,/হিয়ার মাঝে দেখ না ধরে/ভুবন খানা’(৫৪), ‘যে দিল ঝাঁপ ভব সাগর মাঝখানে’ (৮৮)

কাব্যত্রয়ীর^{১২৫} কেবলমাত্র এই কটা পংক্তিতেই নয়, অনেক সময় সমগ্র কবিতাটি-ই হয়ে উঠেছে বাউলধর্মী। বাউলদের দেহতত্ত্বের গানের রূপক চিত্রও মাঝে মাঝে উঁকি মেরে গেছে:

বলতো এই বারের মতো
 প্রভু, তোমার আঙিনাতে
 তুলি আমার ফসল যত।
 কিছু বা ফল গেছে ঝরে,
 কিছু বা ফল আছে ধরে,
 বছর হয়ে এল গত।

(গীতিমাল্য-৮৫)

কিংবা—

পথের খবর পাখির পাখায়
 লুকিয়ে থাকে
 তারার আগুন পথের দিশা
 আপনি রাখে।
 ছয় ঋতু ছয় রঙিন রথে
 যায় আসে যে বিনা পথে,
 নিচ্ছেরে সেই অচিন পথের
 খবর শুধাই।

(গীতালি-৯২)

এসবই অবশ্য বাহ্যপ্রভাবগত সাদৃশ্য। গীতাঞ্জলি পর্বের অন্তঃস্বভাবেও বাউলধর্মিতা মিশে যেতে পেরেছিল। বাউলদের গানের মানববৃত্তি, বা মানবিক ভাবানুভূতি-নির্ভর আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখের সহজ সরল অভিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের কবি-চেতনায় রঙ ধরিয়েছিল। বাউলদের সহজ সাধনার জীবনদর্শনকে স্বীকার করে নিয়ে তিনি তাই লিখতে পারেন:

সহজ হবি সহজ হবি
 ওরে মন সহজ হবি। (গীতালি-৫২)

গানটিকে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বাউল গানের একটি ভাল নমুনা বলে গ্রহণ করেছেন সুকুমার সেন।^{১২৬} এই সহজ সাধনার মূল কথাই হচ্ছে প্রেম:—‘আমার প্রাণের মাঝে যেমন করে/নাচে তোমার প্রাণ/আমার প্রেমে তেমনি তোমার প্রেমের/বহু কণা তুফান/রসের বরিষণে/তারে মিলাও সবার সনে।’ (গীতিমাল্য-১১০)

বাউলদের সাধনার জগতে ‘মনের মানুষ’ যাই হোক না কেন, রবীন্দ্রভাবনায় তা মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ, মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ। তাই সে মহামানব; Universal Man। দেশ-কাল উত্তীর্ণ এক বিশ্বজনীনতার ভাব তার মধ্যে। মনের মানুষের কাজ হল ‘মানবিক প্রোৎসর্হ’ বা মনুষ্যত্বের ‘পূর্ণতার’ দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই মনের মানুষ-ই হচ্ছে যাবতীয় ধর্মশাস্ত্র (Theology) নিরপেক্ষ রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর; প্রেমের পথে, দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়েই ঐর সঙ্গে মিলন। ‘The Religion of Man’-এ রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন—“The humanity of god, or the divinity of Man, the Eternal”।^{১২৭}

বাউলদের মত করেই এই ‘মনের মানুষ’ের সন্ধান করেছেন কবি গীতাঞ্জলি পর্বের অনেক কবিতায়—

ও আমার মন যখন জাগলি নারে
 তোর মনের মানুষ এল দ্বারে
 তোর চলে যাবার শব্দ শুনে
 ভাঙলরে ঘুম—
 ও তোর ভাঙলরে ঘুম অঙ্ককারে।

(গীতালি -২৭)

কিংবা—

আমার নয়ন ভুলানো এলে

আমি কী হেরিলাম নয়ন মেলে।

(গীতাঞ্জলি-১৩)

মানুষের দ্বৈতসত্তার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ‘মানুষের ধর্ম’ প্রবন্ধে। ‘দেহ মনোভূমি’তেই তার লীলা। সে যেমন ‘আমাতে’ বদ্ধ তেমনি ‘বহু’তে ব্যাপ্ত। একদিকে তার অপূর্ণ জাগতিক সত্তা, আর এক দিকে তার ‘পরমমানবিক সত্তা’। কেবল প্রাণ ধারণেই তার চরম তৃপ্তি নয়, একে অতিক্রম করে সে পূর্ণমানব হতে চায়। আঘাত,^{১২৮} দুঃখ-বেদনার মধ্যে দিয়েই লাভ করতে হয় সেই পূর্ণতা, সেই পরম মনের মানুষকে:

ওরে মাঝি, ওরে আমার

মানব জন্ম তরীর মাঝি,

শুনতে কি পাস দূরের থেকে

পারের বাঁশি উঠছে বাজি।

(গীতাঞ্জলি-১৪০)

কিংবা—

ও নিষ্ঠুর, আরো কি বাণ

তোমার তুণে আছে?

তুমি মর্মে আমায়

মারবে হিয়ার কাছে?

(গীতালি-৬)

আবার—

দুঃখ যদি না পাবে তো

দুঃখ তোমার ঘূচবে কবে?

বিষকে বিষের দাহ দিয়ে

দহন করে মারতে হবে।

(ঐ-৪৩)

ফলকথা, ‘গীতাঞ্জলি’ ‘গীতিমালা’ ‘গীতালি’তে একদিকে উপনিষৎ ও বৈষ্ণব কবিতা আর একদিকে বাউল গান—এই সবার মিলনেই রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচেতনা পরিপূর্ণ হয়ে নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছিল; প্রচলিত ধারণার সঙ্গে যার কোন মিল নেই। এই পর্বের কবিতা/গানে তাই বৈষ্ণবপদাবলী ও বাউলসংগীতের যে প্রভাব তা গভীরতর একধরনের গোপন প্রভাব। বস্তুত প্রভাবকে আত্মস্থ করে নতুন সৃষ্টিলীলায় মেতে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

এই পর্বের আলোচনা শেষ করতে চাই ‘গীতালি’র একটি কবিতা/গানের উল্লেখ করে, যাতে ‘রূপকথার মশলা’ রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনায় বিশেষ রস জুগিয়েছে। ‘এদিন আজি কোন্ ঘরে গো/খুলে দিল দ্বার,/আজি প্রাতে সূর্য ওঠা/সফল হল কার’ ইত্যাদি ৯০-সংখ্যক কবিতায় ইঙ্গিত রয়েছে সেই রূপকথার যাতে রামকসের হাতে বন্দী রাজপুত্রকে দিনের বেলায় স্বাধীনতা দেওয়া হয় সব ঘর যথেষ্ট খুলে দেখবার, দু’একটি ঘর বাদে’।^{১২৯} শুধু রূপকথার গল্প বা রূপকল্পই নয়, রূপকথার মোটিফ ব্যবহারেও রবীন্দ্রনাথ যে কতটা সিদ্ধহস্ত, ‘গীতালি’র এই গানটিই তার প্রমাণ।

প্রসঙ্গ নির্দেশ ও মন্তব্য :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ‘গ্রাম্যসাহিত্য,’ লোকসাহিত্য, রবীন্দ্ররচনাবলী (শতবার্ষিক সং) খণ্ড ১৩ পৃ. ৭১৭।
২. দ্র. সাহিত্য সৃষ্টি, সাহিত্য, রবীন্দ্ররচনাবলী (শতবার্ষিক সং) খণ্ড ১৩ পৃ. ৭৮৭।
৩. ‘বানান বিধি’, বাংলা শব্দতত্ত্ব (১৩৯১ সং) পৃ. ১৯৬।
৪. প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লেখা চিঠি, দ্র. দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৬, পৃ. ৩০-৩১।

৫. দ্র. প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩৪ পৃ. ৭৪৪-৪৫।
৬. রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস ও নাটকে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রভাব দেখিয়ে মংলিখিত প্রবন্ধগুলি হল:
 - ক) 'রবীন্দ্রনাটকে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রয়োগ ও প্রভাব' দ্র. বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রয়োদশ সংকলন (২০০০-২০০১)।
 - খ) 'রবীন্দ্র-ছোটগল্পে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রয়োগ-প্রযুক্তি ও প্রভাব', অষ্টবীজ, দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, মে ২০০১।
 - গ) 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য', বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্বাদশ-ত্রয়োদশ যুগ সংখ্যা) ২০০৪।
৭. ঐতিহ্যের উৎস সন্ধান: রবীন্দ্রকবীর কপিবুক পর্যায়: মংলিখিত এই প্রবন্ধটির জন্য দ্র. ছন্দা রায় ও তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রসঙ্গ হাজার বছরের বাংলা কবিতা', অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (২০০১)।
৮. দ্র. 'সূচনা', 'সন্ধ্যাসংগীত'।
৯. দ্র. 'বাউল গান', প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩৪ পৃ. ৭৪৫।
১০. তদেব।
১১. 'কড়িও কোমলে'র একটিমাত্র কবিতাতেই ('পাষাণীমা') শান্ত পদাবলীর অস্ফুট আদল আছে। যদিও ধরনীকেই এখানে 'মা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে তথাপি কবিতাটির কোনো কোনো ছন্দে রামপ্রসাদী আত্মনিবেদনের সুর ধনিত।
১২. 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান', 'সাতভাই চম্পা', 'পুরোনো বট', 'হাসিরাশি' প্রভৃতি কবিতা প্রথমে 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থে থাকলেও পরে 'শিশু' (১৩১০) কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।
১৩. রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা (২য় খণ্ড) পৃ. ২১২।
১৪. 'কড়ি ও কোমলে'র দ্বিতীয় সংস্করণে কবিতাটির নাম বদলে হয়েছিল 'রূপকথা'।
১৫. 'মেয়েলি ছড়া', সাধনা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১ পৃ. ৪৭৪।
১৬. দ্র. 'বর্ষার চিঠি', বালক, শ্রাবণ ১২৯২ পৃ. ১৯৬।
১৭. পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর ১ম খণ্ডে (১৯৮০) 'কড়ি কোমলে'র সংযোজন হিসেবে যে কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে তারমধ্যে 'পত্র/শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকায়' শীর্ষক কবিতাগুলিতে ছড়ার ছন্দের সঙ্গে ছড়ার পংক্তিও (বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর ইত্যাদি) ব্যবহৃত হয়েছে।
১৮. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা (২য় খণ্ড) পৃ. ২১১-২১২।
১৯. দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্র সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব', প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪ পৃ. ১৩১।
২০. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা (১ম খণ্ড) পৃ. ৪১।
২১. রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান পৃ. ৬৭।
২২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড (চতুর্থ সং) পৃ. ১৬।
২৩. দ্র. রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা (১ম খণ্ড) পৃ. ৫৮।
২৪. এই কবিতা লেখার (শ্রাবণ ১২৯৪) কয়েক বছরের মধ্যে 'সাধনা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'একটি আবাড়ে গল্প'র কাহিনী।
২৫. 'বিশ্ববর্তী' দুটি চিত্র সম্বলিত হয়ে রূপকথার মেজাজেই 'সাধনা'র আত্মপ্রকাশ করেছিল। দ্র. বৈশাখ ১২৯৯ পৃ. ৫৩৫-৩৮।
২৬. 'সোনার তরী' (১৯৬৯ মুদ্রণ) গ্রন্থপরিচয় পৃ. ২১৭ দ্রষ্টব্য।

২৭. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য পৃ. ৭২-৭৫।
২৮. 'পুষ্পমালার রূপকথা'র প্রাসঙ্গিক গল্পটুকু উদ্ধৃত করে 'রাজ্যার ছেলে ও রাজ্যার মেয়ে' কবিতার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন আশুতোষ ভট্টাচার্য। দ্র. ঐ পৃ. ৭৫-৮১।
২৯. ঐ পৃ. ৮৩।
৩০. দ্র. ছিন্নপত্রাবলী ১৯ সংখ্যক পত্র। ১৮০ সংখ্যক পত্রেরও (শিলাইদহ/৬ ডিসেম্বর ১৮৯৪) রবীন্দ্রনাথের এই মানস পরিচয় লিপিবদ্ধ।
৩১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, (চতুর্থ সং) পৃ. ৮৮।
৩২. ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, তৃতীয়পর্ব/প্রথমার্ধ (১৯৮১ সং) পৃ. ১৭৩।
৩৩. সুকুমার সেনের পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ. ৮৭। 'সোনার তরী' পরবর্তী কাব্য 'চিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথ যদিও 'রূপকথার তুঙ্গ প্রাসাদ', থেকে অবতরণ করেছেন, তথাপি এই কাব্যের শেষ কবিতা 'সিদ্ধুপারে' (১৩০২) তে রূপকাবরণের সঙ্গে রূপকথার চিত্রকল্প সহজে মিশে যেতে পেরেছে। ড. সেন লিখেছেন, 'কবিতাটি পড়িলে মনে হয় যেন রূপকের স্ফটিক পাত্রের রূপকথার উজ্জ্বল রস উছলিয়া পড়িতেছে'। ঐ পৃ. ১০৭।
৩৪. দ্র. রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য, পৃ. ৮৫।
৩৫. এই ধূয়া পদটি কবিতায় প্রথমে ছিল না। 'স্বপ্নমঙ্গল' নামকরণ এবং ভণিতার মতো এই ছত্রদুটি পরে যোজনা করেন রবীন্দ্রনাথ। দ্র. বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত 'সোনার তরী'র পাণ্ডুলিপি (অভিজ্ঞান সংখ্যা ১২৯) পৃ. ২৬-৩৪।
৩৬. ছিন্নপত্রাবলী, ৮৬ সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।
৩৭. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড (৪র্থ সং) পৃ. ৯৬-৯৭।
৩৮. ঐ পৃ. ৪৬।
৩৯. দ্র. দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৭ পৃ. ১৬১।
৪০. চর্যাপদ (১৯৬৬ সং) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।
৪১. 'বাঙলাভাষা ও বাঙালী জাতির গোড়ার কথা', দ্র.প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ পৃ. ২৪২।
৪২. দৈহিক পরিশ্রমের কাজ করতে করতেও সমবেত কণ্ঠে যে গান গাওয়া হয়, তাকেও সারিগান বলে;—যেমন ছাত পেটানোর গান।
৪৩. জগদীশ ভট্টাচার্য : রবীন্দ্র কবিতা শতক-১, পৃ. ১৪৫।
৪৪. রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য পৃ. ৮৬।
৪৫. উভয়ের কবিতা উদ্ধৃত করে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ড. মজুমদার। দ্র. রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান, পৃ. ৭৪-৭৫।
৪৬. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা (১ম খণ্ড) পৃ. ১২২।
৪৭. 'চৈতালিটা আমার বড় আদরের', দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৫ পৃ. ৪৩।
৪৮. দ্র. মংলিখিত প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাটকে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রয়োগ ও প্রভাব', বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রয়োদশ সংকলন (২০০০-২০০১) পৃ. ৬৭-৬৯।
৪৯. 'কণিকা'র 'কীটের বিচার'—এ মহাভারতের প্রসঙ্গ আছে। আর দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের রূপকল্পটি সুন্দরভাবে ব্যবহার করা হয়েছে 'বস্ত্রহরণ' কবিতায়।
৫০. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড (৪র্থ সং) পৃ. ১২১।
৫১. 'কণিকা'র সেকাল কবিতায় কালিদাসের যুগের ছবি আঁকতে গিয়ে রূপকথার আমেজ লেগেছে কোনো কোনো ছত্রে। যেমন—'প্রিয়নামটি শিখিয়ে দিত/সাধের শারিকারে' ইত্যাদি।
৫২. 'ভক্তিভাজন' (কণিকা), 'সুখদুঃখ' (কণিকা) প্রভৃতি।

৫৩. দ্র. মংলিখিত গ্রন্থ ‘প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার : রবীন্দ্র উদ্যোগ’ (১৩৯৯) পৃ. ১২।
৫৪. ‘অপমানবর’ ‘স্বামীলাভ’ এবং ‘স্পর্শমণি’ কবিতা তিনটির পাশাপাশি ভক্তমাঙ্গের মূল উপাখ্যান উদ্ধৃত করে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন প্রমথনাথ বিশী তাঁর ‘রবীন্দ্রকাব্যের বস্তুবিচার’ গ্রন্থে।
দ্র. রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা (১ম খণ্ড) পৃ. ১৭৮-৮৩।
৫৫. চরিত্র; শ্রীকবিরজী দ্রষ্টব্য।
৫৬. রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান, পৃ. ৭৫।
৫৭. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : রবি-রশ্মি (১ম খণ্ড পূর্বভাগ) পৃ. ৪৬৮।
৫৮. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য সুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড (৪র্থ সং) পৃ. ২০১।
৫৯. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড (৪র্থ সং) পৃ. ৪৫৮।
৬০. বিমানবিহারী মজুমদার : রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান পৃ. ৭৬।
৬১. এর কোনো কোনোটি কীর্তনের সুরে গাওয়া হয়।
৬২. ৫০, ১৪৭ এবং ১৬৯ সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।
৬৩. ‘মদনভস্মের পর’ কবিতায় ‘হাত ঘুরলে নাড়ু দেব’ ছড়ার ছন্দের অনুসরণ আছে বলে উল্লেখ করেছেন সুকুমার সেন; দ্র. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড (৪র্থ সং) পৃ. ১১১। ‘মদনভস্মের পূর্বে’ কবিতার ‘শাসন তরে বাঁকায়ে ভুরু নামিয়া জল রাশিতে’ ইত্যাদি পংক্তিতে প্রাকৃত শ্লোকের ছায়ানুসরণ লক্ষ্য করেছেন ক্ষুদিরাম দাস, দ্র. রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় (১৩৮৪) পৃ. ৯৫।
৬৪. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য সুকুমার সেনের ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’, ১ম খণ্ড, অপসার্ষ, ‘বিদ্যাসুন্দর কাহিনী’ অধ্যায়।
৬৫. বাঙ্গালি কবি নয়, ভারতী, ভাদ্র ১২৮৭ পৃ. ২২৮।
৬৬. ‘চৌরপঞ্চাশিকা’ কবিতাটির ‘ভারতী’ পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠের সঙ্গে ‘কল্পনা’র পাঠের পার্থক্য এতই যে দুটিকে স্বতন্ত্র কবিতা বলে মনে হয়।
৬৭. দ্র. ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, (সাহিত্য পরিষদ সং) পৃ. ১৫৮।
৬৮. রবীন্দ্রসরণী (১৩৮৪ সং) পৃ. ১৫২-১৫৩।
৬৯. চিঠিপত্র, নবম খণ্ড, গ্রন্থপরিচয় পৃ. ৪৯৫।
৭০. রবীন্দ্রকবিতাশতক - ১ পৃ. ১৫৭।
৭১. বিমানবিহারী মজুমদার : রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান পৃ. ৬৭।
৭২. দীর্ঘদিন পরে ১৯২৩/২৪ সালে শেষবারের মতো রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেন বৈষ্ণব পদসংকলন করে প্রকাশ করতে। দ্র. অনাথনাথ দাস ও বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত ‘পদরত্নাবলী’র আনন্দ সংস্করণ (১৩৯৭) পৃ. ৩৩৮-৩৯।
৭৩. ‘নৈবেদ্য’র একটি মাত্র কবিতায় (২৫ সংখ্যক) রূপকথার প্রসঙ্গ আছে—“তারা শুনাক এবার/সমুদ্রতীরের তান, অজ্ঞাত রাজার/অগম্য রাজ্যের যত অপরূপকথা”।
৭৪. “হিন্দু ভক্তি শাস্ত্রে সুপরিচিত বৈষ্ণব ও শাক্ত সাধনা-গীতির ন্যায় এখানেও ভগবৎ মিলনাত্মক কবি-মনের বিনয় নম্র দীনতা ও সহজ অধিকার বোধের প্রসঙ্গ প্রত্যয় একসঙ্গে পরিস্ফুট হইয়াছে।” বলে মন্তব্য করেছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্র. রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা (২য় খণ্ড) পৃ. ১৫৭।
৭৫. চিঠিপত্র, নবম খণ্ড পৃ. ১১।
৭৬. দ্র. সুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড (৪র্থ সং) পৃ. ১৪২।
৭৭. ‘স্মরণীয় বিদ্যাপতির ‘খনে খনে নয়ন কোন অনুসরণ/খনে খনে বসন ধূলি তনু ভরই’ ইত্যাদি পদটি।

৭৮. এই সংকলনের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল 'Visva-Bharati Quarterly' পত্রিকার একাধিক সংখ্যায়। দ্র. অনাথনাথ দাস ও বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত 'পদরত্নাবলী' (১৩৯৭) পৃ. ৩৩৮-৩৯
৭৯. 'মনু্য', পঞ্চভূত, রবীন্দ্ররচনাবলী, শতবার্ষিক সংস্করণ (১৪ খণ্ড) পৃ. ৬৫৫।
৮০. দ্র. পূর্বে উল্লিখিত 'পদরত্নাবলী'র পৃ. ১২৬।
৮১. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত : রবীন্দ্রনাথ (৩য় সং) পৃ. ১২৬।
৮২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড (৪র্থ সং) পৃ. ১৩৮।
৮৩. রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা, ২য় খণ্ড পৃ. ২১৭।
৮৪. এর অনেকগুলিই রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত স্বদেশী পত্রিকা 'ভাণ্ডার'-এ (১৩১২-১৪) প্রথম প্রকাশিত হয়।
৮৫. এই সময়ে অনেক বাউল বৈষ্ণব-স্বাকীরের সংস্পর্শে আসেন কবি। এবং তাঁদের গীতিনিষ্ঠ ঈশ্বর আবাধনায় মুগ্ধ হন। শিলাইদহে লেখা 'গীতিমাল্যে'র ১৩ সংখ্যক গানে (এই যে এরা আঙিনাতে/এসেছে জুটি) এদের কথাই বলতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। পরবর্তীকালে লেখা 'পাগলা হাওয়া বাদল দিনে' গানটিতে সুকৌশলে বলরাম হাড়ী সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে বলে মন্তব্য করেছেন সুকুমার সেন। দ্র. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড (৪র্থ সং) পৃ. ১৫৯ টীকা।
৮৬. দ্র. বাউল গান, প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩৪ পৃ. ৭৪৫।
৮৭. দ্র. পথের শেষ কোথায়, পৃ. ১৩৮।
৮৮. রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয় (১৩৮৪ সং) পৃ. ১৬৩।
৮৯. কবিতাটি আসলে গান, 'বাউলের সুর' বলে নির্দেশও করেছেন রবীন্দ্রনাথ।
৯০. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা (২য় খণ্ড) পৃ. ২৪০।
৯১. ঐ পৃ. ২৪৬।
৯২. গীতিমাল্যের ৩১ সংখ্যক কবিতায় ('কে নিবিগো কিনে আমায়, কে নিবিগো কিনে') রূপকথার রাজ্যের সিন্ধলিক চিত্র আশ্চর্য ব্যঞ্জন লাভ করেছে।
৯৩. 'গীতালি'র ৫০ সংখ্যক গানে ('মোর হৃদয়ের গোপন বিজ্ঞান ঘরে')র সঙ্গে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা'য় প্রকাশিত একটি অপভ্রষ্ট কবিতার আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন সুকুমার সেন। দ্র. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড (৪র্থ সং) পৃ. ১৫৬।
৯৪. আবু সয়ীদ আইয়ুব : পথের শেষ কোথায় পৃ. ১৬৩।
৯৫. দ্র. শঙ্খ ঘোষ: এ আমির আবরণ (১৯৮২ সং) পৃ. ৪০।
৯৬. 'বলাকা' কাব্যের 'শঙ্খ' কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে কবি বলেছিলেন এই কথা। দ্র. উক্ত কাব্যের গ্রন্থপরিচয়।
৯৭. দ্র. 'পুরাতন কথা' দেশ, ২৭ সংখ্যা ১৩৫২ পৃ. ১৭-১৯
৯৮. দ্র. গৌড়ীয় পত্রিকা, চতুর্থ খণ্ড, ৩২ সংখ্যা, পৃ. ৯। রবীন্দ্রসাহিত্যে বৈষ্ণব ধর্মের বিকৃতি নিয়ে গোঁড়া বৈষ্ণবদের নানা অভিযোগের উল্লেখ আছে দীনেশচন্দ্র সেন ও বনোয়ারীলাল গোস্বামী সম্পাদিত 'গোবিন্দদাসের করচা' গ্রন্থের ভূমিকায় (পৃ. ৬৯)।
৯৯. দ্র. বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৫ পৃ. ২৬৪।
১০০. দ্র. হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্রাবলী (২, ৩, ৪, ৫, ১১, ১৪, ১৭, ৪৫, ৯৯, ১৯৯ সংখ্যক পত্র) চিঠিপত্র, নবম খণ্ড।
১০১. দ্র. ভূদেব চৌধুরী: বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা/রবীন্দ্রযুগ, প্রথমপর্ব (১৯৮১ সং) পৃ. ৭৪।
১০২. চিঠিপত্র, নবম খণ্ড পৃ. ৩১৮-১৯।
১০৩. প্রবাসী, পৌষ ১৩৩৪, পৃ. ৩৯৩।

১০৪. দ্র. মণ্ডলিখিত প্রবন্ধ ‘রবীন্দ্র-ভাষ্যে বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন’, প্রাক্তনী, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (স্মরণিকা ১২ ডিসেম্বর ২০০৪) পৃ. ৯০-৯৪।
১০৫. সাহিত্য, রবীন্দ্রচন্দ্রাবলী (শতবার্ষিক সংস্করণ) খণ্ড-১৩, পৃ. ৮১৫।
১০৬. বর্তমান আলোচনায় ‘গীতাঞ্জলি’র সঙ্গে ‘গীতিমাল্য’ ও ‘গীতালি’কেও ধরতে চাই বুদ্ধদেব বসুর একটি উক্তির সমর্থন নিয়ে। তিনি বলেছেন, ‘তিনটি নাম, কিন্তু একটি কাব্য, বক্তব্য ও শৈলীতে অভিন্ন, পরস্পরের পরিপূরক ও সমর্থক।’ দ্র. কবি রবীন্দ্রনাথ পৃ. ৭৭।
১০৭. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড (৪র্থ সং) পৃ. ৫২৩।
১০৮. দ্র-‘মনব্য’ প্রবন্ধ, ‘পঞ্চভূত’।
১০৯. ছিন্নপত্রাবলী-১৪৭ সংখ্যক পত্র।
১১০. The Religion of Man (1963 ed.) P. 66
১১১. কাব্যপরিক্রমা (১৩৫১সং) পৃ. ১৩৫।
১১২. বিমানবিহারী মুজুমদার : ‘রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান’ গ্রন্থের ‘গীতাঞ্জলি-গীতালিতে পদাবলীর অপ্রত্যক্ষ প্রভাব’ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। অপিচ, শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য: ‘পদাবলীর তত্ত্ব সৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।
১১৩. গীতিমাল্যের ১০৩ সংখ্যক কবিতাতেও (‘এই তো তোমার আলোক ধেনু’) এই ভাবচিত্র লক্ষ্য করা যায়। সখ্য ভাবের চিত্র আছে ৮৭ সংখ্যক কবিতায় (ওদের সাথে মেলাও, যারা/চরায় তোমার ধেনু’)।
১১৪. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য শঙ্খ ঘোষ : এ আমির আবরণ (১৯৮২ সং) পৃ. ৩৮-৩৯।
১১৫. কাব্য পরিক্রমা (১৩৫১ সং) পৃ. ১১৭।
১১৬. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ক্ষুদিরাম দাসের ‘বৈষ্ণব রসপ্রকাশ’ গ্রন্থের ‘বৈষ্ণবতা ও রবীন্দ্রনাথ’ অধ্যায়। অপিচ, রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয় (১৩৮৪ সং) পৃ. ২২৭-৩৩।
১১৭. ঐ পৃ. ১৮২।
১১৮. সুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড (৪র্থ সং) পৃ. ৫২৫।
১১৯. আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ (১৯৭৬ সং) পৃ. ৩৪।
১২০. রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয় (১৩৮৪ সং) পৃ. ২৩১।
১২১. সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড (৪র্থ সং) পৃ. ১৫৫।
১২২. কোনো কোনো বাউল গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আরো অনেক কবিতার সাদৃশ্য আছে; ‘বলাকা’ ‘পূরবী’ ও ‘গীতবিতান’ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তা দেখিয়েছেন পম্পা মজুমদার। দ্র. রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস, পৃ. ৪২০।
১২৩. ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ তারিখে নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে লেখা চিঠি, দ্র. ‘দেশ’ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৯ পৃ. ২৬।
১২৪. দ্র. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড (৪র্থ সং) পৃ. ১৫২ ও ১৬০।
১২৫. গীতাঞ্জলির ২৩, ২৪, ২৬, ৬৩, ৬৯, ৯৩ গীতিমাল্যের ৪, ৬, ১২, ৫৯, ৭৪, এবং গীতালির ৩, ৯, ২৩, ৪৪, ৫১, ৬৪, ৯৩, ১০২ সংখ্যক কবিতা/গানের কোনো কোনো পংক্তি বাউলধর্মী।
১২৬. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড (৪র্থ সং) পৃ. ১৫৬।
১২৭. The Religion of Man (1963 ed.) P. 11.
১২৮. ‘আঘাত করে নিশ্চে জিনে/কাড়িলে মন দিনে দিনে’-(গীতিমাল্য-৯)।
১২৯. সুকুমার সেন : রবীন্দ্রনাথের গান, পৃ. ৩৯।

হেমন্তের অরণ্যের এক পোস্টম্যান : শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার প্রথম পর্যায়

হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

হেমন্ত নিতান্তই জীবনানন্দীয়, তবু তাকে শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর নিজের মতন করে খুঁজে নিয়েছেন। নিঃশব্দ নগর জীবনে বাংলা ক্যালেনডার বা পঞ্জিকার পাতা ছাড়া যেমন হেমন্ত থেকেও নেই, তেমনই প্রায় অগোচরে থাকা হেমন্তের মতোই নিভৃতে নানাবিধ টুকিটাকি ভাষাকথা, উল্লেখ, এবং অনুবঙ্গ হয়ে গড়ে উঠেছিলো শক্তির খাঁটি দেশজ কবিতা, যা প্রথম থেকেই আত্মদে আলাদা। তার আগে, কী প্রচণ্ড আলোড়নে যে চল্লিশের কবিতার চত্বর ও চবুতরা ছিল উদ্ভাল, তা উৎসাহী পাঠক মাত্রই জানেন। সাতসমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে মহাযুদ্ধের ঢেউ তো তার চেতনার তটভূমি ভাসিয়ে দিয়েছিলোই, পাশাপাশি বিয়াল্লিশের ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন এবং তারপর খুচখাচ অনটন ও অভাবের গা সওয়া বেহিসেবি বারোমাস্যাকে স্তম্ভিত করে এসেছিলো পঞ্চাশের মঞ্চস্তর। এখানেই শেষ নয়, প্রায় পায়ে পায়ে আসা ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শেষ পর্যন্ত ঘনিয়ে তুলেছিলো অনিবার্য সেই অশনি সঙ্কেত, দেশের সাবেক মানচিত্রের শরীর থেকে দুটুকরো রক্তমাংস খুবলে নিয়ে এসেছিল দেশের স্বাধীনতা, সাতচল্লিশে। সমাজ আর সময়ের এই ঘন ঘন মাথা নাড়ার দিনগুলিতে কবিতা যে আত্মগত, অন্যমনা, অথবা, অস্ফুট থাকবে না আর—প্রত্যাশিত এই সংস্কারের অন্যথা হয়নি সেদিন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, দিনেশ দাস, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু এবং অন্যান্যদের জ্বলন্ত অক্ষরগুলি তার সাক্ষী। আবার সেই চল্লিশের দুর্দিনেই শান্ত প্রশমনে নত ছিল নরেশ শুহ, অরুণকুমার সরকার, জগন্নাথ চক্রবর্তী কিংবা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা, উত্তেজনার ঋতুশীর্ষে বিচরণকারী সমাহিত পথিকের মতোই। এদের সকলের মিলিত পায়ে পায়ে সময় পার হল চারের দশক।

স্বাধীনতা এল, স্বাভিমানও এল কিছু পরিমাণে। কিন্তু স্বপ্ন এল না। প্রাপ্য আর প্রাপ্তের মধ্যে থেকেই গেল ব্যবধান। কাঁটাতারের দুপাশেই বাতাস ছিল ছিন্নমূল মানুষের কান্নায় ভারি, মর্যাদা হারানোর দীর্ঘশ্বাসে পাণ্ডুর। উদ্বাস্ত সমস্যা, বেকারি, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি এবং অপরাধপ্রবণ রাজনীতির বাড়বুদ্ধির সূত্রে সমাজসংস্কৃতিক জীবনের স্থিরতা ও ভারসাম্য গেল বদলে। এবং বদলে যাওয়া আরও অনেক কিছুর মতো বদলে গেল কবিতা। স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম প্রজন্ম এই পঞ্চাশের কবিতায় দেখা গেল নতুন আবেগ ও অভিমান। নতুন আদর্শ এবং অস্মিতা। স্বাধীনতার অস্বাদিত স্বপ্নের খুব কাছেই, স্বপ্নভঙ্গের গভীর হতাশা। কবিতার ভাষা এবং ভাষার সাঁকো দুলে উঠলো নতুন সময়ের ধাক্কা। প্রেমের পরিভাষা, উচ্চারণের উচ্চাবচতা, সমস্তির যৌথতা ছেড়ে এসে দাঁড়ালো এককের অনুকূলে, তার অভিমুখ এক ধরনের জনবোধগম্য সহজতায় বদলে গেল। আর এই সব কিছুর জ্বলছাপ সঙ্গে নিয়ে আধুনিক বাংলা কবিতায় এসেছিলেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। অচেনা হেমন্তের অরণ্যে কোনও অলীক পোস্টম্যানের মতোই তাঁর ঝোলায় পোরা ছিল সময়ের নানারকম বার্তা, রচনারুচি বদলের লেফাফা, সিলমোহরহীন সেই আদেশনামা—যা ভাষান্তরে হয়ে উঠেছিল অবিস্মরণীয় সব কবিতা, কবি যাদের আদর করে ‘পদ্য’ বলে ডেকেছেন আজীবন। হেমন্তের ঝরা পাতা আর ফুল-ফলগুলির মতো সেই সব কবিতাও কতোটা অরণ্যের আদিমতা ও মমতায় মাখামাখি, শক্তির শক্তিমত্তায় বিশ্বাসী, পাঠক তা জানেন। জেনে, ভালোবেসে ফিরে আসেন বারবার সেই অতিমৌলিক উচ্চারণের কাছে। অনুরাগে, সমর্পণে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় কবিতার বিষয় প্রধানত তিনি নিজে, তবে বলা বাহুল্য, তা পুরানো রোমান্টিকদের একরৈখিক ধরনে নয়। শক্তির কবিতায় মিশেছে বস্তুর সেই বাস্তবাত্মক, সুররিয়াল

ধূপছায়া, বাকপ্রতিমার সুস্বাদু চমকপ্রদ জাফরি, সচেতন নিলিপি, অথচ, চোরাগোপ্তা নির্মাণদক্ষতার অনায়াস কারুকাজ। প্রবল প্যাশনের পাশাপাশি প্রচণ্ড অভিমান। হয়তো এ তাঁর একান্ত যুগধর্ম, স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম প্রজন্মের সমবায়িক স্বপ্নভঙ্গের ব্যক্তিগত ফলশ্রুতিই হয়তো ‘জরাসন্ধ’ কবিতার অবিস্মরণীয় অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশিত—“আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে”। মহাভারতীয় পুরাণপ্রতিমার এই আধুনিক, অভিমানী ও প্রত্যাহারপ্রবণ ব্যবহার, বিবাদিত এই কবির কণ্ঠস্বর যেন তাঁর কালের নিজস্ব মাত্রাকে নির্ভুলভাবে চিনিয়ে দ্যায়। বেনিয়ম পরিপার্শ্ব আর বেসামাল সময়ের ক্লাস্তি এখানে, এখানে জন্ম আর যাপনের জরা।

কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘হে প্রেম হে নৈশেক্ষ্য’তে প্রেমও যেন বেদনাবিধুর, নীরব অভিমানে নৈশেক্ষ্যখচিত। যেমন ‘পরজী’ কবিতায় প্রেমিকা হঠাৎ পরজী হওয়াতে কৈশোরক অভিমান যেন এইভাবে ভাষারীর পায়:

“যাবো না আর ঘরের মধ্যে অই কপালে কী পরেছে
যাবো না আর ঘরে
সব শেষের তারা মিললো আকাশ খুঁজে তাকে পাবে না
ধরে-বেঁধে নিতেও পারো তবু সে-মন ঘরে যাবে না
বালক আজও বকুল কুড়ায় তুমি কপালে কী পরেছে
কখন যেন পরে?”

যে বিবাহ চিহ্ন বেদনার বাহন, তার স্মারক স্মরণীয় করে অনেক কিছু, হয়তো। এই রকম দ্বিধা আর অভিমান আছে ‘নিয়তি’ কবিতাতেও, ভিন্ ভাষায়, ভিন্নতর প্রসঙ্গ অনুসঙ্গে :

“বাগানে অদ্ভুত গন্ধ, এসো ফিরি আমরা দুজনে।
হাতের শৃঙ্খল ভাঙে, গায়ে পড়ে কাঁপুক ভ্রমর
যা কিছু ধূলার ভার, মানসিক ভাষায় পুরানো
তাকে রেখে ফিরে যাই দুজন দুপথে মনে মনে।”

এত বিবাদ শেষ পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় অশালীন আর্তনাদে, যদিও পঞ্চাশের কবিতা তথাকথিত ভদ্রলোকি শালীনতাবোধকে খোড়াই কেয়ার করেছে। “শিল্পের প্রস্রাবরসে পাকে গণ্ড, পাকে গুহ্যদেশ” এই সিদ্ধান্ত এই ‘নিয়তি’তে কিছুটা আকস্মিক যদিও। স্ত্রীলতার সীমারেখা নিয়ে শুধু প্রশ্ন নয়, রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন এই সময় শক্তি এবং তাঁর সতীর্থেরা। সমস্ত অনুশাসনকে অবহেলা করার এই সাহস এবং ব্যক্তিগত যন্ত্রণাকে সৌন্দর্য ও সাধের বিলুপ্তির মূল্যে পাওয়া আসলে হয়তো একই আধুলির দুটি দিক। সমষ্টিগত ব্যর্থতা এবং স্বপ্নভঙ্গের একধরনের জটিল সামাজিক-সাহিত্যিক রূপান্তর, যা পঞ্চাশ ও পরবর্তী কবিতার একটি বিশিষ্ট আয়তন হয়ে উঠেছিল। হাংরি-শ্রুতি ধ্বংসকালীন কবিতা আন্দোলনের মধ্যে কোথাও একটা পাল্টা মার, একধরনের একশিলাময় অনড় সামাজিক স্থিতিবস্থাকে ভাঙার ইঙ্গিত রয়ে গেছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় অবশ্য এই সবার মধ্যে থেকেও কবিতাগত যোগ্যতায় এই সব কিছুকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। অনায়াসে।

কবিতার আবেদন প্রধানত মেধার কাছে, না হৃদয়ের কাছে এই সহজ দ্বন্দ্ব বাংলা আধুনিক কবিতার কিনারায় এসে এক যুক্তিগ্রাহ্য মীমাংসিত সমতার শমে পৌছে যায়। জীবন্ত স্বাভাবিক মানুষ যেমন হৃৎপিণ্ড এবং মগজ নিয়েই জীবন্ত—কবিতার জীবনও তাই। মেধা এবং অনুভূতির যৌথতায় পূর্ণায়ত প্রকাশ তার, একটু আধটু তারতম্য থাকতেও পারে, কিন্তু এর কোনো অংশকে বাদ দিয়ে কখনোই তা সম্পূর্ণ নয়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাতে যেমন। এমনিতে তাঁর কবিতা

তার যাপিত জীবনের মতোই, জংলি ঝর্ণার মতো অবিরল, স্বতস্ফূর্ত। তীব্রভাবে হৃদয়বান। কিন্তু এই সব আপাত-আলুথালু, যেন বা স্বেচ্ছায় অবিন্যস্ত কবিতাগুলির মাঝে মাঝে থাকে বুদ্ধির ঝিলিক, মার্গসঙ্গীতের মীড়ের মোচড় কিছুটা। এবং পরীক্ষাপ্রবণতা। ধরা যাক ‘ভ্রান্তি’ কবিতাটির কথা। ধ্রুপদী সাধু-শব্দের জাড়ালে হাহাকারের রণন সেখানে :

“জল যায় রে শিলা আমার বক্ষপট দহে
সালিতালতা রূপসী পোড়ে নিবিড় তরী ভরে
ফেরা ভালো ফেরাই ভালো, বাতাসে কত সহ্যে
দহনভার ভস্মভার মরীচিভার মালা?”

প্রায় স্তোত্রের মাধুর্যে গড়া এই অতিসচেতন গুরুচণ্ডালি, এই আপাত এলোমেলো কিন্তু অন্তরে আত্মবিশ্বাসী এক নিজস্ব কখনভঙ্গিমা কবিতার পর কবিতায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত মুদ্রা হয়ে গেছে। বিশেষত আধুনিকতা যে অর্থে নাগরিকতার সমার্থক, বাংলা আধুনিক কবিতার সেই প্রসারিত ভুবনে শক্তির কবিতাগুলিতে এক আশ্চর্য সমন্বয়ের মেজাজ ধরা পড়ে। সরল প্রাকৃতিক সজ্জলতা এবং দীপ্তিমান নাগরিক উন্মেষের সমন্বয়, মফস্সলি কখনভঙ্গির ছন্দ-মগ্নতার সঙ্গে শব্দের রূপচিকন নির্মাণ নিপুণতার সমন্বয়, মেধা এবং হৃদয়ের অনিবার্য, আবশ্যিক সমন্বয়। যে কবি ‘ধর্ম’ আর ‘জিরাফের’ মধ্যে বন্ধনী খোঁজার মজাটুকু ছাড়তে চান না, দূর বিপরীতে স্থিত বৈশিষ্ট্যগুলির সমন্বয় তাঁর কবিতার ধরন হবে, এমনটাই স্বাভাবিক।

যেমন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার অন্যতম ধরন প্রায় অথহীন অথচ শ্রুতিসুন্দর শিল্পিত কথনের ভিতর থেকে আবছা একটা অর্থের আভাস তুলে আনা। স্পষ্ট কোনো ‘মানে’ নেই, তবু সমস্ত জুড়ে একটা অনিশ্চিত সৌন্দর্যমূর্তি গড়ে ওঠে সেখানে, যেমন ‘আনন্দ ভৈরবী’ কবিতায় আছে :

“সে কি জানিত না যত বড়ো রাজধানী
তত বিখ্যাত নয় এ হৃদয়পুর
সে কি জানিত না আমি তারে যত জানি
অনখ সমুদ্র
আজ এই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি
এমন ছিলো না আষাঢ়-শেষের বেলা
উদ্যানে ছিলো বরষা-পীড়িত ফুল
আনন্দ-ভৈরবী।” (আনন্দভৈরবী : ধর্মে আছো জিরাফেও আছো)

এখানে ‘রাজধানী’ কি শহর কোলকাতা আর ‘হৃদয়পুর’ সেই বারাসতের সন্নিহিত শান্ত মফস্সল? এমন স্থূল একমাত্রায় শক্তির কবিতা পড়তে ভরসা হয়? নাকি হৃদয়পুর অর্থান্তরে, একমাত্র হৃদয়বান পাঠক বুঝবেন, কবিতাটির উত্তরণের নিজস্ব মাত্রা? আসলে ‘এলায়ে পড়া’ এই ছবি যা প্রায় জলছবির মতোই বাপসা ও মায়াবী—শক্তির অভিজ্ঞানচিহ্ন। তার ‘আধেকলীন’ অর্থগুলি আসলে ‘দুয়ার ঐটে ঘুমিয়ে’ থাকা মানের মাঝে নানরকম সম্ভাবনা হয়ে ক্রমাগত কড়া নাড়ে। এই কবির বহুপঠিত কবিতায় যেমন:

“দুয়ার ঐটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া
কেবল শুনি রাতের কড়া নাড়া
‘অবনী বাড়ি আছো?’ (‘অবনী বাড়ি আছো’: ধর্মে আছো জিরাফেও আছো)

কবিতার ‘লাইন-বাই-লাইন’ অর্থের খোঁজ নিছকই অ্যাকাডেমিক অভ্যাসমাত্র; ছাত্রসেব্য এমন

ছেলেমানুষিতে কবির কতোটুকুই বা যায় আসে। আসলে সব মিলিয়ে একটা সুরেলা আবহ, অথবা মনোরম ‘অনর্থের’ ছবিই হয়তো কবির অভিলাষ, অস্থিষ্ট। অভ্যস্ত, অবসন্ন প্রাত্যহিকতার প্রাপ্ত ছুয়ে থাকা এক রকম চেতাবনি ‘অবনী বাড়ি আছে?’ হয়তো তা একধরনের আত্মানুসন্ধানই, যা সচকিত করে আমাদের। সকলকে নয়, সব সময়ও নয়। কখনো কখনো, কাউকে কাউকে। পঞ্চাশে, প্রধানত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে এইভাবে আভিধানিক অর্থবোধের বাঁধাধরা পরিসীমা ছাড়িয়ে বাংলা কবিতা প্রবেশ করেছিলো বিশুদ্ধ কবিতার খেয়ালি ঝাসমহলে। গড়ে তুলেছিলো একটি পৃথক প্রসারিত আয়তন।

এই সব ভাঙাগড়ার বিষয়ে এই সময়ের কবিরা যে অনবহিত ছিলেন, তাও নয়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো প্রবল আত্মবিশ্বাসীরা জানতেন, এইভাবে তিনি এবং তাঁরা কবি ও কবিতার অধিকারের পাল্লা ছড়িয়ে দিচ্ছেন। সেই অর্থেও তাঁরা ছিলেন ‘স্বেচ্ছাচারী’। তাঁদের সকলের হয়ে, এই সময়ের কবিতার, কবিতাকেন্দ্রিক অতিকথার নায়ক কথা বলেন :

“তীরে কি প্রচণ্ড কলবর

জলে ভেসে যায় কার শব

কোথা ছিল বাড়ি

রাতের কম্বোল শুধু বলে যায়—আমি স্বেচ্ছাচারী।”

শক্তির কবিতায় কখনো কখনো খুব আলগোছে একটা গল্পের আভাস ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ঠিক প্রথমাত্মিক আখ্যান থাকে না মোটেই, থাকে তার ক্ষুদ্রতম রেখা, অসম্পূর্ণ কম্পমান রেখা—যা কবিতার ভাষায় প্রকাশিত হলে কবিতার জ্ঞাত যায়না, বরং কবিতা জ্ঞাতে ওঠে। সেই প্রজ্ঞাতির একটি কবিতা, ‘সরোজিনী বুঝেছিল’। সরোজিনী কি বুঝেছিল? অনেকটা জীবনানন্দের মৃত্যুময় কবিতার মতোই ফিসফিসে ইশারায় তার কিছু ইঙ্গিত আছে কবিতার শেষাংশে, অনুমেয় সম্ভাভাষায়!

“জড়িয়ে গিয়েছে মেয়ে হাঁসে ফাঁসে—কাপড়ের প্রেমে

শুধু চোখ মেলে দেখা, এই হাঁস স্পর্শ করা নয়

সরোজিনী বুঝেছিলো, শুধু তার বোঝেনি হৃদয়।”

যে বিহুল মুহূর্তগুলি পার হয়েছিলেন এই তরুণতুর্কিরা, তার জলবায়ুতে ছিল সামাজিক অবিশ্বাস আর সংশয়ের বাষ্প, এবং এই কনফিউশান শক্তির কবিতায় বারবার প্রকাশিত হয়েছে:

“কে জানে গরল কিনা প্রকৃত পানীয়

অমৃতই বিষ!

মেধার ভিতর শ্রাস্তি বাড়ে অহর্নিশ।” (আমি স্বেচ্ছাচারী : ধর্মে আছে জিরাফেও আছে)

কখনো কখনো সময় সমাজ এভাবেই গুলিয়ে দ্যায় ভালো মন্দের বোধ। সোনার মাছি কিংবা সোনালি নীল চোখ ধাঁধানো জীবন যাপনকেও সন্দেহজনক মনে হয়, অন্তর্গত রক্তের ভিতর জাগে খুন করার বাসনা। অথবা, আত্মহত্যা করার ইচ্ছা। “খুব বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না”—এই হঠকারী ইচ্ছা, আমরা জানি, পরে, বদলে যাবে “যেতে পারি কিন্তু কেন যাব?”—এই প্রাপ্তমনস্ক পাল্টা প্রশ্নে, উত্তরগর্ভ প্রশ্নের পরিণতিতে!

শক্তি চট্টোপাধ্যায় অবশ্য বারবার বলেছেন; সামাজিক হিতসাধন, অথবা, সংস্কার কাজ, বা দেশ-দেশের প্রবল উদ্ধার কবিতার উদ্দেশ্য নয়। কার্যত সৌন্দর্যরচনা ছাড়া কবি কী-ই বা করতে পারেন। শক্তি এবং তাঁর ‘কৃতিবাসের’ সতীর্থদের যে সামাজিক শিকল ছেঁড়ার স্বভাব, বদ্ধ ঘেরাটোপ আর নানাখানা বাধ্যবাধকতার খাঁচা চূর্ণ করা স্বভাব, প্রেম এমন কি যৌনতার সমাজবিধানসম্মত

বিধিনিষেধ আর নানারকম বাধ্যবাধকতার খাঁচা চূর্ণ করা স্বভাব, প্রেম, এমন কি যৌনতার সমাজবিধানসম্মত বিধিনিষেধ আর নিয়মতান্ত্রিক মধ্যমেণা ও মাঝারি অনুভূতির মেকি নির্দেশনামা উপেক্ষা, ক্ষেত্রবিশেষে উপহাস করা স্বভাব—সেই স্বভাব কবিতাতে পরিপূর্ণভাবে ধরা পড়বে, এতে আর আশ্চর্য কী! কিন্তু আশ্চর্য লাগে, যখন তাঁদের কারও কারও ভাবমূর্তির সঙ্গে জড়িয়ে যায় তাঁদের ব্যক্তিগত বেঁচে থাকার নানান উৎকেন্দ্রিক দৃষ্টান্ত, মদ্যপান, এলোমেলো জীবনযাপনের উদাহরণগুলি, রচা হয় বাহারি বোহেমিয়ান এক প্রতিচ্ছবি, এমন কি, কখনো কখনো বই বিক্রির বাণিজ্যিক স্বার্থে। শক্তির উত্তরবঙ্গ কিংবা চাইবাসা বাসের বর্ণনায় বৃত্তান্ত, তাঁর কবিখ্যাতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দিবি তাঁকে প্রতিষ্ঠান বিরোধী, মুচমুচে স্বাদু জনপ্রীতি দিয়েছিল, উত্তরকালের স্বপ্নদর্শী তরুণ কবিশোপ্রার্থীর কাছে তাঁকে বানিয়েছিল আইকন। এভাবে কবিতায় এবং জীবনে মিথ্ হয়ে ওঠার মতো ঘটনা এই দশকে, অর্থাৎ পঞ্চাশেই প্রথম দেখা গেল। কবিতাযাপনের সূচনা-লগ্ন থেকেই সুতরাং শক্তি চট্টোপাধ্যায় ছিলেন নায়ক, শেষে তো কিংবদন্তি!

এমন এক প্রস্তুত পটভূমিতে ‘সে বড়ো সুখের সময় নয় সে বড়ো আনন্দের সময় নয়’ কবিতাটি জনপ্রিয় হতে বাধ্য। যথেষ্ট জীবনযাপনের স্বয়ংক্রিয় স্বেচ্ছাচার এখানে শব্দবন্দী, বা, বলা ভালো শব্দে শব্দে মুক্ত:

“পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কর্নিশে কর্নিশ
ফুটপাথ বদল হয় মধ্যরাতে
বাড়ি ফেরার সময়, বাড়ির ভিতর বাড়ি, পায়ের ভিতর পা, বুকের ভিতর বুক
আর কিছু নয়।”

সোজাসাপটা মাতলামি এক জিনিস, কিন্তু তাকে কবিতার ফলিত স্বাভাবিকতায় ধরা অন্য ব্যাপার। তার জন্য অসামান্য কবিক্ষমতা, শব্দে নিরঙ্কুশ অধিকার, শব্দ দিয়ে ছবি আঁকায় অসামান্য পারদর্শিতা প্রয়োজন—যা, এই কবিতা প্রমাণ করে, কবির ছিল। গোটা কবিতা যেন ডিলিরিয়াম, প্রায় প্রলাপোক্তি, ঘোর যেন—বাক্যগঠনের অভ্যস্ত যুক্তিকাঠামোর বিনাশ ঘটিয়ে, চিন্তাস্রোতের স্বতস্ফূর্ত গতির মতোই উচ্চারিত পংক্তিগুলিকে দুমড়ে মুচড়ে টিপসি অবস্থার পাক্কা মাতালের স্বগতোক্তির মতো একটানা ছেঁড়া ছেঁড়া শব্দস্রোত এই কবিতায় উঠে এসেছে। মাতালেরই দ্যাখা অ্যাবসার্ড পৃথিবী যেন, কিংবা, তার বিচিত্র হ্যালুসিনেশন:

“মনে করো, গাড়ি রেখে ইস্টিশান দৌড়ছে, নিভন্ত ডুমের পাশে তারার আলো
মনে করো, জুতো ইঁটছে, পা রয়েছে স্থির— আকাশ পাতাল এতোল বেতোল
মনে করো, শিশুর কাঁধে মড়ার পালকি ছুটেছে নিমতলা — পরপারে
বুড়োদের লম্বালম্বি বাসরঘরী নাচ —”

এইরকম নাটুকে নাইটমেয়ার—দুঃস্বপ্নই, আর কিছু নয়— তার মূল কতোটা কবির মগ্নচেতনায় আর কতোটা বা কবির অব্যবহিত সমাজসময়ের গভীরে, তাও বোধ হয় ভেবে দ্যাখার মতো। কিছু ব্যথিত বৈপরীত্য এবং শোচনীয় ভারসাম্যহীনতা এখানে সহজেই চোখে পড়ে, ‘শিশুর কাঁধে মড়ার পালকি’র পাশে বুড়োদের ‘বাসরঘরী নাচ’ সুস্থতা বা সুস্থিতির সঙ্গে কখনো মানানসই নয়, মানতেই হবে। কবি যতোই নিজেকে বলুন অ-সামাজিক, তবু তাঁর পরিপার্শ্ব কি তাঁকে ছেড়ে যায়? সমস্যাসঙ্কটের গোধূলি কি তাঁকে ছেড়ে যায়? তা তো সম্ভব নয়। যেতে পারে, কিন্তু কেন যাবে? ফলে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাতেও আছে প্রতিবাদ, তাঁর নিজস্ব ধরনে যদিও।

তাঁকে হয়তো দমবন্ধ দুঃস্বপ্নের হাত থেকে পালাতেই ধরতে হয় স্বপ্নের হাত। কবি প্রবেশ করেন হেমন্তের হলুদ অরণ্যে, মেপলপাতায় ছেয়ে থাকে যার পথ, যেন ফ্যান্টাসির জগৎ রচেন তিনি:

“হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান ঘুরতে দেখেছি অনেক
তাদের হলুদ ঝুলি ভরে গিয়েছিলো ঘাসে আবিল ভেড়ার পেটের মতন
কতকালের পুরানো নতুন চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছে
এই হেমন্তের অরণ্যের পোস্টম্যানগুলি....।”

এই কবির কবিতাবইগুলির কালক্রম সাক্ষী, বড়ো দ্রুত লিখতেন শক্তি। তাতে যেমন হওয়া উচিত, কিছু দারুণ কবিতার পাশাপাশি বেশ কিছু এমন কবিতাও জন্মে যায়, যা না হলে ক্ষতি হতো না। তবু মনে রাখা ভালো, একমাত্র আনখশির কবিতায় মজে থাকা কোনো মানুষের কাছেই কেবল সৃষ্ণের এই প্রাচুর্য পাওয়া সম্ভব। শক্তির কবিতা বিশ্লেষণ করলে এমন সত্যও খুঁজে পাওয়া সম্ভব, যেখানে গোটা কবিতার নিতান্ত মামুলিপনা হঠাৎই বদলে গেছে একটি দুটি বাক্যের অসামান্যতায়, সেই দু একটি বাক্যে যেন সঞ্চিত হয়েছে, সঞ্চিত হয়েছে কবিতার প্রকৃত কল্পনায়। এই রকম হিরণ্ময় উচ্চারণ, প্রায় প্রবাদে পরিণত পংক্তি অঙ্কুর রয়েছে এই কবির বিপুল ভাণ্ডারে।

আমাদের এই নিরীক্ষণ, শিরোনামেই মালুম হবে, কিছুটা স্বেচ্ছাবন্দী। প্রচুর লিখতে পারার প্রায় অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সমস্ত কবিতাপর্যায়ের আগাগোড়া বিশ্লেষণ যেকোনো পরিমিত আলোচনার পক্ষে সাধ্যাতীত বিবেচনা করেই আমরা এখানে একটা কল্পিত লক্ষণরেখা নির্ধারণ করে নিয়েছিলাম। কবির প্রথম চারটি কাব্যগ্রন্থ, ‘হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য’, ‘ধর্মে আছো জিরাফেও আছো’, ‘সোনার মাছি খুন করেছে’, এবং ‘হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান’—আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল। কিন্তু তাতে এই কবির স্বভাব বৈশিষ্ট্য বুঝে নিতে অসুবিধা হয় নি। কারণ শক্তি সেই সব কবিদের অন্যতম, যাদের প্রথম পর্যায়ের কবিতার চরিত্র ও ঔজ্জ্বল্য শেষ পর্যায়ের কিছু পরিমাণে রয়ে যায়। তাঁর কবিতার মোট পরিমাণ বেড়েছিল লাফ দিয়ে, কিন্তু মূল প্রবণতা ও বিশিষ্টতা বদলায় নি। প্রায় একই রকম থেকে গেছে তার সাধারণ স্বধর্ম। সেই একই রকম বিহুল বেহিসেবি শব্দব্যবহারের মাঝে মাঝেই অসামান্য চিত্রকল্পের অতর্কিত আবির্ভাব, পূর্বানুমানকে তছনছ করে দেওয়া ছন্দস্পন্দন এবং অন্ত্যমিল, আর শব্দের উপর প্রায় অতীন্দ্রিয় অধিকার, অথরিটি, এই কবিকে শব্দের যথার্থ শাসক, যথার্থ সম্রাটের মর্যাদা দিয়েছে।

তবু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় একই রকম কবিতার ধরন হয়তো শক্তির একমাত্র সীমাবদ্ধতা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে কবিতার খাত বদল, অথবা জাত বদল এই কবির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্পষ্টতায় ধরা যায় নি। পুরস্কৃত, প্রশংসিত এবং পরিণত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অন্তিম কবিতা স্তবকগুলিতে প্রথম যৌবনের সেই বালকের অভিমান খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। ‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাব’—এই দ্বন্দ্ব তবু তো জীবন থেমে থাকে না, মৃত্যু থেমে থাকে না। তবু সব শিরোপা ও সেলিব্রিটি ইমেজের ফাঁকে লুকিয়ে থাকে সেই বিস্মিত বালক, যেন জীবনের শেষ সারাংশে তার “বাল্যকাল খলসে মাছের মতো নড়ে।” ঠিক এইখানে এই কবি আর যেন সকলের চেয়ে আলাদা, অনন্য হয়ে যান।

জ্যোতির্ময়ীর গল্পে রাজপুতানার রাজপ্রাসাদ : অন্দরমহল : অন্তরমহল

ইন্দা রায়

ইচ্ছাপূরণের অলৌকিক জাদু নেই। শিকড়-ছেঁড়া সুখকল্পনার ডানা ছাঁটা। তবু এ যেন রূপকথাই। কালান্তরের ভিন্ন মর্জিতে গড়া নব্য রূপকথা। অতে রাজা আছেন। রাণীরা আছেন। আছে তাঁদের সাতমহলা প্রাসাদ। রাজপুরীর অন্দরে সুয়োরানী-দুয়োরানীর বিবাদ অলক্ষ্যে উদ্বেজনার আগুন ছড়ায়। কিন্তু পরিণামে সুয়োরানীর হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা আর নির্বাসিত দুয়োরানীর সুখের ঘরে পুনর্বাসনের সরল সমাধানে গল্পের নটেগাছ মুড়োয় না। বিলাসের হাজারো সম্ভার, পরিচর্যার অনুগত আয়োজনে মহলের পর মহল জুড়ে যেখানে নানা মানুষের ভিড়, পাপ আর প্রলোভনের, ঈর্ষা আর প্রতিদ্বন্দ্বের অবিরাম ঘূর্ণিতে যেখানে অনেক মুখ নিরালোকে হারিয়ে যায়, অথবা আতঁ হয় প্রতিবন্ধী অস্তিত্বের যন্ত্রণায়, সেখানে আরেক রকম গল্প খোঁজেন একালের গল্পকার। বিদ্রম জাগানো জৌলুসের অন্তরালে সেই হঠাৎ বিলীন অথবা বিক্ষত বিকলাঙ্গ জীবন জ্যোতির্ময়ী দেবীর অন্বেষণ।

বানানো রূপকথা নয়। তিনি বলেন “সত্যিকারের দেখা এক দেশের রাজারানীর কথা।” সময়ের দ্রুত পালাবদলে জ্যোতির্ময়ীর জীবৎকালেই তাঁরা ইতিহাসের অন্তর্গত হয়ে গেছেন। যদি বা কেউ থাকেন, “তাঁরা আর প্রবল প্রতাপাধিত সর্বশক্তিমান সেকালের বাদশা, সম্রাট, মহারাজা ভাবে নেই। এ যুগের রিসিভার বসানো মন্দিরের দেবতাদের মতো তাঁদের ভোগ, রাগ, বিলাস, ব্যসন, ঐশ্বর্য, কোষাগার, ক্ষমতা-প্রতাপের চাবিকাঠিটির ব্যবহার প্রজাপ্রধানদের হাতে এবং মতামতে।”^১ আসলে ক্রান্তিকালের দৃশ্যমান পটে জ্যোতির্ময়ী গণতন্ত্রের হাতে পরাভূত রাজতন্ত্রের অবলোপ দেখেছিলেন। কিন্তু তার আধিপত্যের পূর্বচেহারাটাও তাঁর অপরিচিত ছিল না। স্পর্ধিত প্রভুত্বে ছায়াবৃত সালোকসংশ্লেষহীন জীবনের যবনিকা তুলে পাঠককে তিনি কিছু বিরল অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করাতে চাইলেন। নীরন্ধ্র প্রাচীর আর সতর্ক রাজপ্রহরা এড়িয়ে সে-কাহিনী আমদুনিয়ায় পৌছয় না। ইতিহাসের মহার্ঘ দলিল তার সাক্ষ্যপ্রমাণ রাখে না। সেই গোপনগহনকে নিয়েই জ্যোতির্ময়ীর অর্বাচীন রূপকথার জটিল বয়ন। কঠিন রাজ-অবরোধের অন্তর্ভেদ করা তাঁর পক্ষে খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু তিনি তা সম্পন্ন করলেন ব্যতিক্রমী নৈপুণ্যে। কিছুটা দেখলেন। কিছুটা জানলেন। বুঝলেন অনেক বেশী। মরুমাটিতে জন্মানো বাঙালি ঘরের মেয়ের কলমে গল্প এলো। আরাবল্লীর ওপারের রাজবাড়ির গল্প। অন্ধকার সুড়ঙ্গ পেরনো হারেমের গল্প।

সুলতানী ও বাদশাহী কাহিনীর দৌলতে “হারেম” আমাদের খুব চেনা শব্দ। চলতি অর্থ নারীশালা। আত্মপরায়ণ ক্ষমতাবান একজন পুরুষের তৃপ্তিহীন বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তাঁর ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত, তাঁর মনোরঞ্জে সমর্পিত অসংখ্য নারীর রুদ্ধবাসের ঠিকানা হারেম। অধিবাসিনীদের নিজেদের কাছে ঠিকানা হারানো একটা জগৎ। হারেমের পরিচিত ছবির সঙ্গে প্রজনক আরবি শব্দ ‘হরম্’ (পবিত্র, নিষিদ্ধ)-এর অর্থ মেলানো কঠিন। বরং “Contrary to this image, ‘harem’ is a sacred word, denoting a place of worship, the sanctum sanctorum, where the committing of any sin is forbidden (haram); it was thus at least in concept a site for restraint rather than excesses in sexual among other, filial relationships.”^২

অথচ ঐরাচারী প্রভুত্বের বিকারে হারেমের মৌল অর্থ বিপর্যস্ত হল। ইন্দ্রিয়দমনের শুদ্ধক্ষেত্র ইন্দ্রিয়বিলাসের লীলানিকেতনে রূপান্তরিত হল। ব্যাখ্যাটা তৈরি হল ভোগবাদী পুরুষের একতরফা

দাবির অনুকূলে। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধানে হারেমে সংজ্ঞার্থে বলা হয়েছে—“ভদ্রাসনের যে অংশ পবিত্র ও পরপুরুষের নিকট নিষিদ্ধ।” সুতরাং নিহিত তাৎপর্যে এটাই দাঁড়ায়, স্বয়ং গৃহাধিপতি বহু নারীসংসর্গ করলেও শুদ্ধাশুঃপুরের মহিমায় টান পড়বে না। কিন্তু অস্তরীণ অঙ্গনাদের উপর পরপুরুষের দৃষ্টি পড়লেই হারেমে নাপাক হওয়ার আশঙ্কা। প্রভুশক্তি নির্ধারিত পবিত্রতার এটাই শর্ত।

হিন্দু রাজপরিবারে হারেমে কালচার প্রবেশ করেছিল মোগল জীবনচর্যার অনুবর্তনে। মোগল সম্রাটদের জেনানামহলের রূপসীদের সঠিক পরিসংখ্যান আজ দুর্লভ। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে একটা বিষয় স্পষ্ট, বাবর বা হুমায়ুনের পত্নী-উপপত্নীর সংখ্যা অপরিসীম ছিল না। আকবরের আমলে হারেমে আয়তন ও হারেমবাসিনীদের সংখ্যা অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পায়। বৈবাহিক সম্বন্ধের পিছনে বহুক্ষেত্রে রাজনৈতিক কূটকৌশল কাজ করেছিল। তবে অদম্য রূপমোহ ও নিখাদ ভালবাসার কাহিনীও বাদশাহদের অন্তরমহলে কম ছিল না। কোনো কোনো রক্ষিতা ক্ষমতা ও মর্যাদায় বেগমদেরও ছাড়িয়ে যেতেন। বহু হিন্দু ললনা মুসলিম হারেমে শোভা বাড়িয়েছিলেন। পরিবারের অন্যান্য নারীসদস্যসহ অজস্র সহচরী, পরিচারিকা, খোজা প্রহরী ও প্রহরিনী এবং বৈধ-অবৈধ সন্তান মিলিয়ে বহু মহলে বিস্তীর্ণ মোগল হারেমে হয়ে উঠেছিল একটি পৃথক আশুঃপুরিক সাম্রাজ্য। দীর্ঘকালীন মোগল শাসনের অবধারিত প্রভাবে হিন্দু রাজারাও তাঁদের পুরীতে হারেমপ্রথাকে আত্মসাৎ করেছিলেন।

হিন্দু-মুসলিম সহাবস্থানের ফল অবশ্য একতরফা হয়নি। প্রাক্-আকবরী ও আকবরী আমলের হারেমে প্রভেদ গুরুত্বপূর্ণভাবে ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—“Significantly, while earlier sources make innumerable references to the harem, and presumably there must have been some sort of organization around it, it is only with Akbar that we realize that it was reorganized into a fortresslike institution.”^{৩০} এই রকম সংরক্ষিত দুর্গের চেহারা পাওয়ার ফলে হারেমে পর্যায়ে পর্যায়ে পাহারা ও বিধিনিষেধের অস্ত ছিল না। আমীর-ওমরাহের পত্নীরা যাঁরা দর্শনার্থী হিসেবে সেখানে আসতেন, তাঁদের প্রবেশাধিকারও অনুমতিসাপেক্ষ ছিল। ইতিহাসের গবেষক অনুমান করেন, অম্বরপ্রদেশের রাজকন্যাকে বিবাহ করার পর রাজপুত কুলগৌরব, এমন কি জাতীয় মর্যাদার সঙ্গে নারীর দৈহিক সতীত্ব ওতপ্রোত জড়িয়ে থাকার বিষয়টি হয়তো আকবরের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করেছিল। সেই কারণেই হয়তো হারেমে বিধিগত রক্ষায় তিনি বেশিমাাত্রায় তৎপর হয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও কি পাপের ব্যভিচারের সংক্রমণ বাঁচানো সম্ভব ছিল?

বক্ষিম-উপন্যাসের পাঠকদের অভিজ্ঞতায় মোগল হারেমে আসলে মদনমন্দির। সম্রাট ঔরংজেবের রংমহলের রত্নভেদ করে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন—“ইহা কুবের ও কন্দর্পের রাজ্য,— চন্দ্র সূর্য তথায় প্রবেশ করে না; যম গোপনে ভিন্ন তথায় যান না; বায়ুরও গতিরোধ। এমন রত্নখচিত ধবলপ্রস্তরনির্মিত কক্ষরাজি কোথাও নাই—এমন উর্বশী-মেনকা-রন্তার গর্বখর্বকারিণী সুন্দরীর সারি আর কোথাও নাই; এত ভোগবিলাস জগতে আর কোথাও নাই। এত মহাপাপ আর কোথাও নাই।”^{৩১} পাপের মূল নিয়ন্তা হিসেবে বক্ষিম আঙুল তুলেছেন খোদ বাদশাহের দিকে—“এই কপটচারী সম্রাট জিতেন্দ্রিয়তার ভাণ করিতেন—কিন্তু অশুঃপুর অসংখ্য সুন্দরী রাজিতে মধুমক্ষিকাপূর্ণ মধুচক্রের ন্যায় দিবারাত্র আনন্দধ্বনিতে ধ্বনিত হইত।”^{৩২} ঔরংজেবের চারিত্রিক স্থলন সম্পর্কে বক্ষিমের অভিযোগ অবশ্য ইতিহাস-সমর্থিত নয়। তবে মোগল হারেমে অনাচারের চিত্র প্রদর্শনে ঔপন্যাসিকের মূল লক্ষ্য বাদশাহ নন, তাঁর অনৈতিক প্রশ্রয়ধন্য কন্যা (মতান্তরে

ভগ্নী) জেব-উমিসা। রংমহলের সর্বময়ী কদ্রী হিসেবে স্বেচ্ছাচারী শাহজাদী বিধিবহির্ভূতভাবে তাঁর অনুগৃহীত পুরুষকে নারীশালায় প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন। সেখানেও ক্ষমতাই কারকশক্তি। দর্পিত নারীর বাসনাবহিতে আত্মসমর্পিত পুরুষ অসহায়। ইতিহাসের সীমানা অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত বক্ষিম মোগল হারেমের অধিশ্বরীকে ভিখারিণীর দীনতায় নামিয়ে এনেছেন। আধিপত্যের রাশ হাতে থাকায় পাশার কৌশলী চালটা চলেছেন ঔরংজেবই, মবারক জেব-উমিসার বিবাহসম্পর্ক স্বীকার করেও মবারককে যুদ্ধক্ষেত্রে অনিবার্য মৃত্যুমুখে পাঠিয়ে। কিন্তু উদয়সাগরের তীরে ‘বসুধালিঙ্গন ধূসরস্তনী, জেব-উমিসার আর্ত বিলাপ বহু যোজনদূরবর্তী সম্রাটপ্রাসাদের সতর্কতার নিরোট প্রাচীরেও চিড় ধরিয়েছে। প্রবল বাদশাহী প্রতাপেও তা রোধ করা সম্ভব হয়নি।

মোগল-রাজপুত সংঘাতের পটভূমিতে দুটি ভিন্ন জীবনসংস্কৃতিকে স্থাপন করতে গিয়ে বক্ষিম মোগল হারেমের পঙ্কিল চিত্রে যতটা বিস্তার এনেছেন, রাজপুত অন্দরের অন্তরঙ্গ বিবরণ ততটাই সংক্ষিপ্ত। “রাজসিংহ” উপন্যাসের উপক্রমণিকায় তিনি পাঠকদের নিয়ে প্রবেশ করেছেন রাজস্থানের পার্বত্যপ্রদেশ রূপনগরের রাজা বিক্রমসিংহের অন্তঃপুরে—“ক্ষুদ্র রাজ্য; ক্ষুদ্র রাজধানী; ক্ষুদ্র পুরী। তন্মধ্যে একটি ঘর বড় সুশোভিত। গালিচার অনুকরণে শ্বেতকৃষ্ণ প্রস্তররঞ্জিতহর্ম্যতল; শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত নানা বর্ণের রত্নরাজিতে রঞ্জিত কঙ্কপ্রাচীর; তখন তাজমহল ও ময়ূরতন্তের অনুকরণই প্রসিদ্ধ, সেই অনুকরণে ঘরের দেওয়ালে সাদা পাথরের অসম্ভব পক্ষীসকল, অসম্ভব রকমে অসম্ভব লতার উপর বসিয়া, অসম্ভব জাতির ফুলের উপর পুচ্ছরাখিয়া, অসম্ভব জাতীয় ফল ভোজন করিতেছে।”^৬ মোগলাই স্থাপত্যের অবাস্তব অনুকরণকে বক্ষিম এখানে কটাক্ষ না করে পারেন নি। বহিরঙ্গ বর্ণনার পর তিনি রাজকন্যা চঞ্চলকুমারীর রূপসী সখীদের কিছু রঙ্গ রসিকতার অবতারণা করে পরক্ষণেই তসবিরওয়ালির সম্মুখে নবীন রূপনগরকন্যার ব্যক্তিত্বের বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছেন। এরপর কাহিনী যে নাটকীয় গতিবেগ পেয়েছে, তাতে ক্ষুদ্র রাজ্যের অন্তঃপুরের অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভের আর কোনো সুযোগ আসেনি।

উদয়পুরের রাণা রাজসিংহ রূপনগররাজ্যের মতো নগণ্য রাজ্যের অধিপতি নন। তাঁর শৌর্য প্রাচুর্য অনেক বেশী। কিন্তু তাঁর ইন্দ্রপুরীতুল্য প্রাসাদের অভ্যন্তরেও বক্ষিম বেশি সময় ব্যয় করেননি। রাজসিংহের মহিষী সংখ্যার উল্লেখ উপন্যাসে নেই। তবে তিনি একপত্নীব্রত নন। স্রোত বয়সেও চঞ্চলের লোকমনোমোহিনী রূপের প্রতি তাঁর মুগ্ধতা সাময়িক কালের জন্য হলেও তাঁকে দুর্বল করেছে। কিন্তু ঔরংজেবের বিপরীতে হিন্দু বীরধর্মের মডেল হিসেবে বক্ষিম যাকে দাঁড় করাতে চেয়েছেন, তাঁর স্বভাবের সংযমকেই তিনি গুরুমূল্য দিয়েছেন। অন্তঃপুরের নারীমহলের প্রসঙ্গ সেখানে অবাস্তব। লক্ষ করতে হবে, শুধু বক্ষিমচন্দ্র নন, তাঁর আগে-পরেও যারা ইতিহাসভিত্তিক কাহিনী রচনা করেছেন, সেই সব বাঙালি সাহিত্যিকদের কাউকেই রাজপুত হারেমের বৃত্তান্ত নিয়ে বিশেষ উৎসাহী হতে দেখা যায়নি। হয়তো উপকরণের অভাব ছিল। অথবা ছিল আদর্শায়িত জীবনের প্রতি অনিবার্য মোহ। আর এই জায়গাতেই জ্যোতির্ময়ী তাঁদের থেকে ভিন্ন। তাঁর স্বাতন্ত্র্যের কারণ খুঁজে দেখতে তাঁর সারস্বত আবির্ভাবের কালটাকে সামনে আনতে হবে।

সময়টা গত শতকের পাঁচ বা ছয়ের দশক। প্রথমে সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় জ্যোতির্ময়ীর কয়েকটি রাজস্থানী গল্প মুদ্রিত হল। তারপর “আরাবন্ধীর আড়ালে” (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) ও “আরাবন্ধীর কাহিনী” (১৩৭২ বঙ্গাব্দ) নাম দিয়ে প্রকাশিত হ’ল দুটি গল্প সংকলন। রাজপুত কাহিনী বলতে পাঠকের মন তখনও ‘দুর্গেশনন্দিনী’র রোমাঞ্চ ও “রাজসিংহে”র ইতিহাসে আকৃষ্ট। জ্যোতির্ময়ীর প্রথম সংকলিকাটি হাতে পেয়ে তারারশঙ্কর তাই রীতিমতো বিস্মিত হলেন—“যে ভূমিতে বাংলা সাহিত্যের আদিপুরুষ পদপাত করে গিয়েছেন সেই বিচিত্র ভূমিতে আর একজন পদক্ষেপ করে

কোন সাহসে?”^৭ যেহেতু সেই “আর একজন” আবার নারী, তাঁর পক্ষে পৌরুষ প্রতিভার অনুগমন স্পর্ধা বইকি! অবশ্য গল্পপাঠ এবং গল্পকারের পরিচয় জানার পর তারাশঙ্করের কাছে সমস্তটাই ‘আকস্মিকভাবে চাবি পাওয়া এক অপরিচিত লিপির পাঠোদ্ধারের মতোই সহজ’ মনে হয়েছিল। আমাদের কাছেও জ্যোতির্ময়ীর ব্যক্তি-পরিচিত জরুরি। রাজপুতানার গল্পের প্রতি তাঁর বিশেষ পক্ষপাতের কারণ ওরই মধ্যে নিহিত।

নিজের কালের আর পাঁচজন হিন্দু বাঙালি নারীর তুলনায় জ্যোতির্ময়ীর জীবন সর্বার্থেই বিশিষ্ট। স্বতন্ত্র পারিবারিক পরিচিতি তাঁর অভিজ্ঞতার সহকারী। জীবনের কঠিন বিপর্যয়ের মধ্যে সেই অভিজ্ঞতাকে সন্মাবহার করার মুসীমানা তাঁর শিল্পীস্বভাবের অর্জন। জয়পুরের সামন্ত রাজার সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদাধিকারী সংসারচন্দ্র সেনের পৌত্রী ছিলেন তিনি এবং ঐ রাজ্যের দেওয়ান অবিনাশচন্দ্র সেনের কন্যা। পিতৃপিতামহের কর্মসূত্রে তাঁর বাল্য, কৈশোর ও পরিণত যৌবনের বেশ খানিকটা সময় কেটেছিল রাজস্থানে। জ্যোতির্ময়ীর হিসেবমতো ১৩০০-১৩১৫ এবং ১৩২৫-১৩৩৭ বঙ্গাব্দ—এই দুই সময়পর্বের বেশিরভাগটাই তিনি জয়পুরে প্রবাসী। মাঝখানে বিয়ে হয়ে বাংলাদেশে আসা এবং দশ বছর পর বৈধব্যের দুর্ভোগ নিয়ে প্রবাসে প্রত্যাবর্তন। রাজস্থানের মাটি আর মানুষের সঙ্গে গভীর একাত্মতার সুযোগ তিনি পাননি। কিন্তু সামান্য কয়েকটা দিন রাজবাড়িতে প্রবেশের মওকা পেয়ে ভিতরমহলের জীবন সম্পর্কে ধারণা অনেকটাই স্পষ্ট করে নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য প্রাসাদে বহিরাগতদের গতিবিধি অবাধ ছিল না। জ্যোতির্ময়ীর কথায় “মোগল হারেমের মতোই সেই অস্তঃপুরের ব্যবস্থা ছিল। বাইরে গ্রহরী, ভিতরে প্রতিহারিণী দ্বারা রক্ষিত খোজা-শাসিত সে অস্তঃপুর।”^৮ কিন্তু সেন পরিবার ছাড়াও হিসেবে পেয়েছিল রাজার দেওয়া পাঞ্জা। এই পাঞ্জা-প্রথা বাদশাহী হারেমের বিধানের নিটোল অনুকরণ।

জ্যোতির্ময়ীর অভিজ্ঞতা রাজতন্ত্রের অবসান-পূর্বকালের। নানা ধরনের রচনায় তা ছড়িয়ে আছে। একদিকে আছে তাঁর তথ্যগত স্মরণ-সঞ্চয় “রাজস্থান। সর্বভারতীয় চিত্র” এবং তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা “স্মৃতি বিস্মৃতির তরঙ্গ”। অন্যদিকে আছে তাঁর সৃষ্টিমূলক গল্পসম্ভার। রাজা-রাণীর যুগের প্রামাণিক বিবরণ দানে এক সময় জ্যোতির্ময়ী দ্বিধাস্থিত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য স্বীকারোক্তি—“রাজপ্রাসাদ অস্তঃপুরের চিত্রকটি মাত্র ৪/৫ দিনের দেখা। বাকিটা শোনা কথা। সে সময়ে এইসব কথা লেখার সম্ভাবনা বা সাহস ছিল না। কেননা বাড়ির প্রায় সকলেই ছোটবড় রাজকর্মচারী। তাঁরা এই অস্তঃপুর এলাকার প্রসঙ্গে বিপন্ন হতে পারতেন।”^৯ রসকাহিনীর গায়ে যেহেতু কল্পনার রং লাগে, সুতরাং তাতে তুলনামূলকভাবে সংকট কম হওয়ার কথা। কিন্তু জ্যোতির্ময়ীর দেওয়া প্রথমোক্ত দুটি গ্রন্থের তথ্যচিত্রের সঙ্গে গল্পগুলিকে মিলিয়ে দেখলে বাকুদের রসদটা টের পাওয়া যায়। হয়তো সেই কারণেই তাঁর অভিজ্ঞতা অর্জন এবং গল্প রূপায়ণের মাঝখানেও অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। ততদিনে তাঁর বয়স ও মন পরিণত হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনের নানা দুর্যোগের মধ্য দিয়ে পরিবার ও সমাজে নারীর আসল অবস্থানটা তিনি চিনতে শিখেছেন। সাবকথাটা বুঝতে শিখেছেন, সাধারণ ঘর অথবা রাজমহল যেখানেই থাকুন, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা-অবিচারের বোঝা নারীকেই বইতে হয়। বরং অনভিজাত সামাজিক বৃত্তে নারীর স্বচ্ছন্দ পদচারণার কিছুটা অবকাশ থাকে। হারেমের নারীদের জন্য আলো-বাতাসের পথটাই বন্ধ।

কিশোরী মনে দাগ কেটে যাওয়া রাজবাড়ির শুদ্ধাশ্তঃপুরের স্মৃতি জ্যোতির্ময়ী কোনোদিন ভোলেননি। তাঁর আত্মকথা প্রমাণ দেয়, বিস্মৃতির তরঙ্গে কিছুই খোয়া যায়নি। তাঁর গল্পের শরীরেও একই প্রমিতি। সত্যিই তাঁর মোহভঞ্নের অভিজ্ঞতায় বিপদের বীজ ছিল। যে-রাজাদের অধীনে বাড়ির পুরুষদের জীবিকা, হারেমের রহস্যময় আড়ালটুকু সরিয়ে দিলে তাঁদের রুগ্ন হওয়ারই কথা।

নিজ্জের অত্যাচারী মুখের ছবি কে আর আয়নায় দেখতে চান? কে আর চান অনুগত নারীদের অবদমিত আকাঙ্ক্ষায় অগুণপাতের সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলতে? জ্যোতির্ময়ী সেদিন পারিবারিক স্বার্থে বিবেচনাবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। উত্তরকালে তাঁর দেখা ও শোনা জগতের রমণীরা তাঁর গল্পের বিষাদবৃক্ষ হয়ে উঠলেন।

জ্যোতির্ময়ীর প্রথমদিনের অন্দর দর্শনের কথা বলি। বিশেষ উৎসব উপলক্ষে রাজবাড়ি থেকে পাঠানো ঘেরাটোপ রথে তাঁদের গৃহিণী, বধু ও কন্যারা অবগুষ্ঠনবতী হয়ে পৌঁছেছিলেন অন্ধকার সুড়ঙ্গের মুখে। পিলসুজের উপর ছালা প্রদীপের আলোয় পথ দেখিয়েছিল খোজা গ্রহরী ও দাসীরা। পথ এসে শেষ হল বিশাল প্রাঙ্গণে—চারিদিকে আলো আর রঙের উল্লাসে ভরা এক নারীময় জগতে। প্রথমে রাজারানীকে কুর্নিশ করে রাজাকে নজরানা দেওয়ার আনুষ্ঠানিক পর্ব। তারপর পুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেখা মিলল অজস্র সুরূপা সুবেশিনী নারীর। সেই বয়সেই জ্যোতির্ময়ী তাঁদের মুখের রেখাগুলো পড়তে পেরেছিলেন। বিশাল ভবন জুড়ে মার্বেলের দেওয়ালে মোগলাই কারুকাঙ্ক। পালাকে হাতির দাঁতের নকশা। রানীদের আলাদা মহল, আলাদা জায়গীর, বিপুল ঐশ্বর্য, অপরিমিত দাসদাসী, কামদার, সখী ও নর্তকীর দল। সবই ছিল সেখানে। আহা—বিহারের আয়োজনও নিশ্চয়ই সৌখীন ছিল। কিন্তু “ছিল না স্বামী-পুত্র-কন্যা-স্বজন-আত্মীয় নিয়ে একটি জীবনযাত্রা জীবনধারা। ছিল না শিশুজন্মের আনন্দ, স্বজন-বিয়োগের দুঃখ, দাম্পত্য-প্রেমের বেদনা-বিরহ, সুখ-মিলন। ...একেবারে ফাঁকা জগৎ একটা।”^{১১} মানবিক সম্পর্কের উষ্ণতাবর্জিত সেই বিচ্ছিন্ন জগতের বাসিন্দা স্বয়ং মহারানীর কাছে সেদিন পুত্রকন্যা-পৌত্রপৌত্রী পরিবেষ্টিত সপত্নীহীন বঙ্গনারী—জ্যোতির্ময়ীর পিতামহী—ছিলেন রীতিমতো ঈর্ষার পাত্রী। জ্যোতির্ময়ীর সন্তানকে লুপ্ত আবেগে কোলে নিয়ে ফিরেছিলেন সত্যপ্রাণ অন্তঃপুরিকারা।

সমাজের যে-শাসনাত্মিক পরিকাঠামোয় নারী শুধু পণ্যবস্তুর মতো পুরুষের দ্বারা ব্যবহৃত হতে হতে নিজ্জের ব্যক্তিসত্তাকে ভুলে যায়, সেখানে নিগ্রহ, বঞ্চনা বা রিক্ত অনুভবের কথা বলার সুযোগ ও সাহস দুইই তারা হারিয়ে ফেলে। রাজমহলের অঙ্গনাদের এই অসহায়তা জ্যোতির্ময়ীর বুকে সবচেয়ে বেশি বেজেছিল। তিনি লিখছেন—“কত যে গ্রাম্যতা নিষ্ঠুরতা অহেতুক ইতরতা আছে সেকথা কেউ কাউকে বলে না। বলতে পারেনা। ভাষাহীন ষৈর্ষের সহিবৃত্তাময় উৎপীড়নময় তাদের জীবন।”^{১২} এটাই হারেমের আসল ছবি। ইতিহাসকীর্তিত রাজপুত্রদের জীবনমহিমার অবক্ষয়ী পর্বে অন্তত এই ছবিটাই জ্যোতির্ময়ীর চিত্তপটে মুদ্রিত হয়েছিল। মানুষের বেঁচে থাকার কিছু মৌলিক অধিকার সম্পর্কে তাঁকে ভাবিয়েছিল। অতীত মহিমায় আত্মসম্বৃষ্টির আরাম না খুঁজে তিনি প্রত্যক্ষের জ্বলন্ত সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে চাইলেন। নিজের সঞ্চিত স্মৃতিকে বঞ্চনা না করে তিনি আলোকোজ্জ্বল রাজপুরীর গহরে জমে থাকা অদ্ভুত আঁধারের কথাই বললেন।

বাংলাসাহিত্যের পশ্চাৎপট সম্পর্কে জ্যোতির্ময়ীর ধারণা খুব স্বচ্ছ ছিল। তাঁর সমীক্ষা বলছে, “ঐতিহ্যহীন বাঙালির জীবনে কোনো এক দেশপ্রেমের আদর্শের প্রেরণায় ও আকাঙ্ক্ষায় তাঁদের সকল রচনাতেই বিভিন্ন প্রদেশের চরিত্র এসে ভীড় করেছে। তাহি এসে দাঁড়িয়েছেন পৃথ্বীরাজ, রাণা প্রতাপ, রাজসিংহ দেশপ্রেমের প্রতীকরূপে এবং রাজস্থানের নারীরা : সংযুক্তা, পদ্মিনী, কর্পাবতী, কৃষ্ণকুমারীরা সতীধর্ম তেজস্বিতা বীরত্ব আত্মত্যাগের পরম আদর্শরাপিনী হয়ে।”^{১৩} জ্যোতির্ময়ী উল্লিখিত “বিভিন্ন প্রদেশ” কথাটা বস্তুত গৌরবে বস্বচন। মহারাষ্ট্রের কথা বাদ দিলে মুখ্যত রাজপুত্র মহিমার পরকীয়া গৌরবেই বাঙালির আত্মপ্রসাদ। স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনা জাগাতে কাব্য-নাটক-কথাসাহিত্যে বারবার বীরগাথার নিয়োজন। ব্যক্তিগত সুখদুঃখ অথবা বর্ণরাগময়

জীবনসম্ভোগের বাসনা সেখানে বর্জনীয় মনে হয়েছে। নারীর অকলঙ্ক চরিত্রদ্যুতি রক্ষার জন্য তাকে দেওয়া হয়েছে মৃত্যুস্বয়ংবরার অধিকার।

বীর সম্প্রদায়ের এই দেশপ্রেম, সতীকাহিনী আর আত্মোৎসর্জনের প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্য থেকে অবলীলায় বেরিয়ে এলেন জ্যোতির্ময়ী। নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে তিনি গড়ে নিলেন তাঁর কথনবিশ্ব। পূর্বগামীদের মতো প্রত্নকাহিনী হাতড়ে তিনি হিন্দুর জাতীয় আদর্শ সন্ধান করলেন না। টুডের রাজস্থান বা সমজাতীয় গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় থাকলেও সেখান থেকে তিনি ইতিহাসের সাজানো পাঠ নিলেন না। নিজের শ্রুতি ও দর্শনলব্ধ উপকরণকে গল্পের ভিত্তিতে রেখে কল্পনাকে শুধু ফাঁক ভরাট করার আর আলগাকে জমাট করার কারিগরিতে ব্যবহার করে তাঁর ব্যতিক্রমী নির্মাণ। রাজস্থানী কাহিনী নিয়ে জ্যোতির্ময়ী একটিও উপন্যাস লেখেন নি। গল্পের সংখ্যাও অল্প। কিন্তু প্রতিটি গল্পই শানিত বিদ্যুৎ-ঝলক। মরীচিকার মতো প্রলোভনকর রাজ-অবরোধের বিলাসী জীবনের মোহ ভাঙার পক্ষে প্রতিটি তড়িতাঘাত যথেষ্ট।

“আরাবল্লীর আড়ালে” গল্পে পাহাড়তলির অখ্যাত গ্রামের গরীব ঘরের মেয়ে ধাপির কথাই ধরা যাক। দুই দিদির পর তৃতীয় কন্যাসন্তান। কিছুটা অনাদর তো তার ছিলই। কিন্তু পৈতৃক সংকর রক্তধারার গুণে সে পেয়েছিল রূপের আলো। সেই আলোই তাকে টেনে নিল তিমিরবিলাসে। শহুরে রাজবাড়ি থেকে সুন্দরী কুমারী মেয়ে শিকার করতে আসা পাগড়িশারী সেপাই আর বর্ষীয়সী মহিলাদের নজরে পড়ল সে। তাদের কাছে শুনল সব পেয়েছির দেশের মতো মনোহর হারেমের কথা। তার অমল মনে স্বপ্ন জাগল। তার গরীব বাবা মেয়েকে মূলধন হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ ছাড়ল না। রাজপ্রাসাদে ধাপির জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হল। নাম হল গোদাবরী বাই। পদবী “পাত্রী”।

জ্যোতির্ময়ী তাঁর “রাজস্থানী-চিত্রে” নারীশালার অধিবাসিনীদের অনুপুঙ্খ শ্রেণীপরিচয় দিয়েছেন। জানিয়েছেন, একেকজন রাণীর শতাধিক সখী ও পাত্রী থাকত। পাত্রীরা ছিল কচি মেয়ের দল। অনেকে রাণীদের স্নেহভাজন। “নারীশালার ঈর্ষা প্রতিদ্বন্দ্বিতা কুটচক্রের কথা কিছুই না জানায় কচি কোমল মুখের সহজ মধুর হাসিটা হারায়নি।”^{১৪} ধাপির মুখের হাসিও হারাত না, যদি না ক্রমবিকশিত লাভণ্য তার রাণী ও পাশোয়ানদের তিস্ত ঈর্ষার কারণ হ’ত। পাশোয়ান হল সখীর পদ থেকে উন্নীত রাজার নেকনজরে পড়া প্রেমসীর দল। নিজেদের অর্জিত আসন হারানোর আশঙ্কায় তাদের নিরন্তর সতর্কতার শেষ ছিল না। অশুভ প্রতিযোগিতার এই পরিমণ্ডলে রাজার দৃষ্টি থেকে ধাপিকে অকৃত্রিম স্নেহে আগলে রাখতে চেয়েছিলেন সর্দার খোজা খুশনজরজী। কিন্তু তাঁর সব চেষ্টা ব্যর্থ হল।

ঘটনাটা ঘটল ধাপির রাজবাড়িতে প্রবেশের দশ বছর পরে। জ্যোতির্ময়ী জানতেন, যে শোষিত হয়, পরিস্থিতির দৌলতে স্বাধিকারের বৃক্ষে সেও একদিন শোষক হয়ে উঠতে পারে। ধাপির জীবনকে ঈর্ষায় দক্ষ করল “প্রেমরায়” খেতাবধারী যে-পাশোয়ান, একদিন সে ছিল তাদেরই গ্রামের মেয়ে সরবতীবাই। ক্ষমতার দর্পে সে পূর্ব-পরিচয় ভুলে গেল। নিজের খাসমহলে জলসায় আমদ্রিত মহারাজের মদিরামুগ্ধ দৃষ্টিপথে ধাপি আচমকা এসে পড়ল মাত্র প্রেমরায়ের নজর তীক্ষ্ণ হল। তার আদেশ অমান্য করে কৌতুহলবশে আসরে উঁকি মারার অপরাধে ধাপির স্থান হল প্রাসাদের নীচে অন্ধকার বন্দীশালায়—“নিরপরাধ নিরীহ অপরাধিনীদের নির্বিচার কারাগৃহে।” জীবন যাপনের স্বাভাবিক দাবি থেকে বঞ্চিত হয়ে একেশ্বর রাজার প্রীতিদাক্ষিণ্যটুকু আর খোয়াতে রাজি ছিল না প্রেমরায়ের মতো খেতাবধারিণীরা। তাদের আক্রোশের রূপটাও তাই ভয়াবহ। তারই শিকার হ’ল ধাপি। অপরাধের গুরুত্ব বুঝে ওঠার আগেই প্রধান সখী বড়ারাজীর হাত ধরে তাকে পৌছে

যেতে হল কারার নিঃসঙ্গ নির্বাসনে—একালের ভাষায় ‘সলিটারি সেল’-এ। অন্য সখীরা তাকে সমবেদনা জানানোর সাহস পর্যন্ত পেল না।

ধাপির জীবনের পরবর্তী অধ্যায় খুব সংক্ষিপ্ত। বন্দীশালার নীরঙ্কতমসায় ভয়াব্ধ প্রহর কেটেছে তার। আহায়ে রুচি নেই। সামনে শুধু দুঃস্বপ্নের ছায়া। নিবাত কক্ষে মৃত নারীদের প্রেতাত্মার দীর্ঘশ্বাস। প্রাসাদের লোভে ধাপি একদিন গ্রাম ছেড়েছিল। আজ সে নিজের ফেলে আসা আশ্রয়ে ফিরে যেতে ব্যাকুল। সরল ধাপি জানত না, তাদের মতো মেয়েদের হারেমে প্রবেশের পথটাই খোলা থাকে, প্রত্যাবর্তনের পথ চিরকালের জন্য বন্ধ। আতঙ্কে আধমরা ধাপিকে দেখে স্নেহবিহুল সর্দারখোজা অনেক চেষ্টায় তাকে নিজের গৃহে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি আদায় করেন প্রেমরায়ের কাছে। কিন্তু রাত পোহালে যখন তিনি কারাগৃহে এসে দাঁড়ালেন, তখন সেখানে প্রদীপের সামান্য আলোটুকুও নিভে গেছে। অনেক ডাকেও ধাপির ঘুম ভাঙল না। তার হারেমের স্বপ্ন হারিয়ে গেল অন্তবিহীন তমসায়। নারীশালায় “পাত্রীদের সখীদের সংখ্যা গোনাগাথা করে না কেউ প্রতিদিন। এই গোপন মৃত্যুর আগমনে তো কোন বাধাই কোথাও নেই!... স্বজনবন্ধুহীন অসহায় নারীদের ভাবনা ভাববার জন্য তো কেউ ছিল না।”^{১৫} ছিলেন না আমাদের কথাসাহিত্যিকেরাও। জ্যোতির্ময়ী কিন্তু ভিন্ন পথ নিলেন। অস্তঃপুরের অস্ত্রবাসীদের ট্রাজিডিই তাঁর গল্পের ভর।

ক্ষমতাহীনের নিগ্রহ দেখাতে গিয়ে ঐতিহাসিক কাহিনীতে এ যাবৎ উপেক্ষিত স্ত্রীব অস্তিত্বের মানুষদের কথাও লেখিকা ভোলেন নি। ধাপির গল্পের সূত্র ধরে এসেছে “খুশনজরজী” নামের আরও একটি আখ্যান, সর্দার খোজার আত্মোপলব্ধির অসামান্য বয়ানে। গল্পের উপলক্ষ স্বয়ং রাজার জন্মতিথি উৎসব। এ উৎসবে রাজমাতা থেকে পাশোয়ান—সকলের মহলে মজলিশ জমে। নানাজনে খেতাব জায়গীর পান। সব কিছুর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব খুশনজরজীর। রাজ-অস্তঃপুরের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত মানুষটি নিজের কর্তব্যনিষ্ঠার স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন সম্মানসূচক ‘খুশনজর’ উপাধি আর তিন হাজারি জায়গীর। প্রাসাদের অনেক গোপন খবর তাঁর নখদর্পণে। জলসার আসরে পুরবাসিনী নারীদের কাছে বাইরের জগতের নানা কৌতূহলজনক সংবাদ সরবরাহের দায়ও তাঁর। নিজের পোষ্যপুত্র খোদাবক্সকে নিয়ে অনুষ্ঠানের তদারকিতে বেরিয়ে পাশোয়ানজী প্রেমরায়ের মহলের ধারে সুড়ঙ্গপথে চকিতে তাঁর নজরে আসে গোলাপী ওড়না ঢাকা অনিন্দ্য সুন্দর একটি মুখ। সে মুখ তাঁর পরম স্নেহসম্পদ “পাত্রী” ধাপির। দৃষ্টিবিশ্রম বইকি। আসলে ধাপির মর্মান্তিক মৃত্যুর স্মৃতিটা তিনি আজও ভুলতে পারেননি। স্মৃটনোন্মুখ জীবনের অকাল বিনাশের বেদনা তাঁর বুকে বাজতেই থাকে।

উৎসবের পালা শেষে খুশনজরজী একদিন ছেলের কাছে বলতে বসলেন তাঁর অতীত বৃত্তান্ত। তাঁর পোষ্যপুত্র গ্রহণের ইতিহাস। স্বাভাবিক জীবনচর্যায় বঞ্চিত মানুষটি সাংসারিক সুখশান্তি আর স্নেহমমতার লোভে বহুকাল আগে ঘরে এনেছিলেন সপুত্রক নূরনেহারকে। মনের কোণে দানা বেঁধেছিল আরও একটি আকাঙ্ক্ষা, তাঁর ওয়ারিশহীন সম্পদ যেন রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হয়ে না যায়। খোদাবক্সের কাছে তিনি অকপটে স্বীকার করেন—“যেমন অপত্যহীন লোকের ধনের ‘যখ’ দেওয়ার লোভ হয় শোনা যায়, তেমনি আমাদের ঐ পুরুষানুক্রমিক পদের মোহ ধনের লোভ আমারও কেমন মনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। তোমাকে দেখে মনে হ’ল, তোমাকে আমার পদের উত্তরাধিকারী করতে পারব।”^{১৬} নূরনেহারের মৃত্যুর পর তার সন্তানের উপর অধিকার জন্মানোয় খুশনজরজীর আর কোন বাধাই রইল না।

এ পর্যন্ত বিগত জীবনের কথা। আজকের যুবক খোদাবক্সকে নিয়ে আরও গভীর সুখ, আরও দূরপ্রসারী পরিকল্পনাকে আঁকড়ে ধরতে চান খুশনজরজী। নূরনেহারের ভাইঝি গুলসুর তার দুটি

পুত্রসহ খুশনজরজীর কাছে আশ্রয় চাইলে তিনি তাঁদের স্বাগত জানান। অল্পদিনের মধ্যেই কব্রীহীন নারীস্পর্শহীন গৃহে সেবায়ত্নের একটা নতুন স্বাদ পান তিনি। ফলে গুলসুরৎকে খোদাবজ্ঞের বধু হিসেবে এবং তার সন্তানদুটিকে খোদাবজ্ঞের দত্তকপুত্র হিসেবে পাওয়ার ইচ্ছেটা অদম্য হয়ে ওঠে। এতে দুদিক থেকে সুবিধা হবে—সুস্থ একটি পারিবারিক পরিবেশ মিলবে এবং খোদাবজ্ঞের প্রাপ্ত সম্পত্তি নিয়েও উত্তরাধিকারের সংকট থাকবে না। খুশনজরজীর প্রস্তাব মেনে নিতে খোদাবজ্ঞ বা গুলসুরৎ কেউই অসম্মত ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্ত প্রত্যাশা ও দাবি খুশনজরজী নিজেই ফিরিয়ে নিলেন। গুলসুরৎ তার দুটি পুত্রের মধ্যে অন্তত একটিকে দিতে সহজেই প্রস্তুত ছিল। কিন্তু বিবেকের দায় এড়াতে না পেরে প্রশ্ন তুললেন খুশনজরজী—“বেটি, ছেলে তোমার দুটি জানি। কিন্তু ওদের ‘জিন্দেগী’ তো একটি করেই। ...ওই চমৎকার সুন্দর শিশু বড় হয়ে যখন সকলের মতো জীবনের সুখ আশা কল্পনা আনন্দ খুঁজবে, তুমি দিতে পারবে কি? আমি কি পেরেছি দিতে?”^{১৭} হারেমের তত্ত্বাবধানে থেকে খুশনজরজী সারা জীবন ধরে চারপাশে ভোগবিলাসের অজস্র আয়োজন দেখেছিলেন। সঙ্গে শুনেছিলেন সরল সুস্থ জীবন না পাওয়ার হাহাকার। খাপির অশরীরী আত্মা যেন তাঁকে আর একবার বুঝিয়ে দিয়ে গেল খোলা বাতাসের স্বচ্ছন্দ্য থেকে ঐশ্বর্যের কারাগারে প্রবেশের যন্ত্রণার কথা। তাই জন্ম-অভিশপ্ত মানুষের না পাওয়ার অভাব পূরণের জন্য সুস্থ মানুষকে তিনি আর পঙ্গু বানাতে চাইলেন না। জৈব প্রতিবন্ধনের অসহায়তার মধ্যে এই বিবেকী জীবনবোধ সঞ্চার করে জ্যোতির্ময়ী খুশনজরজীর চরিত্রে নতুন মাত্রা এনেছেন। সামাজিক অবজ্ঞায় প্রান্তিকায়িত শ্রেণীবিশেষ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনও দাবি করেছেন।

ভোগই যাঁদের পরমপুরুষার্থ, সেই রাজা-মহারাজাদের ঔরসজাত অবৈধ সন্তানেরা পারিপার্শ্বিক নানা পরিহাসের শিকার। অদম্য কামনার তাড়নায় অবিবেচক অপরিণামদর্শী ক্ষমতাবান প্রভুরা হারেমের নিশ্চিন্ত অবরোধে অজস্র বন্দিনী বা বাঁদীসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। এরা সকলেই যে বাজার উপেক্ষাভাজন হয়েছেন এমন নয়। কিন্তু বংশগত কোনো সম্মানজনক স্বীকৃতি তাদের কপালে জোটেনি। “লালজী সাহেব” গল্পের ক্ষেত্রবাসী পরিচিতিহীন বাঁদী থেকে ক্রমে “সুমেরু রায়” খেতাবধারী রাজপ্রেষসী রূপে মহারাণীর পরবর্তী পদমর্যাদায় উঠে এসেছিলেন। তবু বৈধ সম্পর্কের অভাবে তাঁর পুত্রেরা চলতি প্রথা অনুসারে “লালজী সাহেব” এবং কন্যারা “বাসীজীলাল” হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। প্রেষসীপুত্রের প্রতি রাজার আন্তরিক স্নেহ ছিল। বালক সুজনসিংহের মৃত্যুতে প্রকাশ্যে বেসরকারী শোকের দরবারও বসেছিল। বৃদ্ধ রাজাকে সান্ত্বনা দিতে সৌজন্য-সাক্ষাৎকারে এসেছিলেন খেতাব রাজদূত তথা রেসিডেন্ট সাহেব। আর তখনই ঘটল অবমাননার ঘটনাটি। রাজা সাগ্রহে মৃতপুত্রের ছোটভাই সমর সিংহকে রেসিডেন্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মন্ত্রীর ইঙ্গিতে সমর সিংহ সাহেবকে যথোচিত সেলামও জানাল। কিন্তু সাহেব পাশ্টা হাত বাড়ালেন না। বরং তার অস্তিত্বটাই যেন অস্বীকার করলেন। বাঁদীপুত্রের পদগত অবস্থান তাঁর জানা ছিল।

মাঝখানে অনেকগুলো বছরের ব্যবধান। লালজীসাহেব সমরসিংহ মধ্য বয়সে পৌঁচেছেন। অনেক তাঁর জায়গীর এবং অনেক সন্তান। সকলে মিলে ফেলেছেও খেলেও সম্পত্তি শেষ হবে না। কিন্তু রাজকীয় বিধান অনুসারে পুরুষানুক্রমিক বৈভবে শুধু জ্যেষ্ঠের অধিকার। কনিষ্ঠ পুত্র সমুদ্রসিং অনধিকারীর ধন নিয়ে মাথা ঘামায় নি। বরং বংশধারার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে সে শিক্ষার্জনে ব্রতী হয়েছিল। ম্যাট্রিক পাশ করার পর তার ইচ্ছা ছিল ঠাকুর সাহেবদের ছেলেদের মতো আজমীর কলেজে পড়ার। কিন্তু পিতা সমর সিংহ-এর স্মৃতি থেকে রেসিডেন্ট সাহেবের অপমানের স্মৃতি

মুখে যায়নি। ছেলের কাছে যন্ত্রণার জায়গাটা গোপন করে তাকে তিনি স্থানীয় কলেজে ভর্তি করে দিলেন। বুদ্ধিমান সমুদ্র সিং আসল রহস্য বুঝে নীরব রইল। কিন্তু পিতা যেদিন তার বিবাহের ব্যাপারে প্রস্তাব দিলেন, সেদিন আর তার জেহাদী স্বর গোপন থাকল না। নিজের চেনা পরিবেশে জন্ম-পরিচয়ের গ্লানি নিয়ে সে আর হীনস্বন্যতায় ভুগতে রাজি নয়। এখানে তার উন্নতির সব পথ বন্ধ। তাই সে ব্রিটিশ ভারতের যুদ্ধের কাজ নিয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বন্ধপরিবর্তন। ছেলেকে ঘরে বাঁধবার জন্য পিতা তাকে বিবাহের যৌতুকের লোভ দেখালেন। সমুদ্র সিং তার ভাগ্যের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল—“বাঁদী সন্তানের, দারোগাদের (রাজপুতদের দাসীপুত্র) দুঃখ-লাঞ্ছনা তো আপনি স্বচক্ষে দেখলেন, আর তাদের বংশবিস্তার করে কি হবে? আমি যৌতুক লক্ষ টাকা পেলেও আর কোন রাজ্যের বাঈজিলালকে বিয়ে করলে আমার ছেলে-মেয়ে বাঁদীর সন্তানই থেকে যাবে।”^{১৮}

এতকাল ধরে বাঁদীপুত্রেরা অকৃত অপরাধের জন্য পাওয়া অবমাননা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে অভ্যস্ত ছিল। সমুদ্র সিং-এর শিক্ষিত মন গন্ডি বাঁধা জীবনের অভিশাপ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। সময় বদলের এই নতুন হাওয়াটাকে গল্পের আধারে ধরেতে চাইলেন জ্যোতির্ময়ী। রাজতন্ত্রের প্রতাপের আড়ালে তিনি একের পর এক আবিষ্কার করে চললেন তার চোরা কুঁঠরিগুলো। দেখালেন, হারেমের পাপ হারেমের বাইরের জীবনকেও সামাজিক দিক থেকে কতটা বিপন্ন করেছে।

মোগল রাজপরিবারে রাজমাতার একটি বিশেষ গৌরবময় ভূমিকা ছিল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—“While the king was the only adult male with unhindered access to the harem, it was his mother whose pre-eminence in the harem was universally acknowledged and respected.”^{১৯} লক্ষ করতে হবে, রাজপুত পারিবারিক কাঠামোতেও রাজসিংহাসনের অধিকারী পুত্রের জননীপদ কম মর্যাদার ছিল না। কিন্তু সেই পদমর্যাদা উপভোগের সুযোগ কোথায়, যদি যে কোন অবস্থানেই অবরোধবাসিনীরা কূটতায় জালবন্দী হন? “মাজীসাহেব” গল্পের মহারাণী রাঠোরজী রাজমাতা হয়েও গ্রহণলাগা জীবনের ছায়াকলুষ থেকে রেহাই পান নি। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে বৈধব্যের বোঝা টেনে আজ তিনি শ্রৌঢ়ে পৌঁচেছেন। কিন্তু প্রাক্ বৈধব্য স্বল্পস্থায়ী দাম্পত্যে তাঁর স্বামীসংসর্গের স্মৃতি এমন কিছু রমণীয় নয়। আঠেরো বছরের সদায়ুবক রাজার জীবনে তিনি এসেছিলেন কুড়ি বছরের বধুরূপে। রাজপুত রাজন্য প্রথায় এ জাতীয় বিবাহের চলন ছিল। রাঠোরজীর স্বামী ঐ বয়সেই ছিলেন “ভোগ-মৃগয়া-ক্রীড়ায় বলিষ্ঠ”। কিন্তু হৃদয়-বিনিময়ের কোনো তাগিদ ছিল না তাঁর। আজও অতীতের দিকে তাকিয়ে রাঠোরজী শূন্য মনে ভাবেন—“ব্যাকুল আবেগময় মোহময় দুর্বীর কোন প্রেম ভালবাসার সত্য পরিচয় তাঁর কিছু জানা নেই, জানা হয়নি।”^{২০} পুরাণ-ইতিহাসে পাওয়া অর্জুন-সুভদ্রা, রাধা-কৃষ্ণ বা পৃথ্বরাজ সংযুক্তার প্রণয়কাহিনী তাঁর কাছে অর্থ হারিয়েছে। তাঁর নবীন অনুভূতির কোরকগুলো সিঁগিত হয়নি।

প্রাসাদমহলে অবশ্য নারীদের চাওয়া-পাওয়ার ধরনটাই আলাদা। পিতৃগৃহে এবং স্বামীগৃহে রাঠোরজীকে সবাই আশ্বস্ত করেছিল, ভবিষ্যতে রাজা আরও বিবাহ করলেও মহারাণীর সম্মান তাঁরই দখলে থাকবে। বুদ্ধিমতী সখীরা মন্ত্রণা দিয়েছিল, শুধু রাজরাণীর পদ নিয়ে তিনি যেন তৃপ্ত না থাকেন। রাণীর চেয়ে অনেক বেশি বিভা রাজমাতৃত্বে। সখীদের প্রত্যাশা ব্যর্থ হল না। রাণী সন্তানসম্ভবা হলেন। কিন্তু নবীন অতিথির অভ্যর্থনার আগেই রাজা নিহত হলেন। নিশ্চেষ্ট দাম্পত্য বলেই বোধহয় রাজার মৃত্যু রাণীর মনে তেমন বিপর্যয় ঘটাল না। বরং সপত্নীর আশঙ্কা

কেটে যাওয়ায় তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। পুত্রসন্তান জন্মালে রাজমাতৃহ লাভের পথও নিশ্চিন্তক হওয়ার সুযোগ রইল। সব মিলিয়ে একটা সহজ ছক তৈরি হল বটে। কিন্তু তাতেই জটিলতা বাড়ল রাণীর জীবনে। তাঁর উপর স্বামীহত্যার কলঙ্ক আরোপিত হল এবং সম্ভবত সাক্ষীর কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠল।

স্বামীকে কেন্দ্র করে রাঠোরজীর হৃদয়ে গভীর অনুভবের কোনো জায়গা হল না ঠিকই। কিন্তু দীর্ঘ-কুড়ি বছর বাদে হঠাৎ একটা স্বপ্ন তাঁর দিনরাত্রির ভাবনাকে তাড়া করে বেড়াতে লাগল। না-জানা অপরাধের, না-করা পাপের ভার তাঁকে ক্রমশ অবসন্ন করে তুলল। অকালেই জরা এসে দেহে। স্বপ্নটা তিনি প্রথম দেখেছিলেন তাঁর পুত্র জন্মানোর রাতে। ছ'মাস আগে হোলির পরবের দিনে হত রাজা যেন উৎসবের লাল পোশাক পরে তাঁর শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বুকের কাছে রঙে ভেজা জামাটা শক্ত জমাট। ঠিক যেমনটা ঘটেছিল হোলির দিনে। রাজার সম্মানে তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি রাণীর। তিনদিন পরে তিনি তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলেন। হত্যাকারীদের নামের সঙ্গে মহারাণীর নামও জড়িয়ে গিয়েছিল।

জ্যোতির্ময়ীর কাহিনীর সূত্রটা হয়তো কিংবদন্তী থেকে পাওয়া। কিন্তু রাজপুরীর ষড়যন্ত্রে আক্রান্ত রাঠোরজীর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়াটি গল্পকারের নিজস্ব আবিষ্কৃত। বহু উচ্চারিত বা বহু-প্রচারিত মিথ্যা যখন সত্যের ছদ্মবেশ পরে তার আবরণ সরিয়ে দেওয়া সহজ নয়। নারীর পক্ষে কাজটা আরও কঠিন। কারণ তার কথা শোনার কেউ নেই। তার হয়ে বলার কেউ নেই। অপবাদের মোকাবিলা করার জন্য হারেমবাসিনী নারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ কে দেবে? পাণ্ডের তলায় তাঁর জমিটাই তো তৈরি হয়নি। তবু মানসিক পীড়ায় শয্যাশায়ী হয়েও শেষ বিচারের আশায় রাজমাতা রাঠোরজী তাঁর পুত্রকে এস্তেলা পাঠালেন। তাঁকে বিচারকের আসনে বসিয়ে নিজের স্মৃতি ঝুঁড়ে তিনি তুলে আনলেন সেই বিশেষ হোলির উৎসবের রাতের ঘটনাবলীর বিবরণ। জানালেন, সেদিন রাতশেষে ঘুম ভেঙে জেগে উঠে স্বামীকে তিনি মৃত বা নিহতই দেখেছিলেন। দিলখুশ খাঁ এবং বড়ারণজীর ভাবগতিক তাঁর কাছে যথেষ্ট সম্ভবজনক মনে হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের সাজানো কৌশলে রাণীই সকলের কাছে দোষী সাব্যস্ত হলেন। সেদিন তাঁর সত্যঘটনা প্রকাশের কোনো উপায় ছিল না। আজ তিনি ছেলের কাছে সব কথা জানিয়ে মনের ভার লাঘব করতে চাইলেন। কিন্তু কার কাছে তিনি দিচ্ছেন তাঁর জীবনবন্দী? কথা শেষ হওয়ার আগেই দেখা গেল, বর্তমান রাজা নিঃশব্দে ঘর থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাহলে কি ছেলেও তাঁকে ভুল বুঝলেন? তিনি কি সকলের কাছে চির-অপরাধিনী হয়ে থাকবেন? রুগ্ন দেহে এতটা আঘাত সহ্য হল না। তাঁর অভিমান বুকে নিয়ে রাণী জীবন থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর পুত্র অবশ্য নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। মায়ের মৃত্যুর আগেই তিনি বৃদ্ধা বড়ারণজীর খোঁজে গ্রামে লোক পাঠিয়েছিলেন। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের দিন রাজ-অস্তঃপুরে রাজার সম্মুখে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বড়ারণজী কবুল করলেন, মহারাণী নির্দোষ। ষড়যন্ত্রকারীরা নিজেদের অপরাধ আড়াল করতে রাণী রাঠোরজীর চরিত্রে কলঙ্ক দিয়েছিল।

আদত সত্য উদঘাটিত হল বটে। কিন্তু একটি যন্ত্রণাময় জীবনের ব্যর্থ অবসানের ক্ষতিপূরণ হল কোথায়? রাজপুরবাসিনীদের হাল-হকিকত জানতে গিয়ে নারীদের পদপ্রাপ্তির আপাতগৌরবে বিভ্রান্ত হননি জ্যোতির্ময়ী। তিনি জানতেন, অন্দরমহলে নারীর ক্ষমতার লড়াইটাও পুরুষের অনুমোদনে নির্ধারিত। হারজিৎটাও পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে প্রাপ্ত। মহারাণী বা রাজমাতা—কোনো পদাধিকারই নারীর নিজস্ব অর্জন নয়। একটু নাড়া পড়লেই তার অন্তঃসারশূন্যতা বেরিয়ে আসে। অধিকারের শক্ত বনিয়াদ ছিল না বলেই রাঠোরজী আপবাদের বিরুদ্ধে সরব হতে পারেননি।

জীবনক্ষয়কারী ঘৃণাপোকাদের প্রতিরোধ করার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। তাই পুত্রের বিশ্বাসের কাছে তাঁকে আশ্রয় খুঁজতে হয়েছিল। রাজামাতার সেরা সম্মানেও তাঁর অসহায়তা ঘোচে নি।

রাজপ্রাসাদের হারেম প্রকৃতপক্ষে নারীদের কয়েদখানা। জেলখানার কয়েদীরা নাম-পরিচয়ের বদলে পায় সংখ্যা-পরিচয়। হারেমের নারীদের পূর্ব জীবনস্মৃতি লোপাট করার জন্য ছিল নতুন নামকরণের বিধান। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পাওয়া আসামীদের মতো তাদের ঘরে ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যেত। পায়ের শিকলটা যখন ভারি ঠেকত, তখন মুক্তিলাভের দুরাশায় ব্যথিয়ে মরাই ছিল নিয়তি। পরিণামী এই ট্রাজিডির পথেও “সুমেরু রায়” গল্পে অনেকগুলো জটিল বাঁক। গল্পের নামভূমিকা পাওয়া খেতাবধারী নারীটিকে জানতে হলে আগে পৌঁছতে হবে রাজপুতানার গ্রামের সুন্দরী কিশোরী উম্দাবাইয়ের জীবনে। কাহিনীর শুরুতেই নাটকীয়তা। স্বপুত্রবাড়ির দুর্বল অত্যাচারে গোপনে পালিয়ে এসেছে উম্দা। মেয়েমানুষের এত বড় স্পর্ধা ক্ষমা করেনি তার আপনজনেরাও— না তার দাদারা, না তার মা। বরং চাপের মুখে তারা মেনে নিয়েছে তাঁর দোদাগপ্রতাপ ভাঙুরের নিষ্ঠুর প্রস্তাব। আগে অনেক সময় দুরন্ত বৌ-বিদের শায়েস্তা করার জন্য রাজবাড়িতে দাসীবৃত্তি করতে পাঠানো হ’ত। বন্ধ দশায় স্বভাবচরিত্র টিট হলে দু’তিন বছর বাদে তাদের ঘরে ফিরিয়ে নেওয়া হত। উম্দার জন্যও সংশোধনের একই দাওয়াই স্থির হল। উম্দার স্বামী গঙ্গা সিং অভিভাবক দাদার উপর কথা বলার সাহস পেল না। আর “রাজপ্রাসাদের স্বপ্নমুগ্ধ কিশোরী উম্দা এই যাত্রায় কোন বাধাও দিল না, প্রতিবাদও করল না।”^{২১} অর্থাৎ একইবকম ভুলের ফাঁদে পা দিল সরল উম্দাবাই, যেমন দিয়েছিল “আরাবল্লীর আড়ালে” গল্পের শাপি।

রাজবাড়ির দরজা খোলা পাওয়া সহজ ছিল না। অনেক তদ্বির করতে হয়েছিল উম্দার মাকে। হারেমে পৌঁছে উম্দা অবশুষ্ঠন খোলার পর গ্রামের মেয়ের কৈশোর সৌন্দর্য দেখে রাণী পর্যন্ত অবাক হলেন। অন্তরে ঠাই পেয়ে গেল উম্দা। কয়েকটা বছর কেটে গেল। তার স্বামী গঙ্গা সিং পশ্টনে চাকরি পাওয়ার পর শুছিয়ে সংসার করার বাসনায় বউকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইল নিজের কাছে। কিন্তু ততদিনে রাজার নেকনজরে পড়ে উম্দাবাই হয়েছে খেতাবধারী সুমেরু রায়। গুণগ্রামের আত্মীয়েরা কেমন করে তার নাগাল পাবে? পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে অভ্যস্ত সুমেরু তখন রাজপ্রায়সীর অধিকার টিকিয়ে রাখার কৌশলী খেলায় দক্ষ হয়ে উঠেছে। হঠাৎই জনরব শোনা গেল, সুমেরুর উপর স্বয়ং গঙ্গাদেবী ভর করেছেন। সেই দেবীর রূপে সে রাজার সম্মুখে প্রতিদিন আবির্ভূত হয়। মদিরামুগ্ধ রাজা সুমেরুর মুখের দৈবদেশ অনুসারে রাজ্যের সংকটের মীমাংসা করেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বিনীদের কোতল করেন। রাণীদের অসম্মান করতেও দ্বিধা করেন না। লোকে বলাবলি করে—“জাহাঙ্গীরের নুরজাহানের মতো সুমেরু রায়ই রাজা এখন।”^{২২}

অপরাধী মানুষের দুর্বল মনস্তত্ত্বকে জ্যোতির্ময়ী সঠিক জায়গায় ধরেছেন। বহ্নারীবিলাসের গোপন পাপবোধ রাজাকে দেবীর অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে একটা মোহময় ভয়ে আবিষ্ট করে রেখেছিল। স্বভাবতই তাঁর যুক্তি স্বচ্ছতা হারিয়েছিল। প্রতাপ মাথা তোলবার সামর্থ্য হারিয়েছিল। সেই সুযোগে সাময়িককালের জন্য হলেও নারীপ্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা। রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সুমেরু রায়ের অবতারত্বের ইন্দ্রজাল ছিঁড়ে গেল। বুজরুকিটা ধরা পড়ে গেল সকলের কাছে। যারা এতদিন তার স্বচ্ছাচারের শিকার হয়েছিল, তারা সমবেতভাবে অবিশ্বাসীদের দলে ভিড়ে গেল। মন্ত্রশক্তি শেষ। সুমেরুর খেলাও শেষ। তার উপর রাজার বিয়োগে রাজ-অন্তঃপুরে ‘প্রমোদ-প্রাসাদবাসিনী অসংখ্য বিলাসক্রীড়নক নারীদের সঙ্গে সুমেরুবাইও এক নিমেষেই মুঢ় মর্যাদাহীন সাধারণ বারনারীর পর্যায়ে মিশে গেল।’ কিন্তু একবার যেহেতু সে ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছে, তাই এই অবনমন তার কাছে দ্বিগুণ অসহনীয় মনে হল।

এবার সখীরা নিতান্ত তুচ্ছ খবরটাও পৌঁছে দিতে সাহস পেল সুমেরুর কাছে। সুমেরু জানল, তার মাকে সঙ্গে নিয়ে তার স্বামী এসেছিল তাকে ফিরিয়ে নিতে। সঙ্গে একটি সুন্দর শিশু। হয়তো বা সতীনের ছেলে। সুমেরুর মনে পড়ে গেল তার ঘরের কথা, গ্রামের কথা, স্বজনদের কথা। সুমেরু আবার উদ্দাবাদি হতে চাইল। এক অন্তরঙ্গ সখীকে অলংকারের প্রলোভন দেখিয়ে তার সঙ্গে সে হারেম থেকে পালাবার পরিকল্পনা করল। কিন্তু সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গের গোপলকথাধায় কোথায় মুক্তির দিশা? অবরোধবাসিনীর নিরুপায় ব্যর্থতায় বিষণ্ণ হয় গল্পকারের কলম—“যারা কবে একদিন শৈশবে না কৈশোরে ঐ বিরাট অস্ত্রপুরে প্রবেশ করেছিল, সেই নারীরা আর তো সেই ব্যুহ কখনো ভেদ করে বাইরে ফিরে আসেনি। তাদের পায়ে নেই সহজ গতি, মনে নেই সহজ সাহস, চোখের সামনে নেই চেনা কোন সহজ পথ।”^{২৩}

স্বাভাবিক নারীজীবনকে পঙ্গু বানাবার যন্ত্র-মন্ত্র গৃহের নামই তো হারেম। সেখান থেকে বেরোবার ফিকির খুঁজতেই সুমেরু রায় সোজা গ্রহরীদের হাতে ধরা পড়ল। এবার আরও কঠিন হল গারদের শাসন। মহারাণীর চকুমে সুমেরুর বাজেয়াপ্ত ধনে তৈরি হল দেবমন্দির। তাতে না থাকল তার নাম, না থাকল প্রবেশের অধিকার। মাসোহারামাত্র সম্বল করে দিন কাটতে লাগল অতীতের গর্বিনী রাজপ্রায়সীর। মনের ভিতর অবিরাম রক্তক্ষরণের যন্ত্রণা। নিজেকে ভুলিয়ে রাখার একমাত্র উপায় গোপনে সংগ্রহ করা মন্দির পানীয়।

রাজপুত অস্ত্রপুরে এমন নিগ্রহের ছবি দেখাবার সাহস বাংলা কথাসাহিত্যে দুর্লভ। মোগল হারেমের সমরূপ ভোগ-সংরাগময় পরিবেশে অন্দরমহলের নিজস্ব শ্রেণীবিভাজনের দুনিয়া থেকে জ্যোতির্ময়ী শুধু রাণী-মহারাণী-রাজমাতাদের নয়, নানা বর্গের চরিত্র চয়ন করেছেন। বর্গের ঠাণ্ডাপড়া দেখেছেন। ক্ষমতার দর্পের মধ্যে অনিবার্য পতনের সম্ভাবনাকে নির্মোহ তির্যক ভঙ্গিতে তুলে এনেছেন। ক্ষমতাচ্যুতির বেদনায় নিছক মমতা না দেখিয়ে পাওয়ার চেয়ে চাওয়ার আঙ্গিটাই বেশি করে ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন।

প্রাসাদবাসিনীদের জীবন সম্পর্কে বর্ণনায় গল্পকথা শুধু গ্রামের সরল বালিকা-কিশোরীদের মনকেই টানেনি। নাগরিক জীবনচর্যায় অভ্যস্ত পরিণতযৌবনা নারীকেও প্রলুব্ধ করে বিনাশের বিবরে ঠেলে দিয়েছে। জ্যোতির্ময়ীর গল্প তার মর্মান্তিক নজির। গল্পের নায়িকা “শেঠনীজী” শহরের বিস্তারিত শেঠের ঘরের বউ। রূপবতী এবং বুদ্ধিমতী। তাঁর স্বর্গদেহ কুদর্শন নিরীহ স্বামীটি তাঁকে রীতিমতো সমীহ করে চলতেন। এই দাহ্যশক্তিহীন পুরুষকে নিয়ে শেঠনীর নারীত্বের ক্ষুধা মেটেনি। রূপবৈভবের যোগ্য সমাদর লাভের আকাঙ্ক্ষায় অস্ত্রত একটিবার তিনি রাজবাড়িতে প্রবেশের সুযোগ চাইছিলেন। বহুকাল আগের একটি পারিবারিক ঘটনায় তাঁদের কাছে প্রাসাদের দরজা বন্ধ ছিল। হঠাৎ করেই তৃতীয় রাণী চন্দ্রাবতীজীর মহলের জলসায় শেঠনী আমন্ত্রণ পেলেন। শেঠ পরিবারের রত্নকোষের সেরা আভরণে বিলাসসজ্জা করে তিনি পৌঁছলেন আসরে। রাজার হাতে নজরানা তুলে দেওয়ার মুহুর্তে লাস্যলীলায় পারঙ্গম শেঠনী অর্ধাবশ্ঠনের আড়াল থেকে মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এরপর থেকে রাজপুরীর প্রতিটি মঞ্জলিশে শেঠনীর ডাক পড়তে শুরু করল।

শেঠনী বাক্পটু। রসিয়ে গল্প বলার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর। তৃষ্ণার্ত অস্ত্রপুতিকাদের কাছে তিনি পৌঁছে দেন বাইরের জগতের বিচিত্র সংবাদ। শহরের নানান ঘরের খবর জানার কৌতূহলে রাজাও শ্রোতাদের দলভুক্ত হলেন। রূপসী শেঠনী তাঁর নিত্যনূতন সাজের বাহারে, মধুর হাসিতে, অকারণ করুণ ভঙ্গিতে সমস্ত ইন্দ্রিয় আশ্বত করে গল্প বলেন। রাজা শোনে নারীদের মধ্যস্থতায়। ধীরে ধীরে আড়ালটুকুও সরে গেল। রাণীরা ছলনাময়ী শেঠনীর প্রতি ঈর্ষায় দম্ব্ব হলেও গল্পের নেশা

ভুলতে পারলেন না। শেঠনীকে প্রাসাদে আহ্বান করে আনার জন্য সকলে রাণী চন্দ্রাবৎজীর উপরই দোষারোপ করলেন। ক্রুদ্ধা রাণী খোজা মারফত শেঠনীর স্বামীকে সচেতন করলে চাইলেন। কিন্তু ব্যক্তিভবর্জিত মানুষটির কোন হেলদোল নেই।

অন্দরমহলে প্রতিশোধের স্বকীয় কিছু খেলা ছিল। তৃতীয় রাণী এবার এক অভিনব কৌশল করলেন। তাঁর প্ররোচনায় একটি বালিকা সখী একদিন শেঠনীর কবরীবিন্যাসের ছলে তাঁর কপালের পাশে কয়েকটি রূপালি চুলের রেখা আবিষ্কার করে ফেলল। মোহিনী ময়্যার আড়ালে শেঠনীর বয়স থেমে নেই। প্রাসাদমহল তরঙ্গিত করে খবর পৌঁছল স্বয়ং রাজার কাছে। কিন্তু শেঠনীর চোখের জলে ভুলে রাজা দশ দিলেন তৃতীয় রাণীকেই—তাঁর জায়গীর বাজেয়াপ্ত করে। তীব্র অপমানের আঘাতে মৃত্যু হল রাণীর। বন্ধারীবিলাসী রাজার এবার মোহ ভাঙার পালা। কূটপ্রশ্নের জাল ফেলে তিনি জেনে গেলেন, শেঠনী নবযৌবনা বিবাহিত কন্যার মা। সূরু রাজা হাত বাড়াতে চাইলেন কন্যাটির দিকে। তাকে না পেয়ে শেঠনীর প্রতি তিনি বিমুখতায় নির্মম হলেন। ক্ষুণ্ণ দিলেন, প্রতিদিন সন্ধ্যায় শেঠনীকে হারেমে বাধ্যতামূলকভাবে হাজিরা দিতে হবে। কৃপাবর্ষণ করা না-করা রাজার মর্জি। পরিস্থিতির পরিবর্তনে এখন আর শেঠনী “লাস্যসঙ্গিনীও নয়, প্রোষিতভর্তৃকাও নয়, বহুবিলাসীর পরিত্যক্ত বিলাসক্ৰীড়নক যেন।”^{২৪} ভান করা যৌবনের মায়া অপগত। হেমন্তের সন্ধ্যার মতো স্রিয়মাণ শেঠনীর দেহ জুড়ে ব্যাধির ছায়া। রাজার নির্দেশে তাঁর ঠাই হল সখীমহলের আরোগ্যশালায়। প্রতিদিন রাজবৈদ্যের দেওয়া ওষুধ পান করতে তিনি বাধ্য হন। এও রাজার ক্ষুণ্ণ।

জ্যোতির্ময়ী একে বলেছেন, “শাস্তিদণ্ডের অনাচার।” রাজস্বানের হাওয়ায় ভেসে থাকা নানান কাহিনী আর নিজের অভিজ্ঞতায় পাওয়া জীবনের পাঠ—দুই মিলে গল্পকারের মনে অকারণ মোহ জন্মাবার কোন অবকাশ ছিল না। তিনি জানতেন, দেশভেদেও রাজতন্ত্রের মূল চেহারাটা অভিন্ন। রাজপুত হারেমে না হয় মোগল হারেমে ধরন-ধারণের প্রতিফলন ঘটেছিল। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে “শুধু মোগল হারেমে কেন, সব দেশেই মধ্যযুগে রাজসভা, রাজা-বাদশা, সম্রাট-সম্রাজ্ঞীদের ক্ষমতা-বিলাস-বাসন-প্রেমের ক্ষেত্রে অনাচারের অত্যাচারের কথা কার আর না জানা আছে। যুরোপের রাণী-মহারাণীদের রাজা-রাজরাদের জীবনের ইতিহাসেও এরকম নজীর পাওয়া যাবে।”^{২৫} আসল কথা প্রতাপ যেখানেই প্রতিরোধহীন, সেখানেই তার আগ্রাসন মানবাধিকারের সীমানা লঙ্ঘন করেছে। স্বেচ্ছাচারের উপর একটা আবরণ পরানোর চেষ্টার বিচার, দণ্ডদান প্রভৃতি আইনি শব্দ ও আইনি ব্যবস্থার কোথাও অভাব ছিল না। কিন্তু নেপথ্যে ছিল ষড়যন্ত্রের চতুর কণ্ঠকৌশল। রাজপুত হারেমেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

সেখানে নিভৃত মৃত্যুর আগমনে কোন বাধা ছিল না। অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ বা সাহস ছিল না। চোখের সামনে জগতের আলো নিভিয়ে দেওয়ার উপায়ের অভাব ছিল না। সবচেয়ে সহজ ও নিরুপদ্রব ছিল ধীরে ধীরে বিষপ্রয়োগে হত্যার প্রক্রিয়া। অন্দরমহলের খবর বলছে, কোন রাণী যদি বেশি তেজস্বিনী হন “রোজ রাজার পাঠানো মদিরা তাঁকে পান করতে হবে। সে পানীয় খোজারা এসে স্বহস্তে পান করিয়ে যাবে। ...তিনি জেনেও ও নিরুপায় হয়েই সেই সুরা পান করবেন।”^{২৬} এটাই দস্তুর। শুধু রাণী কেন, রাজার বিরাগভাজন হলে রাজপ্রিয়সীদের জন্যও একই ব্যবস্থা ধার্য ছিল। আমাদের গল্পের শেঠনীকে এভাবেই মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হল। একদা রাজদৃষ্টির অভিনন্দন পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তিনি উদ্ভ্রান্ত হয়েছিলেন। পরিণামে আত্মবিলাপ তাঁর সম্বল। হৃদয়দহনের মুহূর্তে বারবার তাঁর মনে পড়েছে নির্বোধ স্বামীর বিনীত নম্র সোহাগ, সন্তানদের হাসি, কণ্ঠস্বর, গৃহস্থালির সাতকাহন। আবাল্য প্রার্থিত রাজপ্রাসাদে

হাতির দাঁতের কাজকরা দুর্মূল্য পালঙ্কে শুয়ে দাসদাসীর সেবা পেয়েও তাঁর মন ভরেনি। ভয়ে-ভাবনায় আর গুণ্ধের প্রভাবে আচ্ছন্ন শেঠানীর আশো চेतনায় শুধু ভেসে গেছে “এক একটি প্রতিদিন।”

দিন মানে তো শুধু ঘণ্টা-মিনিটের হিসেব নয়। দিন মানে জীবনের আরেক পা এগিয়ে চলা। অস্তিত্বের আরও কিছু অর্থবহতা খুঁজে নেওয়া। অথচ অবরোধবাসিনীদের জীবনে এ সবের কোন তাৎপর্যই ছিল না। কারণ তাঁদের ছিল না আত্মকর্তৃত্বের অধিকার। রাজার একান্ত উপভোগ্য বস্তু হিসেবে গণ্য হতে হতে নিজের মতো করে বাঁচার ভাবনাটা তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন। রাজার সুখের জন্যই তাঁদের বাঁচা। রাজার দক্ষিণ্য পেয়েই তাঁরা অসার আত্মতৃপ্তিতে ভুগেছেন। কৃপাবশিত হওয়ার আশঙ্কায় অসুস্থ প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। উপেক্ষাকে নতনেত্রে মান্য করেছেন। অবিচারের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়ার বোধ তাঁদের জন্মায়নি। প্রতিবাদ করা দূরে থাক, অভিমান অপমান শব্দগুলোও তাঁদের জীবনের অভিধানে বর্জনীয়। কারণ এ সবই অহংকারের আভরণ, আত্ম-চেতনার অঙ্গ। যদি সেই চেতনা কখনো আঘাত পেয়ে জেগে ওঠার স্পর্ধা দেখিয়েছে, কারাঙ্ককার অথবা মৃত্যুতমসাই তখন নির্ধারিত নিয়তি।

রাজপ্রাসাদের হারেমে রাজা ছাড়া আর সবাই “অপর”। ভোগ-সুখ-প্রতাপের একচ্ছত্র অধিকারীর চোখে আর কেউ মানুষ নয়, কেউ নয় মানুষী। প্রজননক্ষমতাবর্জিত খোজা অথবা জীবনধাত্রী নারী—ন্যূন ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞায় সকলেই এক। একদল প্রশ্নহীন আনুগত্যের বিনিময়ে পেয়েছে শুধু পারিতোষিক। আরেকদল রমণী হয়ে না জন্মালেও পুরুষের প্রয়োজনে হয়ে উঠেছে রমণী। “আপনা মাসে হরিণা বৈরী”—এই অমোঘ জৈবিক সত্যের অন্তর্গত অমর্যাদার বোধ না থাকায় রাজার চোখে নিজেদের মোহনীয় করে তোলার জন্য রেষারিষির বিরাম ছিল না। আত্মতার অনুভবরহিত এই নারীদের অস্তিত্বে মানবিক পরাশ্রয়ের অর্জন বা উৎকর্ষ সবটাই যখন আয়ত্তের বাইরে ছিল, তখন মানবের প্রাণীদের সঙ্গে তাঁদের একাকার করে দেখার বাধাটা কোথায়? যেকালেই লেখা হোক, রূপকথা ঠিক কথাই বলে। রাজাদের হাতিশালে হাতি। ঘোড়াশালে ঘোড়া। আর নারীশালায় নারী।

সংক্ষেপ-সূচী :

- ১ জ্যোতির্ময়ী—“এক যে ছিল রাজা”, ‘রাজা-রাণীর যুগ’, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ১৯৯৪। পৃ. ৩০৫।
- ২ Harbans Mukhya—The World of the Mughal Family”, ‘The Mughals of India’, Black Publishing, 2004. Page-113.
৩. Ibid. Page-132.
৪. বঙ্কিমচন্দ্র-রাজসিংহ, বঙ্কিম-রচনাবলী (১ম খণ্ড), সাহিত্য-সংসদ, ৩য় মুদ্রণ, ১৩৬৯। পৃ. ৬১৭।
- ৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২২।
৬. ঐ—পৃ. ৬০৭।
৭. তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—‘আরাবর্মীর কাহিনী’র ভূমিকা। উদ্ধৃত, “জ্যোতির্ময়ী দেবীর গ্রন্থপঞ্জি”, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন (১ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭।
৮. প্রাগুক্ত—পৃ. ৩৪৮।
৯. জ্যোতির্ময়ী দেবী—“আমার কথা”, “ভূমিকা আরাবর্মীর আড়ালে”, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন (২য় খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

- ১০ জ্যোতির্ময়ী দেবী—“লেখিকার নিবেদন”, ‘রাজা-রানীর যুগ’, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন (২য় খণ্ড), প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩০৩।
- ১১ জ্যোতির্ময়ী দেবী—“স্মৃতি-বিস্মৃতির তরঙ্গ”, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৫০৮।
১২. প্রাণ্ডক্ত।
১৩. জ্যোতির্ময়ী দেবী—“বাংলা কথাসাহিত্যে বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ”, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন (৫ম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫, কলকাতা।
১৪. জ্যোতির্ময়ী দেবী—“নারীশালা—হারেম-নারী”, “রাজস্থান সর্বভারতীয় চিত্র”, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনাসংকলন (২য় খণ্ড), প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৫৩।
১৫. জ্যোতির্ময়ী—“অত্যাচার শাস্তিদণ্ডের অনাচার প্রসঙ্গ”, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৫১।
১৬. জ্যোতির্ময়ী—“খুশ্নজরজী”, “আরাবল্লীর আড়ালে”, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৭।
১৭. প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৭৯।
১৮. জ্যোতির্ময়ী—“লালজীসাহেব”, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৮৮।
১৯. Harbans Mukhia—Ibid. Page-114.
- ২০ জ্যোতির্ময়ী—“লালজীসাহেব”, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯৪।
- ২১ জ্যোতির্ময়ী—“সুমে'র রায়”, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১১৩।
২২. প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১১৬।
২৩. প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১১৯।
২৪. জ্যোতির্ময়ী—“শেঠনীজী”, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১০৭।
২৫. জ্যোতির্ময়ী—অত্যাচার শাস্তিদণ্ডের অনাচার প্রসঙ্গ, “রাজস্থান সর্বভারতীয় চিত্র”, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনাসংকলন (২য় খণ্ড), প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৪৩।
২৬. জ্যোতির্ময়ী—প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৪৪।

বান্ধীকির কবিত্বলাভ এবং...

তরুণ মুখোপাধ্যায়

১. সূরে বাজে মনের ব্যথা

গল্পটি আমরা সবাই জানি, গল্পটি আর কিছুই নয়, বান্ধীকির কবিত্বলাভ, দস্যু রত্নাকর কীভাবে কবি হলেন, তারই ইতিবৃত্ত। যদিও এই কবি হয়ে ওঠার অর্থাৎ কবিত্বের সাধনার কথা রামায়ণে লেখা নেই, তথ্য শুধু এই, ক্রৌঞ্চ-যুগলের একটিকে বাণবিদ্ধ হতে দেখে মুনি শোকার্ত হন। প্রিয়সঙ্গচ্যুতা ক্রৌঞ্চীর বিরহবিলাপে মুনির হৃদয় দ্রবীভূত হয়। দুঃখে, বেদনায় তিনি আত্মবিস্মৃত হয়ে নিষ্ঠুর ব্যাধের উদ্দেশে বলেন :

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাস্বতীঃ সমাঃ

যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥

শোক থেকে জ্ঞাত বলেই এর নাম ‘শ্লোক’, বান্ধীকি নিজেই এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

পাদবদ্ধোহক্ষরসমস্ততন্ত্রীলয়সমঘিতঃ।

শোকাক্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা ॥

তাঁর “ভাষা ও ছন্দ” কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই পরম মুহূর্তটিকে এইভাবে লিখেছেন, “...বেদনায় অন্তর করিয়া বিদারিত/ মুহূর্তে নিলো যে জন্ম পরিপূর্ণ বাণীর সঙ্গীত।” বেদনার্ত হয়ে এই সুললিত বাণী উচ্চারণ করে বান্ধীকিও বিস্মিত হয়েছেন। বলেছেন, ‘কিমিদম্’? এই জিজ্ঞাসাই কাব্যজিজ্ঞাসার উৎস ভূমি। আলংকারিকরা তন্ন তন্ন করে দেখতে ও খুঁজতে চেয়েছেন কবিতার রহস্য, তার আত্মাকে। ফলে, তৈরি হয়েছে নানামুনির নানামত। আমরা বান্ধীকির কবিত্বলাভ প্রসঙ্গটিকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে দেখাতে চাই কবিত্ব ব্যাপারটি স্বয়ম্ভু নাকি শ্রমলব্ধ। কবিতা কি শুধু বেদনার দান? পাদবদ্ধ-সমাক্ষর-তন্ত্রীলয়-যুক্ত হলেই তা’ কি কবিতা হবে? নাকি কবিতার অন্তর্গত রক্তের ভিতরে আরো কিছু আছে এবং তা’ কি!

বান্ধীকির পূর্বাপর ইতিহাস যেটুকু জানা যায় তাতে তাঁর স্বভাবে ও অভ্যাসে কাব্যসাধনার লেশমাত্র নেই, এমনকি কোনো হৃদয় বৃষ্টি অর্থাৎ স্নেহ-প্রেম-করণার কোনো ক্ষীণতম আলোড়ন তাঁর মধ্যে আছে বলে, জানা যায় না, দস্যু রত্নাকরের দাম্পত্য জীবন প্রেমে বা আবেগে সংরক্ত ছিল না। তার প্রমাণ, ব্রহ্মা যখন তাঁকে নরহত্যার জন্য পাপী বলেন এবং সেই পাপের ভাগ সংসারে কেউ নেবে কিনা জানতে চাইলে রত্নাকর বাড়িতে ছুটে যান। বাবা-মা এবং স্ত্রী কেউই তাঁর পাপের অংশীদার হতে চায়নি, স্ত্রীর ভর্ৎসনা বাক্যও মোটেই অনুরাগিণীর ভাষা ছিল না। সুতরাং রত্নাকর হৃদয়ের কোমল অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছিলেন, এমন ভাবা যেতে পারে। তবু ব্রহ্মা ও নারদের পরামর্শে শুধু ‘রাম’, নাম জপ করেই তাঁর আত্মমুক্তি ও সিদ্ধি ঘটল।

দস্যুর খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলেন মুনি বান্ধীকি। তারও ঢের পরে হলেন আদিকবি বান্ধীকি। ক্রৌঞ্চবিরোগব্যথা-য় জন্ম হলো এক কবির, একি আকস্মিক নাকি অলৌকিক ঘটনা? সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য বাধ্য হয়ে যে বান্ধীকি একদা রত্নাকররূপে বহু নরহত্যা করেছিলেন, তাঁর মনে সেই রক্তপাত কি একটুও রেখা ফেলে নি? একথা বিশ্বাস্য নয়। আমাদের ধারণা নরহত্যা বা দাম্পত্য জীবনের অনুরাগহীনতা সবাই তাঁর স্মৃতির পরতে সঞ্চিত ছিল। চাপা অনুতাপে তিনি যখন মথিত, তখনই এলো রামনাম জপের আহ্বান। ভাবলেন, এবার হয়তো প্রাণের আরাম, আত্মার শান্তি খুঁজে পাবেন। কিন্তু তা’ হয় নি। ফলে, তিনি এমন মাধ্যম খুঁজছিলেন, যাতে তাঁর এই অন্তর্দাহ উৎসারিত

হয়ে তাঁকে শান্ত করে। আরিস্টটলের ভাষায় চাইছিলেন ‘ক্যাথারসিস’। বহু দিনের বহু ব্যথা, বহু তাপ তাঁর হৃদয়ের গভীরে পুঞ্জীভূত হয়েছিল, আর তারই বিস্ফোরণ ঘটল ক্রৌঞ্চের আকস্মিক হত্যা দর্শনে। এতদিনের সঞ্চিত ব্যথা, বেদনা ও অনুশোচনা অনর্গলিত হয়ে গ্লোকাকারে বেরিয়ে এলো তাঁর মুখ থেকে। অভিনব গুপ্তের অভিব্যক্তিবাদের সূত্রানুসারে যাকে চিন্তের ভঙ্গাবরণও বলা যায় কিংবা ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাষায় ‘emotions recollected in tranquillity’। হৃদয়ের এই জাগরণকে ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এই ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, “কবির হৃদয়ে অনুভূতির বীজ আছে, তা’ অপরে অনুমিত হইয়া সঞ্জীবিত হয়। মুনির নিষ্কের মনে শোকের ভাব নিহিত ছিল, তিনি ক্রৌঞ্চের আক্রমণের মধ্যে নিষ্কের সেই হৃদয়স্থিত শোক দেখিতে পাইলেন এবং এমনভাবে দেখিতে পাইলেন যাহাতে সেই শোক তাঁহার নিষ্কের শোক, ক্রৌঞ্চের শোক হইয়া রহিল না, ইহা সর্বসাধারণের সামগ্রী হইল” (সাহিত্য পাঠের ভূমিকা)। এই ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য না - করেও, বলব, তবু বাম্শীকির কবিত্বলাভ হঠাৎ হওয়ায় ভেসে আসা ধন নয়। যদিও ‘প্রতিভা’, কে দৈব বলে ঘোষণা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় সর্বত্র। কিন্তু পরিশ্রম বা সাধনা ছাড়া প্রতিভা মূল্যহীন, যেহেতু বাম্শীকির সমগ্র জীবন কথা আমাদের অজানা, তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, কোন সাধনার বলে তিনি ‘কবি’ হলেন। বিহারীলাল চক্রবর্তী তাঁর “সারদামঙ্গল” কাব্যে এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর “বাম্শীকি-প্রতিভা” গীতিনাট্যে আদিকবির কবিত্বলাভ-কে দৈবী প্রেরণাজাত রূপেই দেখিয়েছেন, বাম্শীকির “বাসনালোক” না থাকলে কবি হওয়া, কাব্যরস আনন্দ করা সম্ভব হতো না, এ তথ্য দেওয়া হয় নি। অপার কাব্যসাংসারে কবি যখন প্রজ্ঞাপতিতুল্য বা কবিমনীষী হন, তখন তা, আকস্মিক ঘটনা মাত্র হতে পারে না, তাই বাম্শীকির মনে যে বেদনা ফস্ফুস্মোতের মতো বহমান ছিল, কবি কালিদাসের ভাষায় ‘নিষাদবিদ্বাণ্ডজ দর্শনোথ গ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ’।

শোক থেকে যা জাত তাই গ্লোক, কিন্তু তাই কি কবিতা? অর্থাৎ কবিতার জন্ম কি কেবল শোকে, বেদনায়? নাকি যা পাদবদ্ধসমাক্ষর তন্ত্রীলয়যুক্ত তা-ই কবিতা? ধরা যাক, মদনমোহন তর্কালংকাবের সুপরিচিত এই কবিতাটি—

পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল।

কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল।।

এখানে শব্দসজ্জা সুশৃঙ্খল, ভাবও মনোহর, বর্ণনা সুন্দর। তবু এটি কবিতা নয়, মিত্রাক্ষর পদ্য। কারণ, এখানে সেই অনুভবের আশুন বা স্ফুলিঙ্গ নেই, যা পাঠকের হৃৎপ্রদীপকে প্রজ্বলিত বা আলোকিত করবে। আলংকারিকেরা বলবেন, এরই নাম ‘ধ্বনি’ বা ব্যঞ্জনা। সুতরাং বাম্শীকিকৃত সংজ্ঞাকে যথার্থ কবিতা বলা যাবে না। তাহলে কবিতা কিসে প্রাণ পায়, ব্যঞ্জনাগর্ভ হয়ে ওঠে? ধ্বন্যালোকে তার জবাব আছে—

প্রতীয়মানং পুনরন্যদেববস্তুস্তি বাণীতু মহাকবীণাম্

যন্তং প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাসনাসু।।

অঙ্গনাঙ্গনের লাবণ্যের মতো বাচ্যাতীত এই ব্যঞ্জনা অনুভববেদ্য। তাহলে বাম্শীকি কবিতার আঙ্গিককে কবিতা বলেছেন কি? এর উত্তর, না। কারণ, তিনি সঙ্গে সঙ্গে এও জানিয়েছেন, ‘শোকাকর্তস্য প্রবৃন্তো মে গ্লোকো ভবতু নান্যথা’। অর্থাৎ শব্দ বা বাক্যবিন্যাস মাত্র নয়, তার মধ্যে আছে শোকানুভব কিংবা প্রগাঢ় বেদনা। এই বেদনা-ই কবিতার প্রাণ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

আইনের লৌহহাঁচে

কবিতা কভু না বাঁচে

প্রাণ শুধু পায় তাহা প্রাণে ।

কিন্তু একটি প্রশ্ন তবু উদ্ভবের অপেক্ষা রাখে। কবিতার জন্ম কি বেদনায়, শোকে? আনন্দে নয়? আমরা জানি বিশ শতকে রবীন্দ্রনাথ আর জীবনানন্দ এমনই গহন জিজ্ঞাসায় মুখর হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুজ কবিকে যখন লেখেন, “বড়ো জ্ঞাতের রচনার মধ্যে একটা শাস্তি আছে” এবং তার অভাব ঘটলে সেই রচনা স্থায়ী হয় না, তখন জীবনানন্দ স্পষ্টই জানান—

অনেক উঁচু জাতের রচনার ভেতর দুঃখ বা আনন্দের
একটা তুমুল তাড়না দেখতে পাই। কবি কখনও আকাশের
সপ্তর্ষিকে আলিঙ্গন করবার জন্য উৎসাহে উন্মুখ হয়ে
ওঠেন — পাতালের অন্ধকারে বিষজর্জর হয়ে কখনও
তিনি ঘরতে থাকেন, (৩রা পৌষ, ১৩৩৭এর পত্র)

দুঃখ আর আনন্দ দুই-ই যে কবিতার উপাদান আর উৎস হতে পারে, তার দৃষ্টান্ত বিদ্যাপতির রচনা থেকে দেওয়া যায়। ‘মাথুর’ পর্যায়ে বিদ্যাপতির রাসা বলে,

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লু'
পেখলুঁ পিয়ামুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশদিশ ভেল নিরদ্দা॥

۵۵۵

আমি কেমন করিয়া জানাব আমার
জুড়াল হৃদয় জুড়াল।

তখন আনন্দের অভিঘাতে কবিতারই জন্ম হয়েছে, বলা যায়। আসলে, বেদনা কিংবা আনন্দ নয়, কবিতার জন্ম কবির হৃদয়ে। কবির অনুভবে। মেঘদূত কাব্যের যক্ষের মনে বিরহবেদনা নিহিত ছিল। আষাঢ়ের প্রথম মেঘ এসে তাকে শুধু উদ্দীপিত করেছে। এরপর তার প্রকাশ আনন্দের, নাকি বেদনার হবে, তা প্রকাশের পরেই জানা সম্ভব। একই বর্ষাচিত্র কালিদাসের কাব্যে জননাস্তুর স্মৃতি ও প্রীতি জাগায়। আর বাস্মীকি রামায়ণে সেই বর্ষাবর্ণনা এক সুন্দর আলেখ্যমাত্র হয়ে থাকে। অর্থাৎ কবির অনুভব সেখানে যুক্ত হয় না। কালিদাসের কাব্যে কবিরও হৃদয় যুক্ত হয় বলে আমাদের মনে তা বেদনার ও আনন্দের যুগল অনুভূতি জাগায়।

সুতরাং বাস্মীকির কবিত্বলাভ আকস্মিক কোনো ঘটনার তাড়না মাত্র নয়। কবিচিন্তে যে বেদনা, অনুতাপ সঞ্চিত ছিল, নিষাদের শরে নিহত ক্রৌঞ্চ তাকেই উৎসারিত করেছে। ক্রৌঞ্চবিয়োগবেদনার অনুশ্লেষে জন্ম হয়েছে সীতাহারা রামের। কবির নিজস্ব অনুভূতি এই রামায়ণে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত বলেই, আপামর জনসাধারণকে এই মহাকাব্য আজও হাসায় কাঁদায়। তাই কাব্যের আত্মা থাকলেই তাকে ‘কবিতা’ বলা যাবে না, যতক্ষণ না তার সঙ্গে অনুভূতি যুক্ত হচ্ছে। এই অনুভূতি যেমন কবির, তেমনি পাঠকেরও থাকা দরকার। এমন পাঠকেই তো ‘সহৃদয় সামাজিক’ বলা যায়। শব্দার্থ সহযোগে যে কবিতা লেখা হলো, তা’ যখন পাঠকের প্রাণে সাড়া তোলে, হৃদয়ে হৃদয় যোগ করে, তখনই কবিতা সর্বাঙ্গ, সপ্রাণ হয়। আদিকবি বাস্মীকি কবিতার বাহ্য সংজ্ঞায় তার আকৃতির রূপ বর্ণনা করলেও, অভ্যন্তরে চেয়েছিলেন অনুভবের সত্যকে। যাকে ‘রসচৈতন্য’ বলা ভুল হবে না। লেখক ও পাঠক উভয়ের মধ্যে এই অনুভবের সংযোগ আর বিচ্ছেদ যখন ঘটে, তখনই কবিতার জন্ম হয়। কবির কবিত্ব সার্থক হয়। কবি ও পাঠকের মনে জাগে এই বিস্তৃত জিজ্ঞাসা : ‘কিমিদম’?

২. শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে

রোমান্টিকতার অন্যতম পরিচয় কি, জানাতে গিয়ে থিওডোর ডান্টন্ ‘বিশ্বায়ের পুনরুজ্জীবন’ কথাটি বলেছিলেন। এই বিশ্বয় কাব্যেরও প্রাণ, তাই বাস্মীকি যখন ‘কিমিদম’ বলেন, পাঠক-ও কবিতা পড়ে সেই একই বিশ্বায়ের সহযাত্রী হয়। এর কারণ, যা আমরা প্রত্যহ ভাবি, বলি, তাই শব্দে সমর্পিত হয়ে, কী অজ্ঞাত কৌশলে ‘কবিতা’ হয়ে ওঠে বোঝা যায় না। প্রচলিত কথা এই, আগে রূপ, পরে গুণবিচার। এই রূপ বা form কবিতার দেহ বলা যায়। মানবশরীর যদি হাড়ের কাঠামো আর রক্তমাংসের নির্মাণ হয়, কাব্যশরীর তবে শব্দ ও বাক্যের নিপুণ বিন্যাস। কোলরিজ যখন কবিতার প্রাথমিক শর্ত বা সংজ্ঞা রূপে ‘Best words in the best order’ বলেন, তখন শব্দঅঙ্গরীর মহিমাকে খর্ব করে দেখা যায় না, মালার্মে থেকে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পর্যন্ত কবিদের অধিষ্ট তাই শব্দ—শব্দের শরীরী প্রতিমা।

কিন্তু কাকে বলে শব্দ? অর্থবোধক সুসজ্জিত বর্ণমালাকে শব্দ বলা যায়। কাছেই শব্দের সঙ্গে অর্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পতঞ্জলি মহাভাষ্যকারের হাতে, ‘প্রতীত-পদার্থকো লোকেষ্মনিঃ শব্দইতুচ্যতে’ অর্থাৎ ‘যে ধ্বনিদ্বারা লোকে পদার্থ প্রতীত হয়, তাহাই শব্দ-বলিয়া কথিত হয়’ (কাব্যলোক)। শব্দের সঙ্গে ধ্বনির (sound) যোগও তাহলে স্বীকৃত। সুতরাং ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্তের এই সংজ্ঞা গ্রহণযোগ্য : ‘শব্দ বলিতে বুঝায় কবির চিন্তাগত অর্থ এবং অর্থের বাহন ধ্বনি’। কানে শোনা ধ্বনি মনে সেই শব্দের আশ্রিত পদার্থের রূপ বা আকৃতি মনে আনে। যেমন,

গরু বা গোলাপ শব্দ দুটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দুটি ভিন্ন প্রাণী বা বস্তুর আকৃতি ও প্রতীতি মনে আসে। এজন্য আচার্য শঙ্কর আকৃতির সঙ্গে শব্দের সম্পর্ক চিহ্নিত করেছিলেন। অনুভব আর অভিব্যক্তি মিলে একটি আকার বা রূপ তৈরী করে, এমন কথা ক্রোচেও বলেন, তাঁর Expression is Art বা রবীন্দ্রনাথের ‘প্রকাশই কবিত্ব’ ভাবনাকে শব্দার্থ প্রসঙ্গে আমরা গ্রহণ করতে পারি। সাহিত্য যেহেতু ভাষার বা শব্দার্থের প্রকাশ, তাই আচার্য ভামহের এই সংজ্ঞা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ‘শব্দার্থো সহিতৌ কাব্যম্’ (কাব্যালংকার ১/১৬), শব্দ ও অর্থের সহিতত্ত্ব বা মিলনই কাব্য, সাধারণ ভাবে এই মত অস্বীকার করা যায় না। কেন না ‘নীরব কবিত্ব’ যেহেতু অর্থহীন এবং ভাব ভাষা ছাড়া দেহরূপ পায় না, তাই শব্দার্থ ছাড়া কাব্যরূপের কথা ভাবা আর বন্ধ্যাপুত্রের কল্পনা করা একই ব্যাপার।

সপ্তম শতকে ভামহের উক্তি প্রভাবিত করেছে পরবর্তী শতকের রুদ্রট, রাজশেখর প্রমুখ আলংকারিকদের তাঁদের সিদ্ধান্তগুলি এইরকম—

- ১) ননু শব্দার্থো কাব্যম্ (কাব্যালংকার/রুদ্রট)
- ২) শব্দার্থো তে শরীরং (কাব্যমীমাংসা/রাজশেখর)
- ৩) শব্দার্থে বপূরস্য (একাবলী/বিদ্যাধর)
- ৪) শব্দার্থশরীরস্তাবৎ কাব্যম্ (ধ্বন্যালোক/আনন্দবর্ধন)
- ৫) বাগর্থবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে। (রঘুবংশম্/কালিদাস)

লক্ষ্মীয়া, এখানে ভামহের বলা ‘সহিত’ শব্দটি ব্যবহৃত হয় নি, কারণ সহিত শব্দের সঙ্গে সাহিত্য বোধ জড়িত, যেজন্য রাজশেখর বলেন, ‘শব্দ ও অর্থের যথাযথ সহভাবে যে বিদ্যা তাহাই সাহিত্যবিদ্যা’। স + হিত = সহিত এভাবেও সাহিত্যের ব্যাখ্যা করা যায়। এছাড়াও সংযোগ অর্থে সহিতকে গ্রহণ করা হয়েছে। আচার্য কুস্তক সব জটিলতা দূর করে বলেছেন, ‘সাহিত্য হচ্ছে শব্দার্থযুগলের এক অপরূপ বিন্যাস, যেটা ন্যূনতা বা অতিরিক্ততা বর্জিত হয়ে মনোহারী হয়ে ওঠে’ (বক্তব্য জীবিত)। কুস্তকের এমন কথা বলার হেতু এই, ভোজরাজ তাঁর ‘শৃঙ্গার প্রকাশ’ গ্রন্থে শব্দার্থের বারো প্রকার সম্বন্ধের কথা বলেছেন, যা অতিব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট। এই বারো রকম প্রকারের মধ্যে (যথা, অভিধা, বিবক্ষা, তাৎপর্য, প্রবিভাগ, ব্যাপেক্ষা, সামর্থ্য, অময়, একার্থীভাব, দোষহীন, গুণোপাদান, অলংকার যোগ এবং রসবিশ্লোগ) আটপ্রকার সম্বন্ধকে ব্যাকরণগত, বাকি চারটিকে অলংকার শাস্ত্রগত বলা যায়, কুস্তক ও ভোজ উভয়েই ভামহ-কথিত ‘শব্দার্থো সহিতৌকাব্যম্’ এই সূত্রকে ব্যাখ্যা করেছেন, যার মধ্যে কুস্তকের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণধর্মী ও গ্রহণযোগ্য।

শব্দার্থের সুসম-সুভাগ অবস্থানকে কুস্তক কাব্য বলেছেন। ‘সহিত’ বলতে বুঝেছেন ‘সহিত্যোর্ভাবঃ সাহিত্যম্’। এই সহিতত্ত্বের মধ্যে আছে বাচ্য ও বাচকের মিলনও। অবশ্য এক্ষেত্রে তাঁর শর্ত শব্দ ও অর্থ সমগুণযুক্ত সুহৃদতুল্য হবে। যাকে তাঁর ভাষায় বলা যায় ‘পরস্পর - স্পর্ধিত্ব’। এই স্পর্ধা বা প্রতিযোগিতা মিত্রতুল্য হবে। সুতরাং কুস্তকের মতে, ‘কবির অভিপ্রেত অর্থের বিশেষভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতাই বাচকত্বের বা শব্দের লক্ষণ।’ এই শব্দকেই ওয়ান্টার পেটার “The unique word” বলেছেন। যাকে ‘the single mental presentation or vision within’ (Appreciations) বলা যায়। শব্দের মধ্যে গীতধর্মিতাও দেখেছেন কুস্তক (গীতবৎ হৃদয়ানুদায়ং), সাহিত্যকে কার্লহিল তাই বলেন (musical thought) আর রবীন্দ্রনাথের মতে, সাহিত্যের প্রধান উপাদান চিত্র ও সঙ্গীত। চিত্র ভাবকে আকার দেয়, সঙ্গীত দেয় গতি। এই শব্দচিত্রের মূল্য কম নয়। যেমন,

পাক্ষী চলে! পাক্ষী চলে!

গগনতলে আঙন জ্বলে!

স্তব্ধ গাঁয়ে আদুল গায়ে

যাচ্ছে কারা রৌদ্রে সারা।

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

শব্দার্থময় এই চিত্র সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট করে।

শব্দার্থ বা বাগর্থের মিলন হরগৌরীর মতো অর্ধনারীশ্বর এবং সুন্দর। কাব্য পড়তে গেলে শব্দ ও অর্থকে বাদ দিয়ে পড়া যায় না। রঙে, রেখায় যেমন ছবি, শব্দ ও অর্থ মিলে তেমনি কবিতা। কবির অন্তরে যে ভাব এলো, তাকে উপযুক্ত শব্দে তিনি সাজালেন। তবেই সেই ভাব পেলো দেহ। শব্দার্থসহযোগে কবিতা লেখা হলে, তা সার্থক কিংবা রসোন্মীর্ণ হলো কিনা, সে বিচার পরের কথা। যেমন, হাত-পা-চোখ-নাক-কান-মাথা নিয়ে মানুষ আকৃতি না পেলে তাকে 'মানুষ' বলা যায় না। এরপর আসে তার রূপ গুণ বিচার। সুতরাং ভামহের উক্তিকে অসারোক্তি মনে করা বাতুলতা। তাই পণ্ডিত জগন্নাথ বলেন, 'রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্'; অন্যদিকে আচার্য দত্তী বলেন, 'এই ত্রিভুবন তমসচ্ছন্ন হতো 'যদি শব্দাহং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে' অর্থাৎ শব্দজ্যোতিতে সংসার আলোকিত হয়। এই কারণে বিলম্ব নদীর তীরে সন্ধ্যাকাশে বলাকার উড়ে যাওয়া আর পক্ষধ্বনিতে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, অনুভব করেছিলেন, 'সৃষ্টিয়েন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে', অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জকে মগ্নিত হতে দেখেছিলেন বা গুনেছিলেন এইভাবে -

সহসা শুনিবু সেই ক্ষণে

সন্ধ্যার গগনে

শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে

মূহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।

(বলাকা)

এই 'শব্দময়ী অঙ্গরারমণী'কে নিয়েই রচিত হয় কাব্য। যাকে ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত 'দ্বৈতাদ্বৈতরূপ' বলেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা 'ধ্বনি ও অর্থরূপ দ্বৈতসমগ্র শব্দরূপ এক অদ্বৈতে স্মৃর্ত হইয়াছে'। শব্দের অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা গুণাদির কথা মনে রেখেও বলা যায়, শব্দার্থযুগলের মিলনে যে ভাব সৃষ্টি হলো, তা পাঠক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়ে রসবোধ বা আনন্দ জাগিয়ে তোলে, এলোমেলো শব্দসজ্জা আর পাগলের প্রলাপ অবশ্যই শব্দার্থসহিত হতে পারে না। শব্দার্থ যদি ভাব, জাগাতে না পারে, তবে তা মূল্যহীন। কিন্তু ভাব তো শুধু জাগে না, সঞ্চারিত হয়। কাব্য সম্পর্কে সৌন্দর্য বোধ ও জাগে। সেক্ষেত্রে নিছক শব্দসজ্জার মূল্য কি? একালের কবি জীবনানন্দ দাশ যেজন্য বলেছেন—

মানুষের ভাষা তবু অনুভূতিদেশ থেকে আলো

না পেলে নিছক ক্রিয়া; বিশেষণ; এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল।

(১৯৪৬-৪৭)

ঠিক এই কারণে অলংকারবাদীরা মনে করলেন, ছন্দোবদ্ধ বা শব্দসার হলেই কাব্য হয় না, তাকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করাও দরকার। যে ভাবনা থেকে কাব্যে অলংকারবাদ মত সৃষ্টি হয়েছে। এসেছে কুস্তকের বক্তৃতিবাদ।

৩. বাঁকা বিদ্যুতে আঁকা সে

কবি কালিদাসকে নিয়ে যেসব জনশ্রুতি প্রচলিত, তার একটি এই রকম। রাজা তাঁর সভায় এক কবিকে পড়ে থাকা একটি শুকনো কাঠ দেখিয়ে একটি বাক্স বা শ্লোক তৈরির কথা বলেন। সেই কবি বলেন, 'শুদ্ধং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে'। বলা বাহুল্য রাজা খুশি হন না। কিন্তু কালিদাস যখন

বলেন, ‘নীরসঃ তরুণঃ পুরতো ভাতি’, তখন রাজা সম্ভ্রষ্ট হন। এর কারণ একই কথাকে অন্যভাবে বলার বাগ্‌ভঙ্গি, শব্দচয়ন। অর্থাৎ সাদামাটা কথা যখন মনে দাগ কাটছে না, কবির কাজ তখন তাকে বক্রোক্তি জীবিত করে তোলা। প্রাচীনবঙ্গে জনৈক বঙ্গালকবি সেই কবিতাকে ‘ঘনরসময়ী গভীরা’ বলেছেন, যা ‘বক্রিমসুভগোপজীবিত’। তাই ভামহ যখন বলেন শব্দার্থসহযোগে কাব্য রচিত হয়, তখন কুস্তক সেই শব্দসম্ভার ব্যাখ্যা দেন ‘শব্দার্থো-সহিতো বক্রকবিব্যাপাবশালিনি’ এই বলে। অর্থাৎ এই বক্রতাই কাব্যকে আহলাদজনক করে। কখনো বলেন, ‘কবির অভিপ্রেত অর্থের বিশেষভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতাই’ কবিতাকে আশ্চর্য করে তোলে।

সাহিত্যে বা কাব্যে আমরা চাই রসবোধ ও রম্যবোধ। সেই রম্যতা সৃষ্টি হয় ভাষাভঙ্গি বা বক্রোক্তির জন্য। সাধারণ ভাবে যখন বলা হয়, ভোর হয়েছে, পাখি ডাকছে, ফুল ফুটেছে, তখন তা’ বাক্য হতে পারে, কবিতা হয় না। কিন্তু কবি যখন লেখেন, ‘পাখি সব করে রব, রাত্তি পোহাইল’ ইত্যাদি, তখন বাগ্‌ভঙ্গির বৈচিত্র্য ও সুসম শব্দবিন্যাসে তা রম্য হয়ে ওঠে। ডঃ সুধীর কুমার দাশগুপ্ত তাই বক্রোক্তিকে দীপ্তিকাব্যের অন্তর্গত করেছেন। যেখানে বাগ্‌ভঙ্গি ও মনোহর উক্তি বা রম্যতা আছে, তাই বক্রোক্তি। প্রতিভা প্রসঙ্গে ধ্বন্যালোকের উক্তি ‘অপূর্ব-বস্তু-নির্মাণ-ক্ষমা প্রজ্ঞা’। আমরা অপূর্ববাক্য নির্মাণ ক্ষমতাকে বক্রোক্তি বলতে পারি। কেননা, কাব্যের কাজ সৌন্দর্য্য ও আনন্দ দান করা। বক্রোক্তি কাব্যকে মনোহর ও আনন্দময় করে তোলে, ফলে অনেক সাধারণ ভাব বা কথা ও ভঙ্গিবৈচিত্র্যের গুণে পাঠকের চিত্তজয় করতে পারে দেখা যায়।

যদিও আচার্য কুস্তকই বক্রোক্তির সপক্ষে তাঁর মতামত রেখেছেন, তবু ভামহ বা দণ্ডীর ভাবনায় বক্রোক্তির বীজ ছিল, ভামহ শব্দার্থময় কথাবস্তুকে কাব্য বলেও মনে করতেন, বাক্যের ভঙ্গিতে বক্রতা দরকার (সৈবা সর্বৈব বক্রোক্তিরনয়ার্থো বিভাব্যতে) স্বভাবিক বর্ণনা করা হয় না, তার কাবণ সেখানে বক্রোক্তি নেই। দণ্ডীর মতে, কাব্যের দুটি ভাগ - স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি। রুদ্রটও মনে করেন, শব্দশ্লেষের জন্য বা বস্তুর বাগ্‌ভঙ্গির (কাকু) জন্য বক্রোক্তি অলংকার হয়। কিন্তু ভামহ এভাবে বক্রোক্তিকে দেখেন নি, যদিও তাঁর উক্তিটি নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। ‘সৈবা সর্বৈব বক্রোক্তি’র নানা অর্থ নানা জন করেছেন। যেমন, আনন্দবর্ণনের মনে হয়েছে, ‘ভামহ অতিশয়োক্তি অলংকারকেই বুঝি বক্রোক্তি বলেছেন। অতিশয়োক্তিকে সর্বালংকার মনে করার বিরুদ্ধে অভিনব গুপ্ত অবশ্য প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কারণ, অতিশয়োক্তি যদি সকল অলংকার-স্বরূপ হয়, তবে তো কবিপ্রতিভার আর দরকার নেই। একমাত্র রাজ্ঞানক কুস্তকই বক্রোক্তিকে মর্যাদার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তাঁর সঙ্গে অবশ্য ভোজরাজের নামও পাওয়া যায়। তিনি তাঁর ‘সরস্বতীকণ্ঠভরণ’ গ্রন্থে কাব্যের তিনটি ভাগ করেছেন। যথা, বক্রোক্তি, স্বভাবোক্তি ও রসোক্তি। তাঁর মতে, রসোক্তিই শ্রেষ্ঠ। রসকাব্যের মধ্যে বক্রোক্তিও যে আছে, বক্রোক্তি দ্বারা রস সৃষ্টি যে সম্ভব, তা অবশ্য কুস্তকই জোর দিয়ে বলেছিলেন।

বক্রোক্তি কি? সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কুস্তক তাঁর ‘বক্রোক্তিজীবিত’ গ্রন্থে লিখেছেন, “বক্রোক্তিরেব বৈদম্ভ্য-ভঙ্গী-ভণিতিরূচ্যতে” অর্থাৎ বৈদম্ভ্যসহকারে ভণিতি বা উক্তির নাম বক্রোক্তি। তাহলে বক্রোক্তির দুটি লক্ষণ—বৈদম্ভ্য আর ভঙ্গি। বৈদম্ভ্যভাব ও কবিকর্মকৌশলকে বলা হয়েছে বৈদম্ভ্য। ভঙ্গি হলো ‘বিচ্ছিন্নি’ বা বৈচিত্র্য, চারুত্ব, চমৎকারিত্ব ইত্যাদি। সুতরাং রচনাকৌশল ও তার চমৎকার ভঙ্গি মিলিয়ে, বক্রোক্তির সৃষ্টি হয়। যে বক্রতা শব্দার্থকে মনোহর করে। বক্রতাই হয়ে ওঠে অলংকার-‘উভাবেতা-বলঙ্কার্যো’ বলে অন্তত কুস্তক এমন ধারণা প্রকাশ করেছেন। রস বা ধ্বনি নিয়ে তিনি আলোচনা করেন নি, কারণ, কুস্তকের কাছে ‘ধ্বনি’ একজাতীয় বক্রতা যার নাম ‘উপচার-বক্রতা’। শব্দাশ্রয়ী বাক্য রমণীয় হতে পারে বাচনভঙ্গির বা লিখনশৈলীর চমৎকারিত্বে। এক্ষেত্রে

ইংরাজী Figure কথাটি মনে আসতে পারে। যার অর্থ বস্তুর বাহ্যরূপ বা মূর্তি। কিন্তু অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী তাঁর “অলংকার চন্দ্রিকা” গ্রন্থে দেখিয়েছেন, ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে যখন বলা হয় ‘He has cut a figure’ তখন তার গঠনগত দেহরূপ থেকে সরে এসে ফিগার জ্ঞানিয়ে দেয় যে ব্যক্তিটি কোনো বিশেষগুণে অসামান্য ও শ্রদ্ধেয়। মানুষের ভাষার ক্ষেত্রেও অনুরূপ ভাবে বলা যায়, সাধারণ অর্থ প্রকাশের ভঙ্গি থেকে সরে এসে অসামান্যরূপে একপ্রকার ব্যক্তিত্বে মণ্ডিত হয়ে ভাবকল্পনাকে পরিমূর্ত্ত করলে, তাও হবে ফিগার। উত্তরকালে একেই Figure of speech বলা হয়েছে। অ্যারিস্টটলের ভাষায় Metaphor. ফলে অলংকারমূলক রচনাকে ‘মেটাফর’ বলার প্রবণতা ক্রমে দেখা গেল। অর্থবক্রতা হোল অলংকার। কুস্তক নিছক অলংকরণ থেকে বক্রোক্তিকে সরিয়ে আনলেন। বাগ্ভঙ্গির বৈদম্ব্য ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিলেন। একালে যাকে Aesthetic quality বলে, তারই সূচনা করলেন তিনি। শব্দবিন্যাসের মাহাত্ম্যে তা হৃদয়কে আধ্বুত করে বলেই বক্রোক্তি তাঁর কাছে কাব্যের প্রাণ।

বক্রোক্তিকে কুস্তক ছয়টি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা, বর্ণবিন্যাসবক্রতা, পদবক্রতা বা পদপূর্ব্বাধ-বক্রতা, প্রত্যয়বক্রতা বা পদপর্য্যাবক্রতা, বাক্যবৈচিত্র্যবক্রতা, প্রকরণবক্রতা এবং প্রবন্ধবক্রতা। এগুলির আবার নানা উপবিভাগ আছে। যেমন, পর্য্যায় বক্রতা, সম্পদবক্রতা, উপচারবক্রতা, ভাববক্রতা ইত্যাদি। কুস্তক এইসব বক্রতার নানা দৃষ্টান্তও দিয়েছেন। যার থেকে মনে হয়, “যে যে উপায়ে কাব্যের সৌন্দর্য সাধিত হয় ও হৃদয়ের চমৎকারকারী আহ্লাদ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই তিনি বিভিন্ন প্রকারের বক্রতা বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।” (কাব্যবিচার/সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত)। কাব্য সৌন্দর্যের দুটি দিক আছে—বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ। কুস্তক অন্তরঙ্গধর্মকে বলেছেন ‘সৌভাগ্য’ এবং বহিরঙ্গ ধর্মের নাম দিয়েছেন ‘লাবণ্য’। বাক্য বা শব্দার্থে এই উভয় ব্যাপার দেখা যায়। যা মনে আনন্দ দেয় তাই সৌভাগ্য; আর যা সৌন্দর্যবোধ জাগায়, তাই লাবণ্য। অবশ্য এর সঙ্গে ঔচিত্য বা সংস্থান সমাবেশ থাকাও দরকার। তবেই কবির ভাব সুসমায়ম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। কাব্য রচনার সময় কবির স্বভাব অনুসারে বক্রতা সৃষ্টি হয়। রুচি, শিক্ষা ও অভ্যাসের ফলেই লিখনশৈলী গড়ে ওঠে। তবু কুস্তকের মতে, রচনারীতি তিন প্রকার—সুকুমার, বিচিত্র ও মধ্যম রীতি। যেভাবেই লেখা হোক না কেন তাকে রমণীয় হতে হবে। যেমন, কালিদাসের রচনা সুকুমার রীতির। যা অনায়াসে পাঠককে আকৃষ্ট ও চমৎকৃত করে। পাঠক রসোপভোগে তৃপ্ত হয়। বাণভট্ট, ভবভূতির লেখা বিচিত্রমার্গের। মাতৃগুপ্ত, সম্ভীর প্রমুখ মধ্যমমার্গে লিখেছেন। সব লেখারই প্রধান লক্ষ্য সুন্দর ও আনন্দময় হওয়া এবং পাঠক-হৃদয় জয় করা। আর এভাবেই বক্রোক্তি ধ্বনি বা রস গোত্রের না হয়েও রস সৃষ্টি করতে পারে। তবে রসের গুরুত্ব তিনিও স্বীকার করে লিখেছেন, ‘নিরন্তর-রসোদগারগর্ভ সৌন্দর্য্যনির্ভরা’। শুধু কথা-ই কাব্য নয়; রস-নির্ভর না হলে বাক্য সুন্দর ও কাব্যময় হয় না।

বক্রোক্তির সমাদরের কারণ ‘রস’-কে কুস্তক অন্য ভাবে গ্রহণ করেছেন। বাগভঙ্গি ছাড়াও কবিকর্মকৌশলে সরসতা তৈরি হয় বলেই বক্রোক্তি আমাদের ভালো লাগে। যেমন, ভারতচন্দ্রের এই বাগ্বেদম্যম ভঙ্গি—

চন্দ্র সবে বোলকল্পা হ্রাসবৃদ্ধি তায়।

কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়।।

‘কাব্যলোক’ গ্রন্থে বক্রোক্তি ও রসোক্তির যুগলমিলন দেখানো হয়েছে কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্’ নাটকে দুয়ন্তের অনুরাগভরা এই উক্তিতে—

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলুনং করুণাহৈঃ

অনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিত-রসম্।।

কিংবা শিশু কাব্যে রবীন্দ্রনাথ শিশুর জন্মরহস্য জিজ্ঞাসার উত্তর মায়ের মুখে এইভাবে দিয়েছেন—

যৌবনেতে যখন হিয়া
উঠেছিল প্রস্থটিয়া
তুই ছিলি সৌরভের মতো মিলায়ে।

রবীন্দ্রনাথের “শেষের কবিতা” উপন্যাসে অমিত রায়ের বহু কথা বক্রোক্তিময়। যেমন,

১. জনতা না থাকলে নির্জনতার স্বাদ মরে যায়।
২. পৃথিবীতে আজকের দিনের বাসায় কালকের দিনের জায়গা হয় না।
৩. সম্ভবপরের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকা সভ্যতা, বর্বরতা পৃথিবীতে সকল বিষয়েই অপ্রস্তুত।

প্রথম চৌধুরীর একটি সুখ্যাত উক্তি—“ধানের চাষ পৃথিবীতে একমাত্র চাষ নয়, মনের চাষ বলেও একরকম চাষ আছে, আর সেই চাষেরই ফসল হচ্ছে সাহিত্য।” কিংবা ‘সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্র-ই স্বশিক্ষিত’-কে বক্রোক্তির দৃষ্টান্ত বলা যায়। সুতরাং কুণ্ডক যখন ‘বক্রোক্তিঃ কাব্য জীবিতম্’ বলেন, তখন তিনি বাক্চাতুর্যর পাশে তার সৌন্দর্যকে-ও ইঙ্গিত করেন। হেগেল যেমন বলেন, ‘expression of the insensuous through the sensuous medium’ রবীন্দ্রনাথের সেই গানের অংশ মনে পড়ে—

‘খড়া তোমার আরো মনোহর লাগে বাঁকা বিদ্যুতে আঁকা সে
গরুড়ের পাখা রক্ত রবির রাগে যেন গো অস্ত আকাশে।’

যে শব্দার্থ ‘সহৃদয়াহলাদকার স্বপ্নন্দসুন্দর’ তাই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু বক্রোক্তি যেখানে বাক্‌সর্বস্ব, শোভাশূন্য তাকে কাব্য বলা যায় না। তা’ কাব্যের আত্মা-ও নয়। তবে অড়েন কথিত ‘মেমোরেবল স্পীচ’ আর ‘উক্তি বিশেষঃ কাব্যঃ’—সমালোচকের মতে বক্রোক্তির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

৪. তনুদেহটি সাজাব আভরণে

গদ্যে সোজাসুজি কথা মানানসই হলে ও, কবিতার ক্ষেত্রে বক্রোক্তির প্রয়োজন আছে, দেখা গেল। কিন্তু বাচন ভঙ্গির বিশিষ্টতার সঙ্গে যদি সজ্জা যুক্ত হয়, তবে তা আরো মনোহর হয়ে ওঠে। এই জন্য কবিতার সঙ্গে অলংকারের যোগ প্রাচীনকাল থেকেই স্বীকৃত। এমনকি আচার্য ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে রসের কথা বললেও, অলংকারকে ছাড়তে পারেন নি। তার কারণ, কবিরা যখন কথা বলেন, তখন সাধারণ ভাষা না হয়ে তা’ কবিভাষা হয়ে ওঠে। তার জন্য দরকার অলংকরণের। কাব্যকে নারীর সঙ্গে তুলনা করে তাঁর ‘সাহিত্য’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “কিন্তু মেয়েদের সুন্দর হওয়া চাই। ...মেয়েদের ব্যবহারে অনেক আবরণ আভাস-ইঙ্গিত থাকা চাই।” কবিতা ও নারীর কাজ হৃদয় হরণ করা। ফলে ‘হৃদয়ের ভাব উদ্বেক করিতে সাজসরঞ্জাম অনেক লাগে।’ তাঁর মতে, কাব্যকে সাজিয়ে কবিরা খুশি হন। “মা যেমন করে ছেলেকে সাজায়, প্রিয় যেমন সাজায় প্রিয়াকে, বাসের ঘর যেমন সাজাতে হয় বাগান দিয়ে, বাসরঘর যেমন সজ্জিত হয় ফুলের মালায়।” তেমনি করে কথারও সজ্জার দরকার। অলংকার হলো ‘চরমের প্রতিরূপ’। কডওয়েলও মনে করেন, সাহিত্যে অলংকার ‘exaggeration’ যার প্রভাব পড়ে সাধারণ মানুষের মনে এবং তারা অনুভব করে ‘stimulus of the feeling’ ‘poetic forms of speech’ (Illusion and Reality)।

অলংকারের অর্থ ভূষণ, আভরণ। যার দ্বারা ভূষিত করা যায় তাই অলংকার। অর্থাৎ অলংকারের কাজ শোভা বৃদ্ধি করা। আচার্য দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে লিখেছেন, ‘কাব্য শোভাকরান্

ধৰ্ম্মান্ অলংকারান্ প্রচক্ষতে’। আর ভামহ মনে করেন, প্রিয়ার মুখ স্বভাবসুন্দর হলেও নির্ভূষণ বা অলংকারহীন হলে সেই সৌন্দর্য ফোটে না। যে কাব্য নিরলঙ্কৃত তা’ বিধবাতুল্যা এমন কথা অগ্নিপুরাণের—‘অর্থালংকার রহিতা বিধবেব সরস্বতী’। তাই কাব্যে অলংকার যে প্রয়োজনীয়, সন্দেহ নেই। অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী তাঁর “অলংকার-চন্দ্রিকা” গ্রন্থে দেখিয়েছেন সকল কবির খ্যাতির মূলে আছে অলংকার প্রয়োগের নৈপুণ্য। ‘উপমা কালিদাসস্য’ কথাটির উৎপত্তির মূলেও আছে এই অলংকার। রবীন্দ্রনাথও উপমার রাজা। আধুনিক কবিরাজ অলংকারহীন কবিতা লেখেন না। যেজন্য জীবনানন্দ দাশকে বলতে হয় : ‘উপমাই কবিত্ব’। সুতরাং শব্দার্থময় কথাবস্তু কিংবা বক্রোক্তিময় বাক্য হয়েই কাব্য চিত্তকর্ষক হতে পারে না, তাকে সুন্দর হতে হয়। সেই সৌন্দর্য সৃষ্টি করে অলংকার।

তাই আচার্য বামন বললেন : কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলঙ্কারাৎ (কাব্যালঙ্কার-১।১।১)। অতুলচন্দ্র গুপ্ত শুধু এই সূত্রটির ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর ‘কাব্যজিজ্ঞাসা’ গ্রন্থে। ফলে, তাঁর মনে হয়েছে ‘অলংকৃত বাক্যই কাব্য’ এমন সিদ্ধান্ত অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। অলংকার বলতে তিনি শব্দালংকার ও অর্থালংকার বুঝেছেন। কিন্তু পাশাপাশি বামনের এই সংজ্ঞা দেখেন নি, যেখানে তিনি বলেছেন, ‘সৌন্দর্যম্ অলংকারঃ’। ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্তের মতে, ‘বামন অলংকারকে কাব্যের আত্মভূত সৌন্দর্যই বলিয়াছেন’। এবং ‘সৌন্দর্য আছে বলিয়া কাব্য সকলের নিকট উপাদেয়।’ (কাব্যালোক)। এই কারণে অলংকার শাস্ত্রের অপর নাম সৌন্দর্যশাস্ত্র বা ‘Aesthetic of Poetry’ এখানে সৌন্দর্য নির্দিষ্ট বা বিশেষ নয়, নির্বস্তুক ধারণা, ফলে তার ব্যাপ্তি অনেকখানি, আচার্য জগন্নাথের রমণীয়ার্থ বাক্যও সেক্ষেত্রে সৌন্দর্যসীমায় পড়ে। কারণ, সংস্কৃতে অলম্ শব্দের একটি অর্থ ভূষণ, অন্যটির অর্থ, কোনো নির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনের সামর্থ্য। এই ভূষণ ও সামর্থ্য মিলে কাব্যদেহে আসে শ্রী। যা কাব্যকায়ার কান্তিকে উজ্জ্বল করে। “বিচিত্রিতা” কাব্যের ‘দ্বিধা’ কবিতায় বধূর সজ্জার মনোজ্ঞ বিবরণ এইরকম—

চন্দনের গন্ধজলে মুছালো মুখখানি
নয়নপাতে কাজল দিল আঁকি।
ওষ্ঠাধরে যতনে দিল রক্তরেখা টানি,
কবরী দিল করবীমালাে ঢাকি।

এই কারণে ভামহের মনে হয়েছিল ‘ন কাস্তমপি নির্ভূষণং বিভাতি বনিতামুখম্’ অর্থাৎ ‘বনিতার মুখ মনোহর হলেও বিনা অলংকারে দীপ্তি পায় না।’ এখানে অলংকার বাহ্য উপাদান হয়েও সৌন্দর্যবর্ধক। অতুলচন্দ্র গুপ্ত নিছক অলংকরণকে যা দেহে কটককুণ্ডলাদির মতো, বহিরঙ্গ ভেবেই, বামনের মতকে তেমন গুরুত্ব দেন নি।

নিছক অলংকারকে শোভা বললে, বিলাস ভাবনা তার সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু সৌন্দর্য শব্দটি যুক্ত হলেই তার ব্যঞ্জনা গভীরতর হয়ে ওঠে। তখন ‘দ্বিধা’ কবিতার পরবর্তী অংশটুকু অবিচ্ছেদ্য মনে হয়—

ভূষণ যত পরালো দেহে তাহারি সাথে ব্যাকুল নেহে
মিলিল দ্বিধা, মিলিল কত ভয়।

এই হৃদয়েব ভাব ও স্পন্দনই সৌন্দর্য। আমাদের প্রাত্যহিকতার মধ্যে সৌন্দর্য ‘একটা উচ্চতর সুর’ লাগায় বলেই রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, তা’ আমাদের প্রবৃত্তিকে সংযত করে ও আনন্দ জাগায়। এইজন্য কবির লক্ষ্য চিত্তরঞ্জন করা ও সৌন্দর্য সৃষ্টিকরা। বঙ্কিমচন্দ্র যখন লেখকের কাজ রূপে ‘সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ’ সৃষ্টি বলেন, তখন ‘Watts-Dunton’ বলেন, ‘the poet must never

forget that his final quest is beauty' (What is Poetry) কুস্তক বক্রোজিকোও অলংকার বলেন এজন্য, যে কাব্যটি যাতে রমণীয় হয়ে ওঠে; আহ্লাদজনক হয়। তবে বামন জানান, কাব্যশোভার মূল কারণ গুণগুলি। অলংকার সেখানে শোভা বৃদ্ধি করে। বামন নিজেও অলংকারকে শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য দেন নি। তাই রীতিবাদের প্রবর্তনা তিনি করেন। তবু কাব্যে অলংকারকে হেয় করা যায় নি। অলংকার অনন্ত, এমন বলেছেন আনন্দবর্ধন। আর অগ্নয়াদীক্ষিত একশো চব্বিশ রকম অলংকারের আলোচনা করেছেন।

যেহেতু অলংকারকে কটককুণ্ডলাদির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে (যেমন, সাহিত্য দর্পণে আছে 'অলংকারাশ্চ কটককুণ্ডলাদিবৎ') তাই প্রশ্ন জাগে অলংকার খুলে নিলে সেই কবিতার কবিত্ব বা কাব্যত্ব থাকে কি না। অতুলচন্দ্র গুপ্তর মতে—

তরঙ্গনিকরোন্নীততরুণীগণসংকুলা।

সরিদ্ বহতি কম্পোলব্যাহব্যাহততীরভূঃ।।

(তরুণী তরঙ্গ উঠিয়া নদীতে ছাইয়া ফেলিল নীর।

কম্পোলময়ী বহতী সরিতে বাধা দিল দুই তীর।।)

অনুবাদক : দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। দ্রঃ কাব্যতত্ত্ব বিচার।

এখানে অলংকার আছে, কিন্তু কাব্যত্ব নেই। কিন্তু কবিতার বিচার এতখানি ব্যাকরণগত ভাবে দেখাও বোধহয় ঠিক নয়। অনুপ্রাসাদি অলংকারের কথা ছেড়ে দিলেও যে শব্দচিত্র এখানে আছে তা ভালো লাগার পক্ষে যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথের “সোনার তরী” কবিতায় ‘ঢেউগুলি নিরুপায়/ভাঙে দু’ ধারে’ কিংবা “আষাঢ়” কবিতায় ‘দু’কূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,/দরদর বেগে জলে পড়ি জল ছলছল উঠে বাজি রে’। তখন এগুলির চিত্র-সৌন্দর্য অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ তো বলেছেন, চিত্র এবং সঙ্গীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার দেয়, সঙ্গীত দেয় গতি। অবশ্য অলংকারের সাহায্য না নিয়ে যে কাব্য রসগ্রাহী হয় সে তো নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট। অতুলচন্দ্র তার দৃষ্টান্ত হিসেবে কালিদাসের অকালবসন্ত বর্ণনার উল্লেখ করেছেন—‘মধু দ্বিরেকঃ কুসুমৈক পাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ’ ইত্যাদি শ্লোকে অনুরাগের অপূর্বতা হৃদয়স্পর্শী। রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্যের ‘বধু’ কবিতাটি প্রায় অনলঙ্কৃত, কিন্তু হৃদয়বেদ্য। “ক্ষণিকা” কাব্যের ‘আষাঢ়’ কবিতাটিও প্রায় নিরাভরণ অথচ কবিত্বপূর্ণ। সুতরাং অলংকার না থাকলে কবিতা হবে না, এই মত ভ্রান্ত, কিন্তু অলংকারের গুণে বাক্য যে কাব্য হয়ে ওঠে, এমন ভাবনাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তার প্রমাণ, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ প্রমুখের কবিতাবলী।

অলংকারবাদকে নিয়ে বিতর্কের হেতু হলো, অলংকার সর্বদা কাব্যে মানায় কিনা। যে কবির ঔচিত্যবোধ নেই, সংস্থান সমাবেশ স্জান নেই তিনি অলংকারের ভুল প্রয়োগ করেন। তা হয় সন্ন্যাসীর বা মৃতদেহে সাজসজ্জা পরানোর মত অর্থহীন বা হাস্যকর। প্রয়োগকৌশল না জানলে কী হয়, তার চমৎকার উদাহরণ আছে দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পণ” নাটকে। যেখানে চাষীরা জমিদার বাবুর বাজকীয় মহিমা ও গাঙ্গীর্থ বোঝাতে গিয়ে বলে, “বাবু বসে আছে য্যান গজেন্দ্রগামিনী”। শেষোক্ত শব্দটির অর্থ তাবা জানে না, অথচ ভালো লেগেছে বলেই ব্যবহার করে। এমন বোধসম্পন্ন কবিরাই লিখতে পারেন ‘দাদুরী উড়িছে আকাশে’। ধন্যালোক কবির বা কাব্যের দুটি দোষ দেখেছেন অব্যুৎপত্তিকৃত ও অশক্তিজনিত। শক্তিহীন কবি অনেকসময় ‘চিত্রকাব্য’ রচনা করেন। অলংকারের বাহ্য কবিতার রস ও কাব্যধর্মকে কতখানি নষ্ট করে তার দৃষ্টান্ত কবিওয়ালাদের রচনাগুলি, যেখানে অনুপ্রাস শ্লেষ যমক রূপকের বাহ্য কবিতাকে অপাঠ্য করেছে। আবার অনুপ্রাসের লোভে যখন

বৈষ্ণবকবি জগদানন্দ লেখেন ‘মঞ্জুবিকচ কুসুমপুঞ্জ মধুপশব্দ গঞ্জি গুঞ্জ/ কুঞ্জর গতি গঞ্জি গমন মঞ্জুল-কুলনারী’, তখনও অলংকার বাহুল্য ভার মনে হয়। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কাতরোক্তি মনে আসে ‘অলংকার যে মাঝে পড়ে/মিলনেতে আড়াল করে/তোমার কথা ঢাকে যে তার মুখর ঝংকার।’ নিঃসন্দেহে এসব ক্ষেত্রে অলংকার ত্যাগ্য। কেননা এখানে ভূষণ দূষণমাত্র। তবে যেখানে ‘ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ’ সেখানে অলংকার সার্থক। ধ্বন্যালোক এক্ষেত্রে বলেন—

রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শ্যাক্রিয়ো ভবেৎ।

অপুথগযত্ব-নিবর্ত্যঃ সোহলঙ্কারোধ্বনৌ মতঃ॥

অর্থাৎ “রসকর্তৃক আক্ষিপ্ত বা আকৃষ্ট হইলে যাহার রচনা সম্ভবপর হয়, রসের সহিত কেই প্রযত্নে যাহা সম্পন্ন বা সিদ্ধ হয়, তাহাই ধ্বনিশাস্ত্রে অলংকার বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে।” (কাব্যলোক)। ডঃ সুধীর দাশগুপ্তর মতে, ‘অলংকার যেন রসের রূপে পরিণতির পথে স্বতঃস্ফূর্ত হয়’। একথা অবশ্য মান্য। কবি যখন তাঁর প্রিয়াকে ডাক দেন, তার ঝোঁপায় তারার ফুল দিতে বা রামধনু রঙে চান পা রাজাতে; কিংবা বলেন ‘তনুদেহটি সাজাব আভরণে’—তখন সেই ভূষা কাঁয়া ও কান্তিকে উজ্জ্বল করে। সেখানে অলংকার রসময় হয়ে হরগৌরীরাপলাভ করে। তখনই কাব্যে অলংকার গ্রাহ্য হয় সৌন্দর্য রূপে।

৫. চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে

তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে ‘রসো বৈ সঃ’; কারণ, ‘রসং হোবাযং ললানন্দী ভবতি।’ মিতাক্ষরে এর ভাবানুবাদ করেছেন রবীন্দ্রনাথ—“তিনিই রস; এই রসকে পাইয়াই মানুষ আনন্দিত হয়।” (সৌন্দর্যবোধ)। কী এই রস? কে এই রসের আধার? কেমন তার আশ্বাদ? এমন নানা প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। যেভাবে বাস্তবিক বলেছিলেন: কিমিদম্? একালের কবি বলবেন, ‘একি গভীর বাণী এলো?’ গভীর বাণী যখন মনেই পড়ল তখন বলা ভালো রসের সঙ্গে তার সম্পর্ক সুদূর নয়। বঙ্গাল নিবাসী অজ্ঞাতপরিচয় কবির গঙ্গাপ্রশস্তিতে পড়ি—

ঘনরসময়ী গভীরা বক্রিমসুভগোপজীবিতা কবিভিঃ।

অবগাঢ়া চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গালবাণী চ॥

ঘনরসময়ী গভীর বক্রোক্তিশোভন বঙ্গালভাষা/বাণী-ই পাঠযোগ্য, স্বাদযোগ্য। কবিতার কায়নির্মাণে শব্দ অর্থ অলঙ্কার রীতি ইত্যাদি একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু এ শুধু বাহ্যরূপদর্শন; কাব্যের অন্তঃসার পেতে হলে দরকার ব্যঞ্জনা; যাকে ধ্বনি, রসধ্বনি বলেছেন আলংকারিকেরা।

কাব্যের আশ্বাস সন্ধানে বেরিয়ে ভারতীয় আলংকারিকরা বহু মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। শেষপর্যন্ত প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন : কাব্যের আশ্বাস ‘ধ্বনি’। অভিনব গুপ্ত এর তিনটি রূপ দেখেছেন—বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি, রসধ্বনি। বস্তুধ্বনিতে পাই শব্দ-প্রয়োগের নৈপুণ্য; অলংকারধ্বনি এমন কিছু কল্পিত বিষয় প্রকাশ করে যা আলংকারিক। রসধ্বনির কাজ রস সৃষ্টি করা। ধ্বনি ও রসের মধ্যে ভেদরেখা টানা হলেও অন্তর্গত মিল উপেক্ষা করা যায় না। ধ্বনি তো Sound নয়, তা ‘suggested meaning’। শব্দসজ্জাত ধ্বনিকে আমরা যদি শব্দব্রহ্ম রূপে ভাবি, তবে আনন্দবর্ধন ব্যাখ্যাত ‘শ্রদয়মাণেষু বর্ণেষু ধ্বনিঃ’ মেনে নিতে অসুবিধে হয় না। লোচন এর ব্যাখ্যায় ‘ঘটানুরণনরূপত্বং তাবৎ অস্তি’ বলেছেন। অর্থাৎ উচ্চারিত শব্দ ও তার অর্থ-ই শেষ কথা নয়, তার রেশ (‘মধুর মধুর ধ্বনি বাজে...’) হয়ে ওঠে যথার্থ ধ্বনি। ‘যে গান কানে যায় না শোনা / সে গান যেথায় নিত্য বাজে’ তো ধ্বনি। heard melodies তখন হয়ে যায় ‘unheard’। ধ্বনির পূর্বাবস্থা ‘স্ফোট’। সুপণ্ডিত সুশীলকুমার দে বলেছেন “The sound of word as a whole, therefore,

and apart from those the constituent letters reveal the Sphota" (History of Sanskrit Poetics)। ভর্তৃহরি তাঁর “বাক্যপদীয়” গ্রন্থে বলেছেন, “স ফোটিঃ শব্দজ্ঞাঃ শব্দাঃ।” শব্দের ভিতরে অশব্দবাচ্য ইঙ্গিত বা ব্যঞ্জনাই ধ্বনি। ব্রাডলের ভাষায় তা ‘Infinite suggestion’। একে অঙ্গনাজনের লাভণ্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

তবু ধ্বনির সঙ্গে রসের পার্থক্য থেকেই যায়। অনুভব আর আনন্দ যখন একসঙ্গে মেলে, তখনই জন্ম হয় রসধ্বনি বা রসের। কি এই রস? অভিনব গুপ্তকে সাক্ষী মেনে অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন, “সহৃদয় লোকের অর্থেৎ কাব্যানুশীলনের অভ্যাসবশে যাদের দর্পণের মতো নির্মল মন কাব্যের বর্ণনীয় বস্তুর যেন তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, এমন দরদী লোকের সুকাব্যজনিত চিন্তের অনুভূতিবিশেষের নামই ‘রস’” (কাব্যজিজ্ঞাসা/রস)। তবু এককথায় বলা যায় রস হলো তাই যা আনন্দন করা যায়। চমৎকার ভাবে রবীন্দ্রনাথ বলেন,

যা আমরা দেখছি, শুনছি তার সঙ্গে যখন অনির্বচনীয়ের যোগ হয় তখন তাকেই আমরা বলি রস। অর্থাৎ সে জিনিসটাকে অনুভব করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না।

(ছন্দ/ছন্দের অর্থ)

রস অভিধা বা লক্ষণার নাগালের বাইরে। ব্যঞ্জনাই তার আশ্রয়। মানবমনের স্থায়ী ভাব এই রস কিভাবে প্রকাশ পায়? আচার্য ভরত বলেছেন; ‘বিভাবানুভাব ব্যভিচারি সংযোগাৎ রসনিষ্পত্তি’ মনে যা ভাব জাগায় তাই বিভাব। এর দুই ভাগ। আলম্বন ও উদ্দীপন। মেঘ দেখে রাধার মনে কৃষ্ণভাব উদ্দীপিত হলো। কালো মেঘ তাই আলম্বন বা অবলম্বন। আর কৃষ্ণরতি ভাব জাগ্রত হওয়াই হলো উদ্দীপন। অনুভাব এই ভাবের প্রতিক্রিয়া। আনন্দ-শিহরন, রোমাঞ্চ, হাসি ইত্যাদি ভাবের বহিঃপ্রকাশই অনুভাব, আর ব্যভিচারি বা সঞ্চারী অস্থায়ী। কোনো নির্দিষ্ট স্থায়ীভাব আঁকড়ে ধরেই তার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা। ‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধু’তে (২/৩/১) পাই—“সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিনোপিতে।” তুলনা দিয়ে বলা যায় রাজার সভাসদ, বাবুর সঙ্গে পারিষদ, নদীর ধারার সঙ্গে তরঙ্গভঙ্গ। কবির ভাষায় ‘তটের বৃকে লাগে জলের ঢেউ/তবে সে কলতান উঠে’। সঞ্চারিভাব দ্বারা পুষ্ট না হলে রস রসত্ব পায় না—ধ্বন্যালোক বলে।

কিন্তু ‘নিষ্পন্ন’ শব্দের ব্যাখ্যায় পণ্ডিতেরা নানা মত তৈরি করেছেন। তার মধ্যে প্রধান সূত্র চারটি।

ভট্টলোল্লট	-	উৎপত্তিবাদ
ভট্টশঙ্কুক	-	অনুমিতিবাদ
ভট্টনায়ক	-	ভুক্তিবাদ
অভিনবগুপ্ত	-	অভিব্যক্তিবাদ

অর্থাৎ প্রথমজন মনে করেন, রস উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় জনের মতে, রস অনুভূত বা অনুমিত হয়। তৃতীয়জনের ধারণা, রস চর্চণা-ই ভোগীকৃতি বা উপভোগমাত্র। কিন্তু চতুর্থজন এসব মত খণ্ডন করে বলেন, রসসৃষ্টির এগুলি বাহ্য বিষয়। অসলে রস অভিব্যক্ত হয়। “অভিনবগুপ্তই রস সৃষ্টির রসতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ মীমাংসক” (সাহিত্য মীমাংসা/বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য)। তিনি একে ‘সংবেদন ঘন চৈতন্যের আনন্দাংশের আবরণ ভঙ্গমাত্র’ বলেছেন। ব্রহ্মস্বাদের মতো তখন এই রসাস্বাদে সহৃদয় সামাজিক বলতেই পারেন—“কেমন করিয়া জ্ঞানাব আমার/জুড়ালো হৃদয় জুড়ালো।” তখন দেহমন ভূমানন্দময়—উর্ধ্বচারী। বাইরের জগতের সুখদুঃখ, হাসিকান্না, চাওয়া পাওয়ার রঙের খেলনা ভেসে যায় রসের স্রোতে। রসতীর্থ পথের পথিক রসাস্বাদে বিহ্বল হয়ে বলে,

জীবনজুড়ে লাগুক পরশ,

ভুবন ব্যোপে জাগুক হরষ,

‘তোমার রূপে মরুক ডুবে

আমার দুটি আঁখি তারা।

এই রসাস্বাদ বা রসানুভবকে রসপ্রতীতিরূপেও কেউ কেউ দেখেছেন। মূল কথা কিন্তু রস পাওয়া। আনন্দ পাওয়া। অতুলচন্দ্র গুপ্ত ক্রোচের প্রবন্ধের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন রসের ভূমিকা “we pass from troublous emotion to the serenity of contemplation” হয়ত দার্শনিকতা কিন্তু আন্তরিক উচ্চারণ এটি। আরিস্টটলের তত্ত্ব আলোচনায় বুচার এই রসাস্বাদকে ‘emotional delight’ বলেছিলেন। সঙ্গে ছিল এই বিশেষণ ‘a pure and elevated pleasure’. আপত্তি হতে পারে বুদ্ধিবিচার কেন উপেক্ষিত হবে? বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে রস উপভোগ করার কথা কেউ বলেন নি; কিন্তু রসাস্বাদকে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে তা আর কি আনন্দময় হয়? যেকোনো ভালোবাসাই তো রসের ব্যাপার। সেক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধিকে সজাগ রাখলে তার মাধুর্য থাকে না। এজন্যই বুচার বলেছেন, “The main appeal is not to the reason, but to the feelings” (Aristotle’s theory of Poetry and Fine Art)। নয় রস সাহিত্যে আছে ‘আমরা জানি, কিন্তু আমরা সংখ্যা চাই না। চাই আনন্দ। যে আনন্দন Saddest thought-কে Sweetest করে তোলে। একটু অন্য ভাবে রবীন্দ্রনাথ “সোনার তরী” কাব্যে বলেছেন—

অস্তুর হতে আহরি বচন

আনন্দলোক করি বিরচন,

গীতরসধারা করি সিঞ্চন

সংসার ধূলিজ্বালে। (পুরস্কার)

নাটক, কাব্য উপন্যাস ইত্যাদি সাহিত্যের সব শাখার লক্ষ্য কিন্তু রসের উদ্বোধন। পাঠকচিত্ত বিগলিত হয়, মুগ্ধ হয় এই রসবোধে। যদিও সবাই রসের রসিক হতে পারেন না, এও সত্য। বাসনালোক অর্থাৎ পূর্বজন্মার্জিত সংস্কার কিংবা কাব্যানুশীলনে নির্মল চিত্ত যে নয় তার পক্ষে রসাস্বাদ করা অসম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় বেগুনঅলার কাছে হীরার দর পাওয়া যায় না। রসের অভিব্যক্তি-ই শেবপর্যন্ত কাব্যের তথা সাহিত্যের উদ্দেশ্য। এজন্যই বলা হয় ‘রস’ কাব্যের আত্মা। ‘বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্’ যখন বলা হয় তখন তাকে পরিহাস করা যায় না। “সাহিত্যের পথে” গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এইসূত্রে বলেছেন, “সৌন্দর্যরসের সঙ্গে অন্য সকল রসেরই মিল হচ্ছে ঐখানে, যেখানে সে আমাদের অনুভূতির সামগ্রী, অনুভূতির বাইরে রসের কোনো অর্থই নেই। রসমাত্রই তথ্যকে অতিক্রম করে তাকে অনির্বচনীয় ভাবে অতিক্রম করে।” বচনীয় ও অনির্বচনীয়-র এই দ্বন্দ্ব-ছন্দকে একটি প্রাচীন উপমায় বিশ্লেষণ করা যায়। যেখানে বলা হয়েছে—“অঙ্গনারীর অনাবৃত পয়োধর এবং গুর্জর দেশীয় রমণীর সযত্ন প্রচ্ছাদিত স্তনদ্বয় ইহাদের কোনটিই যেমন সৌন্দর্যরসিকগণের দৃষ্টি বিলোভিত করিতে পারে না ...কিন্তু মহারাষ্ট্র বধুর স্তনদ্বয়ের মতো ঈষৎ অনাবৃত ও ঈষৎ আবৃত, তাহাই সহৃদয়ের প্রীতিকর।” অর্থাৎ বলা না-বলা বাণীর রহস্যই পাঠককে আকর্ষণ ও তৃপ্ত করে। আর অবিশ্রাম বেজে চলে নীল লাবণ্যের বংশীধ্বনি। যে ধ্বনির রেশ নিয়ে বলা যায় ‘রসো বৈ সঃ’—তুমি রসসুন্দর!

আমার এই প্রবন্ধের প্রথম পাঠক ছিলেন ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পুণঃস্মৃতিতে এই প্রবন্ধটি উৎসর্গ করলাম।

রবীন্দ্রবীক্ষণে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য

সনৎকুমার নস্কর

ফেলে-আসা দুই সহস্রাব্দের মধ্যে বাঙালি-মনীষার চূড়ান্ত সারস্বত-প্রকাশ নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ। এই বিচিত্রকর্মা মানুষটির শক্তির তৌলন করঃ প্রায় দুঃসাধ্য। তাঁর জীবনের সমগ্র কর্মধারার দিকে বিহঙ্গদৃষ্টিতে তাকালে দেখা যাবে, সাহিত্য রচনার বাইরে তিনি আরো কতভাবে নিজেকে মেলে দিয়েছিলেন জনতার মাঝখানে। তিনি হয়ে উঠেছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের সূচনাপর্বের বিশিষ্ট নায়ক, দেশীয় শিক্ষাচিন্তার অন্যতম পরিকল্পক, দুর্গত পল্লীর সংগঠক। বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথও কি আলাদা করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন না? রাজা রামমোহনের মতো তিনিও তো ছিলেন বিশ্বের দরবারে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের বার্তাবহ। পৃথিবীর তাবৎ সমকালীন মনস্বীদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ যোগাযোগ চিনিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের মানস-আত্মীয়তার বৈশ্বিক গণ্ডিকে। বাইরের জগতে এই যে তাঁর চলাচল তার দ্বারা যথেষ্টভাবে প্রভাবিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাবিশ্ব। আখেরে লাভবান হয়েছি আমরা। সাহিত্যের নানা শাখায় তার বিচিত্র প্রকাশে রবীন্দ্রনাথও হয়ে উঠেছেন বর্ণবস্ত্ত। সৃষ্টির জগতে এ ধরনের বহুমুখী প্রতিভাকে বহু তল ও অসংখ্য প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট প্রাসাদ-অট্টালিকার সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে জাগে। সে কেবল তার আয়তনগত বিশালতার কারণে নয়, তার ভিতরকার আন্তঃতলিক সম্পর্কের জন্যও বটে। এই ধরনের প্রতিভায় ভিত্তিতলের প্রধান ফটক পেরিয়ে অন্দরমহলের ভিতরে প্রবেশ করে তারপর ধাপ বেয়ে প্রয়োজন মতো নানা তলে ওঠা-নামা সম্ভব। আর একই তলভুক্ত নানা কক্ষে বিচরণে তো কোন সমস্যাই নেই। শীর্ষচূড়া থেকে অধোগঠনের শেষতম সীমা পর্যন্ত, উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমের যাবতীয় বিস্তারসহ একটা চমৎকার সুসঙ্গত পরিকল্পনার ছক যেন ধরা দিতে থাকে এ ধরনের বহুতলিক প্রতিভায়। ফলে এঁদের ক্ষেত্রে সৃষ্টিসম্ভারের চরিত্র-বিচারে এই মোটা সূত্রটি বিস্মৃত হলে চলবে না যে, বহু প্রকাশে বর্ণময় মানুষটি আদতে একটি অভিন্ন জীবন-অভিজ্ঞতাই প্রকাশ করছেন বিচিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে। তবে এরই সঙ্গে মনে রাখা চাই এমন বৃহদায়তন স্থাপত্যের ভিত্তিতলের সাংগঠনিক ইতিবৃত্তের রহস্যটুকু। কেননা সে তো নিছক আর-পাঁচটা নির্মাণের মতো অতি-সাধারণ নয়। যদি তা হতো তাহলে এতবড় সৃষ্টির ইমারতকে রক্ষা করা তার পক্ষে নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য হতো। বস্ত্ত প্রতিভাশক্তির জোর না থাকলে একজন শ্রমীর পক্ষে এভাবে নানামুখী হয়ে ওঠা অসম্ভব। আবার প্রতিভা, সে তো কেবল দেবদত্ত অলৌকিক শক্তিমাত্রই নয়, তার কিছুটা অংশ মানুষের নিজস্ব অর্জন। আমাদের জাগ্রত সত্তায় প্রতিমূহূর্তে মিশে যাচ্ছে যেসব অনেকান্ত অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, শিক্ষা—প্রতিভার চেহারা গঠনে তারাও নেয় বিশেষ ভূমিকা। অন্যদিকে, যে-সংস্কৃতির শক্তিশালী আবহে বড় হয়ে ওঠেন লেখক সেই সংস্কৃতির অতীত ঐতিহ্যেরও একটা প্রবল প্রভাব পড়ে প্রতিভায়। আর এদের সামগ্রিক যোগফলই গড়ে তোলে একজন প্রজ্ঞাবান শ্রষ্টাকে।

রবীন্দ্র-প্রতিভার যৌগিক রসায়নের বিশ্লেষণে তাঁর সমকালের দেশ-কাল থেকে শুরু করে অনেক কিছু উপকরণের সম্ভান পাওয়া যাবে। উনিশ শতকে শহর কলকাতাকে ঘিরে সূচনা হয় বাঙালি তথা ভারতবাসীর নতুন করে জেগে ওঠার পালা। সেই জাগরণে যাদের সদর্থক ভূমিকা বিশেষভাবে চোখে পড়ে তাদের মধ্যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সদস্যরাই অন্যতম। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকে এই পরিবারটি হয়ে উঠতে থাকে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ এক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা-দীক্ষায়, সাহিত্যে-শিল্পকলায়, নৃত্যে-সংগীতে তাঁদের অবদান সহজে ভোলবার নয়। এমন একটা সম্পন্ন পরিবারে প্রথম চোখ মেলবার সৌভাগ্য হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। তাঁর

জন্মের সময়ে ঠাকুর-পরিবারে আর্থিক দৈন্য দেখা দিলেও আভিজাত্যের ঠটিবাটটুকু তখনো বজায় ছিল। প্রিন্সের পৌত্র হিসেবে তিনিও তাঁর বাল্য কাটিয়েছিলেন আমিরি ঘরানায়, ভূত্যরাজক তন্ত্রের মধ্যে। বাল্য থেকে যৌবনোদগম পর্যন্ত সময় পর্বে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাশিক্ষার আয়োজনও হয়েছিল যথারীতি। নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল আকাদেমি, মেট্রোপলিটন স্কুল, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, লন্ডন ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে তাঁকে বিদ্যাশিক্ষার পাঠ নিতে হয়েছিল। কিন্তু বিদ্যালয়ের বাঁধাধরা জীবন তাঁর ধাত্তে সয়নি। ফলে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায় তাঁর বিদ্যালয়ের দুঃসহ দিন। পরিণামে তাঁর আর আই.সি.এস. হয়ে ওঠা হয়নি। এমনকি পাননি পোস্ট-ম্যাট্রিকের তকমা। ঘরে-বাইরে এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে অভিভাবকদের কম গঞ্জনা শুনতে হয়নি। অথচ তাঁর সেই অপদার্থতা (?) দিয়ে তিনি তাঁর সারাজীবন ধরে যা-কিছু সৃষ্টি করে গেছেন তার সমান্তরাল দৃষ্টান্ত পাওয়া দুর্লভ। মনে প্রশ্ন জাগে, কেমনভাবে তাঁর ভিতরে তৈরি হয়ে উঠেছিল সেই বিপুল কৃতবিদ্যতা যা সর্বকালের অনতিক্রম্য এক দৃষ্টান্ত হয়ে রইল? এর একটা অংশ নিঃসন্দেহে তাঁর ভাগ্যদেবতার কৃপা, বাকি অংশটুকু তাঁকে অর্জন করতে হয়েছে শ্রম, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়। রবীন্দ্রজীবনের খোঁজ-খবর রাখেন যারা তাঁরা জানেন যে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরেই বরং রবীন্দ্রনাথ বেশি মাত্রায় নানা জাতীয় বিদ্যাকে রপ্ত করেছিলেন। ‘আশ্রমের রূপ ও বিকাশ’ গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন তাঁর বিদ্যালোভের ইতিবৃত্তের কিয়দংশ - ‘যখন আমার বয়স তেরো তখন এডুকেশন বিভাগীয় দাঁড়ের শিকল ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়েছিলাম। তারপর থেকে যে-বিদ্যালয়ে হলেম-ভর্তি তাকে যথার্থই বলা যায় বিশ্ব-বিদ্যালয়। তখন আমি যেসব বই পড়বার চেষ্টা করেছি কোন কোন গুরুজন তা আমার হাতে দেখে মনে করেছেন স্পর্ধা। শিক্ষার কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে যখন শিক্ষার স্বাধীনতা পেলাম তখন কাজ বেড়ে গেল অনেক বেশি, অথচ ভার গেল কমে।’ ভূতামহলে তাঁর বাল্যকাল কাটবার সুবাদে সেখানে চর্চিত চাণক্যশ্লোকের অনুবাদ ও কৃষ্ণিবাসী রামায়ণ শুনে শুনে তাঁর প্রায় পড়াই হয়ে গিয়েছিল। জীবনস্মৃতির ‘শিক্ষারস্ত’ অধ্যায়ে ওই সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন, ‘চাকরদের মহলে যে-সকল বই প্রচলিত ছিল তাহা লইয়াই আমার সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়।’ নর্মাল স্কুলে পড়বার সময়ে বাড়িতে এসে পড়িয়ে যেতেন ওই স্কুলেরই শিক্ষক নীলকমল ঘোষাল। এই ‘মনুষ্যজন্মধারী ছিপছিপে বেতে’র কাছ থেকে শেখা অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠ, বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, সাতকড়ি দত্তের প্রাণীবৃত্তান্ত, মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য। কৈশোরে কেবল বাংলা বিদ্যার চর্চাতেই তাঁকে কুপমগ্নক করে রাখা হয়নি। পাশাপাশি চলেছিল সংস্কৃত ও ইংরেজি শিক্ষাও। হেরস্ব তত্ত্বরত্নের কাছে মুক্তবোধের সূত্র মুখস্থ থেকে শুরু করে জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে কুমারসম্ভব পড়া তারই অন্তর্ভুক্ত। রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণের হেফাজতে শকুন্তলা পড়ার কথাও স্মরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তবে এসব আয়োজিত পড়াশোনার বাইরে তাঁর হাতে পড়েছিল ফোর্ট উইলিয়ম থেকে প্রকাশিত জয়দেবের গীতগোবিন্দ। গঙ্গার বোটে পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বেড়াবার সময়ে ওই গ্রন্থের আত্মদনের কথা স্মরণ করে কবি লিখেছেন, ‘সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে-জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে।’ ঠিক এই ধরনেরই আবছায়া গোছের অর্থের ধারণা নিয়ে তাঁর উৎসুক মনের দরজায় উপস্থিত হয় প্রচুর ছবিসমৃদ্ধ ইংরেজি বই ওস্তাদ কিউরিওসিটি শপ, যার নানা রঙের ছিন্ন সূত্রগুলিকে বেঁধে তাতেই ছবিগুলিকে গেঁথেছিলেন স্বল্পবয়সী পাঠক। এসব ছাড়াও ছিল ‘নানা বিদ্যার আয়োজন’। মেডিক্যাল কলেজের লাসকাটা ঘরে গিয়ে মানুষের শারীর সংস্থান সম্পর্কে

ধারণা গঠন কিংবা ঘরের মধ্যে টাঙানো নরকঙ্কাল থেকে অস্থিবিদ্যা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন তারই অঙ্গ। বালক হৃদয়ে ঔৎসুক্য সঞ্চার করেছিল যন্ত্রতন্ত্রযোগে প্রকৃতি বিজ্ঞানের পাঠও। আর ছিল ঝানু ওস্তাদের কাছে গানের তালিম নেওয়া এবং কুস্তির আখড়ায় দস্তুর মতো শরীরচর্চা। ড্রয়িং শিক্ষক এসে অঙ্কন বিদ্যাতেও শিক্ষার্থীদের পটু করে তোলবার ব্রতে দৃঢ় সংকল্প হয়ে উঠতেন। নিতান্ত বালক বয়সে এত কিছু বিদ্যার আয়োজন রবীন্দ্রনাথকে কী পরিমাণ পীড়িত করেছিল তার কিছু কিছু পরিচয় ধরা আছে ‘জীবনস্মৃতি’ ও ‘ছেলেবেলা’য়। কৌতুকের মিশেল দিতে দিতে ‘ছেলেবেলা’র পরিণত রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন তাঁর কিশোরকালের পাঠচর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত: ‘সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পড়াশোনার যাঁতাকল চলছেই। ঘরঘর শব্দে এই কলে দম দেওয়ার কাজ ছিল আমার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের হাতে। তিনি ছিলেন বড় শাসনকর্তা। তম্বুরার তারে অত্যন্ত বেশি টান দিতে গেলে পটাং করে যায় ছিঁড়ে। তিনি আমাদের মনে যতটা বেশি মাল বোঝাই করতে চেয়েছিলেন, তার অনেকটাই ডিঙি উলটিয়ে তলিয়ে গেছে, একথা এখন আর লুকিয়ে রাখা চলবে না। আমার বিদ্যোটা লোকসানি মাল।’ এই বিবৃতিকে পুরোপুরি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ, বিশেষত কথটাকে যখন একটু লঘু কৌতুকের সুরেই বলছেন। তবে শিক্ষারস্ত্রের গোড়ায় অধীত বিষয়গুলি বাংলা ভাষার ভেতর দিয়ে পড়বার ফলেই যে ‘সমস্ত মনটার চালনা’ সম্ভব হয়েছিল এটা জীবনস্মৃতিতে খুব গম্ভীরভাবে জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে শিক্ষিতা মহিলাদের জন্য কী ধরনের বইপত্র প্রবেশ করতো তা স্বর্ণকুমারীর ‘সেকলে কথা’র সূত্রে জানতে পারা যায়। সটান বাড়ির ভেতরে বই নিয়ে ঢুকতো মালিনী। তার আনা অধিকাংশ বই বটতলার ছায়া দেওয়া। মেয়েমহল তাতেই উঠতো সরগরম হয়ে। এ তালিকার মধ্যে মানভঞ্জন, দুতী সংবাদ, কোকিলদূত যেমন ছিল, তেমনি ছিল গীতগোবিন্দ, অন্নদামঙ্গল, আরব্যোপন্যাস, হাতেমতাই, বাসবদত্ত। ‘রবি-জীবনী’র লেখক প্রশান্তকুমার পালের মতে, উপরোক্ত গ্রন্থগুলির সবকটির সঙ্গে না হলেও বেশিরভাগের সঙ্গে কিশোর রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর পাঠচর্চার ইতিহাস নানা স্থানে নানা সুবাদে উল্লেখ করেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে বিদ্যাসাগরের বোধোদয়, বেতাল পঞ্চবিংশতি, সীতার বনবাস, ডানিয়েল ডিফোর রবিনসন ক্রুশো, নীলমণি বসাকের পারস্য উপন্যাস, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের সুশীলার উপাখ্যান ও মৎস্যনারীর কথা, উমাচরণ মিত্র অনুদিত গোলেবকাওলি, হরিনাথ মজুমদারের বিজয়-বসন্ত, প্রতাপচন্দ্র ঘোষের বঙ্গাধিপ পরাজয়, রামগতি ন্যাযরত্নের বস্তুবিচার, লোহারাম শিরোরত্নের বাঙ্গালা ব্যাকরণ, মধুসূদন বাচস্পতির ছন্দোমালা ইত্যাদি বই তিনি পড়েছিলেন। আর একটু পরিণত রবীন্দ্রনাথের পাঠচর্চার হৃদিস মেলে জীবনস্মৃতির ঘরের পড়া, সাহিত্যের সঙ্গী, রচনা-প্রকাশ, ভারতী, আমেদাবাদ ইত্যাদি শীর্ষক অধ্যায় থেকে। কেবল জীবনস্মৃতি কিংবা ছেলেবেলাতেই নয়, সমকালে লেখা চিঠিপত্রও রবীন্দ্রনাথের অনেক গ্রন্থপাঠের সংবাদ ও পাঠ-প্রতিক্রিয়ার কথা লিপিবদ্ধ হতে দেখা যায়। তবে সেইসব উল্লেখ থেকে রবীন্দ্রনাথের পাঠ-পরিধির ব্যাপ্তির কিছু কিছু ইঙ্গিত মিললেও তা যে আসলে তাঁর সমগ্র অধ্যয়নের যৎকিঞ্চিৎ অংশমাত্র, সে কথা না উল্লেখ করলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না। এমনিভাবে বিভিন্ন স্থানে টুকরো টুকরো করে পাওয়া পড়ুয়া রবীন্দ্রনাথের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে জুড়ে তাঁর পাঠকসত্তার একটি অস্পষ্ট পূর্ণাঙ্গ মূর্তি কল্পনা করা সম্ভব। এই নিবন্ধে সেই পাঠক রবীন্দ্রনাথের মেধাবী পাঠ-প্রতিক্রিয়াটিকে আমরা ধরতে চেয়েছি একটি বিশিষ্ট বিষয়-পরিধির মধ্যে। সেটি হল উপনিবেশ-পূর্ব অঞ্চল বাংলায় রচিত তথাকথিত প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য।

অনেকেই স্বীকার করবেন যে, সাহিত্যের যুগ বিভাজন সময়-চিহ্নিত হলেও আসলে তা প্রবণতা-

নিয়ন্ত্রিত একটি ঘটনা। কোন সাহিত্যের ‘প্রাচীন’ কিংবা ‘আধুনিক’ অভিধা সম্পূর্ণত দাঁড়িয়ে আছে কালের আপেক্ষিক ধারণার উপর। এই আপেক্ষিকতার ভিত্তি বিচারকর্তার অবস্থানকাল। তাঁর অস্তিত্বের মিকটবর্তী সময় ‘আধুনিক’ নামে কথিত হয়, দূরবর্তীকাল চিহ্নিত হয় ‘প্রাগাধুনিক’ নামে। অথচ স্থিরবুদ্ধিতে ভেবে দেখলে দেখা যাবে যে, অনাদি অনন্ত নিরবচ্ছিন্ন মহাকাল প্রবাহের ভিতর কোন সময়খণ্ডকেই বাস্তবে বিভক্ত করা যায় না। যা যায় সেটা হল, কালের আলাদা চরিত্র বা মর্জি নির্ধারণ। সাহিত্যের বহিরঙ্গ্রে সেই মর্জির চিহ্ন পড়ে, ভাবনার গভীরে সময়ের কোন দাগ রয়ে যায়। এর ফলে এক পর্যায়ের রচনার সঙ্গে অন্য পর্যায়ের রচনার তফাৎ গড়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যাকে ‘প্রাগাধুনিক’ সময় বলা হচ্ছে তারও এরকমের কিছু বাহ্য লক্ষণ আছে, আছে চিনে নেবার অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞান। ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজির হাতে রাজা লক্ষ্মণ সেনের পরাজয় ও পূর্ববঙ্গে পলায়ন একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ঘটনার মধ্য দিয়েই সূচিত হয়েছিল রাজনৈতিক ইতিহাসের নতুন পর্যায়। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এ ঘটনার প্রভাব সুদূরপ্রসারী ছিল। পূর্বেকার হিন্দু-বৌদ্ধ রাজাদের শাসনামল ও পরবর্তী সময়ের ব্রিটেনাগত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালকে স্মরণে রেখে এই সময়পর্বটিকে সাহিত্য-ঐতিহাসিকেরা মধ্যযুগ নামে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, যা রাজনৈতিক দিক থেকে একইসঙ্গে ইসলামি শাসনের যুগও বটে। সাহিত্যের অন্তর্বর্তী লক্ষণে এই যুগের রচনায় ধর্মের প্রভাব সর্বাধিক। বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দুধর্মের ও তার অন্তর্ভুক্ত বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ইত্যাদি উপমতাদর্শের। সাহিত্যের উপজীব্য হিসেবে বাদ পড়েনি শাস্ত্রীয় ইসলাম ও সুফী ধর্মা দর্শনও। বৈষ্ণব পদাবলী, সন্ত জীবনী, অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, প্রণয় আখ্যায়িকা, নাথধর্মকেন্দ্রিক রচনা, শাক্ত পদাবলী, বাউল গান, গীতিকা সাহিত্য, সুফীধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ অগণিত সংখ্যায় লেখা হয়েছে মধ্যযুগে। এইসব রচনার প্রতি শিক্ষিত বাঙালির আগ্রহ বহুদিনের। ইংরেজ শাসনপর্বে এসে সেই আগ্রহ দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যচর্চার সঙ্গে পরিণত হয়। প্রাচীন পুথিপত্র উদ্ধার, লৌকিক ছড়া-গান-প্রবাদ-ধাঁধা সংগ্রহ, পুরনো কবিদের জীবন-তথ্য সংকলন এবং সর্বোপরি সেইসব ঐতিহ্যবাহী রচনার রসাস্বাদনকে ঘিরে সাহিত্য সমালোচনার সূচনা উনিশ শতকের বঙ্গ-সংস্কৃতিচর্চার একটি বিশেষ দিককে নির্দেশ করে। সাময়িক পত্রের পাতায় এ ধরনের সাহিত্যালোচনার সূত্রপাত হয়েছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ বিদ্বান ও রসিক ব্যক্তিদের হাতে। এই তালিকায় অবশ্যই যুক্ত হতে পারে রবীন্দ্রনাথের নাম। তিনিও ছিলেন মধ্যযুগের সাহিত্যের একজন নিবিষ্ট পাঠক। দু’ ধরনের পদাবলী সাহিত্য তো বটেই, খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েছিলেন মঙ্গলকাব্য আর অনুবাদ সাহিত্য। বাউলের গানে তাঁর কবিমন কোথায় যেন ঐক্য খুঁজে পেয়েছিল। তবে কোন ক্ষেত্রেই তিনি আজগুবি বানানো তত্ত্ব দিয়ে সাহিত্যের ভিতরকার ঐশ্বর্য অনুসন্ধান করতে যাননি। তার পরিবর্তে সব সময়ে নির্ভর করেছেন নিজের উপলব্ধি-ক্ষমতার উপর, প্রজ্ঞাবুদ্ধির উপর। তাঁর লক্ষ্য ছিল না সাহিত্যের দরবারে চাটুকারিতা করা। কারণ তিনি বেশ ভালোভাবেই জানতেন, কোন সাহিত্য তার নিজস্ব মূল্যেই মহাকালের দরবারে অমরত্বের ছাড়পত্র পেয়ে যায়। সাহিত্য-সমালোচনাকে একস্থানে ‘পূজা’র সঙ্গে তুলনা করেও তিনি দ্বিধা করেননি ভালোকে ভালো ও মন্দকে মন্দ বলতে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, তাঁর আলোচনা কোথাও বিশ্লেষণের অতিরেকে ভারাক্রান্ত নয়—যা অনেক আবেগমুখ্য সমালোচকের প্রধান ত্রুটি বলে বিবেচ্য। বস্তুত তিনি তাঁর পরিশীলিত বিদ্বান রসিক চিত্ত দিয়েই উপলব্ধি করতেন কোন সাহিত্যের ভালো-মন্দ, শিল্প-অশিল্প, মীলতা-অমীলতা। আমাদের সম্মুখবর্তী আলোচনায় প্রজ্ঞাবান পাঠক রবীন্দ্রনাথের সেই সাহিত্য-বীক্ষণটুকুই হবে আমাদের তৃপ্তি, যার ভিতর দিয়ে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একজন মেধাবী সমালোচক হিসেবে তাঁর মান ও স্থান নির্ণয় করা সহজ হয়।

সাল-তারিখের পরিসংখ্যানগত হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে, গ্রন্থ-সমালোচক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হয়েছিল ১২৮৩ বঙ্গাব্দের কার্তিকে ‘জ্ঞানাস্কুর ও প্রতিবিম্ব’ পত্রিকায় যখন তাঁর বয়স মাত্র পনেরো বৎসর। আর মধ্যযুগের সাহিত্যগ্রন্থ নিয়ে প্রথম বড় আকারের প্রবন্ধ লেখেন এর প্রায় পাঁচ বছর পরে ১২৮৮-র শ্রাবণে ‘ভারতী’ পত্রিকায়। সেটি ছিল ‘নবজীবন’ পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্রের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত ‘প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ’-এর সমালোচনা। এখানে তথ্য হিসেবে উল্লেখ্য যে, এ সমালোচনার আগে ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ (ভারতী, ১২৮৪-র শ্রাবণ-কার্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত) এবং ‘বাঙালি কবি নয়’ (ভারতী, ১২৮৭, ভাদ্র) প্রবন্ধ দুটিতে যৎসামান্য স্পর্শ করে গেছেন যথাক্রমে ভারতচন্দ্র ও কবিকঙ্কণকে। এই শুরু। এরপর একে একে বৈষ্ণব পদ ও পদকার, মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ-মহাভারত, শাস্ত্রপদাবলী ইত্যাদি বিষয়ে কখনো দীর্ঘ প্রবন্ধ কখনো সংক্ষিপ্ত প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করেছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য-কেন্দ্রিক সমস্ত রবীন্দ্র-রচনাগুলিকে একত্র জড়ো করলে তা থেকে পাঠক-রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু প্রবণতা বেরিয়ে আসে। সেগুলি এইরকম—

১. প্রথম বছর দশেক (১২৮৮-১২৯৮ বঙ্গাব্দ) তিনি যতটা আগ্রহ ও ঔৎসুক্য নিয়ে এ সাহিত্যের চর্চা করেছেন, বাকি পঞ্চাশ বছরে (১২৯৯-১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) তা অনেকাংশে স্তিমিত হয়ে গেছে।

২. দীর্ঘ প্রবন্ধ ও সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের মধ্যে সংখ্যা গণনায় প্রথমটি অত্যন্ত দীন। কেননা তাঁর মোট দীর্ঘ প্রবন্ধের সংখ্যা সাকুল্যে নয়টি, যেখানে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের পরিমাণ প্রায় নব্বই।

৩. মধ্যযুগের বাংলায় সাহিত্যের অনেক রকম ধারার সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত বৈষ্ণব সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্যের ওপর আলোকপাত করেছিলেন। এর মধ্যে আবার বৈষ্ণব সাহিত্য ও পদকর্তাদের প্রতি তাঁর বেশি পক্ষপাতিত্ব—যার প্রমাণ মেলে সাত-সাতটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনায়। অন্যদিকে, মঙ্গলকাব্য বিষয়ে দুটি প্রবন্ধ থাকলেও কোনটিই বিশেষ কবিকে কেন্দ্র করে নয়। (স্মরণীয় যে, তাঁর জীবৎকালে বলেদ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরী যথাক্রমে কবিকঙ্কণ মুকুন্দ ও রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বিষয়ে মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করে তৎকালীন পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিলেন।

৪. রবীন্দ্রনাথ আদৌ যে-বিষয়গুলি সম্পর্কে কোন অভিমতই দেননি তার মধ্যে রয়েছে বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চৈতন্যজীবনীকাব্য, নাথসাহিত্য ও মুসলমান কবিদের রচিত প্রণয় আখ্যায়িকা এবং ইসলাম ধর্ম বিষয়ক কাব্যসমূহ।

৫. মধ্যযুগের বাংলার ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করেছেন, তবে সেটা তাঁর সামাজিক আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকার কথা স্মরণ করেই। মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের আদর্শকেও সানন্দ স্বীকৃতি জানিয়েছেন কোথাও কোথাও।

৬. সংগীত বিষয়ক আলোচনায় টেনে এনেছেন কীর্তন গানের প্রসঙ্গ; যদিও কীর্তনের সুর-স্বাতন্ত্র্যই তাঁর আলোচ্য হয়েছে, তাকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়ে ওঠা কোন ধর্মতত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথ বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেননি। একই ব্যাপার লক্ষ করা গেছে বৈষ্ণব পদের আলোচনাতেও। ধর্মনিরপেক্ষ রোমান্টিক অনুভূতি সমৃদ্ধ কবিতা হিসেবে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস-বলরামদাসের পদের বিচার করেছেন, তাদের তত্ত্বমূল্যের প্রতি কোথাও কোন আগ্রহ দেখাননি।

৭. পুরনো বাংলা ছন্দের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ মধ্যযুগের কাব্য থেকে দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন বিচ্ছিন্নভাবে। এই উল্লেখন কাব্যচর্চার মধ্যে না পড়লেও ওই যুগের সাহিত্য সম্পর্কে কবির গভীর পড়াশোনার সাক্ষ্য বহন করে।

৮. মঙ্গলকাব্য বিষয়ক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধি বিশুদ্ধ সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণকে পরিহার করেছেন। যে শৈল্পিক গুণপনা বৈষ্ণবপদে প্রত্যক্ষ করেছেন ও তা পাঠক সমক্ষে হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছেন তার ছিটেফোঁটাও মেলে না মঙ্গলকাব্যের আলোচনায়। কবি বরং মঙ্গলকাব্যগুলিকে বিচার করেছেন তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের মানদণ্ডে। এবং দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া সার্বিকভাবে মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব যে অনুকূল ছিল না সেটা বিভিন্ন নেতিবাচক মন্তব্যে জ্ঞানতে পারা যায়।

৯. বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সমালোচনায় যে-তুলনাত্মক বিচার-পদ্ধতির সূত্রপাত করে গিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিদের আলোচনায় তার সার্থক প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই পদ্ধতিতে মঙ্গল কাব্যের আলোচনায় যত্নবান হননি। হলে পরবর্তীকালে জিজ্ঞাসুরা নিঃসন্দেহে অনেক লাভবান হতে পারতেন।

এই বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়া আরও টুকরো-টাকরা বিশেষত্ব কারও নজরে পড়তে পারে। যাইহোক, আপাতত উপরোক্ত মোটা সূত্রগুলোকে মাথায় রেখে এখন এই আলোচনার মূল অধিক্ষেত্রটিতে প্রবেশ করা যাক।

বৈষ্ণব সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ ছিল অতি গভীর ও ব্যাপক। বাল্যকাল থেকে তিনি বৈষ্ণবপদের রসাস্বাদনে ভীষণই আনন্দ লাভ করেছেন। যদিও গোঁড়া ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান হিসেবে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি তাঁর তেমন কোনো আগ্রহ না জন্মাবারই কথা। বাস্তবেও তা ঘটেছিল। তিনি বৈষ্ণব পদগুলি আশ্বাদন করতেন একজন তত্ত্বনিরপেক্ষ পাঠক হিসেবেই। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্মের ভিতরকার প্রেমতত্ত্বকে অনুভব করেছেন মানব-সম্বন্ধের নিগূঢ় তাৎপর্যে। জীবনস্মৃতির 'ঘরের পড়া' অধ্যায়ে জানিয়েছেন, একদা কীভাবে তাঁর হাতে এসে পড়েছিল 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ'-এর মতো সংকলন। এখানে তথ্য হিসেবে জানানো আবশ্যিক যে, ওই পুস্তিকা ১২৮১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাস থেকে মাসে মাসে ধারাবাহিকভাবে সম্পাদনা করে বের করতেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র। প্রথম পর্যায়ে ছিল বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহের পালা। রবীন্দ্রনাথ সেই সংকলিত পদগুলিকে গভীর মনোযোগ সহকারে পড়তেন। এর ভাব, ভাষা এতটাই উঁচু স্তরে ছিল যে, কোন অল্পবয়সীর পক্ষে তার নাগাল পাওয়া ছিল দুষ্কর। তবু হাল ছাড়েননি। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন : 'বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত। আমি টীকার উপর নির্ভর না করিয়া নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ কোনো দুরূহ শব্দ যেখানে যতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোটো বাঁধানো খাতায় নোট করিয়া রাখিতাম। ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলিও আমার বুদ্ধি-অনুসারে যথাসাধ্য টুকিয়া রাখিয়াছিলাম।' এর ফল কী হয়েছিল তা রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকমাত্রই জানেন। ব্রজবুলি ভাষায় পদ লিখে 'ভানুসিংহ' ছদ্মনামে 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৮৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ থেকে পরপর প্রকাশ করতে থাকেন। পরে এ ধরনের একুশটি কবিতা নিয়ে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১লা জুলাই আত্মপ্রকাশ করে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। কিন্তু শুধুমাত্র ব্রজবুলিতে লেখা বিদ্যাপতির পদেই রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ ছিলেন না, পরবর্তীকালে বেরনো চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বসন্ত রায়, বলরাম দাস প্রমুখের পদও তিনি অমেয় আনন্দে উপভোগ করেছেন। আসলে এই কবিতাগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সন্ধান পেয়েছিলেন কল্পনার দুর্লভ ঐশ্বর্যকে। তাছাড়া রোমান্টিক ভাবানুভূতি যে বৈষ্ণব পদকর্তাদের অন্যতম আশ্রয় এ জাতীয় বোধ পাঠক রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে সঞ্চিত হতে থাকে। এই অনাধুনিক সাহিত্যের মধ্যে দিয়েই যে তাঁর বিশ্ববোধের দীক্ষা হয়েছিল, নিখিল দেশকালকে একটা ব্যাপ্ত দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখেছিলেন সেকথা কবুল করেছেন তাঁর এক গুণমুগ্ধার কাছে। ১৯৩৬ সালের

১৫মে তাবিখে হেমন্তবালা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—‘আমার জীবনের একটা দিক তোমার ভালো করে জানা নেই। প্রথম বয়সে বৈষ্ণব সাহিত্যে আমি ছিলুম নিমগ্ন, সেটা যৌবন চাঞ্চল্যের আন্দোলনবশত নয়, কিছু উদ্বেজনা ছিল না এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু ওর আন্তরিক রসমাধুর্যের গভীরতায় আমি প্রবেশ করেছি। চৈতন্যমঙ্গল চৈতন্যভাগবত পড়েছি বারবার। পদকর্তাদের সঙ্গে ছিল আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। অসীমের আনন্দ এবং আহ্বান যে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যে ও মানবপ্রকৃতির বিচিত্র মধুরতায় আমাদের অন্তরবাসিনী রাধিকাকে কুলত্যাগিনী করে উতলা করেছে প্রতিনিয়ত, তার তত্ত্ব আমাকে বিস্মিত করেছে। কিন্তু আমার কাছে এই তত্ত্ব ছিল নিখিল দেশকালের—কোনো বিশেষ দেশে বিশেষ কালে বিশেষ পাত্রে কতকগুলি বিশেষ আখ্যায়িকায় আবদ্ধ করে একে আমি সংকীর্ণ ও অবিশ্বাস্য করে তুলতে পারিনি।’ রবীন্দ্রনাথের এই নিবিড় বৈষ্ণব সাহিত্য-পাঠ তাঁর প্রথম পর্যায়ের সাহিত্য-প্রবন্ধগুলিকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল। এমনকি, তিনি কিছু সাহিত্যতত্ত্বও গড়ে তোলেন এইসব পদ আত্মদানের ভিতর দিয়ে। সকলেই জানেন তাঁর ‘লীলাবাদ’-এর কথা। এই ‘লীলা’ নিছক খেলা নয়, সাধারণ ক্রীড়ার আরো অতিরিক্ত কিছু। এ শব্দটি কি বৈষ্ণব-সাহিত্যের অনুবঙ্গ থেকে তার পারিভাষিক অর্থবিচ্যুত হয়ে রবীন্দ্র-প্রবন্ধে আসেনি? যাইহোক, পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, সাহিত্য-আত্মদানক রবীন্দ্রনাথের কলম থেকে ১২৮৮-১২৯৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত মোট সাতটি প্রবন্ধ (যার মধ্যে দুটি পত্রাকারে লেখা) বেরিয়ে এসেছে। প্রকাশের কালক্রমানুসারে এগুলি হল—

ক. প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ (বিদ্যাপতি)	— ভারতী	— ১২৮৮, শ্রাবণ
খ. চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি	— ভারতী	— ১২৮৮, ফাল্গুন
গ. বসন্ত রায়	— ভারতী	— ১২৮৯, শ্রাবণ
ঘ. বৈষ্ণব কবির গান	— নবজীবন	— ১২৯১, কার্তিক
ঙ. বিদ্যাপতির রাধিকা	— সাধনা	— ১২৯৮, চৈত্র
চ. নিছনি	— সাধনা	— ১২৯৮, চৈত্র ও ১২৯৯, বৈশাখ
ছ. পছ	— সাধনা	— ১২৯৯, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ ও চৈত্র

প্রবন্ধের সংখ্যা ও প্রকৃতি দেখে অনুমান করতে পারি, কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের ধাতু প্রকৃতির সঙ্গে বৈষ্ণব মহাজ্ঞানদের অন্তঃপ্রকৃতির সাদৃশ্য ছিল যথেষ্ট। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মচর্চায় বৈষ্ণব ছিলেন না একথা সত্য, কিন্তু যে-রোমাণ্টিকতা তাঁর অন্তর জুড়ে বিরাজ করছিল তাকে সর্বপ্রথম আত্মদান করেছিলেন কয়েক শতকের পুরনো বৈষ্ণবপদের সুর মূর্ছনার মধ্যে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য বৈষ্ণব পদাবলীর গীতরসে নিমজ্জিত ও কাব্যানন্দে উৎফুল্ল রবীন্দ্রনাথ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে একত্রে সম্পাদনা করে বের করেন ‘পদরত্নাবলী’র মত একটি বৈষ্ণব পদসংকলন গ্রন্থ। লক্ষণীয়, এটিও প্রকাশিত হয়েছিল আলোচ্য সময় পর্বেই—১২৯২ বঙ্গাব্দের ১২ আষাঢ় অর্থাৎ ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ২৫ জুন। প্রাগাধুনিক বাঙলার অন্য কোন সাহিত্য তিনি এভাবে আগে কিম্বা পরে আর কখনও সম্পাদনা করেননি।

‘প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ’ (বিদ্যাপতি) শীর্ষক প্রবন্ধটিতে বৈষ্ণবপদের একনিষ্ঠ পড়ুয়া রবীন্দ্রনাথের অভূতপূর্ব পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। তিনি ব্রজবুলিতে লেখা মেথিল-কোকিল বিদ্যাপতির পদগুলির রসাত্মক করেছিলেন বিপুল রসোপভোগের লুক্কিত ও সামর্থ্য নিয়ে। সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র ও সারদাচরণ পদগুলিকে শুধু মুদ্রিত করে দেননি, তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক টীকা-ব্যাখ্যাও করে দিয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সীমিত শব্দার্থ-জ্ঞান ও অনন্য সন্ধানী মন নিয়ে পড়তে গিয়ে

বুঝেছিলেন সম্পাদক-কৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আদৌ মূলের সঙ্গে মিলছে না। এজন্য পাঠক হিসেবে তিনি ক্রমশ অসন্তুষ্ট হতে উঠতে থাকেন এবং এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে উক্ত প্রতিবাদী সমালোচনায়। লেখাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিরক্তির ঝাঁজ খুব তীব্র ভাষায় প্রকাশিত। হয়ত নবীন বয়সের রক্ত-তারল্য এর পিছনে থেকে থাকবে। তবে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তাদের বৈধতা নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই। রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য : প্রাচীন কবিতা সম্পাদনা করে সর্বসমক্ষে আনতে গেলে সম্পাদককে অবশ্যই দায়িত্বশীল হতে হবে। ব্যাকরণ শুদ্ধ পাঠের দিকে ও সুকল্পনা-সঙ্গত অর্থের দিকে তাঁর নজর দেওয়া একান্ত কর্তব্য। পাঠ নির্ধারণে অসঙ্গতি ঘটলে তিনি সাধারণ পাঠকের কাছেও জবাবদিহি করতে বাধ্য। তাঁর ধারণায়, সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র অযোগ্য নন, অমনোযোগী। যে অপেক্ষিত সতর্কতা নিয়ে বিদ্যাপতির মত একজন বিশিষ্ট কবির কবিতা সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত ছিল, সেই সচেতনতা অক্ষয়চন্দ্রের ছিল না। এই কারণে এই অমনোযোগী, অসাবধানী, অবহেলাপ্রবণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় তিন-তিনটি নালিশ উত্থাপন করতে দ্বিধা করেননি। কবি, পাঠক ও বিশুদ্ধ সাহিত্যের তরফে ঘনীভূত হয়ে ওঠা সেই অভিযোগগুলি হল : ‘প্রথমত কবিদের প্রতি তিনি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন; দ্বিতীয়ত সাহিত্যের সহিত তিনি যে চুক্তি করিয়াছিলেন, সে চুক্তি রীতিমত পালন করেন নাই; তৃতীয়ত পাঠক সাধারণকে তিনি অপমান করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, অথচ যথাযোগ্য আয়োজন করেন নাই; যথারীতি সম্ভাষণ করেন নাই; এতই কি তাহারা উপেক্ষার পাত্র?’ এ নেতিবাচক সমালোচনার উদ্দেশ্য যে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ক্রোধবশত আক্রমণ নয় বরং ‘কবিতা সকলের যথার্থ মর্মবাহির করার চেষ্টা, তা রবীন্দ্রনাথ কেবল ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হননি খান পচিশেক উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েও দিয়েছেন। সম্পাদকের যে-ভুলগুলি তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ও বুদ্ধিতে ধরা পড়েছে সেগুলির মধ্যে শব্দের ভুল, শব্দার্থের ভুল, বাক্যার্থের ভুল, ব্যাকরণের ভুল ও অসাবধানতাজনিত অন্যবিধ ভুলই প্রধান। যেমন, ‘হরিণী জানই ভাল কুটুম্ব বিবাদ’—এই বাক্যে ‘বিবাদ’ যে ‘নিষাদ’ হলে তবেই যথার্থ অর্থ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে সেকথা জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এবার শব্দার্থ ভুলের দৃষ্টান্ত। শ্যামকে ভর্ৎসনার উদ্দেশ্যে প্রেরিত দূতীকে রাধিকা বলছেন, ‘যো পুন সহচরী হোয় মতিমান। করয়ে পিশুন বচন অবধান।।’ এই পদাংশের ‘পিশুন’ শব্দের যে-অর্থ অক্ষয়চন্দ্র করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাকে আদৌ মানতে পারেননি। সম্পাদক পিশুন শব্দের অর্থ করেছিলেন বায়স বা কাক। ‘কাকের কথাতেই মনঃসংযোগ’ এক অসম্ভব ও অকাব্যিক ঘটনা বিবেচনা করে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গতভাবেই পিশুন শব্দের অর্থ করেছেন ‘নিন্দা’। বাক্যার্থের ভুল নির্দেশ করতে গিয়ে কবি বিদ্যাপতির সেই পদটি উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে নাবালিকা রাধা দেহে ও মনে ক্রমশ যৌবনবতী হয়ে উঠছে—‘নিরঞ্জে উরজ হেরই কত বেরি/হসত আপন পয়োধর হেরি।/পহিলে বদরী সম পুন নবরঙ্গ/দিনে দিনে অনঙ্গ উঘারয়ে অঙ্গ।।’ এই অংশটুকুর সম্পাদক-কৃত ব্যাখ্যা হল—‘প্রথম বর্ষার মতো নূতন নূতন ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিতে লাগিল। বদরি (হিন্দী) বর্ষা। নবরঙ্গ শব্দে নারাজা লেবু অভিধানে থাকিলে এই চরণের অন্যরূপ অর্থ হয়। কিন্তু বদরি শব্দের বর্ষা অর্থও সুপ্রসিদ্ধ নহে।’ বলাবাহুল্য, কাব্যবোধে স্বস্থ রবীন্দ্রনাথ এই অর্থের ভিতর কোন সঙ্গতি খুঁজে পাননি। সম্পাদকীয় টীকার উল্লেখের পর তিনি লিখেছেন—‘বর্ষার মত ভাবভঙ্গী প্রকাশ করা’ শুনিলেই কেমন কানে লাগে যে, অর্থটা টানাবোনা। নবরঙ্গ শব্দে নারাজালেবু অভিধানে থাকিলে কিরূপ অর্থ হয় তাহাও দেখা উচিত ছিল। ‘প্রথম বর্ষার মত হাবভাব প্রকাশ করিতে লাগিল’ এরূপ অর্থ প্রকাশ করিলে ‘পুন’ শব্দের সার্থকতা কি থাকে? যাহা হউক, এ স্থানের অর্থ অতিশয় সহজ, ...রাধা নির্জনে কতবার আপনার উরজ দেখেন, আপনার পয়োধর

দেখিয়া হাসেন। সে পয়োধর কিরূপ? না, প্রথমে বদরীর (কুল) ন্যায় ও পরে নারাজ্জার ন্যায়।” এ ধ্বনের বাক্যার্থগত সমালোচনা এ প্রবন্ধে আরো অনেক রয়েছে। রয়েছে ব্রজবুলি ভাষার স্বতন্ত্র ব্যাকরণেবও উল্লেখ, যা বৈষ্ণব সাহিত্যরসে বিভোর রবীন্দ্রনাথ প্রায় বাল্যেই রপ্ত করেছিলেন। এইসব দৃষ্টান্ত থেকে মেধাবী পাঠক রবীন্দ্রনাথের একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি হয়তো আমরা বানিয়ে নিতে পারি। সমালোচনাটির শেষ অনুচ্ছেদে গিয়ে অসহিষ্ণু রবীন্দ্রনাথ কিছু কড়া কথা শুনিয়েছেন অক্ষয়চন্দ্রকে। কোনরকম কৃত্রিম সৌজন্যের তোয়াক্কা না রেখে লিখেছেন : ‘সমস্ত পুস্তকের মধ্যে এত অসাবধানতা, এত ভ্রম লক্ষিত হয় যে, কিয়দূর পাঠ করিয়াই সম্পাদকের প্রতি বিশ্বাস চলিয়া যায়। ইহার সমস্ত ভ্রম যে কেবল সম্পাদকের অক্ষমতাবশতঃ ঘটিয়াছে তাহা নহে, ইহার অনেকগুলি তাঁহার অসাবধানতাবশতঃ ঘটিয়াছে। এমনকি, স্থান স্থানে অভিধান খুলিয়া অর্থ দেখিবার পরিশ্রমটুকুও স্বীকার করেন নাই। এত অবহেলা, এত আলস্য যেখানে, সেখানে এ কাজের ভারগ্রহণ না করিলেই ভাল হইত।’

এই পর্যায়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধ ‘চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি’। এটি একটি তুলনাত্মক সাহিত্যবিচারের চমৎকার নিদর্শন। এ ধরনের সাহিত্য-সমীক্ষার সূত্রপাত করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ‘উত্তরচরিত’-এ বাঙ্গালী ও ভবভূতি, ‘শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেসদিমোনা’য় কালিদাস ও শেক্সপীয়রকে পাশাপাশি রেখে তৌলন করেছিলেন তিনি। এটা সম্ভব হয়েছিল সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর বিপুল অধিগম্যতার ফলে। এই বিচারধারাতেই লেখেন ‘জয়দেব ও বিদ্যাপতি’ (বঙ্গদর্শন, ১২৮০ পৌষ) প্রবন্ধ। ওই প্রবন্ধে বঙ্কিম সমুদয় গীতিকবিদের দুটি সরল বর্ণে ভাগ করেন— অস্তঃপ্রকৃতির কবি ও বহিঃপ্রকৃতির কবি। কবিত্বের জগতে এইরকম বিভাজন অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মনঃপুত ছিল না। তিনি এক্ষেত্রে তাঁর কল্পনাতত্ত্ব দিয়ে কবিদের শ্রেণীভেদ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর কাছে সৃজনশীল কল্পনাই যথার্থ ‘কবির কল্পনা’ (imagination), বাকিটা কাল্পনিকতা বা ‘জালিয়াতের কল্পনা’ (fancy)। তাঁর বিবেচনায়, কবিকূলের মধ্যে গীতিকবিরাই হলেন যথার্থ কবি। কেননা এঁরা ‘প্রকৃতির বহির্দ্বারে’ বসে ‘কতকগুলো বড়ো বড়ো কথা, টানাবোনা তুলনা ও কাল্পনিক ভাব’ নিয়ে সাহিত্য রচনা করে না; পরস্তু প্রকৃত কল্পনার সাহায্যে মর্মের মধ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। এঁদের ভাষা সহজ, ভাব সরল। আর সেজন্য ‘তাহা যতটুকু বলে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বলে’। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে চণ্ডীদাস এই সহজ ভাব ও সরল ভাষার কবি। তাঁর সারল্য ও সহজতাই তাঁকে বঙ্গের প্রাচীন কবিকূলের শিরোমণি করে তুলেছে। এই কবির বিপরীতে এনেছেন বিদ্যাপতিক। বিদ্যাপতি কাল্পনিকতার দ্বারা গ্রস্ত কিনা সেই নির্ণয় স্পষ্টত প্রবন্ধে না থাকলেও চণ্ডীদাসের সম্পূর্ণ বিপরীতে তাঁকে স্থাপন করে অনেকটা যে সেইরকম শ্রেণীনির্দেশ করতে চেয়েছেন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। জয়দেবের সঙ্গে বিদ্যাপতির যেমন বিপ্রতীপ তুলনা টেনেছিলেন বঙ্কিম সেই একই পদ্ধতি প্রয়োগ করে রবীন্দ্রনাথ বললেন : ‘বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি।’ এই তুলনাকে রবীন্দ্রনাথ আরো নানাদিকে প্রসারিত করে দিয়ে শেষত প্রমাণ করেছেন যে, কবি হিসেবে বিদ্যাপতির তুলনায় চণ্ডীদাস অনেক বড়। কেননা বিদ্যাপতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর ভাষার মাধুর্যে ও বর্ণনার সৌন্দর্যে; আর চণ্ডীদাস পাঠকের হৃদয়ে আবেদন জাগিয়ে তোলেন ভাবের মহত্ব ও আবেগের গভীরতায়। প্রেমের স্বরূপ ঘোষণায়, রাধার মনোভাব বর্ণনায়, প্রেমের সঙ্গে দুঃখের সম্বন্ধ নির্ধারণে এবং প্রেমের সাধনায় চণ্ডীদাস কীভাবে বিদ্যাপতিকে পরাভূত করে আপন বিজয় পতাকা উড়িয়েছেন

রবীন্দ্রনাথ উভয়ের কবিতা উদ্ধৃত করে তা কৌতূহলী পাঠকবর্গকে দেখিয়েছেন। বলা বোধহয় নিস্প্রয়োজন যে, কাব্যের নিরপেক্ষ বিচারে রবীন্দ্রনাথের যুক্তি ছিল অকাট্য এবং আজ পর্যন্ত সমালোচক-মহল বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সম্পর্কে যে-অভিমত দিয়ে থাকে তা আসলে রবীন্দ্রভাবনারই প্রতিধ্বনি। রবীন্দ্রনাথের এই সাহিত্যসমীক্ষাটি এতই যুক্তিসিদ্ধ ছিল যে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো জাঁদরেল সমালোচকও শেষ অব্দি তাঁর অভিমত সংশোধন করে নিতে বাধ্য হন। তাঁর ‘জয়দেব ও বিদ্যাপতি’ (বঙ্গদর্শনে ছাপা হয় ‘মানস বিকাশ’ নামে) প্রবন্ধটি যখন ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ গ্রন্থে সংকলিত হয় তখন খুব সচেতনভাবে আগেকার বক্তব্য পরিবর্তন করে লেখা হয়—‘...যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি; তাহা গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে বেশি খাটে, বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তত খাটে না।’

বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কিত পূর্বোক্ত তালিকাভুক্ত তৃতীয় প্রবন্ধটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এটি বিশিষ্ট পদকর্তা রায় বসন্তের কাব্যের নিগূঢ় বিশ্লেষণ। রায় বসন্তের ব্যক্তি-পরিচয় খুব স্পষ্ট নয়। কেউ মনে করেন, তিনি ও বিদ্যাপতি অভিন্ন ব্যক্তি। আবার কেউ বলেন, রায় বসন্ত ছিলেন যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের পুত্রতাত। ইনি সম্ভবত পদকর্তা গোবিন্দদাসের বন্ধু ও নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। ঐর নামে ‘পদকল্পতরু’তে একাঙ্গটি পদ সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এ কবির কবিত্বে ভীষণ মুগ্ধ ছিলেন। সেই মুগ্ধতা নিয়ে লিখেছিলেন ‘বসন্ত রায়’। সম্ভবত তাঁর কালে বিদ্যাপতি ও বসন্ত রায়কে একই ব্যক্তি বলে ভাবা হতো। যেজন্য এই তথ্য দিয়েই তিনি প্রবন্ধটির সূচক-বাক্যটি লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়টি ছিল দুজনের পৃথক কবিত্বাত্মক পরিস্ফুট করা। আসলে তুলনীয় ওই দুটি কবির কাব্য পাঠ করে বৈষ্ণবপদের জ্বলন্ত রবীন্দ্রনাথের নিঃসংশয়ে মনে হয়েছিল বিদ্যাপতি এবং বসন্ত রায় সম্পূর্ণ ভিন্নগোত্রের স্রষ্টা। বসন্ত রায়ের কবিত্বের সঙ্গে বরং চণ্ডীদাসের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব, বিদ্যাপতির কখনোই নয়। এতে দুই পৃথক কবি-ব্যক্তিত্বকে তিনি কোন ঐতিহাসিক পাথুরে প্রমাণের দ্বারা নিরূপণ করতে পারেননি বটে, তবে যেসব কাব্যগত নজির টেনেছেন তা যথেষ্ট যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে এনেছেন ভাষার যুক্তি। বিদ্যাপতির কবিভাষায় ব্রজবুলির সাথে মিশেছে দু’চারটে বাংলা শব্দ; বিপরীত পক্ষে বসন্ত রায়ের ভাষার জমিটাই বাংলার দখলে, সেখানে মাঝে মাঝে ব্রজবুলির উটকো অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বসন্ত রায়ের কবিতার ভাষা ও ভাব খুবই সাবলীল, স্বচ্ছন্দ, সাদাসিধা, উপমাহীন। সরল প্রাণের সরল কথাতাই তিনি অপূর্ব কবিত্ব সৃষ্টি করেছেন। অন্যদিকে বিদ্যাপতিতে মেলে রাজকীয় অলংকৃতি। সেখানে যেন ‘পোশাকটাই মানুষ পরিয়া বসিয়াছে।’ ভাষা ও ভাবের পর রবীন্দ্রনাথ একে একে এনেছেন, রূপবর্ণনা, সজ্জাগ বর্ণনা, প্রেমস্বরূপের প্রসঙ্গ। আলোচ্য দুজন কবি যে এসব ক্ষেত্রে ভিন্নপন্থাগামী হয়েছেন তা যথেষ্ট দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বর্ণনার ক্ষেত্রে বসন্ত রায় বস্তুগত বর্ণনার পক্ষপাতী আদৌ ছিলেন না, তিনি বরং ভাবলোকের উপস্থাপনে অনেক বেশি যত্নবান। রবীন্দ্রনাথের মতে, বসন্ত রায় মাঝে মাঝে এক-একটি কথায় এমন একটি ‘ভাবের আকাশ’ খুলে দিয়েছেন যে পাঠকের কল্পনা সেই আকাশে পাখা মেলে উড়ে মেঘলোকে হারিয়ে যায়। এই কবির ভাব অথবা মাধুরীর দুটি সঞ্চার করে। তাঁর প্রেম ভোগোন্মত্ত নয়। সৌন্দর্যের সঙ্গে উপভোগ্যতার একটা নিত্য সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এই দুইজন কবি দুভাবে দেখেছেন সেই সম্বন্ধকে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : ‘বিদ্যাপতি কহিতেছেন রূপ উপভোগ্য বলিয়া সুন্দর; আর বসন্ত রায় কহিতেছেন, রূপ সুন্দর বলিয়া উপভোগ্য।... বসন্ত রায় তাঁহার রূপ বর্ণনায় যাহা-কিছু সুন্দর তাহাই দেখাইয়াছেন, আর বিদ্যাপতি তাঁহার রূপবর্ণনায় যাহা কিছু ভোগ্য তাহাই দেখাইয়াছেন।’ ‘প্রাণনাথ, কেমন করিব আমি’ বসন্ত রায়ের এই একটি পংক্তিতে যে-ভাবের অধীরতার সন্ধান

পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তার সমতুল পংক্তি বিদ্যাপতিতে দুর্লভ বলে তিনি মনে করেছেন। আসলে বসন্ত রায়ের রোমান্টিক অনুভবের জাদুতে কোন-না-কোনভাবে সম্মোহিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং নিজে একজন অনুভব-মুখ্য কবি ছিলেন বলে এই পথের পথিক বসন্ত রায়কে তাঁর অনবদ্য বলে মনে হয়েছিল। বিদ্যাপতির কবিতা যতটা না হৃদয়ের, তার বেশি বোধির। তাঁর আড়ম্বরপূর্ণ বহিরঙ্গিক চাকচিক্যও প্রসাধন-বিরক্ত রবীন্দ্রনাথকে মনে মনে অখুশি করে তুলেছিল। কেবল এই প্রবন্ধেই নয়, লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই পর্যায়ের প্রায় সব প্রবন্ধে সেইসব কবিদেরই রবীন্দ্রনাথ বেশি সমৃদ্ধিমান বলে মনে করেছেন, যাঁরা সহজ ভাবের কথা সরল ভাষায় বলতে সক্ষম হয়েছেন।

‘বৈষ্ণব কবির গান’ প্রবন্ধটি আবার অন্য ধরনের রচনা। কোন বিশিষ্ট কবি নয়, কাব্যের অন্তর্ভুক্ত দর্শনই এখানে রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য। অবশ্য এ দর্শন বৈষ্ণবদের প্রতিষ্ঠান-নির্ভর ধর্মতত্ত্বকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠেনি, বরং তার জন্ম হয়েছে বৈষ্ণব পদের সৌন্দর্যতত্ত্বের গভীরে। অহিংস, সমন্বয়কামী, আবেগমুখ্য বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন প্রেম সম্পর্কের নানা বিভঙ্গকে। এই ধর্ম, তাঁর মতে, পৃথিবীর সমস্ত প্রেম সম্বন্ধের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করতে চেষ্টা করেছে। বৈষ্ণবতত্ত্বে প্রেম আর পূজা এক। দেবতা সেখানে প্রিয় হন, প্রিয়তমের মধ্যে দেখা দেন দেবতা। বস্তুত ‘সোনার তরী’র ‘বৈষ্ণব কবিতা’ ও ‘পঞ্চভূত’এর ‘মনুষ্য’ প্রবন্ধ জন্ম নিয়েছিল আমাদের আলোচ্য এই প্রবন্ধটির নির্যাস থেকে। ‘বৈষ্ণব কবির গান’ অনেকগুলি অংশে বিভক্ত। মর্ত্যের সীমানা, স্বর্গের সামগ্রী, স্বর্গের গান, মর্ত্যের বাতায়ন, সৌন্দর্যের ধৈর্য, বাঁশির স্বর ইত্যাদি বিচিত্র তাদের নাম। প্রবন্ধটির মধ্যে বেশিমাাত্রায় এসেছে সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচনা। কবির ধারণায়, স্বর্গের বার্তাবাহক হল এই সৌন্দর্য। আর সৌন্দর্যস্বরূপের হাতে জগৎ যেন একটি বাঁশি, যার রঞ্জে রঞ্জে নিত্য নতুন সুর ধ্বনিত হচ্ছে। সেই সুরের মহাসম্মিলনের শুভক্ষণে জগতের সৌন্দর্য ও অসীমের সৌন্দর্য পরস্পর মালাবদল করছে।

প্রবন্ধের নাম যদিও ‘বিদ্যাপতির রাধিকা’ তবুও সূচনাতেই রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কবি স্বভাবের তুলনা উপস্থিত করেছেন। একজনের প্রেমে ভঙ্গি, নৃত্য এবং চাঞ্চল্যের আধিক্য, অন্যজনের প্রেমে তীব্রতা, দাহ ও আলোকের উপস্থিতি। চণ্ডীদাসের প্রেম সুখদুঃখের উভয় সূতোয় চমৎকার করে বোনা, বিদ্যাপতির প্রেমে কেবল অবিমিশ্র সুখ ও যৌবনের নবীনতা। বিদ্যাপতির রাধার দেহ ও মনের বিকাশ বড়ই মধুর, ‘অঙ্গে অঙ্গে মুকুলিত’। তাঁর রাধা ভীরা স্বভাবের বালিকা। যৌবনের সদ্যবিকচ হৃদয় নিয়ে সে লঙ্কায় ভয়ে সংশয়ে আনন্দে নিরতিশয় বিহ্বল। এ রাধার প্রেম বেদনার অগ্নিজ্বালায় রেঙে ওঠেনি, বিলাসের লালসায় রাগ-রক্তিম হয়ে উঠেছে। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মতো প্রেমের নিভৃত অনুভবকে সেভাবে বাণীময় করে তুলতে পারেননি। এজন্য প্রবন্ধটির একস্থানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘ইহাতে গভীরতার অটল স্ফৈর্য নাই, কেবল নবানুরাগের উদ্ভাস্ত লীলাচাঞ্চল্য। ... কেবল নৃত্য এবং গীত, আভাস এবং আন্দোলন, আলোক এবং বর্ণবৈচিত্র্য। এই নবীন চঞ্চল প্রেম হিম্মালের উপর সৌন্দর্য যে কত ছন্দে কত ভঙ্গিতে বিচ্ছুরিত হইয়া উঠে, বিদ্যাপতির গানে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সমুদ্রের অন্তর্দেশে যে গভীরতা, নিস্তরতা, যে বিশ্ববিস্তৃত ধ্যানলীনতা আছে তাহা বিদ্যাপতির গীতি-তরঙ্গের মধ্যে পাওয়া যায় না।’ প্রবন্ধের সবশেষে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এক অশেষ কথা। ‘লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ তবু হিয়ে জুড়ন না গেল’—এই পদাংশে তিনি অনুভব করেছেন নবীন প্রেমের চিরপুরাতন রূপ; যে চির পুরাতনের গান আরম্ভ করেছিলেন তাঁর প্রিয়তম কবি চণ্ডীদাস।

বৈষ্ণব পদাবলীতে বহুল ব্যবহৃত ‘নিছনি’ ও ‘পষ’ শব্দদুটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একদা ‘সাধনা’তে যে-পত্র লিখেছিলেন, পরে তা তাঁর ‘শব্দতত্ত্ব’ বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। শব্দ দুটি প্রাচীন, তাই আধুনিক

পাঠকের কাছে স্বভাবই দুর্বোধ্য ঠেকেছিল। রবীন্দ্রনাথ শব্দ দুটির যথাসাধ্য অর্থ-নির্ণয়ে যত্নবান হন এবং কাব্যচরণে প্রযুক্ত একাধিক দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে জিজ্ঞাসাজনের সংশয় দূর করার চেষ্টা করেন। জগদানন্দ রায় ‘নিছনি’ শব্দের অর্থ লিখেছিলেন ‘অনিচ্ছা’, কিন্তু মধ্যযুগের কাব্যপাঠে অভ্যস্ত ও পরিপক্ব রবীন্দ্রনাথ সেই নির্ণয় মানতে পারেননি। তাঁর ধারণায়, শব্দটি সংস্কৃতমূল তদ্ভব। মূল শব্দটি হল নির্মঞ্জুন। অভিধান নির্মঞ্জুন শব্দের অনেকগুলি অর্থ নির্দেশ করে। যেমন— নীরাঙ্গনা, আরতি, সেবা, মোছা। এর আরো একটা অর্থ হতে পারে শাস্তিকর্ম। আবার বালাই বা অমঙ্গল তাৎপর্যেও শব্দটির ব্যবহার দুর্লভ নয়। রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দদাস, বসন্ত রায় প্রমুখ মহাজনদের পদ উদ্ধৃত করে শব্দটির ভাবানুসঙ্গত অর্থের প্রতি আগ্রহীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গোবিন্দদাস যখন লেখেন ‘গৌরাস্তের নিছনি লইয়া মরি’ তখন নিছনি সন্দেহাতীত ভাবে ‘বালাই’; কিন্তু যখন লেখা হয় ‘দৌহে দৌহে তনু নিরছাই’ তখন ‘মোছা’ অর্থটাই প্রধান হয়ে ওঠে। অন্যদিকে আরাধনার অর্থোপহার তাৎপর্য বোঝাতে নিছনিকে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় নিম্নোক্ত পদে—‘পরান নিছিয়া দিই পিরীতে তোমার’। রবীন্দ্রনাথ পাঠক হিসেবে যে কতটা সতর্ক ছিলেন তার পরিচয় মেলে তাঁর দেওয়া এই তথ্যে: ‘চণ্ডীদাসের পদাবলীতে নিছনি শব্দ কোথাও দেখি নাই।’ একইরকম শাস্তিক বিবেচনাবোধের ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন ‘পছ’ শব্দটির আলোচনায়। পদ্ধতি পূর্ববৎ অর্থাৎ কাব্যচরণ উদ্ধৃত করে প্রাসঙ্গিক অর্থ নির্দেশ। এতে দেখা যাচ্ছে শব্দটি কেবল ‘প্রভু’ ও ‘পুনঃ’ অর্থ নিষ্কাশন করে না, একই সঙ্গে ‘ভনে’ বা ‘বলে’ অর্থকেও নির্দেশ করে। এ আলোচনার একটা সমালোচনা লিখেছিলেন ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উদ্দেশ্য করে যে-চিঠি লিখেছিলেন তাতে তাঁর অসাধারণ ব্যাকরণজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। একনিষ্ঠ পাঠক রবীন্দ্রনাথের চোখে এটাও ধরা পড়েছিল যে, পছ শব্দটি গোবিন্দদাসের পদেই সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়েছে এবং সর্বত্র অর্থের সমতা রক্ষিত হয়নি। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হলেও ক্ষুণ্ণ রবীন্দ্রনাথ সত্যের অনুরোধে লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন এই দুই বাক্য : ‘গোবিন্দদাস (এবং কদাচিৎ রাধামোহন) ছাড়া আর কোনো বৈষ্ণব কবির পদাবলীতে পছ শব্দ প্রয়োগের এরূপ গোলযোগ নাই। অতএব ইহার বিরুদ্ধে যদি অন্য কোনো দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ না থাকে তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই শব্দ ব্যবহারে গোবিন্দদাসের বিশেষ একটু শৈথিল্য ছিল।’

এইসব দীর্ঘ প্রবন্ধ ও পত্র রচনার বাইরে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র কচিৎ কখনো বৈষ্ণব পদ ও পদকারদের উল্লেখ করেছেন এবং প্রয়োজনানুসারে তাঁদের মূল্যায়ন করেছেন। বিশেষভাবে সাহিত্যের তত্ত্ব পরিস্ফুট করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে টেনে এনেছেন বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস প্রমুখ কবিদের। ‘তথ্য ও সত্য’ প্রবন্ধে কবিতার ভাষার আলাদা চরিত্রের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ টেনে এনেছেন জ্ঞানদাসের সেই বিখ্যাত দুই পংক্তি: ‘রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল/যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।’ এখানে ব্যবহৃত শব্দগুলি আদৌ আক্ষরিক অর্থে প্রযুক্ত কিংবা সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা দ্যোতিত করছে অসীমের ব্যঞ্জনা। রবীন্দ্রনাথ যে-সিদ্ধান্তের সমর্থনে এ চরণদুটিকে ব্যবহার করলেন সেটি তাঁর ভাষায় এইরকম—‘কবিতা যে ভাষা ব্যবহার করে সেই ভাষার প্রত্যেক শব্দটির অভিধান নির্দিষ্ট অর্থ আছে। সেই বিশেষ অর্থই শব্দের তথ্যসীমা। এই সীমাকে ছাড়িয়ে শব্দের ভিতর দিয়েই তো সত্যের অসীমতাকে প্রকাশ করতে হবে। তাই কত ইশারা, কত কৌশল, কত ভঙ্গি।’ ওই প্রবন্ধেই ধার করা হয়েছে বিদ্যাপতির চরণও, যে পংক্তিগুলি শব্দ দিয়ে চিত্র রচনা করে—‘যব গোধূলি সময় বেলি/ধনি মন্দির বাহির ভেলি/নব জলধরে বিজুরি রেহা/দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।’ কিন্তু এই শুকনো তথ্যটুকু পরিবেশনেই কবির গৌরব

বাড়েনি। শব্দের পর শব্দ বসিয়ে প্রাত্যহিক ঘটনার নকল করলেই সেটা কাব্য হয়ে ওঠে না। এখানে এটি কাব্য, কেননা চরণকটির ভিতর দিয়ে স্পষ্ট ছবির বাইরে একটা অনির্বচনীয় ভাবের অস্পষ্ট মূর্তি ফুটে উঠছে। রবীন্দ্রনাথ বললেন, ‘বস্তুত মন্দির থেকে বালিকা বাহির হয়ে ঘরে চলেছে এই বিষয়টি এই কবিতার প্রধান বস্তু নয়। এই বিষয়টিকে উপলক্ষ করে ছন্দে বন্ধে বাক্যবিন্যাসে উপমা সংযোগে যে একটি সমগ্র বস্তু তৈরি হয়ে উঠছে সেইটাই হচ্ছে আসল জিনিস। সে জিনিসটি মূল বিষয়ের অতীত, তা অনির্বচনীয়।’ রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে অত্যাঙ্কিকে মেনে নিয়েছেন রসসৃষ্টির আনুকূল্যে। তবে সে অত্যাঙ্কি যেন সত্যকারের জীবনের সঙ্গে পরিমাণ রক্ষা করে উপস্থাপিত হয়। সাহিত্যতত্ত্বঘটিত এই সিদ্ধান্তটিকে কবি প্রমাণ করতে চেয়েছেন বিদ্যাপতির ‘লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ তবু হিয়ে জুড়ন না গেল’ পংক্তির কষ্টিপাথরে। রসের অত্যাঙ্কিতে যখন এই পংক্তি ধ্বনিত হয় তখন ‘সেই হৃদয়ে যুগযুগান্তরের কোনো সীমাচিহ্ন পাওয়া যায় না।’ এমন উদাহরণ রবীন্দ্র-রচনার আরো অনেক জায়গায় অজস্র ছড়িয়ে আছে। এই দৃষ্টান্তগুলি থেকে বোঝা যায় বৈষ্ণব পদাবলীর রসে বিভোর কবি কতটা তাঁর সন্তার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছিলেন মধ্যযুগের এই সাহিত্যধারাকে। তাঁর মতো ভাবুকের মনকে যোগ্য পরিচর্যা করেছিল মহাজন পদাবলী। তাঁর প্রথম দিকের সাহিত্য-ভাবনা নিয়ন্ত্রণেও নিয়েছিল বিশিষ্ট ভূমিকা। পরবর্তীকালেও ভাবমুখ্য কবিতার কথা বলতে গিয়ে বারবার উল্লেখ করেছেন বৈষ্ণব পদাবলীর নাম। সম্ভবত তাঁর রোমান্টিসিজম বৈষ্ণব কবিদের রোমান্টিকতার ভিতর থেকে কিছুটা প্রাণবায়ু আহরণ করেছিল, যার প্রমাণ মেলে বলাকা-পূর্ববর্তী কিছু কবিতায়। বৈষ্ণব অনুষ্ঙ্গ ব্যবহার করে লিখেছিলেন মানসীর ‘পত্র’, সোনার তরীর ‘বৈষ্ণব কবিতা’, ‘বর্ষাযাপন’, ‘প্রত্যাখ্যান’, ‘লঙ্কা’ ইত্যাদি কবিতা। এমনকি এ সাহিত্যের প্রভাব কেউ কেউ লক্ষ করেন তাঁর গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্যের দু’একটি গানে। আর ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’ বইটাই তো বিদ্যাপতি-চণ্ডিদাস-প্রাণিত নবযুবক রবীন্দ্রনাথের এক অত্যদ্ভুত সৃষ্টি।

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের মধ্যে অনুবাদ কাব্যগুলির স্থান সবিশেষ নির্ধারিত। তুর্কী আক্রমণের প্রত্যক্ষ অভিঘাতে যে-দুটি সাহিত্যধারা জন্ম নিয়েছিল বলে সাহিত্য-গবেষকরা বিবেচনা করেন তার মধ্যে অনুবাদ সাহিত্য অন্যতম। অন্যটি মঙ্গলকাব্য। অবশ্য এ অনুবাদ সংস্কৃত মহাকাব্য ও পুরাণের অনুবাদ, কোন আরবী-ফার্সী-উর্দু কিংবা হিন্দী-অওধী-ভোজপুরী গ্রন্থের নয়। অনুবাদ সাহিত্যের তিনটি বলিষ্ঠ ধারা মধ্যযুগের বাংলায় প্রবাহিত হতে দেখা যায়—রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত। এই তিনটি শাখার স্বতন্ত্র অনুবাদে যথাক্রমে কৃষ্ণিবাস, কাশীরাম দাস ও মালাধর বসু শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। রবীন্দ্রনাথ মালাধরের কাব্যের সঙ্গে সেভাবে পরিচিত ছিলেন না বলেই মনে হয়। কিন্তু কৃষ্ণিবাস ও কাশীরামের কাব্য যে তিনি আদ্যোপান্ত পড়েছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে কবির স্বীকারোক্তিতে। ‘শিক্ষার হেরফের’ প্রবন্ধে লিখেছেন: ‘আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট পাঠ সমাপন করিয়া কৃষ্ণিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়িতে বসিতাম। রামচন্দ্র ও পাণ্ডবদিগের বিপদে কত অশ্রুপাত ও সৌভাগ্যে কী নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি তাহা আজিও ভুলি নাই।’ বস্তুত এ কেবল একা রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা নয়, মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষিত বাঙালির সানন্দ অভিজ্ঞতা। বাংলা রামায়ণ বঙ্গদেশের জাতীয় মহাকাব্য, আর কৃষ্ণিবাস বাঙালির প্রাণের কবি। কাশীরাম মহাভারতের অনুবাদে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে থাকলেও তাঁর গ্রন্থের বিষয় ও বপু এতই বিশাল যে তিনি কৃষ্ণিবাসের মতো বাঙালি সমাজে অতটা বিস্তারিত হতে পারেননি। লোকায়ত ভাষা ও লোক-মনোরঞ্জনক অতিরিক্ত কাহিনী সংযোজন হয়তো এ ব্যাপারে কৃষ্ণিবাসকে কিছুটা বাড়তি সুযোগ করে দিয়েছে। যাই হোক,

রবীন্দ্রনাথ এই দুই কবির কাব্য আনন্দের সঙ্গে পড়লেও তাঁর সমগ্র রচনায় বাণ্মীকি রামায়ণ ও বৈয়াসকী মহাভারতের যতটা প্রভাব স্বীকার করেছেন, বাংলায় লেখা ওই দুই মহাকাব্য সম্বন্ধে প্রায় ততটাই নীরব থেকেছেন। কৃষ্ণিবাসের কাব্যের মূল্যায়ন দু'একটি স্থলে করলেও কাশীদাসী মহাভারত সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করেননি। কেবল বাংলা ছন্দের আলোচনায় কাশীরামের বহু-ব্যবহৃত ভণিতা-চরণদুটিকে ('মহাভারতের কথা অমৃত সমান'...) বারবার ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণিবাস-মূল্যায়নও পাঠকের মনে দ্বিধা জাগিয়ে তোলে। তাঁর কাছে কৃষ্ণিবাসের বিপুল লোকমান্যতা স্বীকৃতি পেলেও এ অনুবাদের ভক্তিবাদী রূপটির কথা বিস্মৃত হননি। তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল বাণ্মীকি রামায়ণের সঙ্গে কৃষ্ণিবাসের রাম-পাঁচালির প্রধান পার্থক্য। বাণ্মীকির চোখে রামচন্দ্র দেবতা নন, 'নরচন্দ্রমা'—মনুষ্যকুলের শ্রেষ্ঠ আদর্শ; আর কৃষ্ণিবাস তাঁকে ঐকেছেন ভক্তবৎসল পতিতপাবন রূপে। 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আদিকবি বাণ্মীকির কাব্যের পাশে কৃষ্ণিবাসের পাঁচালিটিকে স্থাপন করে এই তুলনাত্মক আলোচনার সুযোগ গ্রহণ করেছেন। সাহিত্যে অতিপ্রাকৃত বিষয় মিশ্রিত হলে চরিত্রসৃষ্টি কতটা উদ্ভটত্বে পরিণত হয় তার দৃষ্টান্ত টানতে গিয়ে এই দুই কবির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন। অস্বীকার করা যায় না যে বাণ্মীকি রামায়ণেও অতিপ্রাকৃত আছে, তবে রামচরিত্রটি সেখানে 'মানুষেরই আদর্শরূপে চিত্রিত'। কিন্তু কৃষ্ণিবাসের কালে সেই অতিপ্রাকৃত উপাদান এতটাই ঘোরালো ও জোরালো হয়ে উঠতে থাকে যে শেষপর্যন্ত মানুষকে স্থানচ্যুত করে তার স্থলে দেবতাকে অধিষ্ঠিত করে। এজন্য 'কৃষ্ণিবাসের রাম ভক্তবৎসল রাম। তিনি অধম পাপী সকলকেই উদ্ধার করেন। তিনি গৃহক চণ্ডালকে মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করেন। বনের পশু বানরদিগকে তিনি প্রেমের দ্বারা ধন্য করেন। ভক্ত হনুমানের জীবনকে ভক্তিতে আর্দ্র করিয়া তাহার জন্ম সার্থক করেন। বিভীষণ তাঁহার ভক্ত। রাবণও শত্রুভাবে তাঁহার কাছ হইতে বিনাশ পাইয়া উদ্ধার হইয়া গেল। এ রামায়ণে ভক্তিরই লীলা।' এটা প্রকৃত তাৎপর্যে কৃষ্ণিবাসী রামায়ণের ঋণাত্মক সমালোচনা। যেহেতু তিনি অনুবাদক হয়েও মূলের চরিত্রাদর্শ থেকে ভ্রষ্ট করে দেবতা রামকে পাঠক সমক্ষে হাজির করেছিলেন। তবে ওই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একথা জানাতে ভোলেননি যে, কেবল সরল ভক্তির দ্বারাই শাস্ত্রজ্ঞানহীন আপামর চণ্ডাল সকলে ভগবানকে লাভ করতে পারে—এই কথাটা কৃষ্ণিবাসের পাঁচালি তার আখ্যান ও চিত্রিত চরিত্রের ভিতর দিয়ে সাধারণ্যে প্রচার করেছিল। এই ভূমিকা গ্রহণের সূত্রে রাম-পাঁচালি হয়ে উঠতে পারে 'নতুন গৌরবলাভের সাহিত্য' এবং বাস্তবে তা হয়েছিল বলেই বিশ্বাস করেন রবীন্দ্রনাথ। কৃষ্ণিবাসের জনপ্রিয়তা কালের কৃষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে চিরন্তনত্ব লাভ করেছে। তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্মরণ করে বাঙালি হয়তো কোন স্মৃতিসৌধ গড়ে তোলেনি, কিন্তু তিনি নিঃসন্দেহে বাঙালির রসমন্দির মনে চিরপূজ্য এক লোকমান্য স্রষ্টার আসনে অধিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ 'বারোয়ারি মঙ্গল'—এ লিখেছেন, "যেমন 'গঙ্গা পূজি গঙ্গাজলে', তেমনি বাংলাদেশে মুদির দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত কৃষ্ণিবাসের কীর্তি দ্বারাই কৃষ্ণিবাস কত শতাব্দী ধরিয়া প্রত্যহ পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এমন প্রত্যক্ষ পূজা আর কিসে হইতে পারে?"

রবীন্দ্র-মন্তব্যের পরিমাণ ও পরিসংখ্যানের বিচারে বৈষ্ণবপদের পরেই অবশ্য মঙ্গলকাব্যের স্থান। তবে মঙ্গলকাব্য বিষয়ে তাঁর কোন স্বতন্ত্র নিবন্ধ নেই। সম্ভবত সাহিত্যের এই বিশেষ শাখাটি নিয়ে পরিণত বয়সে আলাদাভাবে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছিলেন। যেকোন কারণে তা আর প্রকাশরূপ লাভ করেনি। তাঁর এই ভাবনা-চিন্তার ব্যাপারটা জানতে পারা যায় অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা একটি পত্র থেকে। চারুচন্দ্র তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগে কবিকঙ্কণ-চণ্ডী পড়ানোর দায়িত্ব পেয়েছেন। বইটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত

জানা তাঁর দরকার ছিল। অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। ফলে তাঁর পক্ষে সেই মুহূর্তে আলোচনা করা সম্ভব ছিল না। সুস্থ হয়ে ওঠার পর চারুচন্দ্রকে চিঠিতে লিখলেন, ‘কল্যাণীয়েষু, কবিকঙ্কণ এবং অন্নদামঙ্গল পড়ে নোট করে রেখেছি। এক কপি মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল যদি পাঠাতে পার তাহলে মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে আমার যা-কিছু বক্তব্য আছে জানতে পারবে।’ (চিঠিপত্র/১৪শ খণ্ড, পত্র সংখ্যা ৭৭) এ চিঠির তারিখ ১৭ মে ১৯১৯। এখানে উল্লেখ্য যে, এর প্রায় সতেরো বছর আগে রবীন্দ্রনাথ নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ নামে একটি সমালোচনাধর্মী প্রবন্ধ লিখেছিলেন (শ্রাবণ, ১৩৯০), যার আশু উদ্দেশ্য ছিল অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন রচিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থটির পর্যালোচনা করা। বইটির বিষয়বস্তুর পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে যথাসম্ভব সংক্ষেপে তাঁর অভিমত লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সেই সুবাদে এসেছিল মঙ্গলকাব্যগুলির কথা। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর রচনাসমূহের ভিতরে দেখেছিলেন ‘শক্তির লীলা’। তাঁব দৃষ্টিতে, মনসা-চণ্ডী প্রমুখ এক-একটি দেবী স্বেচ্ছাচারী, ভয়ংকরী। শক্তির দস্যুবৃত্তিতে তাঁরা দেবী নামের অযোগ্য। তবু সব ত্রাসিতের পুজো এসে ঠেকেছিল তাঁদের পায়ে। শক্তির স্বেচ্ছাচারী প্রকাশ এঁদের উপাখ্যানগুলির ভিতর দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। চণ্ডীমঙ্গলের গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশটিকে রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রীয় অরাজকতার প্রেক্ষাপটে। সম্ভ্রান্ত উচ্ছৃঙ্খল সেই পরিবেশে শক্তির মহিমাকীর্তন স্বভাবতই ন্যায়ধর্মহীন ঈর্ষাপরায়ণ ক্রুরতার জয়কীর্তনে পরিণত হয়েছিল। মনসামঙ্গলের গল্পের ভিতরেও এই একই অন্যায়-অধর্মের বলদর্পিতা। ‘বাংলা ভাষা পরিচয়’-এর পঞ্চম অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: ‘মনসামঙ্গলের মধ্যেও এই একই কথা। দেবতা নির্ভূর, ন্যায়ধর্মের দোহাই মানে না, নিজের পূজা প্রচারের অহংকারে সব দুষ্কর্মই সে করতে পারে। নির্মম দেবতার কাছে নিজেকে হীন করে, ধর্মকে অস্বীকার করে, তবেই ভীকুই পরিত্রাণ, বিশ্বের এই বিধানই কবির কাছে ছিল প্রবলভাবে বাস্তব।’ চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীর ঐতিহাসিক অর্থ নিরূপণেও সচেষ্টিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পূর্বে ব্যাধসমাজে প্রচলিত পশুবলির উপাচারে সম্পন্ন ভীষণ পূজাই যে চণ্ডী আরাধনায় রূপান্তরিত হয়েছিল এ বিষয়ে তিনি ছিলেন নিঃসন্দ্বিষ্ট। বিষয়বস্তুগত বিচারে মঙ্গলকাব্যগুলিকে তাঁর মনে হয়েছিল সমাজ থেকে শিবের প্রাধান্য হটিয়ে শক্তির দম্ভ প্রকাশের নির্ভূর আখ্যান। বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে এঁদের জন্ম-মহোৎসবকে সম্ভাবিত করেছিল তা না বললেও বোঝা যায়। চণ্ডী যেমন প্রচণ্ড উপদ্রবে নিজের পুজো প্রতিষ্ঠায় সফল হন, একই সন্ত্রাসের পথ ধরে আবির্ভূত হন মনসা, শীতলা প্রমুখ দেবীরা। রবীন্দ্রনাথ মঙ্গলকাব্যগুলির আখ্যানের মধ্যে তৎকালীন সামাজিক বিপর্যয়কেও অনুধাবন করতে পেরেছেন। তাঁর ধারণায়, এই কাব্যগুলি আর কিছুই নয়, সমাজের নিম্নস্তরগুলির উপরের স্তরে ওঠবার প্রাণান্তকর প্রয়াসের সাহিত্য-রূপায়ণমাত্র। এমন ঘটনা তো কেবল ভূমিকম্পের সময়েই ঘটে। মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির সময়টাকেও বলা যেতে পারে সামাজিক ভূমিকম্পের কাল। যেজন্য স্বেচ্ছাচারী শক্তির ইচ্ছেয় সেখানে কালকেতুর মতো গুণহীন ব্যাধ রাজা হয়ে সমাজের উঁচু স্তর দখল করেছে। যে-শক্তি এমন ওলট-পালট করে দিতে পারে মানুষ স্বাভাবিকভাবে সেই শক্তির দাসত্ব স্বীকার করে নেয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: ‘এইরূপ শক্তি ভয়ঙ্করী হইলেও মানুষের চিত্ত আকর্ষণ করে। কারণ, ইহার কাছে প্রত্যাশার কোনো সীমা নাই। আমি অন্যায় করিলেও জয়ী হইতে পারি, আমি অক্ষম হইলেও আমার দুরাশার চরমতম স্বপ্ন সফল হইতে পারে। যেখানে নিয়মের বন্ধন, ধর্মের বিধান আছে, সেখানে দেবতার কাছে প্রত্যাশাকে খর্ব করিয়া রাখিতে হয়।’ ওই প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিকভাবে রবীন্দ্রনাথ তুলনা টেনেছেন শাক্ত সাহিত্যের সঙ্গে বৈষ্ণবসাহিত্যের। কেননা এই দুটি ধর্মমত, তাঁর মতে, সমাজের প্রধান ধর্ম শৈব

ধর্মকে দ্বিমুখী আক্রমণে পর্যুদস্ত করেছিল। অবশ্য বৈষ্ণব ধর্ম শাক্তধর্মের মতো ‘বলরূপিনী’ নহে, প্রেমরূপিনী। আনন্দই সে ধর্মের অস্তিম্ব আশ্রয়। বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের সম্বন্ধ যেখানে সেখানে সকলেরই নিত্য দাবি। অন্যদিকে শাক্তধর্ম ভেদকেই প্রাধান্য দিয়েছে, বৈষ্ণবধর্মের মতো তাকে নিত্য মিলনের উপায় বলে গণ্য করেনি। এরপরই অন্যায় শক্তিবাদের বিরোধী ভক্তিবাদী রবীন্দ্রনাথের সেই চমৎকার মন্তব্য : ‘ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে, বাংলাদেশ আপনাকে যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছিল বৈষ্ণবযুগে। সেই সময়ে এমন একটি গৌরব সে প্রাপ্ত হইয়াছিল যাহা অলোকসামান্য, যাহা বিশেষরূপে বাংলাদেশের, যাহা এদেশ হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া অন্যত্র বিস্তারিত হইয়াছিল। শাক্তযুগে তাহার দীনতা ঘোচে নাই, বরঞ্চ নানারূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, বৈষ্ণবযুগে অযাচিত ঐশ্বর্যলাভে সে আশ্চর্যরূপে চরিতার্থ হইয়াছে।’ এ প্রবন্ধটির বাইরে বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি সম্বন্ধে মোটা দাগের মন্তব্য পাওয়া যায় আরো কতকগুলি প্রবন্ধে। ‘সাহিত্য’ বইটির ‘সাহিত্যসৃষ্টি’ প্রবন্ধে তিনি জানাচ্ছেন মুকুন্দের কাব্য, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, কেতকদাসের মনসার ভাসান, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল আসলে ‘বাংলায় ছোট ছোট পল্লীসাহিত্যকে বৃহৎ সাহিত্যে বাঁধিবার প্রয়াস’। এরই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, এ কাব্যগুলির বীজস্বরূপ রয়ে গিয়েছে সমস্ত গ্রাম্যকাহিনী। যদি কোনদিন গ্রাম্য ছড়াগুলির পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়, ‘তবেই ভারতচন্দ্র-মুকুন্দরাম রচিত কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাইবার পথ হয়।’ আরো নানা টুকরো মন্তব্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মঙ্গলকাব্যগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কখনোই উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। তাঁর বিবেচনায়, এ জাতীয় কাব্য ‘ধনীদেব ফরমাসে ও খরচে খনন করা পুঙ্করিণী’ মাত্র। (১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা চিঠি দ্রষ্টব্য) মঙ্গলকাব্যগুলি একটি বিশেষ সময়ের ফসল বলেই এর সাহিত্যমূল্য সম্বন্ধে তিনি ছিলেন ভীষণই সন্দেহান। ১৩২২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠে বেরনো ‘সোনার কাঠি’ প্রবন্ধে লিখেছেন, ‘আজ পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে যদি কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসানের পুনরাবৃত্তি নিয়ম চলতে থাকতো তাহলে কী হত। পনেরো আনা লোক সাহিত্য পড়া ছেড়েই দিত।’ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী বইটির মার্জিনে করা মন্তব্যগুলি যে এই মনোভাব থেকেই বেরিয়ে এসেছিল তার উল্লেখ করা বোধহয় বাহ্যিক।

‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ ও অন্যান্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের এইসব মন্তব্য সামগ্রিকভাবে সবশ্রেণীর মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়েছিল। অবশ্য সেই নির্ণয় আধুনিক বিবেচনায় সবক্ষেত্রে মান্যতা পায়নি। ধর্মমঙ্গল কাব্য সম্বন্ধে তাঁর কোন মতামত সেভাবে জ্ঞানতে পারা যায় না। তাছাড়া মঙ্গলকাব্যের কবিদের সামাজিক পরিচয়ের সূত্রেও বোঝা যায়, যদি সামাজিক মিলনের তাগিদ থেকে শক্তিপ্রতিষ্ঠার এই আখ্যানগুলি লিখিত হয়ে থাকে, তবে সেই তাগিদের জন্ম নিম্নজাতির অভ্যন্তর ভাগ থেকে ঘটেনি, তা এসেছিল সমাজের ওপরের স্তর থেকে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয়, তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর কোন মানুষকেই দেবতার মাহাত্ম্যকথা রচনার কাজে ব্রতী হতে দেখা যাচ্ছে না। যাই হোক, মঙ্গলকাব্যগুলির প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ যে যথেষ্ট পরিমাণে জাগরুক ছিল তার প্রমাণ মেলে ওইসব চিন্তাশব্দক মন্তব্যে। সাম্প্রতিক কালের একজন গবেষক ‘জীবনস্মৃতি’র সাক্ষ্যসূত্রে দেখাতে চেয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকেই মঙ্গলকাব্যগুলি বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রম্য সাহচর্য লাভ করেছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত। তিনি ইউরোপীয় সাহিত্যের পাশাপাশি এদেশীয় পুরনো সাহিত্যেরও ছিলেন একনিষ্ঠ ভক্ত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—‘বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদকর্তা, কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, হরু ঠাকুর, রাম বসু, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক প্রভৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগের সীমা ছিল না।’ অক্ষয়বাবুর সেই অপরিাপ্ত উৎসাহই যে

মধ্যযুগের সাহিত্যপাঠে রবীন্দ্রনাথের মনের জন্ম অনেকটাই তৈরি করে দিয়েছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এখানে জানানো প্রয়োজন, মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে উপরোক্ত সামগ্রিক মন্তব্য করা ছাড়া আলাদাভাবে দুটি মঙ্গলকাব্য নিয়ে তিনি নানাস্থানে তাঁর অভিমত জ্ঞাপন করেছিলেন। এর মধ্যে একটি মুকুন্দ চক্রবর্তীর লেখা ‘কবিকঙ্কণ চণ্ডী’ ও অন্যটি ভারতচন্দ্রের লেখা ‘অন্নদামঙ্গল’। আমরা এখানে পর্যায়ক্রমে সেই দুই বিশিষ্ট রচনা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের পাঠ-প্রতিক্রিয়াটুকু জেনে নেবার চেষ্টা করবো।

যতদূর অনুমান করা যায়, ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের ‘প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ’-এর অন্তর্গত চণ্ডীমঙ্গল সংস্করণ দিয়েই শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মঙ্গলকাব্য বিষয়ে পড়াশুনো। এরপর পড়েছিলেন পূর্বে উল্লেখিত অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত ‘কবিকঙ্কণ-চণ্ডী’ গ্রন্থটি। এবারের পড়া তাঁকে দিয়ে বইয়ের মার্জিনে লিখিয়ে নেয় উনত্রিশটি টুকরো পাঠ-প্রতিক্রিয়াধর্মী আশু মন্তব্য। ১৩৩২ বঙ্গাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর কেবল আখ্যটিক খণ্ডটিই প্রকাশিত হয়। সম্ভবত এটিও তাঁর নজর এড়ায়নি। বস্তুত এইসব পাঠের সামগ্রিক যোগফল হিসেবে তাঁর মন্তব্যগুলিকে এবার পর্যালোচনা করা যেতে পারে। আগেই বলা হয়েছে যে, চণ্ডীমঙ্গলে কবি দেখেছিলেন স্বেচ্ছাচারী শক্তির খেলাকে। ব্যাধ কালকেতু সেই শক্তির ইচ্ছেয় নীচ হয়েও উঁচুতে উঠেছে। এই উত্থানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ কোন হেতু খুঁজে পাননি। ব্যাধ যে প্রথমাবধি দেবীর অনুগত ভক্ত ছিল, এমন তথ্যও চণ্ডীমঙ্গলে পাওয়া যায় না। বরং ব্যাধ হিসেবে সে অরণ্য পশু-শিকারে দেবীর বাহন সিংহকে পর্যন্ত রেয়াৎ করেনি। সিংহ বধের কারণে দেবীর ক্রোধভাজন সে সহজেই হতে পারতো। অথচ দেবী তাকে নিতান্তই যথোচ্ছাক্রমে দয়া করলেন, আর পূর্বের একনিষ্ঠ সেবক কলিঙ্গরাজকে নিগৃহীত করলেন। অতএব সিদ্ধান্ত, এ দেবী ‘দয়ামায়াহীন ধর্মাধর্ম বিবর্জিত’ ভয়ঙ্করী শক্তি।

কবিকঙ্কণের কাব্য নিয়ে রবীন্দ্র-অভিমত সর্বপ্রথম অবশ্য পাওয়া যায় ‘ভারতী’ পত্রিকায়। ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে ওই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ‘বাঙ্গালী কবি নয়’ নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে ছিল চণ্ডীমঙ্গলের একটি বিশেষ কাব্যপ্রসঙ্গের বিচার। প্রসঙ্গটি হল সমুদ্র মরীচিকা ‘কমলে-কামিনী’। এক অপূর্ব সুন্দরী রমণী পদ্মদলে বসে একটি হাতীকে গ্রাস করেই পরমুহূর্তে বমন করছে। বলাবাহুল্য, এ বিষয়টি কবিকঙ্কণের স্বকপোলকল্পিত নয়, ঐতিহ্য থেকে পাওয়া। কবি কেবল তাকে নিজস্ব সামর্থ্য অনুযায়ী রূপ দিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এটি মুকুন্দের লেখাতে পড়ে তাঁর কল্পনার সৌন্দর্যহীনতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে প্রায় আক্রমণাত্মক ভাষায় মন্তব্য করেছেন, ‘কবিকঙ্কণের কমলে-কামিনীতে একটি রূপসী ষোড়শী হস্তীগ্রাস ও উদ্গার করিতেছে, ইহাতে এমন পরিমাণ-সামঞ্জস্যের অভাব হইয়াছে যে, আমাদের সৌন্দর্যজ্ঞানে অত্যন্ত আঘাত দেয়।’ ‘কমলে-কামিনী’র মতো চণ্ডীমঙ্গলের আরো একটি প্রসঙ্গ তুলে রবীন্দ্রনাথ কবিকঙ্কণের কবিত্বহীনতাকে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। প্রসঙ্গটি হল ‘ফুল্লরার বারমাস্যা’। এ বিষয়ে আগে অক্ষয়চন্দ্র সরকার ‘কাব্য সমালোচনা’ শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে, ওই বারমাস্যাটিতে কবিকল্পনার সার্থক পরিচয় ফুটে উঠেছে। সপ্রশংস সেই মন্তব্যে ছিল এইরকম এক বাক্যবন্ধ: ‘ইহাই সার্থক কবিত্ব, সার্থক বন্দনা, সার্থক প্রতিভা।’ একথার সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ ‘কাব্য: স্পষ্ট ও অস্পষ্ট’ প্রবন্ধে লিখলেন, ‘ইহা কাব্যও নহে, কাব্যিও নহে, যাঁহার নামকরণের ক্ষমতা আছে তিনি ইহার আর কোন নাম দিন। যিনি ভঙ্গী করিয়া কথা কহেন তিনি না হয় ইহাকে কাব্য বলুন, শুনিয়া দৈবাৎ কাহার হাসি পাইতেও পারে।’ (ভারতী ও বালক, ১২৯৩, জ্যৈষ্ঠ) শুধু এখানেই থামলেন না, কাকে ‘সার্থক কবিত্ব’ বলে সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর জন্য

রবীন্দ্রনাথ তুলে আনলেন বিদ্যাপতির সেই পদ ‘সখী, এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর/শূন্য মন্দির মোর’। বললেন, এ পংক্তি স্পষ্ট হয়েও কাব্য হয়েছে, যার ত্রিসীমানায় পৌঁছায় না মুকুন্দের প্রতিভা। এই একই প্রতি-তুলনার আরও একবার উল্লেখ মেলে তাঁর ‘সাহিত্যরূপ’ প্রবন্ধে। (বৈশাখ, ১৩৩৫) ‘যব গোধূলি সময় বেলি’... ইত্যাদি কাব্যচরণে সামান্য একটা ঘটনা কীভাবে অসামান্য হয়ে উঠল তা জানানোর পরে অনিবার্যভাবে টেনে এনেছেন বারোমাস্যার সেই দুটি চরণ-‘দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান’/‘আমনি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান’। এই পংক্তি দুটোতে দরিদ্র নারায়ণের স্পষ্ট উপস্থিতি থাকলেও তা যথার্থ কাব্য হয়ে উঠতে পারেনি। এরপর রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘কথাটা রিপোর্ট করা হলো মাত্র, তা রূপ ধরল না। কিন্তু সাহিত্যে ধনী বা দরিদ্রকে বিষয় করা দ্বারায় তার উৎকর্ষ ঘটে না;’ ভাব ভাষা ভঙ্গি সমস্তটা জড়িয়ে একটি মূর্তি সৃষ্টি করা হলো কিনা এইটাই লক্ষ্য করার যোগ্য। ‘তুমি খাও ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘাটে’—দারিদ্র-দুঃখের বিষয় হিসেবে এর শোচনীয়তা অত্যন্ত নিবিড়, কিন্তু তবু কাব্য হিসাবে এতে অনেকখানি বাকি রইল।’ চণ্ডীমঙ্গলের আর একটি কাব্যচিত্র রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম কল্পনাবোধকে ভীষণভাবে বিদ্ধ করেছিল বলে মনে হয়। সেটি কালকেতুর ভোজন-দৃশ্য। অতিকায় মানবটির দানবীয় ভোজনের বর্ণনা দিতে গিয়ে কাব্যের একস্থানে কবিকঙ্কণ লিখেছেন, ‘শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল/ছোট গ্রাস তোলে যেন তে-আঁটিয়া তাল’। এই ছবিটার সঙ্গে যে কোন ভাবেই হোক পরিমাণ-সামঞ্জস্যের অভাববোধ জড়িয়ে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মনে। যার সাহিত্যিক প্রমাণ মেলে ‘জাপানযাত্রী’ বইয়ে সে দেশের বিশ্বগ্রাসী বাণিজ্যের অতিকায় চেহারা বোঝানোর জন্য এই বদখং উপমানটির ব্যবহারে। ওই বইটির ১১নং পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, ‘কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ব্যাঘের আহারের যে বর্ণনা আছে—সে এক গ্রাসে এক এক তাল গিলছে, তার ভোজন উৎকট, এও এইরকম; এই বাণিজ্য-ব্যাঘটাও হাঁসফাস করতে করতে এক এক পিণ্ড মুখে যা পুরছে, সে দেখে ভয় হয়।’ এরপর বুঝতে একটুও অসুবিধা হয় না, কবিকঙ্কণের ওই বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের মনের কতটা বিরক্তি উৎপাদন করেছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সার্বিক চরিত্র চিত্রণ নিয়েই যে রবীন্দ্রনাথের মনে কিছুটা অসন্তুষ্টি রয়ে গিয়েছিল তা টের পাওয়া যায় ‘পঞ্চভূত’-এর ‘নরনারী’ প্রবন্ধ থেকে। প্রসঙ্গটি ছিল এইরকম, সাহিত্যে ও সমাজে নারী ও পুরুষের গুরুত্ব ও অবস্থান কতখানি তা নিয়ে পাঞ্চভৌতিক সভার সদস্যরা মত বিনিময় করছিল। সেখানে সমীর নামক চরিত্রটি জানায় যে, বাংলা সাহিত্যে পুরুষের তুলনায় নারী চরিত্রগুলি বেশি জীবন্ত ও সক্রিয়। উদাহরণ টেনে সে বলে, ‘কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর সুবহং সমভূমির মধ্যে কেবল ফুল্লরা একটু নড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যাঘটা একটা বিকৃত বহং স্থানুমাত্র এবং ধনপতি ও তাহার পুত্র কোন কাজের নহে।’ সমীরের আড়ালে এই মত আসলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। অবশ্য এই দোষের পুরোটাই একা বোটারী কবিকঙ্কণের ঘাড়ে বর্তাবে কিনা সন্দেহ। তবে রবীন্দ্রনাথ অন্য একটি প্রসঙ্গে প্রশংসা করেছেন মুকুন্দের অনবদ্য সৃষ্টি ভাঁড়ুদন্তের। এমন সজীব সরস চরিত্র মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে প্রায় নেই বললেই চলে। ভাঁড়ুর ঠকামি, অভিনয়-চাতুর্য, গায়ে-পড়া ভাব, মোড়লিপনা রবীন্দ্রনাথের রসিক মনকে মুগ্ধ করেছিল। ‘সৌন্দর্য ও সাহিত্য’ (বৈশাখ, ১৩১৪) প্রবন্ধে খুব বিশদ করেই ব্যাখ্যা করেছেন রবীন্দ্রনাথ কাব্যের ভাঁড়ুদন্তের এই রসের সমগ্রতার দিকটি—‘কবিকঙ্কণ এই ছাঁদের মানুষটিকে আমাদের কাছে যে মূর্তিমান করিতে পারিয়াছেন তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। ভাষায় এমন একটি কৌতুকরস লইয়া সে জাগিয়া উঠিয়াছে যে সে শুধু কালকেতুর সভায় নয়, আমাদের হৃদয়ের দরবারে অনায়াসে স্থান পাইয়াছে। ভাঁড়ুদন্ত প্রত্যক্ষ সংসারে ঠিক এমন করিয়া আমাদের গোচর হইত না।...কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ভাঁড়ুদন্ত তাহার সমগ্র অনাবশ্যক বাহ্যিক বর্জন করিয়া কেবল একটা সমগ্র রসের মূর্তিতে আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে।’

বাংলা মঙ্গলকাব্যসমূহের মধ্যে রায়শুণাকর ভারতচন্দ্র রায় রচিত অন্নদামঙ্গল বিশিষ্ট। তাঁর মতো কৃতবিদ্য, যশস্বী, শক্তিমান কবির আবির্ভাব বঙ্গদেশে সারা মধ্যযুগে ঘটেছিল কিনা সন্দেহ। তাঁর অদ্বিতীয় সৃষ্টি অন্নদামঙ্গল বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, চরিত্রচিত্রণের মুগ্ধিয়ানায়, ভাষার আলংকারিকতায় গতানুগতিক সাহিত্য-ভাবনায় অভ্যস্ত বিমিয়ে পড়া পাঠকসমাজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। এই হঠাৎ ঝাঁকুনির একটা কারণ অবশ্যই বিদ্যাসুন্দর। এ অংশে যে অনাবৃত অশ্লীলতা রয়ে গিয়েছে তা কবিকে একই সঙ্গে নিন্দিত ও নন্দিত করেছে। যুগরুটিই যে অনেক সময়ে সাহিত্য-বিচারের মাপকাঠি হয়ে ওঠে ভারতচন্দ্রের কাব্য তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কৃষ্ণনগরের রাজসভার কবি হবার সুবাদে তাঁর রচনায় দরবারি সাহিত্যের যা-কিছু বিশিষ্টতা সবই আছে। সবচেয়ে বেশি আছে ‘আর্ট’, যে-আর্ট শ্লীল-অশ্লীল নিয়ে ভুরু-বাকানো প্রশ্ন তোলে না, জীবনকে দেখায় সেলুলয়েডে তোলা ছবির মতো আধা-জীবন্ত করে। আঠারো শতকের মধ্যপর্বের কাব্য হলেও কবির মনোভাবে কোথাও কোথাও স্পর্শ লেগেছিল আগামী আধুনিকতার। সব মিলিয়ে এ কাব্য অনন্য ও কারো কারো মতে মঙ্গলকাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এমন একটা প্রাতিম্বিক রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাঁর অন্নদামঙ্গল পাঠের খবর পাওয়া যায় পূর্বোক্ত অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৯১৯ সালের ১৭ মে তারিখে লেখা পত্রে। চণ্ডীমঙ্গলের মতো এই বইয়ের মার্জিনেই সম্ভবত ‘নোট’ করেছিলেন তিনি। অবশ্য সে বইটি আর পবে পাওয়া যায়নি। ফলে অন্নদামঙ্গল সম্বন্ধে নানা স্থানে টুকরো টুকরো যে সব মন্তব্য করেছিলেন সেগুলিকে সূত্রাকারে সাজিয়ে এ কাব্য বিষয়ে তাঁর মনোভাবটি বুঝে নেওয়া যেতে পারে।

শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেনের ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ বইটির পুস্তক-পর্যালোচনা সূত্রে যে-প্রবন্ধ লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাতে অন্নদামঙ্গল সম্পর্কে বিশেষ কোন বিশ্লেষণ মেলে না। তবে শক্তি-মাহাত্ম্য বিষয়ক অন্যান্য মঙ্গলকাব্য সামাজিক অরাজকতা ও রাষ্ট্রীয় সন্তোষের অভ্যন্তর ভাগ থেকে যেভাবে উথিত হয়েছিল অন্নদামঙ্গলও এইরকম কোন পটভূমি থেকে উদ্ভূত ছিল না বলে তাঁর মনে হয়েছে। তিনি বরং শিব-গৃহিনীর রূপান্তরটি কালের প্রেক্ষাপটেই লক্ষ করেছেন। পূর্বের ‘অত্যাগ্র চণ্ডী’ ‘উত্তরোত্তর মধুর ও কোমল’ মূর্তি ধারণ করেছেন ভারতচন্দ্রের রচনায়। তিনি এখানে দেখা দিয়েছেন জননী অম্পূর্ণা, ডিখারির গৃহলক্ষ্মী ও বিচ্ছেদ বিধুর পিতামাতার কন্যা রূপে। ‘বাঙালির দরিদ্রগৃহের মধ্যে এই মঙ্গলমাধুর্ষিসিক্ত দেবভাবের অবতারণা কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে কিয়ৎ পরিমাণে আপনাকে অঙ্কিত করিয়াছে, অন্নদামঙ্গল তাহার উপর রঙ ফলাইয়াছে।’ এ মন্তব্যের এক যুগ আগে ১২৯৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে প্রকাশিত ‘আলস্য ও সাহিত্য’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অন্নদামঙ্গলের স্থানে স্থানে অলস কল্পনাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যে-কল্পনা পবিত্র জীবনের অভাবে বিকৃতিপ্রাপ্ত হতে থাকে। বিদ্যাসুন্দরের একটা বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন হৃদয়ের আবেগ কল্পনার তেজ হারিয়ে কীভাবে কেবল বন্ধিম কথাকৌশলে পরিণত হয়। আলস্য ও দারিদ্র্য আসলে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে আহ্বান করে। সাহিত্যেও এ দুইয়ের অবস্থান কখনো কখনো সত্য হয়ে ওঠে। অলস কল্পনার পক্ষে উজ্জ্বলি ছাড়া আর কিছু উপায় থাকে না। ভারতচন্দ্র-অঙ্কিত শিব চবিত্রে এর প্রমাণ পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। অন্নদামঙ্গলের শিব কুমারসম্ভবের যতি-সন্ধ্যাসী নন, বাংলার বেদে সমাজের একজন। যার ধূসর মলিন বেশ, মাথার চুলে জট, গায়ে উঠছে খড়ি। শিবের এই মূর্তি অলসতাপ্রসূত দরিদ্র কল্পনার ফল। এরই সঙ্গে একাব্যে রবীন্দ্রনাথ যে-ইন্দ্রিয়বিকার প্রত্যক্ষ করেছেন, তার মূলেও দেখেছেন এই দরিদ্র কল্পনার উপস্থিতি। প্রবন্ধটির একস্থানে লিখেছেন, ‘কল্পনার দারিদ্র্য যদি দেখিতে চাও অন্নদামঙ্গলের মদনভস্ম পাঠ করিয়া দেখো। বন্ধমলিন জলে

যেমন দূষিত বাষ্পস্ফীত গাড় বুদ্ধদশেণী ভাসিয়া উঠে তেমনি আমাদের এই বিলাস-কলুষিত অলস বঙ্গসমাজের মধ্য হইতে ক্ষুদ্রতা ও ইন্দ্রিয়বিকারে পরিপূর্ণ হইয়া অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর ভাসিয়া উঠিয়াছিল। নিরবচ্ছিন্ন আলস্যের মধ্যে এইরূপ সাহিত্যই সম্ভব।' এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর নিয়ে উনিশ ও বিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি সমাজ স্পষ্টত দুটি দলে বিভক্ত ছিল। একটা দলের মতে, ভারতচন্দ্রের কাব্য যে অশ্লীল হয়ে উঠেছে তার জন্য দায়ী যুগরুচি ও দীর্ঘদিনের ভারতীয় সাহিত্য-ঐতিহ্য। প্রাচীন ভারতবর্ষে এ রসের চর্চা ছিল যথেষ্ট। বিদ্যাসুন্দরের কবি সেই ধারারই অনুবর্তীমাত্র। তাছাড়া উনিশ শতকের পশ্চিমী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ এদেশে প্রবেশ করবার আগে অন্ধি এখানকার অলংকারশাস্ত্রীরা অশ্লীলতাকে অন্য চোখে দেখতেন। ভারতচন্দ্র সেই সময়ের কবি। অতএব তাঁকে বিচার করতে হবে আগেকার সাহিত্য-মানদণ্ডে। ভিন্নপক্ষের বক্তব্য, ভারতচন্দ্র ভীষণই অশ্লীল। তাঁর রচনা রুচি-বিকৃতির চূড়ান্ত, যা পাঠকের মনকে অসুস্থ করে তোলে। এ কাব্য নৈতিক মূল্যবোধের অধঃপতনকে সূচিত করে, অতএব এর থেকে শত হস্ত দূরে থাকাই শ্রেয়। এই দুই প্রান্তবর্তী অভিমতের দুই বিশিষ্ট প্রতিনিধি হিসেবে যাদের নাম করা যেতে পারে তাঁরা হলেন যথাক্রমে প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীলতা নিয়ে ১২৯৮ বঙ্গাব্দ নাগাদ তাঁর বন্ধু লোকেন পালিতকে চিঠিতে যেকথা লিখেছিলেন তাতে তাঁর মনোভাবটি স্পষ্টমাত্রায় জ্ঞানতে পারা যাচ্ছে। রাজসভার এই কৃতবিদ্য কবি অশ্লীলতা পুরোপুরি অনাবৃত করেননি, চাকচিক্যময় ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কারে অর্ধোন্মুক্ত রেখেছিলেন। আর তাতেই সেই আংশিক অনাবরণ হয়ে উঠেছে প্রবলমাত্রায় জুগুপ্সাব্যঞ্জক। পত্রের কিয়দংশ এইরকম—‘সুবৃহৎ অনাবরণের মধ্যে অশ্লীলতা নেই। সেইজন্য সুবৃহৎ শৈল্পপীয়র অশ্লীল নয়, রামায়ণ-মহাভারত অশ্লীল নয়। কিন্তু ভারতচন্দ্র অশ্লীল, জোলা অশ্লীল—কেননা তা কেবল আংশিক অনাবরণ।’ অন্যদিকে ভারতচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শকে সমর্থন করে প্রমথ চৌধুরী ‘ভারতচন্দ্র’ প্রবন্ধে লেখেন যে, তাঁর কাব্যের প্রধান রস আদিরস নয়, হাস্যরস। বিদ্যাসুন্দরে কবি Knowledge-এর সঙ্গে মেলাতে চেয়েছিলেন Art-কে এবং তাতে যে সম্পূর্ণ সফল হয়েছিলেন এ নিয়ে কোন সংশয় নেই। এ কাব্যের চরিত্রচিত্রণ সম্বন্ধেও সেই একই অভিযোগ, যা আগে চণ্ডীমঙ্গল সম্পর্কে উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ পুরুষের তুলনায় নারী চরিত্রগুলি সুচিত্রিত। কাব্যে মালিনী ও বিদ্যার সজীব মূর্তি প্রকাশ পেলেও সুন্দর অনেকটাই নিষ্প্রভ। রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য হয়তো সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য নয়। এসব অভিমতের বাইরে আরো কিছু বিক্ষিপ্ত রবীন্দ্র-মন্তব্য পাওয়া যায়, যাদের মূল ধূয়ো একটাই : ভারতচন্দ্রের কাব্য একালের নাগরিক রুচি ও অভ্যাসের পক্ষে অচল, যেহেতু বিলাস-কলুষিত আলস্যই সাহিত্যকে রসোত্তীর্ণ করতে পারেনি। তাছাড়া অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর মতো ভারতচন্দ্রের হরগৌরীও গ্রাম্যতা মুক্ত নয়। তবে এই কবি ও কাব্য সম্বন্ধে সমালোচক রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য পরবর্তীকালে খুব উল্লেখযোগ্যতা পেয়েছে। ওই মন্তব্যটি ভারত-কাব্য বিষয়ে তাঁর মুগ্ধতা প্রকাশ করে। ভারতচন্দ্র ছিলেন রাজসভার কবি। রাজসভার উপযুক্ত বিদগ্ধতা তাঁর ছিল, আর ছিল উপস্থাপন ভঙ্গির মধ্যে অপূর্ব অভিনবত্ব। ফরমায়েসী রচনা হওয়া সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল যে কালজয়ী হতে পেরেছে সেটা তার অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্যে। সেই গোপন ঐশ্বর্যের পরিচয় দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ‘কবি-সংগীত’ প্রবন্ধে লিখেছিলেন এই স্মরণীয় বাক্যটি : ‘রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকন্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য।’

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি ও তাকে কেন্দ্র করে প্রাসঙ্গিক আলোচনা মেলে রবীন্দ্রনাথের ‘ছন্দ’ নামক বইয়ে। বাংলা ছন্দচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে তাঁর নাম অবশ্যই

স্মরণযোগ্য। একজন ছান্দসিক-কবি হিসেবে কাব্যে নানা প্রকারের ছন্দ-প্রয়োগে তাঁর বিশিষ্টতা ও দক্ষতা পৃথক আলোচনার দাবি রাখে। খুব পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ হাত দেন ছন্দ বিষয়ক প্রবন্ধে। বিভিন্ন ছন্দের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে ও বৈশিষ্ট্য বোঝাতে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য থেকে সুপ্রচুর উদ্ধৃতি প্রয়োগ করেন প্রবন্ধগুলিতে। কাব্যের ছন্দের ভূমিকা বিষয়ে বলতে গিয়ে জানিয়েছেন বাগবিধির অভ্যস্তরস্ব বেগের কথা। কেমন করে ছন্দের গতি কথার মধ্য থেকে জাগিয়ে তোলে অনির্বচনীয়তা তা বোঝানোর জন্য উদ্ধৃত করেছেন বৈষ্ণব কবির এই পংক্তি—‘রজনী শাওন ঘন/ঘন দেয়া গরজন/রিমিঝিমি শবদে বরিষে। পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে/বিগলিত চীর অঙ্গে/নিন্দ যাই মনের হরিষে।’ ছন্দের প্রদক্ষিণ ও পদক্ষেপ অর্থাৎ চাল ও চলন দেখানোর জন্য নিয়েছেন ‘শারদ চন্দ পবন মন্দ বিপিন ভরল কুসুম গন্ধ’ পদটি। মধ্যযুগের অনেক কবি সংস্কৃত ছন্দের প্রয়োগ করেছিলেন বাংলা পদে। ভারতচন্দ্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সংস্কৃত রীতিতে স্বরের ত্রু-দীর্ঘ বজায় রাখতে হয়। ভারতচন্দ্রের ‘মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে’ অংশটুকু উদ্ধার করে ওই ছন্দের উচ্চারণগত বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। একইসঙ্গে অনুমান করেছেন, সাধুছন্দের দীনতা দূর করার জন্য রায়গুণাকর সংস্কৃত ছন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য এমন ছন্দ (প্রত্ন-কলাবৃত্ত আকারের) বৈষ্ণব কবিদের লেখাতেও মেলে। বাংলায় আছে আর-এক প্রকারের ছন্দ, তার লয় দ্রুত। একে বলেছেন ‘মেয়েলি ছন্দ’। হ্রস্ব শব্দ-বহুল বাংলা ভাষায় এই দ্রুত লয়ের ছন্দে নিকটবর্তী শব্দগুলি পরস্পর জুড়ে গিয়ে কেমন একটা রূপ নেয় তার উদাহরণ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তুলেছিলেন রামপ্রসাদের গানের এই লাইন: ‘মধেচারি কী দোষাছে,/যেমন্নাচা তেমনি নাচে।’ (মন বেচারির কী দোষ আছে,/তারে যেমন নাচাও তেমনি নাচে।) এটাই, তাঁর মতে, বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ। ‘যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে।’

ছন্দ-বিষয়ক আলোচনাগুলি খুঁটিয়ে পড়লে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ভাব বা বিষয়বস্তু সম্পর্কেই কেবল আগ্রহী ও সচেতন ছিলেন না, একই সঙ্গে সেসব রচনার গঠনকৌশল বিষয়েও ছিলেন কৌতূহলী। প্রাগাধুনিক রচনার অধিকাংশই ছিল গানের সুরে ঢালা, আসরে পরিবেশনযোগ্য করে বানানো। বাকিটা লেখা হয়েছিল বিশুদ্ধ পাঠের উদ্দেশ্যে। যেগুলিকে গানের মাধ্যমে উপস্থিত করা হতো সেগুলিতে ছন্দপতন ঘটলেও সুরের ঐক্যতানের জন্য কানে ধরা পড়তো না আদৌ। এর পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ সেকালের অতি-ব্যবহৃত পয়ার ছন্দের ক্ষেত্রে এটাও লক্ষ করেছিলেন যে, পয়ারের মাত্রাগুলি অন্য ছন্দের মতো ঠাসবুনানি নয়। তাকে দস্তুর মতো বাড়ানো-কমানো যায়। ‘সুর করে টেনে টেনে পড়বার সময় কেউ যদি যতির যোগে পয়ারের প্রথম ভাগে দশ এবং শেষভাগে আটমাত্রা পড়ে তবু পয়ারের প্রকৃতি বজায় থাকে।’ রবীন্দ্রনাথের এই গভীর নিরীক্ষণ বুঝিয়ে দেয় প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ, কৌতূহল। তিনি শুধু তাদের রসোপভোগ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, একই সঙ্গে জানতে-বুঝতে চেষ্টা করেছেন তাদের নির্মিত হয়ে ওঠার বহিঃঙ্গিক কলাকৌশল।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে উল্লেখ করতে চাই এমন একজন মধ্যযুগীয় ব্যক্তিত্বের কথা যার অতনু প্রভাব তাঁর যুগকালের বেড়া ডিঙিয়ে আধুনিক কালকে স্পর্শ করেছে। তিনি হলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এক কলম সাহিত্য রচনা না করেও অজস্র রচনার অন্তঃপ্রেরণা হয়ে দেখা দিয়েছিলেন এই যুগপুরুষ। অন্যান্য স্মরণীয় ব্যক্তিত্বকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে তাঁদের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত জানিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের

মতো মহাপ্রভু বিষয়ক তাঁর কোন স্বতন্ত্র প্রবন্ধ নেই। এটা হতে পারে যে, তিনি ও শ্রীচৈতন্য ছিলেন স্বভাবের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রান্তবাসী মানুষ। ধর্মবিশ্বাসেও পৃথক। তবুও তৎকালীন সমাজক্ষেত্রে মহাপ্রভু যে-যুগান্তকারী ভূমিকা নিয়েছিলেন, বৃহৎ ভাবের বন্যায় সামাজিক জ্ঞতিবর্ণের ব্যবধান ঘুচিয়ে সব একাকার করে দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেকথা বিস্মৃত হননি। ১২৯৪ বঙ্গাব্দে বেরনো ‘চিঠিপত্র’ বইয়ে নবীনের প্রতিনিধি নবীনকিশোর প্রবীণের প্রতিভু ষষ্ঠীচরণ দেবশর্মাকে যে-কাল্পনিক পত্র লিখেছিল তার অনেকটা অংশ জুড়েই আছে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা, তাঁর সামাজিক বিপ্লবের সদর্থক মূল্যায়ন। একটি কল্পিত চরিত্রের কলমের মুখে-আস। মস্তব্যগুলি যে প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব ভাবনা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কী লিখেছিল নবীনকিশোর? ‘আমাদের বাঙালির মধ্য হইতেই তো চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি তো বিঘাকাঠার মধ্যে বাস করিতেন না, তিনি তো সমস্ত মানবকে আপনার করিয়াছিলেন। তিনি বিস্মৃত মানবপ্রমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন।’ আঘাত পেয়েও যিনি প্রত্যাঘাতের বদলে ভালোবাসা দিয়ে জগতকে ভোলান তাঁর মধ্যে রয়েছে প্রেমের সেই অসম্ভব শক্তি, যা দিয়ে তিনি সমস্ত বিরুদ্ধতাকে জয় করেছিলেন। তাঁর ভাব-আন্দোলনের সেরা হাতিয়ার রাজপথী কীর্তন সমাজ-সংসারের বেড়া ভেঙে টেনে এনেছিল শুচি-মুচি, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র সবাইকেই। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এর মূল্য বড় কম নয়। তবে প্রেমের ধর্মে শ্রীচৈতন্য কোথাও কোন ইন্দ্রিয়-শৈথিল্য ঘটতে দেননি। কঠোর নিষ্ঠায় সেই ধর্মকে বহন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর তিরোধানের পর আর শেষ রক্ষা হয়নি। ভাবের শুদ্ধতা বজায় রাখতে গেলে যে দৃঢ় চারিত্র্যশক্তির প্রয়োজন হয়, তাঁর অনুবর্তীদের মধ্যে সে-শুণের বড় অভাব ছিল। তবুও রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন মধ্যযুগে কেবল চৈতন্য-ধর্মই ভগবানকে তাঁর রাজসিংহাসন থেকে নামিয়ে এনে নিজেদের খেলাঘরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, এমনকি প্রেমের স্পর্ধায় সে ভগবানের ঐশ্বর্যকে পর্যন্ত উপহাস করতে পেরেছিল। ‘সমূহ’ গ্রন্থের ‘দেশহিত’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন: ‘ইহাতে করিয়া যে ব্যক্তি, তৃণাদপি নীচ, সেও গৌরবলাভ করিল, যে ভিক্ষার ঝুলি লইয়াছে, সেও সম্মান পাইল, যে স্বেচ্ছাচারী সেও পবিত্র হইল। প্রেমের অধিকারে, সৌন্দর্যের অধিকারে, ভগবানের অধিকারে কাহারও কোনো বাধা রহিল না।’ রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যদেবের সূত্রে স্মরণ করেছেন উপনিবেশ-পূর্ব বাংলার প্রথম গণমুখী সংগীত কীর্তনের কথাও। মহাপ্রভু ছিলেন রাজপথী কীর্তনের গুরু, প্রবর্তক। এর আগে বাংলার সঙ্গীতে ধ্রুপদী বৈঠকী গানের দূরপন্থে প্রভাব ছিল। যে-গান বিজ্ঞান কক্ষে বিনিয়োগে বিনিয়োগে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করাকেই মনে করতো ওস্তাদের মুল্লিয়ানা। মহাপ্রভু এসে সকলকে ডাক দিলেন উদাত্ত কণ্ঠে। সবাই পথে বেরিয়ে পড়ে মিলনের মহোৎসবে সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত করল বৃন্দের গান। নবীনকিশোরের লেখা বলছে : ‘চৈতন্য যখন পথে বাহির হইলেন তখন বাংলা গানের সুর পর্যন্ত ফিরিয়া গেল। তখন এক কণ্ঠবিহারী বৈঠকী সুরগুলো কোথায় ভাসিয়া গেল। তখন সহস্র হৃদয়ের তরঙ্গ হিম্মোল সহস্র কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত করিয়া নূতন সুরে আকাশে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তখন রাগ-রাগিনী ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল, একজনকে ছাড়িয়া সহস্র জনকে বরণ করিল। বিশ্বকে পাগল করিবার জন্য কীর্তন বলিয়া এক নতুন কীর্তন উঠিল। যেমন ভাব তেমনি তাহার কণ্ঠস্বর—অশ্রুজলে ভাসিয়া সমস্ত একাকার করিবার জন্য ক্রন্দনধ্বনি।’ শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত কীর্তন গানের এমন মূল্যায়ন আর কী কোথাও আছে?

কবিতায় নারীচেতনাবাদ

উর্মি রায়চৌধুরী

নারী হ'ল পৃথিবীর আধখানা আকাশ। পুরুষের প্রেরণা। কিন্তু সৃষ্টির আদি থেকেই নারী ও পুরুষ কি সমান অধিকার ভোগ করে আসছে? পৃথিবীর ইতিহাস বলে, পুরুষ এবং নারী একসঙ্গে ভোটাধিকার পায়নি। তথ্যটি আমাদেরকে ভাবায়। নারীরা প্রথম ভোটাধিকার পায় ১৯০২ সনে অস্ট্রেলিয়ায়, ১৯০৬ সনে ফিনল্যান্ডে, ১৯১৩-তে নরওয়েতে এবং ১৯১৫তে ডেনমার্ক ও আইসল্যান্ডে, ১৯১৭ তে সোভিয়েত রাশিয়ায়। ব্রিটিশ নারীরা ভোটাধিকার পায় ১৯১৮ সনে। এর আগে ১৮৭০ সন থেকে তিনবার ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিষয়টি উঠেও বাতিল হয়।^১ রাষ্ট্রসংঘের সনদে নারীকে Human person বলা হয় ১৯৪৯ সনে।

আদি সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। সেখানে নারীরা ধর্ম, সম্পত্তি এবং বিবাহকে নিয়ন্ত্রণ করত। জে. জে. বেকোফেন তাঁর 'মাদার রাইট' (১৮৬১) গ্রন্থে এ কথা জানান। এরপর এ বিষয়ে দুটি বই লেখেন 'লুইস হেনরি মর্গান'। তাঁর বই দুটির নাম হল 'লীগ অফ দ্য ইরোকোইজ' (১৮৬২) এবং 'এনশেন্ট সোসাইটি' (১৮৭৭)। এই দুজনের বইকে অবলম্বন করে 'এঙ্গেলস' একটি বই লিখলেন। বইটির নাম হল 'অরিজিন অফ ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যান্ড দ্য স্টেট, (১৮৮৪)। এঁদের মতে, সামাজিক প্রক্রিয়াতেই আদিম মাতৃতন্ত্র পিতৃতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন ওঠে, সত্যিই মাতৃতন্ত্র কোনদিন ছিল কি? অর্থাৎ, এমন এক সমাজ, যেখানে পুরুষ সর্বতোভাবে নারীর অধীন। অর্থাৎ মায়ের দিক থেকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হয়, সম্ভান শুধুমাত্র মায়ের পরিচয়ে পরিচিত হয় এবং বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে থাকে। সেই সমাজে হয়তো কোনোদিন নারী-পুরুষের সম্পূর্ণ সমান অধিকার ছিল। "কিন্তু, দুজনের জগৎ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেউ কাউকে নিয়ন্ত্রণ করত না। এ সমস্ত সমাজ সম্বন্ধে যখন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তখন কিন্তু দেখা গেছে সেখানে মাতৃসূত্রিকতা এবং মাতৃস্থানিকতা থাকলে ও নারীশাসন নেই। সম্পত্তি, বিবাহ, এমনকী যদি কন্যাপণ দেওয়া হয়, তবে তার পরিমাণ ও স্থির করে মায়ের দিকের পুরুষ আত্মীয়রা। দক্ষিণ ভারতের নায়ায়, উত্তর-পূর্ব ভারত বা আফ্রিকার বিভিন্ন তথাকথিত মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠীতে এটাই ঘটতে দেখা যাচ্ছে। তাহলে তো এই সমস্ত সমাজকে মাতৃতান্ত্রিক না বলে 'মাতৃসূত্রিক, মাতৃস্থানিক পুরুষশাসিত সমাজ' বলা উচিত।"^২

সমাজবিজ্ঞানীদের এই জটিল তর্কে না গিয়ে 'নারীচেতনাবাদ' শব্দটির একটি সংজ্ঞা দিয়ে আমরা কবিতার জগতে প্রবেশ করব। 'Any attempt to provide a baseline definition of a common basis of all feminisms may start with the assertion that feminisms concern themselves with women's inferior position in society and with discrimination encountered women because of their sex. Furthermore, one could argue that all feminists call for changes in the social, economic, political or cultural order, to reduce and eventually overcome this discrimination against women.'^৩

'নারীচেতনাবাদ' শব্দটি আমি তপোধীর ভট্টাচার্যের 'বাখতিন : তত্ত্ব ও প্রয়োগ' গ্রন্থের 'বাখতিন ও নারীচেতনাবাদ' প্রবন্ধ থেকে নিয়েছি। 'নারীবাদ' শব্দের থেকে 'নারীচেতনাবাদ' শব্দটিকে আমার অধিক অর্থবহ মনে হয়।

কথক যখন পুরুষ

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' আমরা 'ফুল্লরার বারমাস্যা' পাই। 'নারীগণের পতিনিন্দা

অংশে নারীদের যন্ত্রণার চিত্র পাই। জনৈকা যুবতী পত্নী বলে, “দড় বেঞ্জন আমি যেই দিনে রাঙ্কি। মারয়ে পিড়ির বাড়ি কোণে বস্যা কান্দি।”

মঙ্গলকাব্যের কবিদের রচনাতেই পাই, সতীনের জ্বালার ছবি। এই কবিরা কিন্তু সকলেই পুরুষ।

ভারতচন্দ্রের (১৭১৯-১৭৬৭)

‘অন্নদামঙ্গলে’ শিবের প্রেম নিবেদনে অন্নদা বলেছেন—

“সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয়।

নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন

পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন।।”

অর্থাৎ, বহুগামী শিবকে তিনি পরিহাস করছেন। স্বামী মারা গেলে স্ত্রী সহমরণে যায়, আর স্ত্রী মারা গেলে স্বামী বিয়ে করে ঘরে আনে অন্য নারীকে।

অন্নদার এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে নারীচেতনাবাদের উদাহরণ হ’তে পারে। নিজে পুরুষ হলেও, কামুক, বিয়ে পাগল শিবের চরিত্র অঙ্কনে ভারতচন্দ্র শ্রদ্ধার পরিচয় দেননি।

ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাজে সেভাবে নারীর স্বাধীনতা ছিল না। কিন্তু, ভারতচন্দ্রের বিদ্যা সুন্দরের বিদ্যা স্বাধীনভাবে স্বামী নির্বাচন করে এবং পুরুষ সঙ্গ করে। নিজের উপার্জনে হীরা মালিনী স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকে। সৈন্যদলে কর্মরত ১৫ বছরের ঘেসেড়ানী এগার বার স্বামী বদলায় এবং ‘খুচরো’ প্রেম করে।^৪

ভারতচন্দ্রের সুন্দর বলে, “বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ তপজপ যজ্ঞ যাগ ধন ধ্যান জ্ঞান।” “নারীকে মহত্তম শ্রদ্ধার এ এক নিদর্শন। উত্তর কালের নারী মুক্তি আন্দোলনের বীজ এইখানেই উগ্ধ হয়েছিল। সুন্দর বিদ্যাকে দেবী করেনি, আদর্শায়িত ও করে নি।”^৫

এরপর আমাদের মনে পড়ে শান্তিপদাবলীর সাধক কমলাকান্তের (উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় তৃতীয় দশকে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন) কথা।

“কামিনী করিল বিধি, তেই হে তোমারে সখি।

নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে।”

এই পংক্তিদ্বয়ে মেনকার তথা তৎকালীন নারীহৃদয়ের যন্ত্রণাকে অপূর্বভাবে ধরেছেন কবি। প্রায় সমগ্র শান্তিপদাবলীর ‘আগমনী’ ও ‘বিজয়া’ অংশ কিন্তু নারীহৃদয়ের যন্ত্রণার সঙ্গীত।

আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি, ইংরাজী সাহিত্যে ছব্ব এই একই কথা উঠে এসেছে এক মহিলা কবির কলমে।

“I, being born a woman and distressed.” —Edna St. Vincent Millay.

জনৈকা আমেরিকান মহিলা কবিও একই কথা বলেন—

“Being born a woman is my awful tragedy. From the moment I was conceived I was doomed.” —Sylvia Plath

আমাদের দেশের এক সাধক পুরুষ কবির এবং বিদেশের দুই মহিলা কবির কণ্ঠস্বর মিলে গিয়ে সেতারের একটি তারে কাঁপতে থাকে।

‘মধুসূদনের’ বীরঙ্গনা কাব্যে নারীচেতনাবাদের পরিচয় পাই। প্রথমেই লক্ষ্য করি, এই বইটি নারীজাগরণের পথিক বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করা হয়েছে। ‘দশরথের প্রতি কেকয়ী’, ‘দুষ্যস্তের প্রতি শকুন্তলা’, ‘নীলধ্বজের প্রতি জনা’, ‘সোমের প্রতি তারা’ প্রভৃতি পত্রিকায় কোথাও প্রকট, কোথাও বা প্রচ্ছন্নভাবে নারীচেতনাবাদের অস্তিত্ব অনুভব করি।

‘সোমের প্রতি তারা’ পত্রিকায় আত্মসচেতন তারা বলে,
‘জন্ম মম মহাশয়িকুলে
তবু চণ্ডালিনী আমি।’
কেকয়ী তার স্বামীকে তিরস্কার করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না।
“থাকে যদি ধর্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কশ্মের প্রতিফল! দিয়া আশা মোরে,
নিরাশ করিলে আজি; দেখিব নয়নে
তব আশা বৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি?”

এই কেকয়ীর চোখে তার স্বামী সমালোচনার উর্ধ্বে অবস্থিত দেবতা নয়। স্বামীকে সে নিজের
সমান জ্ঞান করে। রেনেসাঁসের আলোয় এই নারী আত্মসচেতন।

রবীন্দ্রনাথের নারীর মুখে শুনি—

“নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার,
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা?
নত করি মাথা
পথপ্রাপ্তে কেন রব জাগি
ক্লান্তধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে?” (সবলা/মহুয়া কাব্যগ্রন্থ)

রবীন্দ্রনাথের নারীর রক্তস্রোতে বেজেছে রুদ্রবীণার ধ্বনি।

“হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহীনা—
রক্তে মোর জাগে রুদ্রবীণা।”

রবীন্দ্রনাথের ‘পলাতক’ কাব্যগ্রন্থের ‘মুক্তি’, ‘ফাঁকি’, ‘নিষ্কৃতি’ প্রভৃতি কবিতা এ প্রসঙ্গে
আমাদের স্মরণে আসে।

“শুনি নাই তো মানুষের কী বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি,
রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাঁধা—
বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা।”

রবীন্দ্রনাথের ‘চিত্রাঙ্গদা’ নারীচেতনাবাদে উদ্দীপ্ত। সে জানে, “পূজা করি মোরে রাখিবে উর্ধ্বে,
সে নহি, সে নহি। / ঘৃণা করি মোরে দূরে ঠেলে দেবে সে নহি সে নহি।” তার প্রকৃত পরিচয়
তখনই পাওয়া যাবে, যখন পুরুষ তাকে সমান জ্ঞান করবে। (যদি পার্শ্বে রাখ মোরে, পাইবে
আমার পরিচয়।) এই সূত্রে আমাদের আবার মধুসূদনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তাঁর সেই বিখ্যাত
পংক্তিগুলি—

“আশারূপে মোর পাশে দাঁড়াও রূপসী।
দ্বিগুণ বাড়িবে বল, চন্দ্রমুখ হেরি,
চন্দ্রমুখি।” (বীরাজনা কাব্য)

সত্যেন দত্তের কলমে পাই—“কন্যা ঘরের আবর্জনা! —পয়সা দিয়ে ফেলতে হয়/ পালনীয়া

শিক্ষণীয়া—রক্ষণীয়া মোটেই সে নয়! /ভদ্র খাণ্ডু আছেন দেশে করেন যাঁরা সদগতি,/কামড় তাদের অর্ধরাজ্য, পরের ধনে লাখ-পতি।/হায় অভাগ্য! বাংলা দেশের সমাজ বিধির তুল্য নাই/কুলটাদের মূল্য আছে, কুলবালার মূল্য নাই।” (মৃত্যু-স্বয়ম্বর : অন্ন-আবীর)

সত্যেন দস্তের ‘সহমরণ’ কবিতায় মিশি বিক্রেতা মেয়েটি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। ‘খেয়া দেয়’ এমন এক ‘মরদ জোয়ান’কে সে বিয়ে করেছে। তার এই বিয়েই তো সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। আর, এই প্রতিবাদ তো আসলে কবিরই কণ্ঠস্বর।

‘যতীন্দ্রমোহন বাগচী’র ‘একটি কালো মেয়ের মনের ব্যথা’ কবিতাটিও কি খুব প্রচ্ছন্নভাবে নারীচেতনাবাদকে সমর্থন করে না?

নজরুলের বিখ্যাত নারী কবিতাটি এ প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণে আসে।

“নারী সে শিখালো শিশুপুরুষেরে স্নেহ প্রেম দয়ামায়া/দীপ্ত নয়নে পরালো কাজল,/বেদনার ঘন ছায়া।/অদ্ভুতরূপে পুরুষ পুরুষ করিল সে ঋণ শোধ।/বুকে করে তারে চুমিল যে, তারে করিল সে অবরোধ।”

কবির পরামর্শ অবিস্মরণীয়—“মাথার ঘোমটা খুলে ফেল নারী/ভেঙে ফেল ও শিকল।”

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘মেজাজ’ কবিতার কালো বউয়ের গটগট করে চলে যাওয়া এবং সম্ভানের ‘আফ্রিকা’ নাম রাখার কথাটি মনে রাখার মত।

কবি সব্যসাচী দেব তাঁর ‘বেহুলা ভাসান’ কবিতায়, ‘কৃষ্ণা’ কবিতায় নারীচেতনাবাদের কথা বলেন। ‘বেহুলা ভাসান’ কবিতায় তাঁর বেহুলা তাই পুনর্বীর বেঁচে ওঠা লখিন্দরকে বলে,

“তোমার জন্য পণ্য করেছিলাম যে-শরীর
গ্রহণ করো সেই শরীরকে;
আমাকে দাও জননী হবার ভাগ্য; যেন আমার
সম্ভানের স্মৃতিতে থাকে তার মা-র লাঞ্ছনার জ্বালা।
তার শিরায় আমি ঢেলে দেব বিষ।
সেই বিষের দহনে জ্বলে যাবে দেবভূমি,
আমাকে সেই ভাগ্য দাও লখিন্দর।”

এ বেহুলা প্রতিশোধম্পূর্য্য জ্বলছে। অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মত এক নারী।

সব্যসাচী দেবের ‘কৃষ্ণা’ প্রতিবাদে সোচ্চার—

“এই দ্যুতসভায় দাঁড়িয়ে আমাকে জ্ঞানতে হলো
নারী শুধু কয়েকপ্রহরের বিলাসসঙ্গিনী।
মণিময় হার, শতসহস্র দাসী, দান্ত মাতঙ্গ,
গন্ধর্ব্বপ্রেরিত অশ্বযুথ আর আমি পাণ্ডুপুত্রবধু—
এক পঙ্ক্তিতে দাঁড়িয়ে আমরা সবাই অপেক্ষায়;”

কৃষ্ণার নিজেকে মনে হয়েছে ভোগ্যপণ্য।

“পিতৃগৃহে যেমন দেখেছি, আহিরিনীরা দূর গ্রাম থেকে
নিয়ে আসে তাদের পশরা—আর তার উপর ঝুঁকে পড়ে
লুদ্ধ ক্রোতার দল—আমাদের ব্যবহার করার জন্য
তেমনই উন্মুখ হয়ে আছে, যারা আমার পতির আত্মীয়,”

আজ এই দূতসভায় দাঁড়িয়েই যে কৃষ্ণ প্রথম জানলেন,

“আমার কোনো বাসনা নেই, নেই কোনো নিজস্ব ইচ্ছা”, তা কিন্তু নয়।

“অর্জুন, প্রথম দেখার মুহূর্তে আমার হৃদয় দিয়েছিলাম তোমাকে;

অথচ আমার শরীরকে প্রথম আলিঙ্গন করলেন

ওই মহাভাগ, যাঁর খ্যাতি ধর্মপুত্র বলে।”

কৃষ্ণর ভাণ্ডাব ভরে উঠছে নতুন নতুন উপলব্ধিতে।

“এই রাজগৃহে দাঁড়িয়ে

আমি জানলাম—প্রেম নয়, শ্রদ্ধা নয়, অধিকার নয়

নারী শুধু প্রয়োজনের। জানলাম, এখানে কোনো ভেদ নেই ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির,

শক্তিমান ভীম, প্রেমিক অর্জুন

আর লোলুপ ধৃতরাষ্ট্র নন্দনদের মধ্যে।”

এই কবিতাটি পড়তে পড়তে আমাদের মনে পড়ে যাচ্ছে

‘Simone de Beauvoir’-এর ‘The second sex’ বইটির কিছু কথা। “Humanity is male and man defines woman not in herself but as relative to him. She is not regarded as an autonomous being... She is what man decrees, thus she is called “the sex” by which is meant that she appears essentially to the male as a sexual being. For him she is sex—absolutely sex, no less...” (Introduction xxii, vintage books edition, sept 1989.)

অমিতাভ দাশগুপ্তের ‘কবি ও রমণী’ কবিতাটিও কি উপরের উদ্ধৃতিটির কথাই বলে না?

“গরম দুধের মত বলকারী, নিবিড় চূষনে

কবিকে জাগাও তুমি, প্রমোদে বক্সিম দেহ ঘিরে

ফোটাও টলস্তু, কম্প্র, অশ্রু-গরলের অভিশাপ,

রমণীর কাছে যেতে যারা পরে কাঠের কৌপীন,

সেইসব দেশপ্রেমী যোগ্য নয় উরুর তোমার।”

কৃষ্ণা বসুর “জীবনসঙ্গীত” কবিতাতেও শুনি সেই একই সুর।

“মাংস বিক্রয়ের মূল্যে বেঁচে থাকো নারী,/শ্বেত কেতুর নির্বন্ধে ব্যক্তিগত পুরুষের কাছে/নয়, সমাজের আরো দশ বারো পুরুষের কাছে/হয়, গৃহগণিকার বেশে গৃহবধূ নাম নাও/নয়, বাহির-বেশ্যার পরিচয়ে বেঁচে থাকো,/এর বেশী মূল্য সমাজ দেয়নি তোকে, মেয়ে।” কবি অমিতাভ গুপ্ত তাঁর “ভারতগাথার তিনকন্যা”র অন্তর্গত ‘গান্ধারী’

কবিতায় পণপ্রথাকে বাঙ্গ করেছেন।

“তৈজস, পিতলের এবং তামার

একটি কানের দুল, নাকছাবি, হাতের

কয়েকগাছা চুড়ি

সোনা ও রূপোর

কালো বউ জানে শুধু মেয়েরাই মাটির পুতুল

গরীব ও বোকা বাবা খাতু দিয়ে তাকে

মুড়ে জুড়ে পাঠিয়েছে স্বপ্নের ঘরে

স্বপ্নের ছেলে তাকে কালরাতে চুপিচুপি বলেছিল

ঘরে ঢের কেরোসিন আছে।”

এই কবিতায় ‘গান্ধারী’, এই পৌরাণিক নামের ব্যঞ্জনা লক্ষ্যীয়। কিছু দ্বীকে শ্বশুরবাড়ীতে গান্ধারীর মত অন্ধ সেজে থাকতে হয়। প্রতিবাদ করবার মত শক্তি ও সাহস তার নেই। সে জানে, সে শুধুই মাটির পুতুল। এহেন পরিস্থিতি হয়তো তাকে একদিন প্ররোচিত করে আত্মহত্যা।

মৃদুল দাশগুপ্তের ‘খাবার’ কবিতায় নারীকে পুরুষের খাদ্য হিসাবে দেখা হয়েছে। একটি নারী যেন একটি ফল এবং দুদিক থেকে তাকে ভোগ করেছে স্বামী ও প্রেমিক।

“দুদিকে কামড় লাগা যে ফল, কখনো তা গড়িয়ে যাবে না

পিছনের পথে আজ মোরগের পালক ছড়ানো

বলোনি স্বামীকে তবু ওষুধ খেয়েছো, কিন্তু শোনো—

এতো দিন পরে কেউ এভাবে কাঁদে না।”

জয় গোস্বামীর “যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল”, ‘রাখাল’, ‘মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়’ ইত্যাদি কবিতায় নারীচেতনাবাদের কথা পাই। ‘রাখাল’ এবং ‘মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়’ কবিতায় কবি ‘কৃষ্ণ’ ইমেজ ভেঙেছেন। ‘মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়’ কবিতায় কৃষ্ণ (বেণীমাধব) আজকের প্রজন্মের বিশ্বাসহীন প্রেমের প্রতীক। নারীর অসহায়তার কথা পাই তাঁর ‘মেঘলাপুর’ নামক দীর্ঘ কবিতায়।

“চিরদিনকাল দাসীবাদী

প্রথমদিন হাতে ধরে সাধি

তারপর সে সাধবে আমায়

তাকে বেঁধে রাখবার দায়

আমার, আমার, কারও নয়।”

কিংবা,

“তবু তো শেষকালে ভেঙে পড়া।

মাটিতে আছড়ায় কলসী, ঘড়া

সারা ঘর জলে থই থই

যে বাঁচাবে সে কই? সে কই?”

এভাবে আমরা আরও অজস্র পুরুষের কলমে নারীচেতনাবাদের পরিচয় পাই। স্থানাভাবে তা আর বিবৃত করা গেল না। কোন চিত্রেরই দুটি পিঠ না দেখালে তা স্পষ্ট হয় না। তাই, এবার আমরা নারীর কলমে নারীচেতনাবাদের সামান্য পরিচয় দেব।

কথক যখন নারী

আমাদের প্রথমেই মনে আসে চন্দ্রাবতীর রামায়ণের কথা। আনুমানিক ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মে এই কবি পাঁচালীর ভঙ্গিতে ‘রামায়ণগীত’ রচনা করেন। তিনি সীতার চোখ দিয়ে রামকে দেখিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী নারীচেতনাবাদী।

আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি, নারীর কলমে আজ নতুন ধরনের চিত্রকল্প উঠে আসছে। ঘৃণা ও তাজিল্য মিশিয়ে পুরুষ এতকাল নারীকে দেখেছে ডাইনী বা জিনের ভূমিকায়। তাই, সম্ভব, আশি ও নব্বইয়ের বহু নারী কবি নিজেদেরকে জিন বা ডাইনী হিসাবে চিত্রিত করেছেন। এর পিছনে নিশ্চয়ই একধরনের অভিমান কাজ করেছে। তবে, পঞ্চাশের দশকের কবি কবিতা সিংহ প্রথম তাঁর কবিতায় নিজেকে ‘ডাকিনী’ হিসাবে কল্পনা করেন। “দুই বাহু আন্দোলনে জানি হে সমুদ্র দুলে ওঠে/এমত ডাকিনী যাদু আছে বলে নহে ব্যবহার/কুঁড়িতে ভাঙিয়া দিও তেমন বাসনা যদি ফোটো।”

পঞ্চাশেরই অপর কবি শিপ্রা ঘোষ ‘কোন প্রেতিনীকে দেখে’ নামক কবিতাটি লেখেন।
এর বহু পরবর্তীকালে, অঞ্জলি দাশ লেখেন—

“এখন জিনের মতো আমাদেরও উন্টোদিকে পা।”

মল্লিকা সেনগুপ্ত লেখেন—“আমরা ডাইনি আমরা আগুনে মরি না।”

রমা ঘোষ লেখেন—

“বৃষ্টি ডাকার গান জানে পরী মেয়ে/আমি জানি প্রেততন্ত্র শকুনি ডাকার।”

চৈতালী চট্টোপাধ্যায় লেখেন,—

“আমি ও মানুষ নই, ডাইনি মায়ের/অষ্টম গর্ভের মেয়ে, বিষকৌটো জিভের তলায়।”

সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন—“প্রেতিনীর রূপকথা।”

সমালোচক মনে করেন, “আজকের সচেতন নারী-পরিচয় খোঁজার প্রয়াসে লোক-ঐতিহ্যের এই উপাদানই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে, একেই মনে হয়েছে প্রতিবাদের একটা রাস্তা। অবশ্যই এ হলো লোক ঐতিহ্যকে ভাঙা এবং পুনর্নির্মাণ, আধুনিকতার সচেতন ভারনায় পুরনোকে ব্যবহার।”^৭

আজকের নারীচেতনাবাদী কবির সমস্ত প্রচলিত বিশ্বাস আর ভাবনাকে ভেঙে দিচ্ছেন। তাঁরা কখনও ভেঙে দিতে চাইছেন বেঙ্গলার মিথ, কখনও ভেঙে দিতে চাইছেন রাধা-কৃষ্ণ মিথ, আবার, কখনও বা ভেঙে দিতে চাইছেন ‘বিবাহ’ নামক প্রতিষ্ঠানকে।

আশির দশকের অন্যতম কবি চৈতালী চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘বিস্ফোপনের মেয়ে’র ১০ সংখ্যক কবিতায় বলেন, “কতকাল ঘরে পা দেয়নি বেঙ্গলা। কতকাল ধরে ভাসছে সে আর তার ভেলার পাশ বরাবর ভেসে যাচ্ছে কুমীর ও কামটের দল। ছিন্নবিচ্ছিন্ন দৃশ্যপট তাকে পাগল করে তোলে, টলমল করে ওঠে বিশ্বাসের মূল। জলে কিম্বা অন্তরীক্ষে তার মানুষটিকে প্রাণ ফিরিয়ে দেবার জন্য আজ আর বসে নেই কেউ। লৌকিক এই বেটনী, যা তাকে দেবী মহিমায় বন্দিত করে এসেছে এতকাল, দুহাতে সেই ঘোর সরিয়ে উঠে দাঁড়ায় বেঙ্গলা। পরম সম্ভরণে স্বামীর শবদেহটি নামিয়ে নেয় জলে।”

আবার, চন্দ্রানী বন্দ্যোপাধ্যায় বেঙ্গলাকে দেবতাদের পিছনে ঘুরে বেড়াতে বারণ করেছেন। স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা করে না বেড়িয়ে তাকে প্রেম ও যৌনতার মধ্যে ফিরে আসতে বলেছেন। “কলার মান্দাস ফেলে নেমে আসছে বেঙ্গলা /...ওকে ছেড়ে দিয়ে ফেরো সখি দুচামচ সঙ্গীবনী ভিক্ষা নয়/দেব দরজায়। তবে বলি, ভালবাসি। আর সব অলীক, নশ্বর/নিজেকে উদ্বৃত্ত করো যোনি। মৃত/সহবাসে সতীচ্ছদ ছিন্ন হয়নি যার।”

শতরূপা সান্যালের ‘মোরে খাইল কি’ কবিতায় দেখি —

“নতুন করে লিখব আবার বেঙ্গলা-মঙ্গল।

চোখের পলক দিলাম ছিঁড়ে ঘুম যেন না আসে

হাঁ করা চোখ মাছের মত প্রখর আশে পাশে

তবু খাইল নারী জন্ম পায়ের শিকলটি

ঘুমোইনি তাও পুড়ল কপাল, সায়েবনের ঝি।”

রাধা-কৃষ্ণ মিথকে অপূর্ব নৈপুণ্যে ভেঙে দিয়ে নমিতা চৌধুরী সৃষ্টি করেছেন নব বৈষ্ণব পদাবলী।

“অন্ধকারে গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে রাধা
বিলায় দেহ কৃষ্ণকে নয় টাকায় প্রেম বাঁধা”

(মানুষ কেনা বেচার ছড়া)

আবার, তাঁর ‘ঝুলন যাত্রা’ কবিতাটিতে এক আশ্চর্য করুণ চিত্র পাই। কৈশোর থেকে রাধা
নানী দরিদ্র এক মেয়ের স্বপ্ন ছিল, সে কৃষ্ণের সঙ্গে দুলবে। কিন্তু, তার রূপের পাহাড় নেই,
রূপোর পাহাড় নেই। একা তাই রাধা চলেছে ঝুলন যাত্রায়

“শাড়ির একপ্রান্ত বাঁধা আছে কদমের ডালে
অন্যপ্রান্ত গলায় জড়িয়ে
রাধা ঝুলছে
রাধা দুলছে।”

আবার, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় দেখি, “...কালো, কুচকুচে কালো বাঙ্কবী আমার,
তুমি যে দেশের মেয়ে, সেইখানে ক-বলতে কৃষ্ণনাম স্মরে, একশো আটটি যুবতী কেঁদে লুটোপুটি
হয়, শ্রীচরণাশ্রিতা থাকবে বলে। শোনো, নতুন শিক্ষাবর্ষে নতুন বর্ণপরিচয় আমাদের ক-য়ে কালো
রং (সঙ্গে, নিহিত অভিশাপকথা লেখার নয়) ...ব-য়ে বরপণ ...ন-য়ে নির্যাতন ...এভাবেই লেখা
চলতে থাকে।” (ষষ্ঠ কবিতা, আড়কাঠি/অ্যাসাইলামের সকাল)

‘বিবাহ’ সম্পর্কে অনাস্থা শুনি বহু নারী কবির কবিতায়।

আশির দশকের কবি সুতপা সেনগুপ্ত তাঁর ‘অন্ধকারের নৌকো’ কাব্যগ্রন্থে প্রেমে বিশ্বাস করেন,
কিন্তু বিবাহে বিশ্বাস করেন না।

“বিবাহে বিশ্বাস নেই, জানাই প্রস্তাব...

* * * * *

অভিমান কোরো, তবু—বিবাহ প্রস্তাব
কখনো করবো না বলে কোরো না আক্ষেপ
এই বালিয়াড়ি জুড়ে আত্মা প্রণয়
দেখো, অনশ্বর থাকবে, সমুদ্র সাক্ষী।”

(প্রাকৃত)

নব্বইয়ের দশকের কবি “সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়” তাঁর “অন্নদামঙ্গল”—এ বলেন—

“...আমারই গয়না বাঁধা টাকার বদলে/ছন্নরূপ যে পুরুষ এসে আমাকে উচ্ছিন্ন করল, তাকে
/শিব বলে স্বামী বলে আর কখনও ভাবতে পারি না/বিবাহ ও সাধব্যের দিকে আজ যদি অবিশ্বাস
ছুঁড়ে দিই, /সেই গান তোরা শিখে নিস আমার পাঁচালি মনে করে। আমি/তোদেরই তো গৃহদেবী।”

“চিলেকোঠার উন্মাদিনী” কবিতায় সংযুক্তা বলেন—

“আজ আমি থু থু ফেলব
সব আলো আর উৎসবের গায়ে
যেখানে ফুরোসেন্ট হরফে লেখা থাকে
বিবাহার্থী আর উদ্যোক্তাদের নাম।”

পঞ্চাশের দশকের মহিলা কবি শিপ্রা ঘোষের কলমে দেখি, “তাছাড়াও মহিলা কবির/লিরিক
যন্ত্রণা সে তো নৈশব্দের যন্ত্রণা ভাষায়।”

পঞ্চাশের কবি নবনীতা দেবসেনের কলমে যে সত্য উঠে আসে, তা আমাদের এই পুরুষ প্রধান

সমাজের যে কোন নারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। “জ্ঞাত যে পিঞ্জরে, আকাশে ভয় তার/খাঁচাতে ফিরে যেতে রাজি সে সূতরাং।”

কিংবা,

“যে প্রতিমা গড়েছিলে সে আমার ছিল না কখনো
সে আমার প্রতিকৃতি নয়
দর্পণে দেখেছি আমি ইদানিং আমার স্বমুখ
সে মুখ তোমার চোখে পড়েনি কখনো।”

পুরুষতন্ত্র নারীর প্রতিমা গড়েছে। তাদের মতে, নারী হবে কবিতা। সে হবে পুরুষেরই সম্পদ।

“তোমার কবিতা হবে, তোমারই কবির সম্পদ...।”

পুরুষের নির্মিত নারী নয়, নারীকে তার আত্ম-অন্বেষণ করতে বলেছেন নবনীতা।

“এখন নিজে হাতে নিজেকে নির্মাণ...”

সিমোন দ্য বোভয়া তাঁর “The second sex” গ্রন্থে লিখেছেন,

‘Humanity is male and man defines woman not in herself but as relative to him....One is not born but rather becomes, a woman ... it is civilization as a whole that produces the creature.’

তসলিমার কবিতাতে ও সেই একই কথা পাই। তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে মেয়েদের নাকে, কানে ছিদ্র করে গয়না পরানো হয়, হাতে চুড়ি, পায়ে মল পরানো হয় এবং “একটি মানুষকে এভাবেই পণ্য করা হয় বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন দরে পণ্য...”।

এ সূত্রে আমাদের মনে পড়ে যায়, নব্বইয়ের কবি যশোধরা রায়চৌধুরীর কথা। মেয়েদেরকে পণ্য করার সূত্রে তিনি তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থের নাম দিয়েছেন, “পণ্যসংহিতা”। মেয়েদের রূপচর্চাকেও তিনি ব্যঙ্গের চোখে দেখেছেন। (বিশেষ ত্বক সংখ্যা কবিতা)।

মেয়েদেরকে পণ্য হিসাবে দেখার কথাই পাই সুমিতা চক্রবর্তীর ‘A boxful of Girls’ কবিতায়। (কবিতাটির অনুবাদ করেছেন অমিতাভ গুপ্ত)।

একবাক্স মেয়ে চালান যাচ্ছে পতিতালয়ে।

“A boxful of girls/
None of them is a mother, none daughter,
no one is a sister either/
None of them can be looked up as a girl-friend/
No one is a prostitute
It is only an export, a boxful of girls.”

যেমনভাবে একবাক্স কমলালেবু, একবাক্স আপেল বা একবাক্স আঙুর চালান যায়, ঠিক সেভাবেই একবাক্স মেয়ে চালান যাচ্ছে পতিতালয়ে।

নারীকে নির্মাণ করার সূত্রে আমাদের মনে পড়ে, মল্লিকা সেনগুপ্তের একটি গ্রন্থের কথা— ‘স্ট্রীলিঙ্গ নির্মাণ’।

কবিতা সিংহের কবিতায় দেখি—

“আমার কবন্ধ দেহ ভোগ করে তুমি তৃপ্ত মুখ
জ্ঞানলে না কাটামুণ্ডে ঘোরে এক বাসন্তি অসুখ।”

তিনি মনে করেন, প্রথম মানবী ইভ, প্রথম মানব ‘আদমে’র থেকে অনেক বেশী বুদ্ধিমতী

ছিল। কারণ, 'ইভ'-ই প্রথম লাল আপেলে কামড় দেয়। "লাল আপেলে পয়লা কামড় দিয়েছিলাম আমিই প্রথম"—তাঁর কবিতায় ইভের এ স্বীকারোক্তি অনবদ্য।

তাঁর কবিতায় নারী পুরুষের ভোগ্যবস্তু হতে চায় না। সে তার নিজস্ব প্রতিষ্ঠা চায়। এমনকি নগ্নতার ক্ষেত্রেও তাঁর নারী, পুরুষ কল্পিত কোন ভঙ্গিমা (মন্দিরের দেয়ালের পরী, বা ভেনাস) নয়, নিজস্ব ভঙ্গিমা চায়।

তাঁর সচেতন কলমে প্রথম ধরা পড়ল—

“কিস্ত পুরুষ দেখ—‘অসতী’ নামক শব্দ পুংলিঙ্গহীন
এবং ‘বেশ্যা’ শব্দ, এবং ‘ছিনাল’!
এভাবে চামড়া রাখো, দেহের, চোখের।”

তিনি তাঁর কবিতায় একজন প্রতিবাদী নারীকে কল্পনা করেন—

“অন্তত একজন তার উদ্ধৃত মস্তক তুলে দীর্ঘ দাঁড়াক
অন্তত একজন তার বেণী খুলে হোক না পাঞ্চালি
অন্তত একজন তার রক্তফিতা খুলে হোক কুলকুণ্ডলিনী
অন্তত একজন তার মেরুরজ্জু টান করে ছেনে যাক কি আনন্দে ফেলে
বিষছত্র দলিতা ফনিণী।”

পঞ্চাশের মহিলা কবিদের মধ্যে কবিতা সিংহ নারীচেতনাবাদে সবথেকে বেশী উদ্দীপ্ত।

এরপর যাঁর কথা মনে পড়ে, তিনি কৃষ্ণ বসু। তাঁর অজস্র কবিতায় নারীচেতনাবাদের কথা পাই। তাঁর ভঙ্গি তীক্ষ্ণ, ঋজু।

তাঁর “কথা নয় কথার অধিক” কাব্যগ্রন্থের ‘পুরুষপুরাণ’, ‘কী পেলে কী পেলে’, ‘পরম্পরা’, ‘দ্বিচারিতা’, ‘নারী জীবনের পরম্পরা’ প্রভৃতি কবিতায় নারীচেতনাবাদের কথা পাই।

“বিবাহ মঙ্গল সুতো ছিঁড়তে পারো না
নিষ্ঠা আশা করো তুমি সঙ্গিনীর কাছে
একব্রতা, তীব্রমুখ নদীটির মতো অনুগামী
একগামী হবে শুধু তোমার মোহনা,
কারো দিকে তুলবে না আঁখির পল্লব,
তোমার দিকেই শুধু অভিসারী হবে,
রক্তে তার বাজে যেন পার্বতীর গান,
শিবের সমীপে গিয়ে প্রস্রবী চূপ,
সমর্পণে নুয়ে যাবে জলমগ্ন গাছ।”

তাঁর কবিতায় সরাসরি প্রস্রবী উস্তরের পালা দেখি।

“ঘর ছাড়া আর স্বামীহারা করল তাকে কে?
সামন্তরাজ, পুরুষ-রাজ, পিতৃতন্ত্র রে।”

কখন বা শুনি পুরুষের রুদ্ধ কণ্ঠের আশ্রয়—

“মুঠির মধ্যে আয় বালিকা, আয়রে মুঠি ভর
মুঠির ভিতর স্বপ্নের বীজ, মুঠির মধ্যে ঘর,
কোনখানে যাস? কার পানে চাস? আমার কেনা নারী,
মস্ত্রে কিনি, মুদ্রা কেনে, করলে বাড়াবাড়ি

শিক্ষা দেবো, পিঠের ওপর ঠেকাই ঠাণ্ডা নল,
আমাকে তুই ভিতর ঘরে থাকতে দিবি বল”

(প্রণয় প্রস্তাব)

আমাদের মনে পড়ে যায় সিমন্ দ্য বোভোয়া-র

‘The second sex’ বইয়ের দুটি ছত্র

“Woman is her husband's prey, his possession”.

কিন্তু, কৃষ্ণা শুধু পুরুষের প্রস্তাবেই থেমে থাকেন না। তাঁর নারী সোচ্চারে উত্তরও দেয়।

“না যাবো না মুঠির মধ্যে, মুঠির ভিতর কালো,

মুঠির মধ্যে খুব প্রভুতার বিদ্যুৎ চমকালো।”

তারে “রক্তে আমার পূর্বনারী”, ‘চির সেবাদাসীদের গান’, ‘কন্যাভুগ’ ‘সেবাদাসীদের পদাবলী’, ‘স্বামী ও প্রেমিক’ প্রভৃতি কবিতায় নারীচেতনাবাদ উচ্চারিত। তীব্রভাবে তা পুরুষকে আক্রমণ করে—

“আমার সমস্ত দাহ আগামী প্রজন্মে

আমাদের মেয়েদের শিরা ধমনীতে

গূঢ় প্রতিশোধ হয়ে ঠিক জন্ম নেবে।

‘নারীবাদ’ বলে তাকে চিনত পারবে?”

তিনি কিছু মৌলিক প্রশ্ন তোলেন।

“বিয়ের আগের বাড়ি, বিয়ের পরের বাড়ি,—

বলো কোন্ বাড়ি আমার নিজের অধিকারে?

* * * * *

মাগো, বলে দাও, আমার নিজের বাড়ি কোনখানে আছে?

মেয়েদের নিজের বাড়ি থাকে কোনোদিন?”

ভার্জিনিয়া উলফ তাঁর ‘A room of her own’-এ এই একই কথা লেখেন—

“It is far more difficult to murder a phantom than a reality.”

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত লেখেন—“অধিকাংশ ভারতনারী গৃহসূখে বঞ্চিত।”

মল্লিকা সেনগুপ্ত আশির দশকের উজ্জ্বল কবিব্যক্তিত্ব। তিনি প্রথমাধি নারীচেতনাবাদী। ‘কথামানবী’ গ্রন্থে তিনি নারীর অপমানের চিত্র ১২০০ লাইনের আত্মকথনে তুলে ধরেন। “শৌর্যবীর্যের গঞ্জে ভরা ইতিহাস বইয়ের তলায় মেয়েদের যে গহন কাহিনী চাপা পড়ে আছে, কথামানবী তারই ভাষ্যকার” ঋগ্বেদ থেকে একুশ শতক পর্যন্ত তার বিচরণকাল, দ্রৌপদীজন্ম, গঙ্গাজন্ম, রিজিয়াজন্ম, মেধাজন্ম, মাধবীজন্ম, মালতীজন্ম, শাহবানুজন্ম, খনাজন্ম ইত্যাদি কবিতার মাধ্যমে তিনি যুগে যুগে নারীদের যজ্ঞগার ইতিহাস তুলে ধরেছেন। “আমি জিত কেটে নেওয়া খনার বচন/সাগরে পাহাড়ে আকাশে/যুগ যুগ ধরে পথে পথে আমি হাঁটছি/আমি কল্পনা চাওলার থেকে কুন্তি/সীতা থেকে রূপ কানোয়ার আমি, আমরা/আমি দ্রৌপদী, রূপান বাজাজ আমরা।”

এর আগে ‘হাঘরে ও দেবদাসী’ গ্রন্থে ‘মাছের চাবুক: সামন্তযুগ’, ‘মাছের চাবুক: মোগল হারেম’, ‘মাছের চাবুক: উনিশ শতক’, ‘জ্ঞানদাসুন্দরীর বিবাহ বর্ণনা’ প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি নানা যুগের নারীর যন্ত্রণাব ছবি আঁকেন।

একটি প্রশ্ন তাকে আমূল নাড়া দেয়—

“আমি তো জানি পৃথিবী রমণী আকাশ আদিম পুরুষ
তবে কেন তুমি আমার দু হাতে শেকল পরিয়ে রেখেছে
হাজার বছর ধরে কেন তুমি সূর্য দেখতে দাওনি?”

(রেখাচিহ্ন/আমি সিঞ্চুর মেয়ে)

তার ‘আত্মপালী’ কবিতাতেও এ ধরনের কিছু তীক্ষ্ণ প্রশ্ন আছে। তার ‘বেতকলসীর জল’ নামক দীর্ঘ সংলাপ কবিতাতে ও পুরাণের পটভূমিকায় নারীচেতনাবাদের কথা পাই।

বাংলাদেশের মহিলা কবি তসলিমা নাসরিন তাঁর অজস্র কবিতায় নারীচেতনাবাদের কথা বলেন। যেমন—‘ওরা পুরুষ, ওরা মানুষ নয়’, ‘ঘুম ভাঙ্গানিয়া’ ইত্যাদি।

কবি চৈতালী চট্টোপাধ্যায় এমন একটি দিনের স্বপ্ন দেখেন, যদি পাখি ‘গেরস্তের খোকা হোক’ না বলে ‘গেরস্তের খুকি হোক’ বলবে।

“অমনি বেজে ওঠে ফুঁটি, ছদ্মোড়;
বংশে বাতি দেবে যে মেয়ে তার মুখ
গিনিতে দেখে নিতে মানুষ জড়ো হয়,
মানুষ কখনও ডাইনি বলে আর
আধলা ইট তুলে ছোঁড়ে না ওর চুলে,
ছিন্ন কুসুমের মতন মেয়েদের
ভাসে না বৃতি আর মশলা-ধোয়া-জলে
হয়তো কোনও দিন। স্বপ্ন মনে হয়....”

(ইউটোপিয়া)

সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আরব্য উপন্যাসের মেয়ে’ বা মেয়েদের ব্রতকথা’ বইটিতে লেখিকা মুসলিম ও হিন্দুসমাজের নারীর যন্ত্রণার কথা বর্ণনা করেছেন। তাঁর ‘লেডিস বাসের পাশে পাশে আর একজন ও ছিলো, ‘আমরা যে জ্যামিতি শিখতে পারলাম না,’ ‘বাইরে থেকে যা ভেবেছিলো সবাই’, সর্বত্রই নারীচেতনাবাদের কথা পাই। ‘ঠাকুরমার ঝুলির ভূমিকা’ কাব্যগ্রন্থের ‘নাচ’ কবিতায় পাই, ‘পুরুষবন্ধুটি যাতে সংসারের প্রভু হয়ে না বসে কখনও, সেই বর দাও।’

পৌলোমী সেনগুপ্তের কলমে পাই “পুরুষের সংজ্ঞা লিখি। তার নামে ভালোবাসা পুষ্টি,/তারিফ করেই যাই পুরুষের অনন্য গুণের—/সে স্বার্থপরতা একা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে।”

দীপশিখা পোদ্দার বলেন—

“যোনি পেতে শুয়ে আছে নারী
এক পেট ভাতের আশায়
তেরোশ পঞ্চাশ থেকে এতদূরে এসে
আজো কেন এই মম্বস্তর?”

(স্বাগত ১৪০০)

এত যন্ত্রণা সহ্য করেও নারী সংসারে টিকে আছে কেন? পুরুষের কাছে সম্মান, শ্রদ্ধা, সমপ্রাণতা, ভালোবাসা কিছুই যখন মিলছে না, তখন তার সংসারে থাকা কেন?

কৃষ্ণা বসুর ন-লাইনের “মেয়েমানুষের লাশ” কবিতাটি তার উত্তর দেবে।

“সাঁকোর কিনারে এসে আটকে আছে লাশ/মেয়ে মানুষের লাশ;/আটকে আছে, বেরুতে পারছে

না।/তার মুখ ফেরানো রয়েছে সন্তানের দিকে/তার মুখ ফেরানো রয়েছে সংসারের দিকে/তার মুখ ফেরানো রয়েছে পুরুষের দিকে।/প্রহারে প্রহারে তাকে পর্যুদণ্ট করে গেছে যে পুরুষ/তার মুখ ফেরানো রয়েছে তার দিকে।/বোকা, অভিমানী, আদর-কাঙালী মুখ/ফেরানো রয়েছে আজো জীবনের দিকে।/সাঁকোর কিনারে এসে আটকে আছে লাশ,/মেয়ে মানুষের লাশ,/আটকে আছে, বেরুতে পারছে না।”

শেষ কথা কে বলবে?

“What is Woman?”

Says one, “Woman is a womb.”^৯

নারীচেতনাবাদী নারীকবি উত্তর দিচ্ছেন—

“I decided to wear my ovaries on any sleeve raise my poems on my milk and count my days by the flow of my menses..”

(Nappy Edges)

অ্যারিস্টটল বলেন, “The female is a female by virtue of a certain lack of qualities.”^{১০}

কেউ বলেন, ইভ চরিত্র অসম্পূর্ণ। কারণ, সে আদমের একটি হাড় থেকে জন্মেছিল।

St. Thomas নারীকে বলেন, ‘Imperfect man’, “Incidental being”.^{১১}

তুলসীদাস বলেন— “ঢোল গাঁওয়ার শূদ্র পশু নারী

ইয়ে সব হায় তাড়নাকে অধিকারী”

নারীর কলম তাই অভিশাপে সোচ্চার হয়—

“না কোন ও অভিমান নয়/অভিমান অতি মহার্ঘ সঞ্চয়/তাকে ভুল ব্যবহারে নষ্ট করা ঠিক নয়/রাগ নয়, অভিযোগ নয়, সমস্ত দাবিই প্রত্যাহার করে নিই আজ;/শুধু এক প্রার্থনা রেখে যাই মহাকালের নিকট;—/নারীহীন, মাতৃহীন, কন্যাহীন, বধূহীন, যোষিত সংসগহীন,/বান্ধবী বিহীন হয়ে বেঁচে থাক আগামী প্রজাতি।”

(কন্যাভূণ/কৃষ্ণা বসু)

নারীচেতনাবাদীরা আজ প্রতিবাদে সোচ্চার। নারীচেতনাবাদ সমালোচনার একটি নতুন ধারার জন্ম দিয়েছে। তার নাম ‘Feministic criticism.’

নারীচেতনাবাদ নারীকে আত্মসচেতন করেছে, প্রতিবাদে সোচ্চার করেছে। কিন্তু, তা কি নারীকে আংশিকভাবে বিপথগামীও করেছে? সন্দেহ জাগে—

“সভাপতি, মানবাধিকার কমিশন, একটি আর্জি আছে—

সোনাগাছি আছে থাক, শহরের মধ্যপ্রান্তে একখানি রূপোগাছি চাই,/হাড়কাটা গলি-মধ্যে, মেট্রো স্টেশনের ধারে, কালীঘাট ব্রিজে, তারা এসে দাঁড়াক তো, বেবুশ্যে পুরুষ—

...নারীদের প্রিয় দাবি মেনে অঙ্গিতে গলিতে।”

(শ্বেতা চক্রবর্তী, সভাপতি সমীপেষু)

কিংবা,

“স্বপ্নে তো পুরুষ ছিল, তুমি কেন সেই স্বপ্নে এলে

দশ বছরের ছোট তুই অনুরাধাদির ছেলে।”

(মন্দাক্রান্তা সেন/কাল থেকে আসব না)

কোথাও বা শুনি ‘সমকামিতা’র পদধ্বনি। (Lesbian Feminism)

চেতালী চট্টোপাধ্যায়ের ‘ভয়’ কবিতাটিতে পাই—

“...এভাবে জীবন-যৌবন চলে গেলে/সিরিয়াল আর রন্ধনশালা থেকে/সে মেয়ে আস্তে বিষ খেতে খেতে শেখে/রূপসী জন্ম কত পাপক্ষয়ে পেল/শুধু মাঝে-মাঝে নীল প্যারাসুট খুলে/সমলিঙ্গেরা নেমে এলে জলাশয়ে/যে যৌনস্বাদ থেকে গেছে অধরাই/জিভ সে ইশারা চেটে নিত ফণা তুলে”। এ প্রসঙ্গে স্মরণে আসে সংযুক্ত বন্দোপাধ্যায়ের—“চিলেকোঠার উন্মাদিনী” কবিতাটিও। এই সমলিঙ্গতা কি শেষ পর্যন্ত সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় না? সমাজ বিজ্ঞানী বলেন, “The primary difference between heterosexual and homosexual relationship is that one leads to production of human being and the other does not. Heterosexuality is the primary bondage of society because it leads to propagation of human species and this fact is true for the entire animal world.”^{১২}

কখনও তসলিমা নাসরিনের মুখে শুনি, পুরুষের থেকে কুকুরও ভালো।

আবার, কখনও শুনি —

‘আমার খুব ছেলে কিনতে ইচ্ছে হয়
ডাঁশা ডাঁশা ছেলে, বুকে ঘন লোম—
ছেলেকে কিনে ছেলেকে আমুল তছনছ করে
...জোর লাগি কষে বলে উঠব—যাশ শালা।’

কবিতাটি যদিও প্রতীকী, তবুও এটির সুস্থতা সম্বন্ধে মনে সামান্য সংশয় জাগে।

তুলনায় মন্দাক্রান্ত সেনের ‘অর্জুন-কৃষ্ণচূড়া কথা’-র মত কবিতাকে আমার মনে হয় অনেক সুস্থ। যশোধরা রায়চৌধুরীর ‘নন্দ’ কবিতাটিতে সহপাঠী পুরুষ বন্ধুদের হাতে খুনসুটির মাধ্যমে নন্দকে ধর্ষিত হতে দেখছেন যে বৌদি, তার মধ্যেও কিন্তু কিছু নারীচেতনাবাদের অতিরঞ্জন লক্ষ্য করি। (নন্দ, শারদীয় দেশ, ১৪০৯)/যশোধরা রায়চৌধুরীর ‘দুইবোন’ কবিতায় দুইবোনের স্বাভাবিক সম্পর্কের মধ্যে সমকামিতা খোঁজার ব্যাপারটিও কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগে।

এই অতি জটিল এবং আধুনিক বিষয় সম্পর্কে শেষ কথা বলার মত তীক্ষ্ণ মনন ও মেধার স্পর্শ আমার নেই। কিন্তু, নারীচেতনাবাদ আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, এ বিষয়ে মনে মাঝে মাঝে সংশয় জাগে। যাই হোক, শেষ কথা বলবেন সমাজবিজ্ঞানীরা, মেধাবী পাঠকেরা আর মহাকাল। আমি এক সীমিত প্রতিভার মানুষ। তাই এখানেই এ প্রবন্ধের ইতি টানলাম।

উল্লেখপঞ্জী

- ১। মঞ্জুষ দাশগুপ্ত/প্রাককথন/‘কানাকড়ি’, কলকাতা বইমেলা ২০০২ নারীর কবিতা, নারীর অভিজ্ঞান।
- ২। সমতার দিকে আন্দোলনে নারী : প্রথম পর্ব/শাস্ত্রী ঘোষ, পৃঃ ৩, প্রথম অধ্যায়, ‘পুরুষ শাসন. প্রকৃতির বিধান?’
- ৩। Feminism/Jane Freedman page no. 1 (Viva Books pvt. Ltd.) (New Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata)
- ৪। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ : ফিরে দেখা/শক্তিনাথ ঝা পৃঃ ৮৩/প্রসঙ্গ হাজার বছরের বাংলা কবিতা সম্পাদনা-ছন্দা রায়, তরুণ মুখোপাধ্যায়।
- ৫। ঐ
- ৬। পঞ্চাশের দশকের মহিলা কবি/সুতপা ভট্টাচার্য/প্রসঙ্গ হাজার বছরের বাংলা কবিতা, সম্পাদনা: ছন্দা রায়, তরুণ মুখোপাধ্যায়।

- ৭। লোকঐতিহ্য ও আধুনিক কবিতা/ইরাবান বসু রায়/অনুষ্ঠাপ শীত, ১৯৯৬
- ৮। Simon De Beauvoir/The second sex, p-N-152 (Vintage, edition)
- ৯। Simon de Beauvoir. 'The second sex'. Introduction : P. N. XIX.
- ১০। ঐ
- ১১। ঐ
- ১২। P.N 96, A short introduction to Feminist theory/Rinita Mazumdar,/Anustup 2001.

সহায়ক প্রবন্ধ

- ১। নাবীব কবিতা নারীর অভিজ্ঞান/কানাকড়ি/প্রাককথন—মঞ্জুষ দাশগুপ্ত
সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ-২০০২
- ২। নাবী চেতনার কবিতা : ভাষা, কল্পনা, অভিজ্ঞান/
রামকিশোর ভট্টাচার্য/ঐ গ্রন্থ।
- ৩। সম্ভব, আশি ও নব্বইয়ের মহিলা কবি/উর্মি রায় চৌধুরী/ঐ গ্রন্থ।
- ৪। পঞ্চাশের দশকের মহিলা কবি, প্রবন্ধ/সুতপা ভট্টাচার্য।
- ৫। কবিতা: সম্ভব দশক/হিমবস্তু বন্দ্যোপাধ্যায়/কোরক, শারদীয়, ১৪০৩।
- ৬। লোক ঐতিহ্য ও আধুনিক কবিতা/ইরাবান বসু রায়/অনুষ্ঠাপ শীত, ১৯৯৬।
- ৭। বাংলা নারী কবিতায় বিকল্প বিশ্বনির্মাণ/রাহুল দাশগুপ্ত, ধ্রুবপদ, ২০০৫, কলাম 'নারীবিশ্ব'।

বাংলা উপন্যাস : বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ

সূচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা মোমের মতোই জ্বলে পুড়ে গলে যাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, আর এই দহন নিয়েই আমাদের যাবতীয় শিল্পের সূচনা। কথনের দাহ থেকেই যেন সৃষ্টিলাভ করে কাহিনি। সময়ের চলনের সঙ্গে প্রতি পলে বদলে যাচ্ছে মানুষের মন, যার অবশ্যস্বাবী প্রতিফলন ঘটছে আমাদের সাহিত্যে। তবে সময়ের স্পন্দনকে আমরা সবাই একইভাবে একইমাত্রায় তো অনুভব করি না, ফলে বদলে যায় সাহিত্যের সংরূপ। কথাশিল্পেও এভাবেই আসে পর্ব-পর্বান্তর। বাংলা উপন্যাস পাঠকালে সময়ের শিল্পিত সংরূপ সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়েই ওঠে। জনপ্রিয় কথাশিল্প উপন্যাসে আমরা খুঁজি কতটা ঘটেছে বাস্তবের অনুসরণ বা কতটা আছে কাল্পনিক সংবেদন। পরিচিত জীবনের ভিতর ও বাহিরকে যে উপন্যাস বিশ্বস্তভাবে ধারণ করে, তা আসলে সময়কেই সঠিক অর্থে ব্যবহার করে। অবশ্য সব রচনাই কালোস্তর হয় না, অনেক রচনাই বিশেষ সামাজিক রাজনৈতিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতের প্রয়োজনটুকু মেটায়—ফলে কালজ্ঞ অস্তিত্বই হয় তাদের বিধিলিপি। আবার ফেলে আসা সময়ের বর্ণনাকে কখনো পরবর্তী প্রজন্মের পাঠক পুনরাবিষ্কার করে। অর্থাৎ জীবনের মতো জীবনের কথকতাও অফুরান বলেই আজো অক্ষুণ্ণ রয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির পাঠ পুনঃপাঠের প্রক্রিয়া।

শতাব্দীর দর্পণে বাংলা উপন্যাসকে দেখলে আমরা লক্ষ করি পরিবর্তনের সামগ্রিক অভিঘাতে বারংবার বদলে গেছে বাংলা উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক। অবশ্যই বাংলা উপন্যাস এগিয়েছে নান্দনিকতার লক্ষ্যে। আমাদের অভিজ্ঞতার নিরিখেই আমরা বুঝি গত শতক থেকেই একটা নতুনত্বের তাগিদ দেখা গিয়েছিল শিল্প সাহিত্যে। উনিশ বিশের সন্ধিলগ্নে মানুষ ও তার মানসিকতা আমূল বদলে গেল আর্থ-সামাজিক নানান ঘটনায়। ডারউইনের অভিযুক্তিবাদ, শিল্পবিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব প্রভৃতির কারণে যুগমানসে অবধারিত পরিবর্তনের প্রতিফলন যেন দেখা গেল কথাসাহিত্যে। সার্থক ঔপন্যাসিক ব্যক্তিগত সৃজনীশক্তি ও কল্পনার যৌথবিন্যাসে কাহিনি ও চরিত্র নৈয়ায়িক পরম্পরায় গৌণে বিশেষ পরিণতির অভিমুখে বিশ্বাসযোগ্য ও প্রাণময় করে এগিয়ে দেন। লেখকের অভিজ্ঞতা ও প্রতিভার মিলিত প্রয়াসে সৃজনের এই মায়ার খেলা সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

ফিরে তাকালে দেখি বিগত শতকে আমরা যেন পেরিয়ে এসেছি অন্তহীন এক পথ। পেরিয়ে আসা শতকেই ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। উনিশ শতকে বাংলা উপন্যাসের শাসনকর্তা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, এই শতকের সূচনা থেকেই ধীর অথচ সুনিশ্চিত গতিতে বিকশিত হচ্ছিল উপন্যাসের শিল্পরূপ। প্রতীচ্যের নভেলের দোসর বাংলা উপন্যাসে এল বঙ্কিমী জগৎসিংহ তিলোত্তমারা, আর জন্মলগ্ন থেকেই বাংলা উপন্যাস সীমাবদ্ধ রইল উচ্চবর্গীয় জীবনধারায়, অস্তেবাসী নিম্নবর্গের নিরুদ্ধকণ্ঠ রইল অশ্রুত হয়ে। পরিবর্তিত পটভূমি ও নতুন কালের ইশারা অবশ্য ছিল ‘রজনী’তে। ঔপনিবেশিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের ঘেরাটোপে নারীর চারপাশে সামাজিক ও আঙ্গিক অবরোধ। সূর্যমুখী তাই পথে বেরিয়েও ফিরে আসে অস্তঃপুরে আর দেবী চৌধুরানী রূপ প্রফুল্ল তার দেবীত্ব বিসর্জন দিয়ে পুকুরঘাটে বসে বাসন মাজে। অর্থাৎ পুরুষসমাজের দ্বারা চালিত নারী সমাজের তৎকালীন বাস্তবতাকে ঔপন্যাসিক অস্বীকার করতে পারেন নি। এই প্রেক্ষিতে মনে পড়ে, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য দুটি উপন্যাসের কথা। ‘ইন্দিরা’ ও ‘রাজসিংহ’। ‘ইন্দিরা’র চরিত্রগুলি সমাজ ও সময়ের আলো আঁধারে যেন হাঁটাচলা করে কারণ নগর কলকাতার অলোক উজ্জ্বলতা ও গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার আঁধার এখানে যুগপৎ ব্যক্ত। ডাকাত

দ্বারা লুপ্তিত গৃহবধূ ইন্দিরার সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠার গভীর সমস্যাটিকে এখানে লেখক রঙ্গব্যঙ্গে হালকা করেছেন। অশ্বেবাসী নারীসমাজের নিজস্বতার আভাস আছে এখানে ইন্দিরার কণ্ঠস্বরে, কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চাপে লেখক তাকে হাসি মশ্কারায় লঘু করেছেন। সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের সঙ্গে ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিসত্তার দ্বন্দ্বের চকিত আভাস এখানে থাকলেও লেখক একে স্বেচ্ছায় বাড়তে দেন নি। ‘রাজসিংহ’ উপন্যাসে লেখক মবারক জেবউন্নিসা দরিয়ার যে অল্পমধুর রমনীয় জীবনের স্বপ্ন এঁকেছেন, তা উপন্যাসটির বৃহত্তর রাষ্ট্রনৈতিক কাহিনিকে যেন ম্লান করেছে। তবে জেবউন্নিসা বা দরিয়ার এই রমনীয় স্বপ্ন পরিস্ফুটনের নান্দনিক প্রক্রিয়ায় পাঠক কেবল নিষ্ক্রীয় এক ভোক্তা। যদিও পরবর্তী প্রজন্ম বঙ্কিম-সাহিত্যকে নীতিবোধ দ্বারা আকর্ষণ রূপেই চিহ্নিত করে, কিন্তু তাঁর নীতিবোধ ও শিল্পবোধের দ্বন্দ্বিকতা রঞ্জিত বাস্তবতার প্রতি আমরা যেন সেভাবে আলোকপাত করি নি এখনো। বাংলা উপন্যাসের আদ্যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো পথস্রষ্টা, পাথেয় সন্ধানকারী ও গন্তব্য নির্দেশকের এমন সমন্বিত লেখকসত্তা আর কারুর মধোই দেখা যায়নি। তিনি যেভাবে ‘ইন্দিরা’ বা ‘রাজসিংহ’র পুনর্নির্মাণ করেছেন, তা এককথায় অসাধারণ। ১৮৯৩-র ‘রাজসিংহ’র চতুর্থ সংস্করণ তাই যেন নতুন গ্রন্থ। যার আকৃতি ও প্রকৃতির রূপান্তর ছিল লক্ষণীয়। এখানে যেন তাঁর জীবন ভাবনা সম্পূর্ণতা পেয়েছে। ঐতিহাসিক এই উপন্যাসের অন্তরে আছে প্রেমের মূর্ছনা যা লেখকের কবিপ্রাণতার প্রমাণ। অর্থাৎ একই রচনার মধ্যে বিভিন্ন সংস্কারের আবেদন ‘রাজসিংহ’র অনন্যতার নিহিত কারণ। আবার এখানে আছে পুরুষের অহং-এর লড়াইয়ের মধ্যে নারীপ্রেমের ভিন্ন অন্তর্ভবন। এভাবেই তিনি প্রমাণ করেছেন উপন্যাস মূলত এক অশেষ মানব নির্মিতি। তাই কেবল সাদামাটা কাহিনি বলেন নি তিনি, বরং বহু অনুপস্থের সমাহারে, সময় ও সমাজের সংলাপে, মূল্যবোধের নতুনতর বিন্যাসে তিনি গড়েছেন তাঁর কথনবিশ্ব। উনিশ শতকীয় রক্ষণশীলতা ও প্রগতির দ্বন্দ্ব বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক যে নবীনতার প্রতীক্ষায় ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র যেন সেই দাবিকে সার্থকভাবে মিটিয়েছেন। তিনি কল্পনার মর্মসত্যে পৌঁছে ছিলেন এবং কাল্পনিকতা দ্বারা সৃষ্ট সত্যভ্রমের থেকে নিজ সাহিত্যকে দূরবর্তী করেছিলেন। জীবন নিয়ে কি করবেন— এই অনুসন্ধান রত বঙ্কিমচন্দ্র যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এবং নিজ জীবনের উপাস্তবেলায় উপনীত হয়ে তাঁর সৃজিত সাহিত্যের মাধ্যমে যেন এর মীমাংসা করেছিলেন। পাশ্চাত্যের নান্দনিক আদর্শকে যেন আত্মীকৃত করেও তিনি বাঙালির বাস্তব জীবন নির্ভর ঐতিহ্যকে পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। ঔপনিবেশিক সমাজের সঙ্গে সঙ্গতিময় আধুনিক বিশ্ববীক্ষা হয়তো তিনি গড়ে তুলতে পারেন নি, কিন্তু তিনি নান্দনিক আধুনিকতার সমাজ নিরপেক্ষ প্রকাশে প্রয়াসী ছিলেন, তা বলাই বাহুল্য।

বঙ্কিমপর্বেই এসেছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত (‘সংসার’, ‘সমাজ’) স্বর্ণকুমারী দেবী (‘স্নেহলতা’, ‘স্বপ্নবাণী’), শিবনাথ শাস্ত্রী (‘যুগান্তর’, ‘নয়নতারা’), ফলে ঐ সময়পর্বে উপন্যাস রচনায় যেন ভরা কোটালের বান ডেকেছিল। ঐ সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছিল ফলে ঐতিহ্যের সঙ্গে বিচ্ছেদ জনিত দূরত্ব বেড়েছিল, আর তারই সঙ্গে বেড়েছিল অনন্য ও পরনির্ভরতা। উপন্যাস বীক্ষণে সামাজিক আধুনিকতার অমীমাংসিত আভাস যতটা প্রকটরূপে প্রকাশিত হয়েছিল, নান্দনিক আধুনিকতার আদর্শ কিন্তু ততটা স্পষ্টরূপে হয়ে ওঠে নি উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও রূপরীতিতে। তাই এই রচনাগুলির অধিকাংশই আজ সময়ের করাল গ্রাসে হারিয়ে গেছে। সেদিনের ঔপনিবেশিক সমাজের লেখকগণ নিজস্ব পথ হারিয়ে কেবল প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিক রীতির অনুসরণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও সেদিন বাংলা উপন্যাসে ‘নভেলি মিথ্যার ছায়া’ দেখেছিলেন। কারণ উপনিবেশবাদ মিথ্যা ও আত্মপ্রতারণার ছদ্মজগৎ নির্মাণে মনস্ক, তাই ‘নভেল’ লেখার শর্ত হিসেবে বাঙালি লেখকরা সেদিন হয়তো জীবনের সত্য থেকে মিথ্যার

মরীচিকার দিকেই ক্রমে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃতজীবনের দিকেই তাকিয়েছিলেন, আর এতেই স্পষ্ট হয়েছিল যে উপন্যাসের প্রাচ্যায়নই তাঁর অভিষ্ট। বাংলা উপন্যাসে আখ্যান গ্রন্থনার এক বিকল্প প্রকরণ গড়ে তোলাই ছিল রবীন্দ্র-অভিमत।

আবার ত্রৈলোক্যনাথের রচনায় ঐ ‘মিথ্যা ছায়া’র অপসারণে বাংলার রূপকথা ও লোককথা কেই সার্থক ভাবে ব্যবহৃত হতে দেখি। আসলে তিনি বুঝেছিলেন উপনিবেশের মনন-জাত উপন্যাসে শোষিত সাধারণ মানুষের কষ্টস্বর ও বিকল্প প্রতিবেদনের সমান্তরালতা চিরদিন অব্যক্তই থাকবে। একারণেই আখ্যান গ্রন্থনার বিপ্রতীচ্যানে তিনি ‘প্রচলিত ঔপন্যাসিক কৃৎকৌশলে’র পরিবর্তে জীবনের কৃৎকৌশলকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তবে তাঁর এই বিকল্প বরন সার্থক হয় নি। বরং উপন্যাসে প্রতীচ্যায়ন প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং এই আবহেই এসেছিলেন বাংলা উপন্যাসের অসামান্য শ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ।

সর্বত্রগামী প্রতিভায় বাংলা উপন্যাসকে ঋদ্ধ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কারণ মানবসত্ত্বের আবিষ্কার ও উদ্ভাসন তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু। তাঁর জীবন জিজ্ঞাসা বাস্তব জগৎ থেকে জেগে উঠলেও, তাকে তিনি পুনর্নির্মাণ করেছিলেন এক আধুনিক সূক্ষ্ম সংবেদনার সাহায্যে। বক্ষিম-প্রবর্তিত পথটি ছেড়ে তিনি স্বক্ষ্ম নির্মাণ করেছিলেন ‘চোখের বালি’তেই (১৯০৩)। যুগপৎ অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী মনের অধিকারী রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের কথাবস্তু বয়নে তাঁর দার্শনিক কবিতার অন্তর্বয়ন এনেছে এক স্বাদবৈচিত্র্য। তাঁর ‘পথে ও পথের প্রান্তে’ গ্রন্থে প্রকাশিত ভাবনা অনুযায়ী আমরা জানি তাঁর ‘বীণায় অনেক বেশি তার’ এবং তাঁর নিহিত কবিধর্মের কারণেই সব তারে ‘নিখুঁত সুর মেলানো’ তাঁর পক্ষেও কঠিন, অথচ ‘অস্তিত্বের নানা বিভাগেই’ ছিল তাঁর ‘জবাবদিহি’। সূক্ষ্ম কবিত্বের কারণেই তাঁর উপন্যাসে অস্তিত্বের বহুমাত্রিকতা স্পষ্ট। এভাবেই তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত বাস্তব হয়ে ওঠে সাম্প্রতিকতায় সমৃদ্ধ এক বৃহত্তর বাস্তব। তাঁর চরিত্রদের আত্মসচেতনতাবোধ আমাদের চেতনাকে স্পর্শ করে বলেই তারা আজো বাস্তব এবং আধুনিক। বক্ষিম-উপন্যাসের মতো তাঁর উপন্যাস ঘটনা-প্রধান নয়, বরং ধীম প্রধান; সমাজনীতির সমস্যা নয়, রবীন্দ্রনাথ বড় করে তুলেছেন মানুষের ব্যক্তিত্বের সমস্যাকে। তাই বিনোদিনী, গোরা, সন্দীপ ও নিখিলেশ, কুমুদিনী ও মধুসূদন, শচীশ ও দামিনী, অমিত ও লাভণ্য, এলা ও অতীন—সকলেই যেন ভিন্নমাত্রিক বাস্তব ব্যক্তিত্বের প্রতিনিধি আর একারণেই তাঁর উপন্যাস প্রতীচ্য-প্রভাবিত রীতিকে পেরিয়ে স্বীয় সার্বভৌমতায় উন্নীত। ঘটনা নির্মাণের দায় অস্ত্রে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রের অভিপ্রায়কে উপন্যাসে বড় করে তুললেও, ব্যক্তির উন্মেষ যে ঘটে সামাজিক পরিস্থিতির ফলে—এই উনিশ শতকীয় শিক্ষাকে ভোলেন নি বিশ শতকীয় আধুনিকতার মুহূর্তেও। তবে বক্ষিমী বিচার-প্রবণতা নিয়ে নয়, তিনি চরিত্র সৃষ্টি করলেন সহানুভূতিশীল সাক্ষীর ভূমিকায়। আঙ্গিকের অভিনবত্বে তিনি গল্প বলার দায় তুলে দিলেন চরিত্রের হাতে। ‘চোখের বালি’ থেকেই তাঁর উপন্যাসে আধুনিকতার আভাস মেলে।

সংবেদনশীল এই লেখক জ্ঞানতেন উপনিবেশের বাস্তব আসলে মেকি, তাই স্বাধীন ও অখণ্ডিত মানবসভ্যতার রূপায়ণ দেখি তাঁর উপন্যাসে। ‘চোখের বালি’ থেকেই তাই তিনি কল্পনারঞ্জিত বাস্তবতায় চেতন-অবচেতনের আঁতাতকে এবং অবচেতন অনুভূতিকেও প্রকাশ করেছেন। সেকালের সমাজ-পটভূমি সম্পর্কিত সচেতনতাই উপন্যাসের নিহিত বিক্ষোভ ও রূপান্তর-রীতিকে চরিত্রগুলির টানাপোড়নে যেন প্রতিফলিত করেছে। সামাজিক নানা আন্দোলনের ফলে সেদিনের নারী-ব্যক্তিত্বের ধীর অথচ নিশ্চিত উপায়ে উন্মোচনকে তিনি লক্ষ করেছিলেন বলেই, পুরুষের চেতনালোক আবিষ্কার করা ছেড়ে সৃষ্টি করেছিলেন বিনোদিনী, বিমলা, কুমুদিনী বা দামিনীর মতো

চরিত্র। ‘নারীর মনুষ্যত্বে’ তিনি মেয়েদের মানবত্বের পূর্ণমূল্য দাবির কথা বলেছিলেন। তাই কি তাঁর বিনোদিনী বা দামিনী ‘বিধবা’র ঘেরাটোপ থেকে নারীসত্তার পূর্ণ অভিব্যক্তিতে পৌঁছতে সংগ্রামরত? একই ভাবে ব্যক্তি হয়ে ওঠার চেষ্টা চালিয়েছে ললিতা, বিমলা বা কুমুদিনী। তাঁর উপন্যাসে আমরা নারী ব্যক্তিত্বের প্রজ্ঞাস্তরকেও লক্ষ্য করি। তাই বিনোদিনী যে নারীজীবন পর্যায়ের প্রতিনিধি এলা তার থেকে সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র। এভাবেই পর্ব থেকে পর্বান্তরে পৌঁছেছে তাঁর উপন্যাস এবং উপন্যাসের কথাশরীর নির্মাণে, মূল্যবোধের উপস্থাপনে বা উপসংহার অঙ্কনে তাঁর মৌলিক পরিবর্তনগুলি ক্রমশ প্রকট হয়েছে। তাঁর উপন্যাসে চিন্তা ও কর্মের দ্বন্দ্বিকতা জনিত জটিল জীবন-প্রশ্ন উত্থাপিত, তেমনি আধুনিক ঔপনিবেশিকতার মধ্যেও গতি প্রতিগতির নানা দ্বন্দ্ব বিবৃত। ফলে ‘চোখের বালি’র পরবর্তী ‘নৌকাডুবি’র সমাজসংস্কার ও নবমূল্যবোধের একমাত্রিক ঘাত-প্রতিঘাত জনিত পশ্চাৎপরতা ও অসম্পূর্ণতাকে আমরা বুঝি। এখানে ব্যক্তি হৃদয়ের নিশ্চলতায় ট্রাজিক বিপন্নতা দেখাতে চেয়েও তিনি ব্যর্থ হয়েছেন কারণ এর ব্যক্তি ও সমাজের টানাপোড়েনের অসমানুপাতিক বিন্যাস।

নানান দ্বন্দের বিন্যাস-প্রতিন্যাসে উপন্যাসের কথাবস্তুকে এক অসাধারণ উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর বিশিষ্ট প্রেমচেতনা ও পরিণামে জীবনের সার্বিক উদ্ঘাটনের প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। তাই তাঁর মহাকাব্যিক উপন্যাস ‘গোরা’য় শুধু হিন্দু-ব্রাহ্ম বিরোধ প্রসঙ্গই প্রাধান্য পায় নি, বরং গোরা’র জন্ম রহস্য উদ্ঘাটনের সূত্রে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনায় স্বল্প যুগসঙ্গিকালীন ভারতীয় সত্তা মানবতার বেদীমূলে প্রণত হয়েছে। ফলে ব্যক্তিসত্তা ও বিবর্তনশীল সময়ের সম্পর্ক এই উপন্যাসের উপজীব্য। ‘চতুরঙ্গ’-এ শচীশের আত্মানুসন্ধান জ্যাঠামশাই জগমোহনের পজিটিভিজম থেকে শুরু করে লীলানন্দ স্বামীর ছদ্ম ভাবুকতার স্রোত পেরিয়ে, দামিনীর সংরাগ-তপ্ততাকে অস্বীকার করে, অসীমতার অনুসন্ধানে নিষ্কান্ত—এতে মানবসত্তার এক রাবীন্দ্রিক বিশিষ্টতাই যেন বিধৃত। এমনি আত্মসন্ধানের বিচিত্র ও জটিল বুনট আছে ‘ঘরে বাইরে’ বা ‘চার অধ্যায়’ উপন্যাসে, যেখানে রাজনীতি এনেছে এক অন্যতর মাত্রা। সেদিনের সঙ্গিকালীন বাঙালি আত্মপরিচয় অর্জনের পথে বিভ্রান্ত হয়েই ঔপনিবেশিক মিথ্যা জগৎ ছেড়ে নিজস্ব এক সত্যজগৎ নির্মাণে মনস্ক হয়েছে। এভাবেই ব্যক্তিসত্তার গূঢ়তাকে সমান্তরাল অপরতার মাধ্যমে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বাখতিনের মতে অপরতার বোধই হল মানবিক চেতনার ভিত্তি তাই ব্যক্তিসত্তার সংজ্ঞা উপন্যাসেও প্রাধান্য পায় বহুস্বর। আবার ব্যক্তি সত্তায় এবং উপন্যাসে একই সঙ্গে থাকে পার্থক্য ও সমান্তরালতা। অর্থাৎ রবীন্দ্র উপন্যাসের শক্তি এর কাহিনির বহিরঙ্গ নয়, বরং নিহিত থাকে চরিত্রের অন্তরঙ্গে।

সমাজনীতির বিরুদ্ধে নারীর বিদ্রোহের আধুনিক বিষয়টির বিস্ফোরক প্রকাশ আছে ‘চোখের বালি’র বিনোদিনী চরিত্রে। বিষবৃক্ষ-এর তুলনায় এর আধুনিকতা অতি স্পষ্ট। গঙ্গের কেন্দ্রে সেখানে ছিল ভোগী নগেন্দ্রনাথ, আর এখানে বিধবা বিনোদিনী। মহেন্দ্রের ফিউডাল বোধের সঙ্গে বিনোদিনীর গণতান্ত্রিক আত্মপ্রতিষ্ঠার বিরোধটি লক্ষণীয়। কুন্দের মতো অনিশ্চয়তার মাঝে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে নি, বরং সুক্ষ্ম কৌশলে সে আত্মপ্রতিষ্ঠায় বদ্ধমূল থেকেছে। তার প্রেম অবৈধ হলেও, সেই প্রেমের প্রতিষ্ঠায় সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নিজের অপ্রাপ্তিতে সে আশার ঘর ভেঙেছে, তবে শেষ পর্যন্ত সে মহেন্দ্রের কামুকতা এড়িয়ে বিহারীর শুভার্থী প্রেমে উপনীত হয়েছে। লেখক এভাবেই বাসনা আবিষ্ট বিনোদিনীর প্রেমকে পূজায় পরিণত করেছেন। আবার ‘চতুরঙ্গ’র কথক শ্রীবিলাস নিজের অপ্রাপ্তির যন্ত্রণাকে বুকে চেপে, কখনো বা ড্যাশচিহ্নে প্রতীকী করে তুলে, আমাদের জানিয়েছে বিধবা দামিনীর গুরুদ্রোহ কিভাবে শচীশের প্রতি আত্মনিবেদন প্রশমিত হয়েছে।

জীবনপথে শচীশ জ্যাঠামশাইয়ের যুক্তিবাদ থেকে লীলানন্দ স্বামীর ভক্তিবাদে পৌঁছেছিল দুটি মৃত্যুর অভিজ্ঞতায়। কিন্তু এখানেও দামিনীর আগমনে তাকে অন্যতর পথের খোঁজে বেরিয়ে পড়তে হয়। শচীশের প্রতি প্রেম আর শচীশের প্রত্যাখ্যানকে বুকের গভীরে বহন করেই অবশেষে দামিনী হয় শ্রীবিলাসের ঘরনী। আর স্বল্পসময়ের দাম্পত্য-অস্ত্রে মৃত্যুপথযাত্রী দামিনী সাধ না মেটার আক্ষেপ নিয়ে অর্মতালোকে যাত্রা করে। ‘ঘরে বাইরে’র আঙ্গিকের অভিনবত্ব এখানেই যে কথক তিনজনেই—এদের জীবনের ত্রিভুজ প্রেমের গল্প এরা তিনজনেই বলে। সন্দীপের ‘দুর্দান্ত ইচ্ছার প্রলয়মূর্তি’ আর ‘কৌতূহল’ নিখিলেশ-পঙ্কী বিমলাকে সন্দীপের প্রতি আকৃষ্ট করে, তবে অমূল্যের প্রতি তার মাতৃহৃৎ শেষ পর্যন্ত তাকে ভুলের কিনারা থেকে সংসারের কিনারায় স্বামীর কাছে ফিরিয়ে আনে। লেখক এখানে নারীস্বাধীনতা, প্রেমের স্বাধিকার প্রভৃতির সঙ্গে জাতীয় স্বাধীনতার সমস্যাও সম্পৃক্ত করেছেন। দাম্পত্য সম্পর্কের আলোয় দেশের মুক্তি সংগ্রামকে দেখা বা রাজনৈতিক মতাদর্শের মাঝে দাম্পত্য সমস্যা দেখা—এখানে সম্ভবপর হয়েছে রবীন্দ্রপ্রতিভার আশ্চর্য নৈপুণ্যে। এছাড়া নিখিলেশ-সন্দীপের আদর্শগত বিতর্কে আমরা আজকের তত্ত্বগত বহুস্বর চিনে নিই। ‘গোরা’ উপন্যাসের মতো এখানে তর্ক ও তত্ত্ব নিরাশ্রয় নয়, বরং চরিত্রদের জীবন সমস্যার অংশ। তত্ত্ব যে আধুনিক মানুষের অস্তিত্বের এক অন্তরঙ্গ ব্যাপার তাই যেন দেখিয়েছেন এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ। অবশ্য মডার্ন সন্দীপকে নির্মাণ করে রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার মিথ্যা ছলনাময় দিকটির প্রতি যেন আমাদের সচেতন করেছেন। ‘ঘরে বাইরে’র চেয়ে ‘যোগোযোগে’ রবীন্দ্র পশ্চাৎপরতাই যেন লক্ষিত হয়। তাই নিখিলেশ নিজের বাড়ির ফিউডালতন্ত্র থেকে স্ত্রী বিমলাকে মুক্তি দিতে উদ্যোগী হয়েছে, আর ‘যোগোযোগ’এ ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিকতার প্রতিনিধি বিপ্রদাসের ঘর থেকে বেরিয়ে কুমুদিনী ধরা পড়ে মধুসূদনের ধনতন্ত্রের হাতে। কুমুর চিন্তে অবশ্য তার যুক্তিবাদী দাদার প্রভাব ছিল না, তাই অযুক্তির পথে চলে সে তার বিয়েকে বিধির বিধান বলে মেনেছে। চরিত্রগুলি এখানে আত্মসচেতনতায় পূর্ণ। তাই মধুসূদনের অর্থের অহং এবং পৌরুষের দাপট কাহিনীতে চিহ্নিত। বিপ্রদাসের প্রতি ঈর্ষা মধুসূদন তার বুজোয়া মানসিকতায় কুমুদিনী-কে বাঁধতে মাতৃহৃৎ বন্ধন ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে নি। আধুনিক রবীন্দ্রনাথ কুমুর সর্বাস্থে মানির ছাপ দেখিয়ে প্রমাণ করেছেন প্রেমের অভাবে স্বামীসহবাসও কত মমান্বিত যজ্ঞগার ও অপরিসীম অশুচিকর হতে পারে। নারীত্বের চরম মূল্য দিয়ে কুমু বুঝেছে প্রথা বা দৈবনির্দেশের চেয়েও বড় নিজস্বতা। অযুক্তি থেকে যুক্তিতে, সামাজিক প্রথানুগত্য থেকে প্রাতিষ্মিকতায় এই উত্তরণই উপন্যাসটির মূলীভূত সত্য। ঐ সময়ের বিবেচনায় লেখক সন্তানসম্ভবা কুমুকে মধুসূদনের ঘরে ফিরিয়ে আনলেও, দুঃসহ আত্মগ্লানিতে কুমু পৌঁছেছিল এই আধুনিক অনুভবে—‘এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যও খেয়ানো যায় না’। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘দুই বোন’-এ প্রায় বিজ্ঞানীর পরীক্ষাধর্মিতায় নারী পুরুষের সমস্যাকে যাবতীয় বহির্জগতের অনুপস্থিতির অবসানে তুলে ধরেছেন। শর্মিলার অপত্য স্নেহে লালিত ছিল তার স্বামী শশাঙ্ক। শর্মিলার অসুস্থতায় সেবা করতে আসা শ্যালিকা উর্মিমালার কারণে শশাঙ্ক সেই প্রথম অভ্যস্ত আরামের বদলে একটা ছুটির হিপ্পোল অনুভব করে। নতুন এই অভিজ্ঞতার আবেশেই খেলারছলে ঘটে যায় উভয়ের মনোবিনিময়। উর্মিমালাকে লেখক মুক্ত করেন নীরদের কাছ থেকে আর সুস্থ শর্মিলা বিড়ম্বনা এড়াতে বোনকেই সতীন করতে চায়। তবে এই ব্যবস্থা আধুনিক উর্মিমালা নাকচ করে চলে যায় বিলেতে। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল দিদির দাম্পত্যের ভাঙচুর একদিন সময়ের প্রলেপেই জোড়া লাগবে।

একটা সময়ে সাহিত্যের মূল শ্রোত ছিল ‘পুরুষশ্রোত’ তাই প্রেমকে আদর্শায়িত করে রক্তমাংসের নারীকে প্রতিমায় পরিণত করার প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছিল। আবার নারী প্রতিমা বস্তুগত নারীর

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় লোকচৈতন্য ও লোকাভরণ*

বিপ্লব চক্রবর্তী

‘চৈতন্যের শুভ স্তম্ভ কবির উদ্ভাবনায়’

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় লোকচৈতন্য ভাষা রূপ পেয়েছে লোকাভরণ শৈলীর পরিমিত ব্যবহারে। লোকচৈতন্যের প্রকাশ তাঁর কবিতায় অত্যন্ত অনায়াস ভঙ্গিতে স্ফূর্তি পেয়েছে। ফলে লোকচৈতন্য তাঁর কবিতার ভাষা ও নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত। লোকচৈতন্য ও লোকজ ধারণা একই মুদ্রার দুই পিঠ হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতায়। লোকধারণা অত্যন্ত হৃদয় ও সাবলীলভাবে কবিতায় রূপ ধরেছে; লোকাভরণ শৈলীর তাৎপর্যও তাই তাঁর কবিতার গভীরে নিহিত।

লোকধারণা লোকমনে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। জগৎ জীবন বিষয়ে ধারণা সাধারণভাবে লোকমনে জমা হয়ে থাকে। সত্যমিথ্যা, লঘুশুদ্ধ, ভালমন্দ, জগৎ প্রকৃতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে লোকধারণা অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক ভাবেই লোকচৈতন্য মিশে থাকে। লোকমুখে প্রবাদ, প্রবচন, লোককথা প্রভৃতির উচ্চারণে লোকচৈতন্য ক্রিয়া করে। লোকমনের সহজ ও স্বাভাবিক ধারণাগুলি যখন কবিতায় প্রকাশ পায় তখন লোকাভরণ শৈলীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রকাশ ঘটে।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় লোকজ উপাদানের যে সংযত ও শিল্পিত ব্যবহার ঘটেছে তার সঙ্গে লোকাভরণ শৈলী নির্মাণের গভীর যোগাযোগ বর্তমান। খুব সাধারণভাবে প্রবাদ প্রবচনের প্রয়োগ তাঁর কবিতায় নজরে পড়ে না। কোনো লোকগল্পের কাব্যিক রূপদানও কবির লক্ষ্য নয়। অথচ লোকচৈতন্যের এক বাণীময় কাব্যরূপ তাঁর কবিতায় সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে। কবির নিজস্ব বাগ্ভঙ্গি ও ছন্দোবীতির সঙ্গে তার আশ্চর্য মেলবন্ধন ঘটতে দেখা যায়। লোকালয়ের অভিজ্ঞতা কবির রচনায় কাব্যরূপ ধরে লোকাভরণ শৈলীতে। বাগ্ভঙ্গির ভাষা ও ছন্দে তার নির্মাণকৌশল প্রনিধানযোগ্য।

লোকচৈতন্যের অভিজ্ঞান অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় ছড়িয়ে আছে কবির শিল্পিত স্বাক্ষরে। লোকচৈতন্যের শুভ স্তম্ভ কবির নির্মাণশৈলীর ভিত্তিভূমি, কবির উদ্ভাবনার আলোয় উদ্ভাসিত সে এক আশ্চর্য জগৎ।

দুই

‘গভীরে আজ লোকালয়ে’

অমিয় চক্রবর্তীর ‘কবিতা সংগ্রহে’ কবির যে অপ্রচলিত কাব্যপুস্তিকা মুদ্রিত হয়েছে তাতে কবির প্রারম্ভিক কাব্য সাধনার পরিচয় মেলে। প্রথম কাব্য খসড়া প্রকাশের (১৯৩৮) পর ‘কবিতা’ সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু কাব্যটিকে বিস্ময়কর বই বলে অভিনন্দন জানান। প্রথম কাব্য প্রকাশের এক দশকেরও আগে রচিত (১৯২৪-২৫), কবিতাবলী পড়লে এক শক্তিমান কবিকে চিনে নেওয়া শক্ত নয়। কবিতা সংগ্রহের পরিশিষ্ট রূপে মুদ্রিত এই কবিতাগুলিকে পরবর্তীকালে রচিত নির্মীয়মাণ কবিতার ভূমিকা রূপে বিবেচনা করা চলে।

* কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে লোকাভরণ শৈলী ও আধুনিক বাংলা কবিতা বিষয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছিলাম (৬ এপ্রিল, ২০০৪) তারই অনুসরণে বর্তমান প্রবন্ধটি লিখিত। তবে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় লোকাভরণ শৈলীর প্রয়োগ এই আলোচনার মূল লক্ষ্য।

‘কবিতাবলী’-র কবিতা পড়লে কবিমনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে যথা

১। লোকজগৎ চেতনা

২। সুদূর ও অসীমের প্রতি আকৃতি

৩। প্রেমিক মনপ্রাণের উদ্বোধন

এই তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ক্রমশ্চুট হয়েছে কবির প্রারম্ভিক কাব্যসাধনায় যুগে। এই সময়ে কবির নিজস্ব ছন্দোবীতি পরিষ্কৃত হয়নি, বাগ্ভঙ্গিমার মধ্যেও স্বাতন্ত্র্যের লক্ষণ নেই, প্রচলিত ছন্দোবীতিরই অনুসরণ দেখা যায় এখানে। তবুও কিছু কিছু শব্দবন্ধে বা পদবীতিতে ভবিষ্যতের নতুন দিগ্ভ্রমণ কবিকে চিনে নেওয়া যায়, যেমন—জয় উজ্জ্বল চেতনা, অসীম জীবন ভুবন মাঝে চলি সে কোন লোকে, সমাহিত চেতনায় অনির্বাণ, বৈরাগী পরাণচলে, ধ্যাননেত্রে মিলায় সুদূর যুগান্তযাত্রার স্রোতে, যাত্রাপথে দিনরাত্রি, জন্ম-যুগান্তরজয়ী, চেতনায় আনন্দজীবন ইত্যাদি শব্দবন্ধে লোকচেতনার সচেতন ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দৃষ্টব্য নয়। এই চেতনা উজ্জ্বল, সমাহিত আবার অনন্তজীবন ও দিনরাত্রির নিত্য যাত্রাপথে দূরাভিসারী। এই চেতনাই অনন্ত জীবন প্রত্যাশী। প্রারম্ভিক কবিতায় সে সব ধারণা লুকানো অথবা অর্ধস্ফূট রয়েছে পরবর্তীকালে তা লোকচেতনার ভাষারূপ পেয়েছে নানাভাষায়।

লোকায়ত জীবন ও লোকায়তিক ধারণাগুলিকে কবি লোকচেতনায় আলোয় আলোকিত করেন। তাই সেই চেতনা হয়ে উঠেছে ত্রিমাত্রিক—

১. সমাহিত চেতনা

২. যুগান্তর জয়ী উজ্জ্বল চেতনা

৩. জন্ম যুগান্তরজয়ী অনন্তচেতনা

লোকচেতনা ব্যক্তি তথা কবিমনে সমাহিত হয়ে থাকে, দিনযাপনের ক্ষণেক্ষণে বিনষ্ট হয় না, বরং যুগান্তর জয়ী হয়ে ওঠে। লোকলোকান্তরে জন্মে জন্মে যুগান্তর ঘটে যায়, কিন্তু লোকচেতনার অনির্বাণ শিখা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়।

মানুষের নিত্য যাওয়া আসার সহস্র সত্য লোকসত্যের রূপ ধরে প্রকাশ পায় কবির রচনায়

০.১ নাগরের বাটে হাটে দেয়া নেয়া—

আবহ তাই।

প্রত্যেকে আসি, প্রত্যেকে যাই।

নগরের দেয়া-নেয়ার আবহ বর্ণনার ভঙ্গির মধ্যে লোকবাক্য উচ্চারণের প্রবণতা স্পষ্ট। ভবের হাটে মানুষের নিত্য দেয়া-নেয়া এবং নাগরের বাটে মানুষের নিত্য যাওয়া আসা চলে। এই নগর দেশকালের সীমায় বদ্ধ নয়, এই মানুষই লোকচেতনায় ভাস্বর। এই লোকচেতনাই নানা রূপ ধরেছে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায়। কবি যখন লেখেন—

০ ২ সেখানে গেলে শান্তি পাই

সেই বটহায়ায়।

দাহদিনের দক্ষ মাঠ

শূন্য বাট

তখন সেই গভীর লোকালয়ের রূপই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার নিত্য লোকসম্মান চলাতেই থাকে মানুষের মনে। লোকপালনের সঙ্গে তার গভীর সম্বন্ধ—

০.২.১ কালের বীজ মৃৎজলে তব আশ্রিতের
রক্ষা হোক, হে পুষন লোকহিতের।
পরুষপথে, গাছের তল; শীথ বাজায় সৃজন তাই।
সেখানে এসে শান্তি পাই।^৪

সেই লোকপালনে ইন্দ্র ও পুষন একাকার হয়ে যায়। ভেঙে যায় দেশকাল গন্তীর সীমানা, সমাহিত লোকচেতনা যুগান্তর জয়ী উজ্জ্বল এক চেতনা রূপে অনন্তরূপে ভাস্বর হয়ে ওঠে।
সূরের চেতন্যকে কবি যেন সহসাই অবিস্কার করেন। সেই নব আবিস্কার আসলে এক সমাহিত চেতনার পুনর্জাগরণ—

০.৩ দেখিলাম চেয়ে
অসীম জীবন আছে ছেয়ে
সমাহিত চেতনার অনির্বাণ পরম প্রকাশ,
সঙ্গীতের মুগ্ধ মর্মোচ্ছ্বাস।^৫

কবি এই জাগরিত চেতনারই জয়গান গান :

০.৪ জয় উজ্জ্বল চেতনা
বন্ধনহীন বেদনা।^৬

এই চেতনাই সুস্পষ্টভাবে ছড়িয়ে যায় কবির সৃষ্টিজগতে, কোনো এক টির অতৃপ্ত প্রেরণাই তাঁকে চিরযাত্রী করে রাখে।

০.৫ যুগযুগান্ত তিমির রাত্রি
হবে লঙ্ঘন, চলিব যাত্রী,
দনিরীক্ষ্য শক্তি হানে
মঙ্গল-উন্মেষণা!^৭

এই মঙ্গল উন্মেষক দুনিরীক্ষ্য শক্তির চেতনাই সমাহিত থাকে। ঘটমান জগতের অভিঘাতে তার জাগরণ অথবা পুনর্জাগরণ ঘটে। হতে পারে তা কোনো গান শোনার উপলক্ষ্যে :

০.৬ দেউলে জ্বলচে শিখা মেঘনীল বেদনা
হে সূরের চেতন্য
বিহ্বল কথার ধূলি উড়িয়ে উঠেছে দৈগম্বিক।^৮

সূরের চেতন্যের এই অভ্রভেদী রূপ নির্মাণে কবি যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন তা লক্ষ করার মতো। এই ভাষা কবির নিজস্ব রীতি সম্মত। সূরের শাদা চূড়োর স্থির ত্রিশূল কল্পনা তাই ভাব ও ভাষার বন্ধনে রূপ পায়—ত্রিশূল স্থির। ‘সূরের শাদা চূড়ো এই দুই বাক্য বাক্য ও পদবিন্যাস বাক্য বিভাজন পদ্ধতিতে প্রযুক্ত। তার সাথে শব্দের রূপান্তর ঘটে। শব্দের পারাপারে ভাসে দিগন্ত থেকে দৈগম্বিক, মরুতাপস থেকে মরুতাপসিক। নক্ষত্র থেকে নাক্ষত্রিকা এমন অনেক শব্দ। রবীন্দ্রনাথও গান শুনে মনে হয় ত্রিশূল স্থির, পরে তা বাক্যবিস্তারের রূপ নেয়—‘অলকায় স্থির ঐ স্বর্গ ত্রিশূল—

তিন

সৃষ্টির আকাশে দৃষ্টিলোক

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় যাওয়া-আসা, পারাবার বারবার নিত্যযাত্রীর অভিজ্ঞানে ফুটে উঠেছে।

কবির প্রথম কাব্য ‘খসড়া’ (১৩৪৫) চেতনার বিদ্যুতে উদ্ভাসিত এক অভিনব সৃষ্টি। ‘কথায়-কথা-গাঁথা’ সে সৃষ্টি অস্পষ্ট চেতনাবেগে দোলায়িত—

১.১ সঞ্চার হতেছে সৃষ্টি
 রচনার ঘরে।^৯

সেখানে লোকসত্তাই আধার। বাক্যোপম পদবন্ধে কবি তার ছবি আঁকেন—

১.২ সঞ্চার আধার।
 শিকড় মিশেচে। মাটি-মেঘ
 অণুর গোধুলি মিলা।
 প্রদোষে
 ওঠে শিরা বেয়ে পাতা
 চেতনায় দিস্তরে।^{১০}

প্রথম কাব্যেই কবির বাক্য ও পদবন্ধন রচনার আশ্চর্য কলাকৌশলের সঙ্গে মিশেছিল নির্ভুল শব্দ এবং লোকচেতনার তুল্য পরিমাণ অভিযোজনা। ক্রমশ এটা একটা পদ্ধতি হয়ে উঠেছে তার কবিতার। কালের বহমানতায় চেতনার বিদ্যুৎ জ্বলে। কবি তাই লেখেন—

১.৩ তবু দেখো স্রোতাবেগে
 চেতনা - বিদ্যুৎ নামে;
 মর্মঘরে জ্বালি অন্যকাল।^{১১}

কালের জগৎ ছুটে চলে। সময় থাকে না, তাই দণ্ডপল মুহূর্তের জলস্রোত বিরামহীন। চেতনার বিদ্যুৎ কেবল মর্মস্বরে অন্যকাল রচনা করে।

এই কালান্তরের তাৎপর্য বোঝা যায় লোকবিজ্ঞানের প্রয়োগে। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় লোকচেতনা লোকবিজ্ঞানেরই অন্যদিক।

‘কালান্তর’ অথবা ‘পুষ্প দৃষ্টি’-র মতো কবিতায় লোকচেতনার সঙ্গে লোকবিজ্ঞানের কাব্যময় রূপ প্রকাশ পেয়েছে। ‘কালান্তর’ কবিতায় সময়ের বহমানতার সাধারণ লোকসত্তাই তাই ভাষা পায়—

১.৪ সময় কি থামে?
 আঙুলের ফাঁক দিয়ে
 দণ্ডপল মুহূর্তের জল বয়ে যায়
 থামাই ঘড়ির কাঁটা।^{১২}

সময় যে থেমে থাকে না সেকথা লোকচেতনারই অংশ। এই অংশের নিহিত উপাদান হল একটি প্রবাদ—

১.৪. সময় যায় জলের মতো।

এই লোকপ্রবাদ কবির চেতনায় এমনভাবে মিশে ছিল সে কাব্য রচনার সময় তা বাক্যাময়ী লোকাভরণের রূপ ধরেছে। এই একটি বাক্যের প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর নিহিত এবং অন্যবাক্যে প্রবাদোক্ত জলের প্রবহমানতার উল্লেখ রয়েছে।

স্পষ্টতই বোঝা যায়, লোকচেতনায় যা প্রবাদ কবি তাকেই কাব্যের ভাষায় বাক্যের অন্বেষে প্রকাশ করেছেন। এমনি ভাবে লোকচেতনায় যা বিজ্ঞান, তা কবির কাব্যে কাব্যভাষার রূপ নেয়। মাটিতে গাছের বীজ থাকলে রোদ জল হাওয়া লেগে তা সোনার থালায় শস্য হয়ে ওঠে। এই বিশেষ জ্ঞান লোকবিজ্ঞানের অংশ, তবুও কবি তাকে কাব্যরূপ দেন—

১.৫ মেলাবার দৈব। কী চায়? জীবন্ত মাটি,
 মিলেছিল বীচি, রোদ, বলদ-আনা জল,
 আকাশের জলে; আল-দেওয়া খণ্ড মাঠে
 রৌদ্র বলয় ঘিরল একদা কাঁচা শস্য সোনার ফল—^{১৩}

লোকবিজ্ঞান এখানে লোকজগতের মাঝে ছড়ানো এবং লোকের কর্ম জগৎ ও ভাবনার সঙ্গে
 মিশে থাকে :

১.৬ ভরা পাকা ধান; হলুদ শর্বে। কাজ, কত লোকের
 যুগের চেষ্টা জড়ানো আমার দুপুরভরা কাজ।
 একেজো মাসে গরু চরেচে মাঠে, দেখি বাঁকের
 আল-পথে লোক চলেছে, দূর মন্দিরের উঠেছে ধ্বজ।^{১৪}

এই ভাবে কবি একদিকে লোক জগতের, অন্যদিকে লোকের কর্মের আর জীবনভাবনার বর্ণনা
 দেন। অতি সূক্ষ্মভাবে কবি এই লোকজগৎ ও লোকমন তথা লোকচেতনার স্বরূপ মেলে ধরেন।
 সেখানে লোকবিজ্ঞান ও লোকবিশ্বাসের পাশাপাশি অবস্থান।

১.৭ জীবন্ত মৃত্যুর ধুলো।
 নগরের ঘরে ঘরে বীজ রোপো,
 বীজ হতে ওঠে চারা
 অপ্রাণ নিঃসঙ্গ আকাশে!
 সাক্ষী ক'রে যক্ষ্মা-দেবী সঁপো
 কান্নার ফাটা ফল, ভারা-ভারা।
 যথা সনাতন হরিদ্বারে
 সম্যাসী-জনতা পুষ্ট মারী
 ওলা-বিবি তুষ্ট ধর্মকারি
 পুণ্যের বন্যায় ভাসে,
 ভুভারতে শ্মশান-বিলাসে;
 বৎসরে বৎসরে
 মৃত্যু-কুস্ত পূর্ণ ক'রে
 ধুলি, তব মন্ত্র দাও।^{১৫}

লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, কবি যে লোকজগতের বর্ণনা করেছেন তা টুকরো টুকরো শব্দবন্ধে
 গড়া। তাই ‘সম্যাসীজনতা পুষ্ট মারী’, ‘ওলাবিবি তুষ্ট ধর্মবারী’ শুধু অস্তমিলের দৃষ্টান্ত নয়, বরং
 জীবন্ত মৃত্যুর ধুলো ও ধুলি-মন্ত্রের ভাবগত অম্বয় ঘটায়।

সৃষ্টির আকাশে এই ভাবেই দৃষ্টিলোক রচিত হয়। কবি ছোট ছোট পদবন্ধে সেই দৃষ্টিলোক
 ভরিয়ে তোলেন। তার সাথে লোকচেতনের বড় গভীর যোগ। লোকচেতনার আলোয় কবির
 কাব্য যে উদ্ভাসিত হয় তার কারণ এইখানে নিহিত। লোকচেতনাই তখন বাক্যাহ্বয়ী লোকাভরণের
 শৈলীতে কাব্য হয়ে ওঠে—

১.৮ নিমতলার ঘাটে আদি মহানিমের গাছ
 তারি তলায় বাদি বাজায় শ্রোত কন্যের নাচ
 রাতদুপুরী।^{১৬}

১.৮.১ বুরু-বুরু ঝরা পাতা ছু হাওয়ার কাণ্ড
হা হা করে শুকনো শিকড়, ভাঙা মাটির ভাণ্ড
ও হো হো: হো।^{১৭}

‘গন্তব্য’ কবিতা থেকে উদ্ধৃত এই (১.৮ এবং ১.৮.১) স্তবকদ্বয়ে নিমতলা শ্মশানে মহানিম গাছের তলায় বহমান স্রোতধারায় কবি স্রোত-কন্যারে নাচের বাদ্যির বাজনা শুনতে পান। পাঠকামনেও নিমতলা ঘাটে শ্মশানের চেতনা জাগায়, বহমান গঙ্গান্নোত ধারা তার অনুসঙ্গী।

দ্বিতীয় স্তবকে কবি লোকধ্বনির সংযোগ ঘটান। শুকনো শেকড়ের হা হা এর ভাঙমাটির ভাঁড়ের ও হো হো: হো তাই লোকধ্বনির সন্নিপাত ঘটায়। তখন নিরবধি প্রবাহিত কালধারার পাশে নশ্বর জীবনের ইঙ্গিতবাহী হয়ে ওঠে। অতপর কবি পুনরায় লোকচেতনার চিন্তার সংযোগ ঘটান বাক্যায়ী লোকাভরণ শৈলীতে—

১.৮.২ যমভগ্নী যমুনা নয়, গঙ্গা বাজায় তালি
গঙ্গাতীরের নমুনা এই রুম্ব হাড়ের বালি
—ওকি ঢেউ-এর শব্দ।^{১৮}

১.৮.৩ মাঝি রইলো মাঝদরিয়ায়, নৌকা তবু ঘাটে
ট্রামে চড়ে এলেন গোসাই আগুন লাগার হাটে—
শোনো, শোনো।^{১৯}

প্রচলিত লোক প্রবাদ হল যমুনা যমের ভগ্নী; এখানে সে প্রবাদকে উল্টে দেওয়া হয়েছে, কারণ কবি লোকউপাদানে শিল্পনির্মাণে মগ্ন। উপাদানটির রূপ বদলে গেছে ‘গঙ্গা বাজায় তালি’ শব্দবন্ধের প্রয়োগে। স্রোত কন্যাই যে সেই লোকছড়াকে বৃড় আসুল দেখিয়ে মৃত্যুবহ ধারায় বহমানতার সত্যকে স্পষ্ট করতে চায়। তাই ‘ওকি ঢেউয়ের শব্দ’ বলে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে।

পরের স্তবকের (১.৮.৩) লোকধাঁধার রূপকল্পে বাক্যায় ঘটেছে। লোকধাঁধায় প্রহেলিকাময় বাক্য থাকে। তার উত্তরদানই ধাঁধা রচনার উদ্দেশ্য। যেমন, হাত আছে পা নেই সেট বলমল করে—এই ধাঁধার উদ্দিষ্ট অর্থ হল জামা এবং জামা-ই হল এর উত্তর। লোকভরণ শৈলীতে যখন কোনো ধাঁধার অনুকল্প রচিত হয় তখন ধাঁধার কোনো উত্তর থাকেনা, বরং তার স্বরূপ বোঝা যায় ইঙ্গিতময় বাক্য প্রয়োগে। এখানে তাই ইঙ্গিত স্পষ্ট। দৃশ্যটা যেহেতু শ্মশানের এবং গন্তব্য যেহেতু পরপার, তাই স্বাভাবিক ভাবে নৌকা পারাপারের মাঝির উল্লেখ নেই। পারাপার করা যাবে কিনা তাও স্পষ্ট নয় আর সেই জন্যই তো মাঝি রইলো মাঝ দরিয়ায়, নৌকা তবু ঘাটে। আগুন লাগার হাট যে শ্মশান সেখানে স্বাভাবিক অথবা অস্বাভাবিক (অর্থাৎ ট্রামে বসে স্বাভাবিক মৃত্যু অথবা ট্রামের ধাক্কায় অপঘাতে মৃত্যু) ভাবে মরা যে লোকই আসুক তার গন্তব্য কোথায় কেউ জানেনা। তাতে আসলে প্রহেলিকা, স্বাভাবিক ভাবে কোনো মাঝি তাকে নৌকা করে ওপারে নিয়ে যাবে না।

শুধুমাত্র ধাঁধাময় বা প্রহেলিকাপূর্ণ গন্তব্য পথের কথা বলেই কবি শেষ করেন নি। এই অপূর্ব প্রহেলিকার গল্প বলার ভঙ্গিটিও পাদপূরক কোনো কোনো শব্দ বন্ধে স্পষ্ট। সেখানে শুধু লোকধ্বনি অনুরণিত হয় সাস্থনার স্বরে—

১.৮.৫ শঙ্করে জাদু গাঁয়ের মাধু পান্ডাপুরুত পোলা
অফিস ছুটি বাবুরা ছোট: ঘাটের আসর খোলা
ও হো হো: হো।^{২০}

ঘাটের আসরে গাঁয়ের গাঁয়ের ভেদে মুছে যায় লোকচেতনা আর লোকধ্বনির অনুরণনে। কবিতা যে লোকধ্বনির প্রয়োগে কত ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে তা অম্বয়ী লোকাভরণ শৈলীতে লেখা এই কবিতাটি পড়লেই বোঝা যায়।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় লোকাভরণ শৈলী প্রয়োগের গুরুত্ব ও মর্ম বোঝা যায় এইসব কবিতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে। বলাবাহুল্য, কবিতা সমগ্রের সব কবিতাই লোকাভরণ শৈলীতে রচিত নয়, তা সম্ভবও নয়। তবে এই নিয়ে সন্দেহ নেই যে তাঁর অনেক বিশিষ্ট কবিতাই লোকাভরণ শৈলীতে রচিত। কোথাও তা বাক্যাম্বয়ী, কোথাও বা পদাম্বয়ী, কখনও তা পাদপূরক অথবা অবধারক লোকাভরণ শৈলীকে আশ্রয় করেছে, আবার ভাবাম্বয়ী লোকাভরণ শৈলী প্রয়োগেরও দৃষ্টান্ত রয়েছে। অম্বয়ীর মত অনম্বয়ী লোকাভরণ শৈলীতে রচিত কবিতাও তাঁর রচনায় রয়েছে। প্রসারিত লোকচেতনার শিল্পরূপদানে এই শৈলী বিশিষ্টতা লাভ করেছে।

চার

‘আপন লোকের ঘর’

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় লোকচেতনের দোলা অনুভব করা যায়। চেতন্য সেখানে চেতনার শুকতারা হয়ে নির্ভুল দিকচিহ্ন রচনা করে। তাই লোক আর লোকজগৎ সেখানে মেশামেশি হয়ে থাকে। লোকমনের চিরন্তন অনুভবগুলো স্তরে স্তরে বর্ণায়িত হয় তাঁর কবিতায়। লোকধারণা লোকভাবনার অনুসঙ্গ রচনা করে শব্দার্থের স্তর বিন্যাসে। কবি যে বিশ্বময় ভ্রমণ করেছেন সেটা যেমন স্পষ্ট হয় বারবার। বিশ্ব ভ্রমণের নানা কথা, চেনা লোকের মুখভঙ্গি প্রভৃতি সবই যেন তাঁর কবিতার স্তর থেকে স্তরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম দিকের ‘খসড়া’ (১৩৪৫) কাব্যে লোকের কথা বারবার শোনা যায়; এই কাব্যে লোকচেতনারই খসড়া রচনার কাব্যপ্রয়াস। পরবর্তী ‘একমুঠো’ (১৩৪৬) কাব্যের নামহীন তিনটি ভাগে সে খসড়া নতুনতর রূপ পায়। ‘খসড়া’ ছিল বিভাজনহীন। লোকবীক্ষণের আশ্চর্য একজগৎ এই বিভাজনশূন্য কাব্য কথায় যে পরিধি রচনা করেছে তা পরবর্তী কাব্যেও বিভাজিত কাব্যকায়ার স্তরে স্তরে মূর্ত হয়েছে। সেই জন্য ‘এক মুঠো’ কাব্যে রয়েছে তিনটি ভাগ বা তিনটি ভাবের স্তর বিন্যাস। ‘রামায়ণ’, ‘গম্ভব্য’, ‘সঙ্গৎ’ ‘সংসার’ প্রভৃতি ১৫টি কবিতা তার প্রথম স্তর। ‘চেতন স্যাকরা’ ‘মহা পৌরুষ’ ও ‘প্রাগতিক’ নিয়ে তার দ্বিতীয় স্তর এবং ‘যুদ্ধের খবর’ শীর্ষক একটি কবিতার তৃতীয় ভাগটি তাঁর তৃতীয় স্তর।

খসড়া কাব্যে ‘লোক’ শব্দটির প্রয়োগ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং বহুগুণিত; একমুঠো কাব্যে তা লোকায়তিক স্তরবিন্যাসে ব্যাপ্ত। ফলে সেই বহুগুণিত লোকাভাস সূক্ষ্মতর হয়ে উঠেছে। প্রথম থেকেই লোকমন ও লোকঐতিহ্য তাঁর কাব্যের আশ্রয় হয়ে ওঠে। এই দুই কাব্যে লোকসঙ্গ মনে রাখার মত বৈশিষ্ট্য রচনা করেছে :

- ২.১ দরজায় সাড়া, ঘরে আনি
 চেনা লোক। চেয়ারে বসাই
 কথা শুনে যাই :

—(পরিধি/খসড়া)

- ২.২ রঙিন প্রাণকে ভোলাও, ভুলো
 কাঁচের জলের আয়না :
 হাসির কথায়, লোকের বিজ্ঞভাবে
 —(পুকুর/খসড়া)

ওপরের তিনটি উদাহরণেই লোকের চলা, চেনা লোকের কথা ও বিজ্ঞ লোকের কথা বিশেষ বিশেষ লোকভঙ্গিমার দ্যোতনা বহন করছে। পদাঙ্কয়ের 'ডঙ্গিও' লক্ষ্য করার মতো। এই কাব্যে 'হাসপাতাল' ও 'অতিআধুনিক' কবিতা দুটি পড়লে বোঝা যায় লোকচেতনা ও লোকমন কীভাবে ঐতিহ্যবিস্তারী হওয়ার পথ সন্ধান করে। সেজন্য লোকযাত্রায় হিজিবিজি লোকের ভিড় :

২.৪ সবজিমণ্ডির হিজিবিজি ভিড়ের লোক, ডুব ডুব
বাজায়, কেউ হাঁকে মুলো, শর্যে, কাঁকায়;

—(সঙ্গৎ/একমুঠো)

আসলে ভিড়ে লোকরঙ্গের ছবি ফুটেছে এই কবিতায়। 'খসড়া' থেকে যে তিনটি উদাহরণ দিয়েছি তা ছিল লোককথন ও লোকভঙ্গির এবং 'একমুঠো'র এই উদাহরণটি হল লোকরঙ্গের। পাশাপাশি 'খসড়া'-র 'হাসপাতাল' ও 'একমুঠো'-র 'চেতন স্যাকরা' কবিতাদ্বয়ের তুলনা করলে লোকচেতনার মাত্রাটা বোঝা যায়। 'খসড়া'-র 'চলতি বিজ্ঞান', 'অতি-আধুনিক' 'স্মারক' প্রভৃতি কবিতায় লোকচেতন্যের আভাস রয়েছে। 'মেডিকেলতত্ত্ব' 'পাভলভ' 'চলতিবিজ্ঞান' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগে কবির বিজ্ঞান চেতনার সঙ্গে লোকবিজ্ঞানচর্চার মিশ্রণ ঘটেছে।

অতি-আধুনিক বলতে যা বোঝায় তাকে উন্টে দেখলে সব শেষের সবদেশের বলে চেনা যায় বলেই কবি লেখেন—

২.৫ উলটিয়ে দেখো।
মন, যা সব শেষের
সর্বদেশের
তাতেই উহা ইতিহাস।^{২২}

এই ভাবে লোকমন লোকইতিহাস রচনা করে, লোকমনের ধারণ এই অতীত - ভবিষ্যতের ঠাসবুননে :

২.৫.১ মনের আনাগোনা,
অতীত রয় ঠাস-বোনা।
শুরু এখান হ'তে
চলো ভবিষ্যতে।

২.৫.২ আধুনিকের কাব্য
সামনে খোঁজে অভাব্য,
ভিস্তি, মনের ধারণ—^{২৩}

এই মনের ধারণা চলতি বিজ্ঞানে অর্থাৎ যাকে বলে লোকবিজ্ঞানে :

২.৬ কেমন ক'রে কী হচ্ছে
একান্ত দেখব তাই
দেখতে-দেখতে পৃথিবীর মর্ম কাজের গড়ন
ধরণ,
বরণ,
মরণ,
হঠাৎ ঝলসে উঠবে—ও কী?^{২৪}

লোকবিজ্ঞান এই একান্ত দেখার চেষ্টা নানা প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি, তবুও বোঝা ও না-বোঝার স্তরভেদ—মুছে যায় না। কবি তাই লেখেন :

২.৬.১ তখন বুঝেছি, না বুঝেও হঠাৎ বুঝেছি যেন?

বুঝেছি, পারব কি বুঝতে

খুঁজতে - খুঁজতে ...

—কী ?

শুধু কেমন ক'রে নয়, কেন? ২৫

কবি যাকে চলতি বিজ্ঞান আখ্যা দেন তা আসলে লোকমনের অনুসন্ধিৎসা, একান্ত ভাবে জানতে ও দেখতে চাওয়ারই ফল। লোকমন জানতে, দেখতে, ও বুঝতে চায় ঠিকই, তবে জানার পরেও যে অনেক অজানা থেকে যায় সেটাও সত্য। তাই লোকমনের জানার চেষ্টা ও আপাত অসন্তোষ প্রবাদের রূপ ধরে :

২.৭ না বুঝে ছিলাম ভাল

আধেক বুঝে পরান গেল।

এই লোকপ্রবাদের স্পর্শ অনুভব করা যায় চলতি বিজ্ঞান কবিতায়। আবার ‘পারাপার’ কাব্যের ‘মার্কিনি কবিতায়’ কবি লেখেন

২.৮ হঠাৎ চেনা হাওয়া বুকে বয়ে ছিলো,

জানিনি, জানিনি,

আজও কি জানি সে জানা কাল আনিনি।

অমিয় চক্রবর্তী বিজ্ঞান সচেতন কবিমনের অধিকারী ছিলেন বলেই বিজ্ঞান চেতনা তাঁর কাব্যে বিশেষ দ্যোতনা সৃষ্টি করে। ‘স্মারক’-এর মতো অনেক কবিতায় তার পরিচয় রয়েছে :

২.৮ খুঁজেছি জড়কে, প্রাণকে, মনকে,

সবমিলে আপনাকে

জেনো, সস্তার স্বামী

মানুষ, বহুযুগের আগামী।

অথবা ‘খসড়া’-র ‘বকযন্ত্র’ কবিতাতেও লোকবিজ্ঞানের অভিনিবেশ লক্ষ করা যায় :

২.৯ জড় সেখানে হয় জীবন

সেই খোলো আস্তরণ,

চামড়া।

জড় থেমে জীবন, জীবন থেকে মন, মন থেকে ভাবনা, এবং সেই ভাবনাই বুদ্ধির নাট্য রচনা করে—

২.৯.১ বুদ্ধির নাট্য হবে মাথায়

তারি আসন-পাতায়।

লোকমনের কাছে যা কিছু দুর্বোধ্য, তা উদ্বেগ রচনা করে মনে। তবুও উদ্বেগ জয়ের জন্য বুদ্ধির নাট্য রচিত হয়। সে নাট্যরঙ্গে লোকবিজ্ঞানের সহযোগী হয় লোকভাবনা এবং আরও অনেক কিছু—

২.৯.২ জীবন যেখানে হয় মন

সেই খোলো আবরণ

ভাবনা।

স্বপ্নে, জাগায়, কাজে

প্রাণ হল মননায়িত;

জীবন, তার সংরক্ষণ,

লোকমন সংরক্ষণ চায় শুধু জীবনের নয়, লোকচেতনা তথা ঐতিহ্যের। লোকবিজ্ঞানের অনুমুখে কবি যে লোকচেতনার আভাস দেন তা লোকঐতিহ্যের বিস্তারী রূপে তাঁর কবিতার শিল্পসুখমা রচনা করে মাত্র।

ফলত লোকবার্তা লোকচেতনার রূপধরে। তখন বোঝা যায় ‘চেতন স্যাকরা’ কবিতাটির তাৎপর্য। খসড়া-র ‘হাসপাতাল’ ও ‘একমুঠো’-র ‘চেতন স্যাকরা’ যে লোকচেতনার কাব্যময় প্রকাশ তা স্তরাস্তরিত হয়েছে পরবর্তী কাব্যগুলিতে। ‘মাটির দেয়াল’ (১৩৪৯)-এর ‘রুদ্র কামার’ ‘অভিজ্ঞান বসন্ত’ (১৩৫০)-এর ‘সংগতি’ ‘হরেকৃষ্ণের যুক্তি’, পারাপার (১৩৬০)-এর ‘সাবেকি’, ‘লোকাযত’ প্রভৃতি অঙ্কশ কবিতায় তার উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে।

পাঁচ

‘নতুন পৃথিবী চেতনায়’

লোকমন ও লোকভাবনা অমিয় চক্রবর্তী কবিতায় লোকচেতন্যের আধার রচনা করেছে। কেমনভাবে ঘটেছে তা বোঝা যাবে সুনির্দিষ্ট ও পূর্বে উল্লেখিত কবিতার বিশ্লেষণে।

‘চেতন স্যাকরা’ অমিয় চক্রবর্তীর একটি অতি পরিচিত ও বিশিষ্ট ভাবময় কবিতা। ‘এক মুঠো’ কাব্যের দ্বিতীয় ভাগে যে তিনটি কবিতা রয়েছে (যেথা চেতন স্যাকরা, মহা-পৌরুষ ও প্রাগতিক) তার প্রথম কবিতাটির শিরোনামটি লক্ষ করার মত। এই শিরোনাম শুধু একটি কবিতার নয়, লোকচেতনার এবং বলা যায় লোকমনেরও।

‘খসড়া’-র ‘হাসপাতাল’ কবিতাটির সঙ্গে ‘চেতন স্যাকরা’ কবিতাটির তুলনা করলে লোকচেতনার স্বরূপ বোঝা যায়। ‘হাসপাতাল’ কবিতায় রয়েছে ‘চেতনার দাম কত’ এবং শানের ঘরে প্রাণের টানাটানি পদগুচ্ছ। ‘হায়রে চেতনা’ পদগুচ্ছের বন্ধনীভুক্ত ব্যবহার এবং তার পূর্নব্যবহার লক্ষণীয়। দেওয়ালের একপাশে রাস্তার চিৎকার অন্যদিকে রুগ্ন কান্না অর্থাৎ হাসপাতালে প্রাণের টানাটানি। রুগীদের আত্মীয়রা এই দুই জগৎ দেখে আর ভাবে :

৩.১

চেতনার দাম কত ভাবে

বড়ো ডাক্তারের ফি ষোলো টাকা

(হায় রে চেতনা) (ওষুধের শিশি কৌটো রাশিরাশি)

এই ভাবে বন্ধনীভুক্ত ‘হায় রে চেতনা’ কবিতাটিতে শৈলীগতভাবে তিনবার ব্যবহৃত। হাসপাতাল-চিত্র এই ‘হায় রে চেতনা’ পদগুচ্ছের ত্রিমাত্রিক ব্যবহারে চেতনা নির্ণায়ক হয়ে ওঠে। চেতনার দাম, রোদ্দুরে উড়ন্ত চিলের মত আকাশে চেতনার মুক্তি ও চেতনাসম্মানী ক্লান্ত রোগীর চেতনাহীনতা বা ভাষান্তরে ‘হায় রে চেতনা’ সেই ত্রিস্তর চেতনার স্তর রচনার প্রয়াস।

‘চেতন স্যাকরা’ কবির সেই চেতনারই লোকমূর্তি লাভ করেছে। কবিতাটি শ্রোতা সম্ভাষণ মূলক কাব্যশৈলীতে রচিত। এই বিষয়ে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি।^{২৬} এখানে সংক্ষেপে বলি।

‘চেতন স্যাকরা’ কবিতাটি নোংরা এক গলির বাসিন্দাদের উদ্দেশে এক সোনা ব্যবসায়ীর বা স্যাকরার উক্তি। নোংরাগলির বাসিন্দারাই তার শ্রোতা এবং তাদের উদ্দেশে বক্তৃতা দেওয়ার চণ্ডে চেতন স্যাকরার শ্রোতা-সম্ভাষণ।

‘চেতন স্যাকরা’ সম্ভাষণ-মূলক দীর্ঘোক্তির শৈলীতে রচিত হওয়ায় চেতনা - প্রতিক্রিয়া অনুমিত শ্রোতার উদ্দেশ্য কথিত হয়েছে। দোকান দেহলিতে তার অবস্থান হল গলি বাসিন্দাদের থেকে দূরে এবং কিছুটা উঁচু জায়গায়। চেতন হল একজন চেতনা সম্পন্ন মানুষ। নোংরা গলির বাসিন্দাদের কিম্বাচর্য বাঁচা দেখে, তাদের জীবনকে নরক বানাতে দেখে, চেতন তাদের সোনার মার নেবার

পরামর্শ দেয়, অনুমিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য ছুঁড়ে দেওয়ার ভঙ্গিটি বিমিশ্র বাক্যপ্রকারে স্তবক থেকে স্তবকান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। পেশায় স্যাকরা বলে নিজের পরিচয় দিলেও চেতনের পরিচয় সোনা বানানো থেকে ধ্যান বানানোর ক্ষেত্রান্তরে মুদ্রিত। বিসংগতি ভরা সমাজ পারিপার্শ্বিকে চেতনার আসলে তীক্ষ্ণ এক চেতনা-ঋদ্ধ মনের বাক্যস্পন্দন।

হাসপাতাল অথবা নোংরা গলি উভয় ক্ষেত্রেই চেতনার সংকট লক্ষ করে কবি চেতনা ও জাগানোর কাজটায় গুরুত্ব দিতে চান। হাসপাতালে সেই চেতনা জাগানোর মূল্য অনেক আর নোংরা গলিতে সোনার তাল ছুঁড়েও বাসিন্দাদের ধ্যান বানানোর কর্মে উৎসাহ দেওয়াও অনুরূপ মূল্য দাবি করে।

চেতনার সংকটকে হাসপাতালে প্রাণের টানাটানি আর নোংরা গলির বাসিন্দাদের কিম্বদন্তি জীবনচরণের প্রেক্ষাপটে কবি তুলে ধরেন সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি কাব্যশৈলীতে। এই চেতনা সংকট নানা ভাবে ও ভাষায় অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় রূপ পেয়েছে। কবির নতুন পৃথিবী সন্ধান করা, তাই এই হাসপাতালের রুগ্নতা, গলির নোংরামি অথবা যুদ্ধের খবর তাঁকে বেদনা দেয়।

৩.২ আনলে তুমি বেদনায়
নতুন পৃথিবী চেতনায়^{২৭}

এই নতুন পৃথিবী সন্ধানে তাঁর কবিতায় লাগে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের স্পর্শ, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের শিহরণ ও লোকমনের বহুবর্ণ সংলাপ। ‘মাটির দেয়াল’ কাব্যের শুরুতে কবি লেখেন—

৩.৩ দুদগু রাস্তার লোককে ডাকতে
মাটির আঁচড় কাটা এই মাটির দেয়াল^{২৮}

এই কাব্যে কবি চেয়েছেন আখর আঁকতে—মাটির আঁচড়ে, রাস্তার লোক, পথের লোক অথবা পথ তাই এই কাব্যে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। এই বিশিষ্টতার অর্থ কবির লোকচেতনার নতুনতর কাব্যরূপায়ণ। অর্থাৎ যে লোক ও লোকমনের কথা ইতিপূর্বে কবি বলেছেন তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে লোকচেতনা অথবা লোকঐতিহ্যের অভিপ্রকাশে।

‘রুদ্র কামার’ কবিতাটিতে লোকচেতনার সঙ্গে মিশে আছে মহাজাগতিক সচেতনতা। এই কবিতাটির তিনটি ভাগের তিনটি সহশিরোনাম দেওয়া হয়েছে এই রকম—হাতুড়ি, আগুন ও মাটির মানুষ। প্রথমটিতে আছে বিশ্বধাঁধার ছবি :

৩.৪ বিশিষ্ট-ছাঁদ শৃঙ্খলে বাঁধা
 বিশ্বের ধাঁধা :
 কঁদা,
 প্রত্যহ হাসা আর ভাষা। ১৯

এই বিশ্বধাধার উত্তর নেই। তাই কবি বন্বন্ব অগ্নির আর হাতুড়ির সৃষ্টির উল্লেখ করেন মাত্র। এই হাতুড়ির অর্থ বোঝা যায় আগুনের মহাজাগতিক রূদ্র কামারের উল্লেখে—

৩.৪.১ লাল আগুন। হরো দাহ বহুশ্রুণ।
আমার রুদ্র পরম কামার
ধ্বংসক জ্বালালেন, তিনিই জ্বালেন
বস্তুকারা কে। স্বস্তিধারা কে রাখে।

মাটির মানুষ দেশে দেশে অগ্নি দেখে মুগ্ধ হয়,^{৩০} কারণ :

৩.৪.২ বন্ বন্ বন্ বন্ : দেশে-দেশে অগ্নি—
নাচে মুক্তির প্রাতঃভঙ্গী।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রয়োগে অগ্নির নৃত্যধ্বনি যখন স্পষ্ট শোনা যায় তখন লোকমনে তার যে প্রতিক্রিয়া হয় তা মাটির মানুষের উজ্জ্বল প্রতিধ্বনিত হয় :

৩.৪.৩ অপূর্ব শোভা। বহ্নিত যুদ্ধ, তব প্রভা।
 তীর মূর্ছিত মাটিতে নিলাম দুশ্ববুকের তলে নাম
 কী শোভাতোমার
 লক্ষ জ্বলন্ত উপমার।
 ভাঙাপথ রাজা পথ এ জগৎ
 হাহাকার দাবালন' বলমল ভগ্নি'
 মৃত্যুলগনে গড়ে; লগ্নী'^{১১}

দেশে দেশে রুদ্র কামার বস্তুকারায় আগুন জ্বালেন আর তার তীর শোভায় ভাঙা পথে রাজাপথে এ জগৎ হাহাকারময় দাবালনের রূপ ধরে। লোকমনে এই রুদ্র পরম কামার, শিবরূপী রুদ্রকামার লোকমনে সহজ আসনে স্থিত।

‘রুদ্রকামার’ কবিতায় যে লোকসাঁধার আভাস আছে মহাজাগতিক চেতনার সংযোগ তারই আরও এক কাব্যরূপ হল ‘উদ্ভট’ কবিতাটি। এই কবিতায় কবি বলেছেন বনবন্ ঘুরচে বিশ্বের লাটু। চকচকে নীল শূন্যের মেঝেতে মর্ত্য লাটিমে মানুষ ঘোরে, তবুও লোকমনে লোকজীড়ার ইচ্ছা জাগে—

৩.৫ অঙ্গুলি মন-ময়—
 খেলা ঘোর তন্ময়
 কী ইচ্ছা পাঠাই—
 লাটিমে থেকেও ধরি লাটাই।^{১২}

এই ভাবেই মহাজাগতিক চেতনা লোকবিজ্ঞান ও লোকজীড়ার উপাদানে কাব্যরূপ ধরে, সেখানে লোকমনের বিস্তার ও ব্যাপকতার স্বরূপে ধরা পড়ে। সে লোকমনকে শত শতাব্দীর সময় পরিধি বেয়ে কবি চিনে নেন—

৩.৬ শত শতাব্দীর
 তরু-বনশ্রী—
 নির্জন মনশ্রী।^{১৩}

সেই মনই তো লোকজীবনের নানা স্মৃতি সঙ্গ আর লোক সঙ্গীতের সুর বহন করে—

৩.৭ গাঙে স্রোতে, ভাটিয়ালি, কীর্তন দেউল মুর্সিদ্যার বাড়ি
 ওপারে যাবো কেমনে?
 (চিরদিন বাইলাম মনে গো)
 হাটের ধারে ঘাটের নাও; লণ্ঠন-ঝোলানো গরুর গাড়ি
 ছায়ায় ছায়া একে চলে।^{১৪}

পদাঙ্কীয় লোকভরণ শৈলীতে বিচিত্র লোকশৈলীতের কথা ব্যক্ত হয়েছে; তার সাথে বাক্যসময়ে ওপারে যাবার মনোবাসনাও যুক্ত। তার অতিরিক্ত একটি মাত্রা হল বন্ধনীভুক্ত বাক্যে লোকমনের চিরআকৃতির বাক্যময় রূপ। বন্ধনীভুক্ত বাক্যে অন্তর্মনের ভাবপ্রকাশ অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার একটি শৈলীগত বৈশিষ্ট্য। সেই শৈলী লোকভরণ শৈলীর রূপ ধরেছে নিহিত লোকোপাদনের ব্যবহারে। অনেক সময় ব্যঙ্গ কৌতুকের সুরেও মেশে লোকমনের বিমিশ্র ভাব ও ভাবনা :

৩.৮ প্রভুর পদে সেলাম ঠুকে, মানৎ দেবার জোরে
ভাগ্য চাকা ঘুরের কিছু? —ঘুরের নেশার ঘোরে।

মানৎ দেবার লোকবিশ্বাস, ভাগের চাকার ঘোরার বিষয়ে প্রশ্ন লোকমনেরই নানাদিক মাত্র।
লোকমন চিরন্তন, চির নতুন পৃথিবীর পথে।

ছয়

‘লোকালয়ের নিজস্ব কবি’

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় বন্ধনীভুক্ত বাক্য প্রয়োগের যে বাক্য প্রযুক্তি দেখা যায় তা আসলে
অন্তর্মনের ভাবনা প্রকাশক এক শৈলী। লোকমনের গভীরে থাকা অস্ফুট অনুভূতিকে ভাষাদানই
কবির উদ্দেশ্য। ফলে অনেক সময় বাক্যকে বন্ধনীভুক্ত না রেখে দ্বৈতবাক্য সমাহারে নিত্য
বিপরীতকে বাক্যে অস্ফুট বা অর্ধস্ফুট রাখেন। প্রত্যক্ষভাবে বন্ধনীভুক্ত করার বদলে ভাবকে অদৃশ্য
বা অর্ধস্ফুট রাখার এই পদ্ধতি লোকাভরণ শৈলী প্রয়োগ বৈচিত্র্য এনে দেয়। কবি যখন লেখেন—

৪.১ কোথায় চলেছে পৃথিবী।

আমারও নেই ঘর

আছে ঘরের দিকে যাওয়া।^{৩৬}

তখন বিপরীত বাক্য সমাহারে উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন যাত্রার কথাই শোনা যায়। পৃথিবী ও
মানুষের এই একই লক্ষ্যহীন যাত্রার তথা আবর্তনের কথাও অশ্রুত থাকে না। এই উদ্ভট যাত্রার
আভাস রয়েছে লোকপ্রবাদেও :

৪.২ ঘর কাছে দুয়ার দূর।

বিপরীত ভাবদ্বন্দ্বে পূর্ণ এই ধরনের বাক্য প্রযুক্তি লোকবাক্যে তথা প্রবাদে প্রচুর রয়েছে।
এই ধরনের বাক্যপ্রযুক্তি অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাতেও প্রচুর রয়েছে। যেমন—

৪.৩ কাকে চাই তা চাওয়ান তিনি সৃষ্টি দিয়ে,
জানান হঠাৎ রোদের বেলা বৃষ্টি দিয়ে।^{৩৭}

আবার অন্য একটি কবিতায় কবি লিখেছেন—

৪.৪ বলো নেই, নেই
শূন্য যে সেই—
পারো যদি মন,
বোঝাও মনকে।^{৩৮}

আপাত হেঁয়ালি-ভরা এই ধরনের বাক্যসংযোজনায় বিরোধের মধ্যেও সংগতিভাব রয়েছে।
লোকপ্রবাদে যেমন বলা হয়েছে—

৪.৫ দেবার যিনি দিলে, —
আপনা আপনি মিলে।

এই বাক্যে ‘কাকে চাই তা চাওয়ান তিনি সৃষ্টি দিয়ে’ (৪.৩) ইত্যাদি বাক্যের প্রতিধ্বনি শোনা
যায়। বস্তুত, লোকজগতের সংগতি ও বিসংগতির সমন্বয়কে কবির কাব্যে এইভাবেই প্রকাশিত
হতে দেখা যায়।

‘অভিজ্ঞান বসন্ত’ (১৩৫০) কাব্যের দ্বিতীয় ভাগের শিরোনাম ‘সূর্যখণ্ডিত ছায়া’। এই শিরোনামে
যে বিপরীতের ভাব লুকিয়ে আছে তা এই ভাগের প্রথম কবিতা ‘সংগতি’-তে আশ্চর্য কাব্যরূপে

পেয়েছে। শুধু এখানেই নয়, ‘সংগতি’ শীর্ষক আরেকটি কবিতা রয়েছে ‘পুষ্পিত ইমেজ’ (১৩৭৪) কাব্যে। দুটি কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ করার মত। তবে তা বিস্ময়কর নয় এইজন্য যে এই সংগতি সন্ধান, বৈপরীত্যের এই মিলন কেন্দ্রে পৌছানোর চেষ্টা কবির কাব্যে বারংবার অনুরণিত। ‘পুষ্পিত ইমেজ’ কাব্যের ‘দ্বৈত’ কবিতায় কবি পাথর জলের জ্বাবানীতে দুই প্রেমিক সত্তার প্রাণের ভাষাকে কাব্যরূপ দিয়েছেন। জল খুঁজছে পাথরকে কেননা তার চৈতন্যে শিলা বাজে, আর সেই কথটাই প্রিয় পাথরকে সে জানায়। পরিবর্তে প্রিয়জনের উদ্দেশে পাথরের প্রশ্ন—

৪.৬ হে জল
কেবলি বিচ্ছেদ, অচির মিলন
অঙ্গে-অঙ্গে পরিশীলন—
কবে
রৌদ্রে সমুদ্রে দুজনার সত্তা এক হারে?^{৩৯}

প্রেমের কবিতা হলেও দ্বৈতসত্তার মিলন সন্ধান বা সংগতি কামনাই এখানে মুখ্য। এই ভাবটি ‘পুষ্পিত ইমেজ’র ‘সংগতি’ কবিতাতেও রয়েছে। ১৯৬৭ সালে লেখা এই কবিতাটি এবং ‘অভিজ্ঞান বসন্ত’ কাব্যের ‘সংগতি’ রচনার কালগত ব্যবধান প্রায় পঁচিশ বছর। তথাপি যে সংগতি সন্ধান জনিত আর্তি কবি সত্তার মধ্যে নিহিত তা অন্যান্য অনেক কবিতার মত এই দুটি কবিতাতে ধ্বনিত।

১৯৬৭ সালে লেখা ‘পুষ্পিত ইমেজ’ কাব্যের সংগতি কবিতায় কবি লেখেন প্রেমের কবিতার চণ্ডে—

৪.৭ বসন্ত সৌরভ
বৈরাগ্য পবনে মিশেছিলো,
দুটি ফুল সে-লগনে
 দেখা দিলো;
 প্রাণের গৌরব
এদিনের জীবনে-মরণে
 আন্দোলনে
সেই তো দুজনে বহি ক্ষণে-ক্ষণে।^{৪০}

‘সংগীত’ এখানে বৈপরীত্যের সমাহার। এই সমাহারকে লোকচেতনার আলোয় কবি দেখেছিলেন পঁচিশ বছর আগে রচিত ‘সংগতি’ কবিতায়।

৫.১ মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর
 পোড়ো বাড়িটার
 ঐ ভাঙা দরজাটি
 মেলাবেন।^{৪১}

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রথম স্তবকে ঝোড়ো হাওয়া ও পোড়ো বাড়িটার ঐ ভাঙা দরজাটি যে তিনি মেলাবেন তা জোর দিয়ে বলা হয়েছে। মেলাবেন, তিনি মেলাবেন পদগুচ্ছে ক্রিয়াপদের দ্বিভূত প্রয়োগ ঘটলেও তা এক শৈলীগত বিশিষ্টতা লাভ করেছে। প্রথম চরণে বলা হয়েছে ‘মেলাবেন তিনি’ পরে শেষ চরণে বসেছে ‘মেলাবেন’। সমগ্র কবিতাটি যেহেতু আট স্তবকে রচিত ‘মেলাবেন তিনি মেলাবেন’ পদগুচ্ছটি ৮ বার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রথম স্তবকে ‘মেলাবেন তিনি’ ও ‘মেলাবেন’ প্রথম ও শেষ চরণে পৃথক ভাবে বসেছে।

তারপর এই পৃথক ভাবে না বসে পাশাপাশি একত্র বসেছে (অর্থাৎ মেলাবেন তিনি, মেলাবেন) চতুর্থ ও অষ্টম স্তবকে বাকি স্তবকগুলির শেষে কেবলমাত্র ‘মেলাবেন’ কথাটি বসেছে। নিচের ছকটি থেকে বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যাবে।

স্তবক	শব্দ বা শব্দগুচ্ছ	ব্যবহার শৈলী
১ম	মেলাবেন	বাক্যের প্রারম্ভে ব্যবহৃত
২য়	মেলাবেন	ঐ
৩য়	মেলাবেন	ঐ
৪র্থ	মেলাবেন, তিনি মেলাবেন	১ম স্তবকের ব্যবহার শৈলীর বৈপরীত্য
৫ম-৭ম	মেলাবেন	২য়-৩য় স্তবকের ব্যবহার শৈলীর পুনর্ব্যবহার
৮ম	মেলাবেন তিনি, মেলাবেন	৪র্থ স্তবকের ব্যবহার শৈলীর পুনর্ব্যবহার

দেখা যাচ্ছে, ১ম স্তবকে যে শব্দগুচ্ছ ভেঙে দুটি পৃথক একক রূপে বসান হয়েছে পরবর্তী দুটি স্তবকে (২-৩য়) তারই একটিকে পৃথক একক রূপে দুবার ব্যবহার করা হয়েছে। চতুর্থ ও অষ্টম স্তবকে দুই শব্দ-একক পাশাপাশি বসে একত্রিত এবং অখণ্ডিত হয়ে রয়েছে। মাঝে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকের অনুবর্তন ঘটেছে পঞ্চম থেকে সপ্তম স্তবকে। যে সংগতি ও বিসংগতি কবিতাটির মূল বিষয় তা প্রধান শব্দ বা শব্দগুচ্ছের ঐক্য ও বিভাজনে ইঙ্গিতময় হয়ে উঠেছে।

শব্দ ব্যবহারের শৃঙ্খলা শুধুমাত্র মেলাবেন তিনি মেলাবেন মূলপদগুচ্ছই রয়েছে এমন নয়। কবি শব্দ ব্যবহারের এই শৃঙ্খলাকে অন্যভাবেও প্রকাশ করেছেন। কবি ঝোড়ো হাওয়া আর ভাঙা দরজাটার বৈপরীত্য ও সহাবস্থানকে স্তবকে স্তবকে ভিন্নভাব ও ভাষায় প্রকাশ করেছেন এই ভাবে—

স্তবক	বাক্য/বাক্যাংশ
১ম	ঝোড়ো হাওয়া আর পোড়ো বাড়িটার
২য়	বন্যার জল, তবু ঝরে জল
৩য়	ক্ষুধা ও ক্ষুধার যত পরিণাম
৪র্থ	জীবন, জীবন-মোহ
৫ম	প্রাণ নেই তবু জীবনেতে বেঁচে থাকা
৬ষ্ঠ	যত কিছু সুর যা কিছু বেসুর বাজে
৭ম	কেন কিছু আছে বোঝানো, বোঝা না যায়
৮ম	সমাজ ধর্মে আছি বর্মেতে আঁটা

ভিন্নভাব সঞ্চারণের যে আটটি প্রধান সূত্র উদ্ধার করা হয়েছে তার ব্যবহারগত তথ্য ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত। প্রতিপাক্ষিত অব্যয় যত আছে প্রসঙ্গসূচক অব্যয় তত নেই; আবার থাকলেও প্রসঙ্গসূচক ছিঁ নেই। কবি যেভাবে বিপরীত ভাবের বন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন তাতে এইসব অব্যয়ের বাক্যগত যথাযথ প্রয়োগ জরুরি হয়ে ওঠেনি। কারণ বিপরীতভাব ও তার পাশাপাশি সহাবস্থান ঘটানোর প্রয়াসে কবি প্রবাদে বাক্য প্রযুক্তি প্রয়োগ করেছেন। দেবার যিনি দিলে আপনাআপনি মিলে—এই ধরনের অন্তর্মিল যুক্ত প্রবাদে মত ছোট ছোট পদসমষ্টি বা ভাবগত একক (ইউনিট) তার একটা প্রধান দিক।

‘বন্যার জল তবু ঝরে জল’, ‘যত কিছু সুর, যা-কিছু বেসুর বাজে’, ‘সমাজ-ধর্মে আছি বর্মেতে আঁটা’, ‘প্রাণ নেই তবু-জীবনেতে বেঁচে থাকা’ প্রভৃতি পদগুচ্ছ বা বাক্যাংশে প্রবাদধর্মী বাক্য প্রযুক্তিই

চোখে পড়ে। প্রবাদের বাক্য-প্রযুক্তির সঙ্গে যেমন লোকাভিজ্ঞতা বা লোকবিজ্ঞানের সংযোগ দেখা যায়, ‘সংগতি’ কবিতার বাক্য প্রযুক্তিতেও তার আভাস স্পষ্ট।

লোকবিজ্ঞান আর বিজ্ঞানের পার্থক্য রয়েছে আবার সাদৃশ্যও রয়েছে। বিজ্ঞান-গবেষণার প্রধান দিক হল বিশেষ বিশেষ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বা কলাকৌশলের প্রয়োগে এবং গবেষণাগারের উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে গবেষণা কার্যের অগ্রগতি ও সাফল্য। লোকবিজ্ঞান এই দিক থেকে বিজ্ঞান সাধনার পদ্ধতি থেকে পৃথক। এই গবেষণাগত বা পদ্ধতিগত পার্থক্য বাদ দিলে বিজ্ঞান ও লোকবিজ্ঞানের সাদৃশ্যও কম নয়। লোকবিজ্ঞান বিজ্ঞানচেতনাই অংশমাত্র, তাই লোকবিজ্ঞান সাধারণ বিজ্ঞানের মতই দুটি প্রধান বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। যথা—

১. পর্যবেক্ষণ

২. পরীক্ষণ

বিজ্ঞান সাধনায় এই পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা চলে সাধারণ গবেষণাগারে। গবেষণার যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণের সাহায্যে বিশেষ আবিষ্কার বা বৈজ্ঞানিক সত্য যাচাই করা হয়।

লোকবিজ্ঞানের ক্ষেত্র লোকজীবনে বিস্তৃত। তাই বৃহত্তর ও পরিকীর্ণ লোকজীবনই লোকবিজ্ঞানের পরীক্ষাগার। লোকবিজ্ঞান লোকজীবনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে লোকবিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্য পরীক্ষিত হলে একই সত্য প্রমাণিত হয়। তবে লোকবিজ্ঞান যেহেতু লোকসচেতনারই অংশ, তাই তার পরীক্ষা ও সত্যতা যাচাই চলে লোকমনে, মননে এবং সর্বোপরি লোকজীবনে।

লোকবিজ্ঞান যখন প্রবাদের রূপ ধরে তখন লোকে বলে—

১.১ . বেশি খেলে কম খাবে,
কম খেলে বেশি খাবে।

এখানে লোকবিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা দুটোই রয়েছে বলে এই প্রবাদটিকে লোকবিজ্ঞানের প্রবাদরূপ বলা চলে। লোকজীবনের পর্যবেক্ষণে এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরীক্ষণে এই কথার সত্যতা প্রমাণিত।

‘সংগতি’ কবিতায় প্রবাদের প্রয়োগ নেই, কিন্তু প্রবাদ-প্রযুক্তির প্রয়োগ রয়েছে। তাই কবি যখন প্রবাদধর্মী বাক্য প্রয়োগ করেন তখন লোকবিজ্ঞানের স্পর্শ লাগে। সেইজন্য কবি যখন বলেন—

৫.২ বন্যার জল, তবু বারে জল,
প্রলয় কাদনে ভাসে ধরাতল—^{৪২}

তখন লোকবিজ্ঞান-চেতনা লোকপর্যবেক্ষণ এবং লোকাভিজ্ঞতার আলোয় পরীক্ষিত সত্য রূপে মূর্ত হয়ে ওঠে। তার সাথে কবি ‘অকালে আগুনে তৃষ্ণায় মাঠ ফাটার’ কথা যুক্ত করেছেন। বৃষ্টি ও বন্যা বিষয়ে লোকধারণা ‘খসড়া’র ‘বৃষ্টি’র মতো কবিতায় যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে তা যেন এখানে অতিরিক্ত মাত্রা পেয়েছে। বস্তুত ‘বন্যার জল তবু বারে জল’ পদসমষ্টি লোকবিজ্ঞান চেতনারই প্রবাদোপম কাব্যরূপ। এই ধরনের পদসমষ্টি অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় প্রচুর পাওয়া যায়। একদিকে বিজ্ঞাননিষ্ঠ মনের প্রকাশ যেমন ঘটে তাঁর কাব্যে, অন্যদিকে তার সঙ্গে মিশে থাকে লোকবিজ্ঞান চেতনা।

‘বেশি খেলে কম খাবে, কম খেলে বেশি খাবে’ প্রবাদটিও লোকবিজ্ঞান চেতনার আধার তা পূর্বেই বলেছি। ‘সংগতি’ কবিতায় সেই লোকবিজ্ঞান চেতনা কেমন কাব্যরূপ ধরেছে এবারে তা বলব। কবি লিখেছেন—

৫.৩

তোমার আমার নানা সংগ্রাম,
দেশের দেশের সাধনা, সুনাম,
ক্ষুধা ও ক্ষুধার যত পরিণাম।
মেলাবেন।^{৪০}

ব্যক্তি বিশেষের নানা সংগ্রাম দেশের ও দেশের সাধনার পথ ধরতে পারে। ক্ষুধা ও ক্ষুধার পরিণাম বিষয়েও লোকধারণা স্পষ্ট। কেননা স্বাভাবিক ক্ষুধা ও বিকৃত ক্ষুধার ভেদ তার পরিণামগত পার্থক্য এনে দেয়। একইভাবে জীবন ও জীবনের প্রতি মোহ এক নয়। জীবনের ভাষাহারা বৃকে স্বপ্নের বিদ্রোহ যে বৈপরীত্য রচনা করে তার সংগতি এবং সহাবস্থানে কবি আশাবাদী।

জগৎ প্রকৃতির মধ্যে অনেক কিছুই বিসংগতিময় এবং আপাতভাবে অর্থবোধহীন মনে হয়। সঙ্গীহার পাখি কেন ছায়া ঢাকা দুপুরে পাখা মেলে দেয় তা হয়ত বোঝা শক্ত নয়; পাখায় তার নানা রঙ কেন যে আঁকা তা বোঝাও দুরূহ নয়। কিন্তু যখন—

৫.৪

প্রাণ নেই, তবু জীবনেতে বেঁচে থাকা
—মেলাবেন।

তোমার সৃষ্টি, আমার সৃষ্টি, তাঁর সৃষ্টির মাঝে
যত কিছু সুর, যা-কিছু বেসুর বাজে
মেলাবেন।

স্পষ্টত, প্রাণ নেই তবু নির্জীবের মত বাঁচা এবং প্রাণযুক্ত উল্লাসময় বেঁচে থাকা এক নয়, বরং বিসংগতিপূর্ণ। তাই প্রাণহীন বাঁচা গতিময় বাঁচার পাশে বেমানান, বেসুর বাজে। সামাজিক ধনবৈষম্য তথা ধনী দরিদ্রের দুষ্টের ব্যবধান তাই বোধ্য ও অবোধ্য দুটি পৃথক স্তর রচনা করে।

৫.৫

মেটির গাড়ির চাকায় ওড়ায় ধুলো
যারা সরে যায় তারা শুধু—লোকশুলো^{৪১}

এমনভাবে ধনবৈষম্য লোকসমাজে মেকি অথচ নিষ্ঠুর বিভেদের আড়াল রচনা করে। দেবতা যখন মলিন কাঁটা ধরেন তখনও কিছু লোক স্পর্শ বাঁচিয়ে পুণ্যের পথে হাঁটতে চেষ্টা করে। সমাজধর্মই তখন বর্ম হয়ে ওঠে। ঝোড়ো হাওয়া আর ঐ পোড়ো দরজাটির সহাবস্থান চলতেই থাকে।

বিসংগতিকেই কবি লক্ষ করেন সংগতির সূত্র যোজনাতে। সেই জন্য প্রায় পঁচিশ বছর পরে (১৯৬৭) লেখা কবিতায় একই ভাব প্রকাশিত হয়। সেখানেও বসন্ত সৌরভ বৈরাগ্য পবনে মিশে যাবার লগ্নে যে দুটি ফুল ফুটে ওঠে তারা জীবন মরণে আন্দোলনে বৈপরীত্যের সমাহারে প্রাণের গৌরব ঘোষণা করে। বিষয়গত পার্থক্য সত্ত্বেও ‘সংগতি’ শীর্ষক দুটি কবিতাতেই কবির একই জীবন ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। তবে শৈলীগত পার্থক্য রয়েছে।

‘অভিজ্ঞানে বসন্ত’ কাব্যের ‘সংগতি’ কবিতায় লোক চেতনা বিশেষত লোকবিজ্ঞান চেতনার প্রকাশ দেখা যায়। ‘পুষ্পিত ইমেজ’ কাব্যের ‘সংগতি’ কবিতায় অবশ্য এই ভাব ও ভাবনার প্রকাশ থাকলেও লোকাভরণ শৈলীর প্রয়োগ নেই। তবুও বিসংগতিপূর্ণ জগতে সংগতির কথাটাই মুখ্য হয়ে ওঠে। যেমন ‘পালাবদল’-এর ‘বিসংগতি’ কবিতার কবি লেখেন—

৬.১

হোক না যতই মৃদু, তবু
প্রসন্ন মেঘ উগ্র আগুন কোমল কালো
বজ্র হানা।^{৪২}

এই ‘বিসংগতির মধ্যেই সংগতির আবাস কল্পনা করেন কবি। এই বিসংগতির অন্য নাম যদি হেঁয়ালি নাট্য (বা সর্বনাম) তবে তার রচয়িতার অন্য নাম লোকালয়ের নিষ্কম্ব কবি। ‘সংগতি’ কবিতার সেই লোকালয় ও লোকচেতনা ভাষার হয়ে উঠেছে। কবির অন্যান্য কবিতাতেও তার প্রতিরূপ পাওয়া যায়। বিসংগতির তাৎপর্য সুর-বেসুরের সংগতিতে স্পষ্ট হয়।

সাত

‘মেলাবেন তিনি’

প্রশ্ন উঠতে পারে, ‘সংগতি’ কবিতায় কবি যাকে বারংবার ‘মেলাবেন তিনি’ বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি কে? তিনি কি ঈশ্বর? তাহলে কবি অমিয় চক্রবর্তী কি ঈশ্বরবাদী আন্তিক? এই সব প্রশ্নের সহজ উত্তর ছড়িয়ে রয়েছে কবির কাব্যের অন্তরনিহিত লোকচেতনার কাব্যময় প্রকাশে। সেই কাব্যরূপ প্রায়শই লোকাভরণ শৈলীকে আশ্রয় করেছে।

জগৎ সংসারের বৈপরীত্যের বিচিত্র সহাবস্থানকে কবি প্রবাদোপম বাক্য যোজনায় কাব্যরূপ দেন। যেমন—

- ৭.১ মায়ার জগতে তবু বুকভরা মায়্যা^{৬৭}
- ৭.২ কম্পিত পরিধি প্রান্তে; পাশে অসংলগ্ন গম্ভীর বকের
একপা বাড়ানো ধ্যান; মনে একটি মাছ^{৬৮}
- ৭.৩ ধর্মের আগে আরো সে ধর্মে
গোপন মর্মে নিয়ো পদ-ছাপ;
যিনি এসেছেন যুগে-যুগে আসা
শুনে সেই ভাষা^{৬৯}
- ৭.৪ কিছুই না বলে
কী কথা গেলেন তিনি বলে^{৭০}

এইসব উদাহরণ থেকে বোঝা যায় কবি বিসংগতিকে প্রবাদবাক্যের ঢঙে কাব্যরূপ দিতে অত্যন্ত পারদর্শী।

৭.১নং উদাহরণে মায়ার জগতে মায়ারই প্রাচুর্যের কথা বলেছেন কবি। প্রাণের মর্মকে হাসপাতালে শুয়ে হাড়ে হাড়ে চিনেছেন ভাঙা হাড় জোড়া দিতে গিয়ে।

৭.২ নং উদাহরণে প্রবাদ ভেঙে উন্টে দেওয়া হয়েছে বাক্যায়ী লোকাভরণ শৈলীতে। ফলে ‘বক ধার্মিক’ প্রবাদটি দুটি বাক্যের সংযোগে নতুন মাত্রা পেয়েছে।

৭.৩ নং উদাহরণে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের পরিবর্তে যুগবাহিত লোকধর্মই গুরুত্ব পেয়েছে। ‘সংগতি’ কবিতায় উক্ত ‘তিনি’ কে এখানে তার আভাস রয়েছে।

৭.৪ নং উদাহরণে কিছু না বলে কিছু কথা বলার বৈপরীত্য ফুটেছে প্রধানত প্রবাদ বাক্যের ঢঙে। যিনি বিসংগতি ভরা লোকজগতে সংগতি আনেন তার কথাই যেন আভাসিত। রবীন্দ্রনাথের ‘অনেক কথা যাও যে বলে কোন কথা না বলে’ গানটি এখানে মনে পড়া স্বাভাবিক।

বিসংগতি ভরা লোকজগতের ধারণা লোকধারণারই অংশ। তাই লোককামনা এবং লোকঅতৃপ্তি প্রবাদ বাক্যের ঢঙে কবির কবিতায় উঠে আসে প্রায়ই। যেমন :

৭.৫

ট্রেনে প্লেনে মাটিতে হাওয়ায়

চলি যত

অবিরত

শ্লোকে বাজে বুকের রণন

—সেই আমার—

—সেই আমার, নেই আমার।^{৫১}

লক্ষণীয় ‘সেই আমার নেই আমার’ লোকোক্তিটি লোকমনে অনুরণিত প্রবাদোপম শ্লোকই শুধু নয়, কবিতারই প্রথম ও শেষ অংশে পুনরুক্ত হয়েছে তারাব্বয়ী লোকাভরণ শৈলীতে।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় লোকাভরণ শৈলীর প্রয়োগ যে বারেরবারে ঘটে তার অন্যতম কারণ হল লোকচেতন্যের অমোঘ বিস্তার ও তার কাব্যরূপদানে কবির নিরন্তর আগ্রহ। বিসংগতি ভরা জগৎসত্য সেই লোকচেতনায় বারবার ছায়া ফেলে যায়। তাই ‘সংগতি’ কবিতায় উক্ত ‘তিনি’ লোকচেতনারই পরিপ্রকাশ। কোন প্রাতিষ্ঠানিক ঈশ্বর তিনি নন, তবুও লোকচেতনায় তিনি বারংবার সমস্ত বিসংগতির অবসানকর্তা রূপে কল্পিত। নিত্য বিপরীতের অবস্থানও তাই বিসংগতির রূপে ধরা পড়ে। ‘মেলাবেন তিনি, মেলাবেন’—এ বাক্য তাই একই সাথে আশা ও আশ্বাসদানের লোকভাষা হয়ে ওঠে। তাই তো কবি অন্যত্র বলে ওঠেন :

৭.৬

বলে নেই, নেই

শূন্য যে সেই—

পারো যদি মন,

বোঝাও মনকে।^{৫২}

তাই ‘অশ্রুদান’ কবিতায় কবি প্রবাদ বাক্যের ঢঙে ‘শহর-ভরা মনে’ বলে ওঠেন—

৭.৭

দিলে সুতো বেদনাই

মালা করে পরি তাই।^{৫৩}

এই কথাটাই লোক-আক্ষেপোক্তির রূপ ধরে অন্যত্র :

৭.৮

ভাগ্য এই মানি বরাত

বরফ পাথর দরজা দিলো

কপালে কারাঘাত।^{৫৪}

‘ঘরে-ফেরার দিন’ কাব্যের (১৯৬১) ‘শ্রুতি’ কবিতাটি বিসংগতি ভরা জগৎসত্য বিষয়ে লোক ধারণার একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য প্রয়াস। এই কবিতাটির নিহিত উপাদানকে আক্ষরিক অর্থে নিশিডাক বলা যেতে পারে। তথাপি এই উপাদানটি লোকাভরণ শৈলীতে প্রযুক্ত হয়ে লোকবিশ্বয়ের প্রকাশ ঘটায়। তাই কবি লেখেন :

৭.৯

চীৎকার করে কে দোতলায় ডাকছে

—‘অ-ম-র দ-স্ত’—

মাথা নেড়ে ভাবি ঠিক; দেখি

হঠাৎ এ কী

নিজের চোখ আর বাইরের লোক

একতলার গলি আর কুমোরতলি

যা কিছু আছে, যা থাকছে,

—সমস্তই তাই।

গ্রাহ্য। যিনি মেলাবেন সেই 'তিনি' নিছক লোকমুখে উচ্চারিত লোকবিশ্বাস ও লোকচেতনারই শব্দরূপ। তাই এখানে আধ্যাত্মিকতা বা প্রাতিষ্ঠানিক কোন ঈশ্বর অর্থে 'তিনি' শব্দটি প্রযুক্ত নয়।

বুদ্ধদেব বসু^{৬৮} সংগতিকে অমিয় চক্রবর্তীর 'সকল কাব্যের মূল মন্ত্র' বলেছিলেন। এ কথা সত্য হলেও অর্ধসত্য রূপে বিভ্রান্তিজনক হয়ে উঠতে পারে। কেননা এই সংগতি বিসংগতির মতই সমান সত্য। বিসংগতিভরা জগতে লোকে সংগতি আশা করে। এই বিসংগতি শুধু আধুনিক মানসের দ্বন্দ্বময়তার ইঙ্গিত দেয় না, প্রকৃতপক্ষে তা লোকমানসের দ্বন্দ্বময়তারই প্রকাশ। লোকে যখন বলে, 'জীব দিয়েছেন যিনি আহাৰ দেবেন তিনি' অথবা 'দেবার যিনি দিলে আপনা আপনি মেলে' তখন লোকমানসেরই রূপ ফুটে ওঠে। 'মেলাবেন তিনি' সেই লোকমানসের প্রতিধ্বনি।

আট

“অনেকটা নিশি-চালিতের মতো কবিতা লিখি”

আধুনিক বাংলা কবিতা ও কবি অমিয় চক্রবর্তীর কাব্য বিষয়ে গবেষক-অধ্যাপিকা কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়কে লেখা একটি পত্রে কবি অমিয় চক্রবর্তী জানিয়েছিলেন :

“আমি অনেকটা নিশি-চালিতের মতো কবিতা লিখি

—প্রায় সবটাই ছেড়ে দিই/অবচেতনা'র উপর—খানিক অদল-বদল করি।”^{৬৯}

এই পত্রাংশ পড়লেই বোঝা যায় লোকচেতনার দ্বারা কবির মন কেমনভাবে স্বাক্ষর ছিল। কোন কোন দেশী বা বিদেশী কবির প্রভাব তাঁর কবিতায় পড়েছে বলে কবির মনে হয় তা জানতে চেয়েছিলেন গবেষিকা। উত্তরে অবচেতনার উপর নির্ভর করে নিশি চালিতের মতো কবিতা রচনার কথাই কবি বলেছেন। নিশির ডাক লোকচেতনা বা লোক ধারনার ওপর নির্ভরশীল এমন এক ডাক যা ঐ ডাক শোনা ব্যক্তিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে। সৃষ্টিকর্মে ব্যাপ্ত কবি তাঁর কবিতা রচনা প্রক্রিয়াকে নিশি-চালিত বলে চিহ্নিত করেছেন। কবি যে কোনো দেশী বা বিদেশী কবিকে অনুসরণ করে কবিতা লেখেননি তা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় যে লোকাভরণ শৈলীর প্রয়োগ দেখা যায় তা আসলে কবি হৃদয়ের অন্তর্গোকে অবস্থিত ঐকান্তিক লোকচেতনারই শিল্পরূপ। কবি যখন নিশি চালিতের মতো কবিতা লেখেন তখন লোকচেতনা তাঁর কাব্যশৈলী নির্মাণের অন্যতম প্রেরণা হয়ে ওঠে। ফলে লোকচেতনা, লোকঐতিহ্য তাঁর কবিতায় বারবার কাব্যরূপে স্রীমণ্ডিত হয়ে ওঠে। “বেদনার মধ্যে দিয়ে মানুষের চেতনা দীপ্ত হয়ে ওঠে” একথা স্বীকার করেই কবি লিখেছেন, “শিল্পের মধ্যে সেই বেদনাকে খুঁজলে চেতনাকেও চেনা যায়; সেই বেদনা সেই চেতনা দুঃখও নয়, সুখস্বস্তির চেয়েও অনেক বেশি”^{৭০}—অর্থাৎ সেই বেদনা লোকচেতনার মধ্যে এমনভাবে মিশে থাকে যা দুঃখ বা সুখস্বস্তির চেয়ে অনেক বেশি হয়ে ওঠে। এই চেতনাই লোকচেতনা রূপে কবির কাব্যে নানাভাবে ও ভাষায় ব্যক্ত হয়।

‘অমরাবতী’ (১৯৭২) কাব্যে কবির শেষ ক’বছরের যেসব কবিতা সংগৃহীত হয়েছে তাতে বিশেষ প্রাসঙ্গিক কবিতা যেমন আছে, তেমনি রয়েছে স্থানমাহাত্ম্য বা জনালয়ে বা বিজনতায় কবির নিবিড় চেতনো মিশেছে। ন্যূনপঙ্ক্ত এর বিদেশী পরিবেশে বসে কবি রচনা করেন ‘বাংলার ডায়েরি’ আর তাতে লোকঐতিহ্যের হাজারো উপাদান কাব্য সৃষ্টির ধারাপথে শিল্পমূর্তি গ্রহণ করে:

৮.১

জেনেছি প্রাণের দান কত পূর্বপুরুষানুক্রমে
অপূর্ব সংস্কৃতি সেই,

নদীচর কচি ধান নয়ন-সবুজে দেখা তীর
 ডুবে আছে চেতনায়, উলু-দেয়া বিয়ে, শাঁখ ধূপ
 ময়নামতীর গান, গাঁথা সুম্ব রঙিন সুতোয়
 নল্লিকাঁথার মাঠ, গুরু মুর্সিয়ার ভক্ত দোহা,
 নমাজ ভজন গাঁয়ে, চৈত্রের চড়কে
 চিত্রাপিত ছায়া মেলা বসে, হাটে-হাটে
 কদমা বাতাসা জুপ, ঢাকাই শাড়ির শিল্পশোভা
 মহরমে দশমীতে দামামা উৎসব, বারোয়ারী।^{৬১}

এই বর্ণনায় লোকসংস্কৃতির স্মৃতি যে উৎসবমগ্ন প্রাণময়তাকে ধরতে চেয়েছে তা লোকধর্মের অংশ। এই ধর্ম বিচিত্র ব্যাপক ও বহুবিস্তারী এক লোকচেতনাকে আশ্রয় করেছে। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় এই লোকচেতনার ব্যাপ্তি ও বিস্তার বহুবিচিত্র লোকোপাদানে সংগতিপূর্ণ শিল্পরূপ লাভ করেছে লোকাভরণ শৈলীতে। সেই জন্য ‘গানে সুরে’ কবি বলে ওঠেন :

৮২ পরান বাউল কয় গো
 কখন হাসি কখন কাঁদি জনাজানির নয় গো,

তার সঙ্গে মিশে থাকে লোকমঙ্গল প্রার্থনা :

৮.২.১ সংসারে আজ সংসার পার বক্ষে মানি
 মঙ্গল দাও, মঙ্গল দাও, হে কল্যাণী।

কবির শেষতম ‘অনিঃশেষ’ (১৩৮৩) কাব্যের ‘প্রাণের ভর্ৎসনা’ কবিতায় কবি বলেছেন ‘মস্ত নেবো দেশে সেই ওংকার আমেন্ স্বস্তি’। এই মস্ত প্রাতিষ্ঠানিক মস্ত নয়, যুগে যুগে লোকজীবন প্রবাহে মিশে থাকা লোকপ্রার্থনা বা লোকধর্মের প্রার্থনা।

৮.৩ যে-ধর্ম আমরা মানি সে তো উৎস, তারি লোকায়ত
 কত ধারা উৎকর্ষের কালে-কালে প্রবাহ কল্যাণী
 নেমে এলো জনচিন্তে সেখানেই করুণা আধার।^{৬২}

এই লোকায়ত ধর্ম চেতনা কবিকে লোক চেতনার গভীরে নিয়ে যায়। এই চেতনা নিয়ে কবি লোকসমাজের ইতিহাস সন্ধান করেন।

‘ইতিহাস’ শিরোনামে দু’টি কবিতা রচনা করেছিলেন কবি অমিয় চক্রবর্তী। প্রথমটি ‘পালা-বদল’ (১৩৬২) কাব্যের অন্তর্গত। কবিতাটি কাহিনী কবিতার ঢঙে রচিত। দ্বিতীয়টি রয়েছে অপ্রকাশিত পুরানো রচনার সংগ্রহে। প্রথম কবিতাটিতে বর্ণিত হয়েছে একজন মানুষ ঢালু মাটি পেরিয়ে যে নির্জন চড়াইয়ে এসেছিল সেখানে ক্রমে সে সঙ্গে এনেছে তিনজনকে এবং সেই নির্জন স্থান ক্রমে পরিবর্তিত হয়েছে গ্রামে এবং গ্রাম থেকে ইট বাঁধা বহু গ্রামের একত্র সমাবেশে গড়ে ওঠা শহরে। গ্রাম উঠেছে গেছে, শহর পত্তনের অনিবার্যতায়। লোকবসতির এই বিবর্তন রেখা লোক ইতিহাসের গভীরে লুকানো থাকে। কবি তাকেই স্পষ্ট ভাষা রূপ দেন।

দ্বিতীয় কবিতাটি অন্য ইতিহাসের বর্ণনা। দৈবের অঘটনে যাকে একদা ছেড়ে যেতে হয়েছে ‘সেদিনের সেই তীর ক্ষণে’ তার সঙ্গে জনতায় দেখা পুনর্ব্বার। তখন:

৮.৪ জনতায় দেখা পুনর্ব্বার,
 কিছু মোর নাই বলিবার।

যে-সংগ্রাম, যে-সম্মান
জ্ঞানে তা গভীর প্রাণ,
মিশে গেছে জীবনে আমার
ভিড়ে দেখা হল পুনর্বীর।^{৩০}

এইভাবে স্মৃতি-বিস্মৃতি, একাকিত্ব আর ভিড়ে, সংগ্রাম ও শান্তির দ্বৈত পথে সংগতি সম্মান করে। লোকচৈতন্যে তার যে নিত্য আবাস কবি তাকেই কাব্যরূপ দান করেন লোকাভরণ শৈলীতে।

তথ্যসূত্র :

১. কবিতা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, অমিয় চক্রবর্তী, ১৯৭৭, গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ৩০৪।
২. অন্ত রৌদ্র, পারাপার, কবিতা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪।
৩. লোকায়ত, পারাপার, তদেব পৃ. ২৩৪।
৪. তদেব।
৫. কবিতাবলী, কবিতা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০।
৬. কবিতাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯।
৭. তদেব।
৮. একটি গান শোনা, পারাপার, কবিতা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮।
৯. নাম-ওঠা, খসড়া, কবিতা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।
১০. তদেব।
১১. কালাস্তর, খসড়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।
১২. তদেব।
১৩. যৌগিক, খসড়া, প্রাগুক্ত পৃ. ১২।
১৪. তদেব।
১৫. মর্মান্তিক, খসড়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।
১৬. গম্ভব্য, একমুঠো, কবিতা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।
১৭. তদেব।
১৮. তদেব।
১৯. তদেব।
২০. তদেব।
২১. তদেব।
২২. অতি আধুনিক, খসড়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।
২৩. তদেব।
২৪. চলতি বিজ্ঞান, খসড়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।
২৫. তদেব।
২৬. দ্রষ্টব্য, একালের কবিতা : শৈলী সম্মান, বিপ্লব চক্রবর্তী, প্রথম সংস্করণ ২০০৪, পৃ. ৩৫-৩৬।
২৭. যুদ্ধের খবর, এক মুঠো, কবিতা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।
২৮. বিজ্ঞাপন, মাটির দেয়াল, কবিতা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।
২৯. রুদ্ধ কামার, মাটির দেয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।
৩০. তদেব পৃ. ৮৬।
৩১. তদেব।

৩২. উদ্ভট, মাটির দেয়াল, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৮৪।
৩৩. বড়োবাবুর কাছে নিবেদন, মাটির দেয়াল, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৭৮।
৩৪. প্রবাসী, মাটির দেয়াল, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৭৬।
৩৫. কচুরিপানা, মাটির দেয়াল, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৭৪।
৩৬. কোথায় চলেছো পৃথিবী, অভিজ্ঞান বসন্ত, কবিতা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১০৮।
৩৭. ধুলোর ঘরে, হারানো অর্কিড, কবিতা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা নরেশ গুহ, ১৯৭৯, পৃ. ১৫৯।
৩৮. উজানী, হারানো অর্কিড, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৫৮।
৩৯. হৈত, পুষ্পিত ইমেজ, কবিতা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৯২।
৪০. সংগতি, পুষ্পিত ইমেজ, কবিতা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, প্রাণ্ডক্ত পৃ. ১৯৩।
৪১. সংগতি, অভিজ্ঞান বসন্ত, কবিতা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, প্রাণ্ডক্ত পৃ. ১০৯।
৪২. তদেব।
৪৩. তদেব।
৪৪. তদেব।
৪৫. তদেব।
৪৬. বিসংগতি, পালাবদল, কবিতা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৬।
৪৭. ভাঙা গোড়ালি, পালাবদল, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১২।
৪৮. সমাবর্ত, পালাবদল, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯।
৪৯. পদাবলী, পালাবদল, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৯।
৫০. ধর্মতাত্ত্বিক ব্রাহ্মণকে একদিন প্রমোদন, ঘরে-ফেরার দিন, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৬৫।
৫১. একইসঙ্গে, ঘরে-ফেরার দিন, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১০০।
৫২. উজানী, হারানো অর্কিড, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৫৮।
৫৩. অশ্রুদান, ঘবে-ফেরার দিন, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১০৯।
৫৪. ক্ষতিপূরণ, তদেব পৃ. ১১১।
৫৫. ক্ষতি, তদেব পৃ. ৬৭।
৫৬. সংবিৎ, তদেব পৃ. ১৬৮।
৫৭. সাবেকি, পারাপার, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২১১।
৫৮. গ্রহ পরিচয়, পালাবদল, কবিতা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩১।
৫৯. আধুনিক বাংলা কবিতা ও কবি অমিয় চক্রবর্তী, ড. কাঞ্চনকুম্ভলা মুখোপাধ্যায় ২০০২, তনু চিঠি দ্রষ্টব্য, পৃ. ১৬।
৬০. তদেব।
৬১. বাংলার ডায়েরি, অমরাবতী, কবিতা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২২১।
৬২. প্রাণের ভর্ৎসনা, অনিঃশেষ, কবিতা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৫১।
৬৩. ইতিহাস, অপ্রকাশিত পুরানো রচনা, কবিতা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৯৯।

কালান্তরের পথে মেয়েরা

গোপা দত্তভৌমিক

গত দুই শতাব্দী ধরে আমাদের দেশে নারীমুক্তি, নারীশিক্ষার যে ধার বইছে তার সূচনাপর্বে ১৮২২ সালটিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। ওই সালে পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালংকার 'স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক' নামে ছোটো একটি বই প্রকাশ করেন। মধ্যযুগের তন্ত্রা ভেঙে কয়েকজন ব্যক্তির মনে তখন সমাজের অর্ধেক অংশ অর্থাৎ মেয়েদের নিয়ে একটা স্পষ্ট সদিচ্ছা দেখা দিচ্ছে। সমাজের বৃহৎ অংশে যদিও তখন কুসংস্কার জমাট বেঁধেছিল। সত্যের খ্যাতিরে এ কথা স্বীকার করতেই হবে মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারটা এ দেশে পুরোপুরি সাগরপার থেকে আমদানি করা হয়নি, এখানে একটা ঐতিহ্য ছিল। শাস্ত্রে মেয়েদের লেখাপড়ার কিছ কিছু উল্লেখ আছে। পরাশর মাধব বলেছেন, মেয়েদেরও উপনয়ন হত, তাঁরা বেদ পড়তেন। হারীত ধর্মশাস্ত্র বলেন নারী দুই প্রকার, ব্রহ্মবাদিনী আর সদ্যোবধু। কিন্তু ব্রহ্মবাদিনীদের সংখ্যা খুব একটা আশাব্যঞ্জক ছিল না। বিশ্ববারা, ঘোষা, অপালা, গার্গী, 'মৈত্রেয়ীদের বিখ্যাত দৃষ্টান্ত সন্তেও সুকুমারী ভট্টাচার্য যথার্থ বলেছেন, 'ব্যতিক্রমের মতো কোনো কোনো নারী শিক্ষার সুযোগ পেতেন।' এই ব্যতিক্রমও বিরল হয়ে এল যখন জাতিভেদ সমাজে প্রবল হল। জাতিভেদকে অক্ষত রাখার জন্য পছন্দ অপছন্দের বালাই জন্মাবার আগেই বালিকাদের বিয়ে দেওয়া হতে লাগল। গৌরীদান হয়ে উঠল এক প্রশংসিত প্রথা। মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা এবং স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে তাদের পিতা, পতি ও পুত্রের অধীনে রাখবার ব্যবস্থা হল। দেশে ক্রমাগত বৈদেশিক আক্রমণের ঢেউ ভাঙছিল। অপহরণ ইত্যাদি থেকে কুমারী কন্যাকে রক্ষা করার একটা পথও যেন হয়ে দাঁড়াল বাল্যবিবাহ। মনু বলেছেন,

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে

রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমহতি।।

ঐতিহাসিকরা অবশ্য অন্য একটি কারণও দেখিয়েছেন। আর্য অনার্য সম্প্রীতির পথ ধরে খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দ থেকে সমাজে অনার্য কন্যা বিবাহ করার প্রবণতা বেশ বেড়ে যায়। অনার্য স্ত্রীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় নারীর স্থানের কিছুটা অবনতি ঘটে কারণ পুরোহিতরা কোনো অবস্থাতেই একজন অনার্য নারীকে মন্তোচ্চারণের অধিকার দিতে রাজী ছিলেন না। রাজাদের অনেকেরই অনার্য পত্নী ছিলেন, তাঁরা সেই স্ত্রীদের যজ্ঞাধিকার দিতেও চেয়েছিলেন— সেই চাপের মুখে পুরোহিতশ্রেণি প্রতিক্রিয়াশীল সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সাধারণভাবে সব মেয়েদেরই যজ্ঞে অংশ নেওয়া নিষেধ করে দিলেন। কর্মকাণ্ডে অংশ নেবার জন্যই শাস্ত্র পড়ার প্রয়োজন ছিল এখন আর শাস্ত্রচর্চার দরকার রইল না ফলে মেয়েদের ক্ষেত্রে বিবাহের বয়স কমাবার দিকেই সমাজের ঝোঁক দেখা দিল। বিবাহ এবং সম্ভান উৎপাদনেই গণ্ডিবদ্ধ হল মেয়েদের জীবন, বিবাহই তার একমাত্র শাস্ত্রীয় সংস্কার, 'ভবসমুদ্রে ভেলা' এবং পুত্রসম্ভান লাভেই নারীর কৃতার্থতা এই ধারণাই প্রতিষ্ঠিত হল। ঋগ্বেদের যুগে ছিলেন 'অমাজুরা', 'কুলপা'— যারা অবিবাহিত অবস্থায় পিতৃগৃহে থাকতেন। সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া হল। মনু কিন্তু নির্দেশ দিয়েছেন 'শুণহীন পাত্রে কন্যাদান না করে বরং প্রাপ্তবয়স্ক কন্যাকে আজীবন ঘরে রাখো।' মনুর অন্যান্য উপদেশ মেনে নিলেও সুবিধাবাদী সমাজ এটি কিন্তু যথারীতি অবজ্ঞা করেছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ এক শ্রেণির নারীর অবশ্য ছাড়পত্র ছিল। কবিতা লেখা, নাচ, গান, শেখা, ছবি আঁকা, পাশা খেলা এমনকি স্থাপত্য গণিত পর্যন্ত শেখার অনুপতি মিলত গণিকাদের। কারণ তাঁদের কাজ ছিল রাজা ও অভিজাত পুরুষদের চিন্তবিনোদন। দরকার মতো রাজনীতি

নিয়েও তাঁদের কথা বলতে হত। কর্মক্লাস্ত পুরুষের নর্মসহচরী হবার জন্য এইসব নারীকে যোগ্যতায় গৃহবধূদের থেকে এগিয়ে দেওয়া হত। বোঝাই যাচ্ছে নাচগান শেখানো ইত্যাদির আড়ালে তাঁদের নারীত্বের চূড়ান্ত অবমাননাই লুকিয়ে ছিল।

কুলবধূদের ক্ষেত্রে ঘরগৃহস্থালি আর সন্তান পাঙ্গনের বাইরে আরে কোনো বিদ্যাশিক্ষার দরকার ছিল না। গৃহস্থালিতেও অনেক সময় শান্তির আশা ছিল না। বৌধায়ন ধর্মসূত্র, আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ইত্যাদি শাস্ত্র বলছে,

- ১) নিঃসন্তান বধুকে বিয়ের দশ বছর পর ত্যাগ করা যায়।
- ২) যে স্ত্রী শুধু কন্যাসন্তানের জন্ম দেয় তাকে বারো বছর পর ত্যাগ করা যায়।
- ৩) যে স্ত্রী মৃতবৎসা তাকে পনেরো বছর পর ত্যাগ করা যায়।
- ৪) যে স্ত্রী কলহপরায়ণা তাকে তক্ষুনি ত্যাগ করা যায়।

এইসব নিয়ম যে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হত তা অবশ্য বলছি না। তবে নারীর চারদিকে এক অমানবিক পরিবেশ ক্রমে ঘন হয়েছে এই সত্য অস্বীকার করা যায় না। বহু সতীনের সংসারে স্বামীর ওপর নিজের অধিকার বজায় রাখার জন্য মেয়েদের সপত্নীনাশন অভিচারক্রিয়ার ক্রমেই বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। অনেকেরই মনে পড়বে আশাপূর্ণা দেবীর ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাস। সতীনকে ভালোবেসে মিলেমিশে থাকতে হয় রামকালী যখন মেয়েকে এই সদুপদেশ দেন, বালিকা সত্যবতীর মনে হয় তাহলে সতীন কাঁটা উদ্ধারের জন্য সৈজ্জ্বি ব্রত করতে হয় কেন? এই উপন্যাসে ব্রতটির যে বোমহর্ষক বর্ণনা আছে তার একটুখানি মনে করা যাক, গৃহস্থালির প্রতিটি জিনিস ধরে ধরে মনোবাসনা জানানো হচ্ছে,

‘হাতা, হাতা, হাতা, খা সতীনের মাথা।’

‘টেকি, টেকি, টেকি, সতীন মরে নীচেয় আমি ওপর থেকে দেখি।’

খুব মার্জিত ভাষায় লিখিত হলেও স্বধেদের দশম মণ্ডলের ১৪৫ সূত্রে বহু বছর আগেও একই কথা বলা হয়েছিল। ঋষি ইন্দ্রাণী বলছেন, ‘এই যে তীব্রশক্তিয়ুক্ত লতা, ইহা ওষধি, ইহা আমি খননপূর্বক উদ্ধৃত করিয়াছি, ইহা দ্বারা স্বামীর প্রণয়লাভ করা যায়। সেই সপত্নীর নাম আমি মুখে আনি না।’ ১৬০ সংখ্যক সূত্রে ঋষি শচী সপত্নীদের পরাস্ত করে পরিবারের ওপর প্রভুত্ব করার আনন্দে আত্মহারা। সমধর্মী নারীর ওপর নিষ্ঠুর হতে শিখিয়েছে বাস্তব পরিস্থিতি।

কন্যা জন্মানোকেই প্রায় অভিশাপ হিসেবে দেখা হয়েছে। পরিবার সর্বদাই নারীর কাছে দাবি করেছে বংশরক্ষার জন্য পুত্রসন্তান; শিশুকন্যা হত্যার শুরু কবে থেকে কে জানে। আজও এই মহাপাপ ভারতে এবং অন্যত্র প্রতিদিন ঘটে চলেছে। এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে কন্যা ভ্রূণ হত্যা করা হয়। আগে নানারকম হাতুড়ে পদ্ধতি ছিল। গুজরাতে সদ্যোজাত কন্যাকে দুধে ডুবিয়ে মারা হত, তার নাম ছিল ‘দুধপীষী’। প্রথাটি এখনও তলায় তলায় আছে। অনেক সময় হত্যাকালে, শিশুটিকে বলা হত ‘যাও, গিয়ে ভাইকে পাঠিয়ে দাও।’ ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে গ্রামীণ সম্প্রদায় বেশ গর্ব করেই বলত, তাদের গ্রামে কখনও বরযাত্রীদল আসে না। অর্থ জ্বলের মতো সহজ। প্রকৃতির নিয়মে মেয়ে নিশ্চয়ই জন্মাত। তাদের আঁতুড়ঘরের বাইরে পৃথিবীর আলো দেখতে দেওয়া হত না। জ্যোতির্ময়ী দেবীর ‘বেটি কা বাপ’ গল্পটি মনে পড়ে। পরপর কন্যার জন্ম হওয়াতে ঠাকুমা নিজের হাতে ওই গল্পে ছোট্ট নাটনিটিকে আফিম খাইয়ে হত্যা করেন। প্রায় সব জাতিই যে শিশুকন্যা বধ করত সে বিষয়ে শরৎচন্দ্রের ‘নারীর মূল্য’ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিতে চাই, ‘রাজপুত্রেরা করিত, আরব শেখেরা কন্যা জন্মিবামাত্রই গর্ত

কাটিয়া পুঁতিয়া ফেলিত, কৈশা প্রদেশের আরবেরা শিশুকন্যার পাঁচ বছরে তাকে হত্যা করিবার পূর্বে কন্যার জননীকে বলিত ‘এইবার মেয়েকে গন্ধ মাখাইয়া দাও, সাজাইয়া দাও, আজ সে মায়ের ঘরে যাইবে।’ অর্থাৎ কুপের মধ্যে নিষ্কিণ্ড হইবে। কোরিশের লোকেরা মক্কার নিকটবর্তী আবুদেলোমা পাহাড়ে নিজেদের কন্যা বধ করিত। প্রাচীন গ্রিক ঐতিহাসিক স্ট্রাবো বলিয়া গিয়াছেন, ‘the practice of exposing female infants and putting them to death being so common among the ancients that it is remarked as a thing very extraordinary in the Egyptians that they brought up all their children.’ চীনা ও গ্রিকদের মধ্যে কন্যাশিশু হত্যার প্রথা যথেষ্ট ছিল। চীনে বর্তমানে এক সম্ভান বাধ্যতামূলক হওয়াতে প্রথাটি নবরূপে দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশে মেয়েদের ওপর অত্যাচারের একটি চমৎকার ইতিহাস রচিত হয়েছে কৌলীন্যকে ঘিরে। কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও আমাদের এই তথাকথিত গৌরবময় সামাজিক প্রথাটি সম্বন্ধে দু-চার কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। শত শত নারীর জীবনের করুণ অপচয়, চিতার আশুনে জীবন্ত পুড়ে মরা ইত্যাদি নানা সামাজিক অত্যাচারের মূলে এই প্রথা। পথের পাঁচালীর যে অংশে হতভাগিনী ইন্দির ঠাকরুনের কথা আছে তার নাম ‘বম্বালী বালাই’। এই ‘বম্বালী বালাই’ বা কৌলীন্য প্রথার ইতিহাস আমরা পাই কুলজি গ্রন্থগুলিতে। সব কুলজিই একসুরে বলছে আদিশূর, কনৌজ থেকে শাশুলা, কাশ্যপ, বাৎস, ভরদ্বাজ ও সার্বর্ণ গোত্রের পাঁচজন ব্রাহ্মণ এনেছিলেন। বাংলা দেশের রাঢ়ী ও বারেন্দ্র দুই প্রাণের সব ব্রাহ্মণ তাঁদের বংশোদ্ভূত। যদিও এই ইতিহাস সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা ঘোর সন্দেহ। বম্বাল সেন (বা ধরাসুর) প্রবর্তিত এই প্রথায় লক্ষ্মণ সেন দুটি নিয়ম নতুন সংযোজন করেন; বংশপরিবর্ত ও সমীকরণ। প্রথা দুটির তাৎপর্য হল কুলীন কন্যার যে ঘরে বিয়ে হয়েছে সেই ঘরের থেকেই মেয়ে নিতে হবে। কুলীনরা কে কেমন উঁচু বা নীচু কুলে বিয়ে করেছে তা দিয়েই পদমর্যাদা ঠিক করা হবে। অবশেষে পঞ্চদশ শতকে আচার বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শাস্তি, তপ, দান—কৌলীন্যের এই নবগুণের বদলে দেবীঘর ঘটক দোষ অনুসারে কুলীনদের মেলবন্ধন করেন। দেবীঘর যাঁদের বেশি দোষ ছিল কিংবা হয়তো যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধপক্ষ ছিলেন তাঁদের নিষ্কুল করেন। নানা রকম ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাবার ইঙ্গিত কুলপঞ্জিগুলিতে রয়েছে। দেবীঘর এক এক প্রকার দোষে দুই কুলীনদের নিয়ে এক এক মেল তৈরি করেন। কানুন জারি হল প্রত্যেককে নিজের মেলের অন্য গোত্রের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কুলকার্য করতে হবে। মেলের বাইরে গেলে কুলনষ্ট হবে এবং বাইরের মেলের দোষাবলি লাভ করে সেই মেলভুক্ত হয়ে যেতে হবে। এতে সম্মানেরও যথেষ্ট হানি হত। তাই পারতপক্ষে কেউ মেল ছাড়ত না, এর ফলে কুলীন সমাজে পুরুষের বহুবিবাহ, মেয়েদের উপযুক্ত বর না জোটায়ে অপাত্রে কন্যাদান, বৃদ্ধ বরে বালিকা কন্যাদান এইসব অনাচারে দেশ ছেয়ে যায়।

কুলজিগ্রন্থের বিবরণগুলি প্রায়শ পরস্পরবিরোধী, অবাস্তব। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ‘অসত্য’। রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন ‘পাঁচজন ব্রাহ্মণের সম্ভান সম্ভূতিতে সারা বঙ্গদেশ ছাইয়া ফেলিল বাতুল ভিন্ন এ কথায় কেহ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না।’ আসলে গোটা ব্যাপারটি এসেছিল হীন্যমর্যাদা থেকে। অনার্যদেশ বাংলার প্রতি আর্য ব্রাহ্মণদের ছিল দারুণ অবজ্ঞা, তাঁরা বাঙালি ব্রাহ্মণদের হেয় করতেন। বাঙালি ব্রাহ্মণরাও তখন সমান মর্যাদা পাবার জন্য নিজেদের কনৌজিয়া ব্রাহ্মণদের বংশধর বলে পরিচিত করান। বম্বাল আর লক্ষ্মণ সেন নাকি ব্যক্তিগত গুণ দেখে কৌলীন্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে সর্বানন্দ, হলানুধ, অনিরুদ্ধ ভট্ট, জয়দেব, গোবর্ধন এইসব গুণী মানুষদের কেউ কুলীন হলেন না। হলেন তাঁরাই কুলজি গ্রন্থের বাইরে যাঁদের নাম কেউ জানে না।

কৌলীন্যের উলটোদিকে ছিল বংশজদের কন্যাবিক্রয়। নারীর ক্ষেত্রে দুটির ফলই কাছাকাছি। ‘কঙ্কাবতী’ তে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় অর্থপিপাসা তনু রায়কে দেখিয়েছেন, যিনি বৃদ্ধ পায়ে পর পর কন্যাদান করে অর্থ উপার্জন করছেন। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, অপায়ে কন্যাদান সব কিছু মিলিয়ে মেয়েদের অবস্থা উনিশ শতকের প্রথম পর্যন্ত এক কথায় ভয়াবহ। প্রচলিত বচনটি মনে পড়ছে,

পুড়ল নারী উড়ল ছাই।

তবে নারীর গুণ গাই।।

স্বামীর সারস্বতজীবনের সঙ্গে নারীর যোগাযোগ কীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল তার একটি ছোটো দৃষ্টান্ত হিসেবে মনে পড়ছে মধুসূদন সরস্বতীর কাহিনি। মনীন্দ্র গুপ্তর কাছে গল্পটির জন্য খণী আছি। বেদান্তের নিজস্ব একটি টীকা রচনায় মগ্ন ছিলেন মধুসূদন বছরের পর বছর ধরে। অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে যেদিন তাঁর বইটি লেখা শেষ হল সেদিন খেয়াল হল বোমটাটানা একটি বউ এসে রোজ তাঁর ঘর পরিচ্ছন্ন করে বিছানা পেতে খাবার খাইয়ে গেছে এঁটো তুলে নিয়ে গেছে, সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়ে গেছে। কে সে? সেদিন সন্ধ্যায় প্রদীপ দিতে এলে কৃতজ্ঞতাবশত অপরিচিতার পরিচয় জানতে গিয়ে মধুসূদন স্তম্ভিত, এই বৃদ্ধা তাঁর স্ত্রী।

রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, আঁতুড় ঘরের চৌহদ্দিতে ভাত সেদ্ধ করা, ছেলে ঠেঙানো, পাড়া বেড়ানো, কোন্দল করার রুটিনে বন্দি নারীকে নিকৃষ্ট জীব হিসেবে অবজ্ঞার প্রতি রাগী জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে দিয়েছিলেন রামমোহন রায় ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে, ‘স্ত্রীলোকের বুদ্ধি পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? ...আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কীরূপে নিশ্চয় করেন?’ অবশ্য দু-চারজন মেয়ে যে লেখাপড়া করতেন না তা নয়, রূপমঞ্জরী বা হটু বিদ্যালংকার অবিবাহিতা থেকে গোটা জীবন জ্ঞানচর্চা করেছেন, চিকিৎসাশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নাকি পুরুষের বেশবাস ধারণ করতেন। সুকুমারী ভট্টাচার্য জানিয়েছেন তৈত্তিরীয় আরণ্যকে শিক্ষিতা নারী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে নারী হয়েও এরা পুরুষ। সমাজে বদ্ধমূল ধারণা ছিল নারীর স্বাভাবিক জীবন এঁদের জন্য নয়। অন্য এক বিদূষী হটু বিদ্যালংকার কাশীতে চতুষ্পাঠী খুলেছিলেন। কিন্তু এ সবই ব্যতিক্রম। বেশ বোঝা যায় কেন গৌরমোহন বিদ্যালংকার ১৮২২ সালে প্রমোত্তরের ভঙ্গিতে বোঝাচ্ছেন যে স্ত্রীলোক লেখাপড়া করলে বিধবা হয় এই কুসংস্কার ভিত্তিহীন।

এই প্রসঙ্গে রাসসুন্দরী দেবীর আত্মজীবনী স্মরণ করা যাক, বাংলার নারীমুক্তির ইতিহাসে আশ্চর্য সম্পদ এই বইটি। কালান্তরের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে এখানে। বইটি সম্পাদনা করতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র বিমুক্তভাবে বলেছেন, ‘ইহা প্রাচীন হিন্দু রমণীর একটি খাঁটি নক্সা প্রাচীন কালের দোষগুণ লইয়া হিন্দু রমণীগণ যে মূর্তিতে গৃহস্থানিকে স্নেহে ও ত্যাগের মহিমায় পূর্ণ করিয়া বাখিতেন—সেই পবিত্র প্রভা বিরহিত হইলে হিন্দুর গৃহস্থালীর প্রকৃত শোভা চলিয়া যাইবে।’ আমাদের কিন্তু এত মুগ্ধতা নেই। রাসসুন্দরীর আত্মকথাকে সম্পূর্ণ বিপরীত দিক দিয়ে দেখতে পারি আমরা। একটি সম্ভ্রান্ত অভিজাত পরিবারে নারীর অবস্থান কেমন ছিল তার মূল্যবান দলিল গ্রন্থটি। মায়ের অসুখ এবং মৃত্যুর সময়ও যেতে পারেননি রাসসুন্দরী,

‘আমি যদি পুত্রসন্তান হইতাম, আর মার আসন্ন কালের সম্বাদ পাইতাম, তবে আমি যেখানে থাকিতাম পাখির মত উড়িয়া যাইতাম। কি করিব আমি পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গী।’ রাসসুন্দরী সকলের অগোচরে লুকিয়ে লেখপড়া শেখেন। তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং অসামান্য ব্যক্তিত্ব আত্মজীবনীতে প্রকাশ পেয়েছে। রাসসুন্দরী লক্ষ করেছেন, ‘সকলেই মেয়েছেলেকে বিদ্যায় বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তখনকার মেয়েছেলেগুলো নিতান্ত হতভাগা, প্রকৃত পশুর মধ্যে গণনা করিতে হইবেক। ব্যস্তবিক মেয়েছেলের হাতে কাগজ দেখিলে সেটি ভারি বিরুদ্ধ কৰ্ম্ম জ্ঞান করিয়া, বৃদ্ধা ঠাকুরাণীরা অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন।’

মজার ব্যাপার সে গণ্ডিরক্ষার দায়িত্বও প্রধানত নিয়েছিলেন মেয়েরাই। উৎপীড়িতাদের মনে এটা গেঁথে দেওয়া হয়েছিল মানবিক গুণে তাঁরা পুরুষদের থেকে খাটো। বুদ্ধি বা বিদ্যাচর্চা তাঁদের নয়, তাঁদের থাকবে ব্রতকৰ্ম, আচারবিচার, পুজোআচ্চা ঘেরা কুসংস্কার আর প্রভুত্ব মেনে চলা জীবন। এই মেনে চলাতেই গৌরব। মনে পড়ে যাচ্ছে ইহুদি ধর্মগ্রন্থে আদমের প্রথমা স্ত্রী লিলিথ প্রভুত্ব মানতে চায়নি বলেই অভিশপ্ত হয়েছে। ভাগ্যের আশীর্বাদ পেয়েছে শাস্ত অনুগত ইভ। লক্ষ্মীমেয়ে হয়ে ওঠার সিলেবাসে প্রতিবাদের কোনো অধ্যায় ছিল না।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কলকাতায় নারীশিক্ষা আন্দোলন যেভাবে শুরু হয় তাতে খ্রিস্টান মিশনারিদের একটি ভূমিকা ছিল যদিও সেসব স্কুল থেকে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা দূরে থাকতেন। এইসব আসলে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অভিসন্ধি এমনি একটা ধারণা স্বাভাবিক ভাবেই ছিল। ততদিনে পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিঘাতে জাগ্রত আলোকপ্রাপ্ত বাঙালি পুরুষ পার্শ্ববর্তিনীর মুখতা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন। কৃতবিদ্যা স্বামী অশিক্ষিত স্ত্রীকে নিয়ে কীভাবে সংসার করবে এই প্রশ্ন আর চাপা দেওয়া যাচ্ছে না। তখনও কিন্তু রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীলরা বাড়িতেই মেয়েদের পড়ানোর পক্ষপাতী। অন্যদিকে ইয়ংবেঙ্গল দল একে একটি আন্দোলনের রূপ দিতে চাইলেন। ১৮৪২ সালে রামগোপাল ঘোষ হিন্দু কলেজে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। প্রথম হয়েছিলেন মধুসূদন দত্ত, দ্বিতীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ১৮৪৭ সালে বারাসতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। রক্ষণশীলরা প্রচণ্ড বাধা দিলেন। এই স্কুল স্থাপনের জন্য প্যারীচরণ সরকার ও তাঁর সহযোগীদের সমাজচ্যুত করা হয়। ১৮৪৯ সালের ৭ মে বেথুন তাঁর বিখ্যাত বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। যে ঘোড়ার গাড়ি ছাত্রীদের নিয়ে আসত তার গায়ে বিদ্যাসাগর লিখে দিয়েছিলেন, ‘কন্যা অপি এবং পালনীয় শিক্ষণীয়া অতি যত্নতঃ’ আসলে বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রে যেমন পরাশর সংহিতার ‘নষ্টে মৃত্যে’ ইত্যাদি শ্লোক, এখানেও তেমনি শাস্ত্র-অন্ধ দেশবাসীর মনে বিদ্যাসাগর শাস্ত্রবচন তুলে পৌঁছে দিয়েছেন আধুনিক মানবিক ভাবনা। না হলে তিনি তো জানতেন প্রাচীন শাস্ত্র অনুযায়ী এই শিক্ষার আসল চেহারাটা কী, বিবাহ হল নারীর উপনয়ন, পতিগৃহবাস হল গুরুগৃহবাস আর পতিসেবা হল বেদাধ্যয়ন। ১৮৫৭ থেকে ১৮৫৮ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় খুলেছেন। সরকার অর্থসাহায্য বন্ধ করলে নারীশিক্ষা ভাঙার খুলে এগুলিকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছেন। কালাত্তরের এই ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের কাছে মেয়েদের ঋণ সবচেয়ে বেশি।

তবে উনিশ শতকের এই আন্দোলনে নারীর কাছে সমাজের যে প্রধান গার্হস্থ্য দাবি, শিক্ষার সঙ্গে যেন তার সংঘাত না বাধে সে ব্যাপারে গোড়া থেকেই একটি সর্তকতা ছিল। মেয়েদের পড়াশুনা যাতে গৃহস্থীকে সুন্দর করে তুলতে পারে সেদিকেই জোর ছিল। নারীশিক্ষার প্রসারে অগ্রণী বামাবোধিনী লিখছেন, ‘স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার কেবল এই লক্ষ্য যে তাঁহারা যে কেবল সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতি সাধারণ বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইবেন তাহা নহে, কিন্তু কন্যা, ভগিনী, ভাৰ্য্যা ও মাতার পদে উপযুক্ত হইয়া ঐ সকল সম্বন্ধের কর্তব্য সাধন করিতে সক্ষম হইবেন। অতি কঠিন কঠোর বিদ্যাসকল সাধনার্থ মস্তিষ্ক বিলোড়ন করা স্ত্রীপ্রকৃতিবিরুদ্ধ। দীর্ঘকাল পর্যন্ত একাগ্র চিন্তে কেবল একটি তত্ত্বের, সুস্বাণুসূক্ষ্ম আলোচনা তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক নহে।’ এই সূত্রে বহুকাল পরে লেখা রবীন্দ্রনাথের বিদ্রূপাত্মক একটি কবিতা মনে পড়ছে। ‘প্রহাসিনী’র ‘নারীর

কর্তব্য' পড়লে বোঝা যায় বামাবোধিনীর ভাবনার রেশ তখনও সমাজে ভালোই রয়েছে, এখনও যে একেবারে অবলুপ্ত তা বলতে পারি না।

পুরুষের পক্ষে সব তত্ত্ব মস্ত্র মিছে
মনু পরাশরদের সাধ্য নাই টানে তারে পিছে,
বুদ্ধি মেনে চলা তার রোগ;
খাওয়া ছৌওয়া সব তাতে তর্ক করে বাধে গোলযোগ।
মেয়েরা বাঁচাবে দেশ, দেশ যবে ছুটে যায় আগে।
হাই তুলে দুর্গা বলে যেন তারা শেষ রাতে জাগে;
* * * * *

মেয়েরাও বই যদি নিতান্তই পড়ে
মন যেন একটু না নড়ে।
নতুন বই কি চাই। নতুন পঞ্জিকাখানা কিনে
মাথায় ঠেকায় তারে প্রণাম করুক শুভদিনে।
আর আছে পাঁচালির ছড়া,
বুদ্ধিতে জড়াবে জোরে ন্যাশনাল কালচারের দড়া।
দুমতি দিয়েছে দেখা; বঙ্গনারী ধরেছে শেমিজ
বি. এ. এম এ. পাস করে ছড়াইছে বীজ
যুক্তিমানা ঘোর স্লেচ্ছতার।
ধর্মকর্ম হল ছারখার।
শীতলামায়ীকে করে হেলা,
বসন্তের টিকা নেয়; 'গ্রহণের বেলা
গঙ্গানানে পাপ নাশে'
শুনিয়া মুর্খের মতো হাসে।'

পরাক্রান্ত হিন্দু জাতীয়তার সঙ্গে সুকৌশলে নারীর বন্ধনকে গৌরবান্বিত করে গেঁথে মেয়েদের পারিবারিক ও জাতীয় সংহতির প্রতিমা করে তোলা হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিক্রিয়াশীল প্রচেষ্টাকেই নির্মম ভাবে আঘাত করেছেন।

'এমিল' উপন্যাসে সমাজ পরিবর্তনের প্রধান দিশারি দার্শনিক রুশো পর্যন্ত এমিল ও সোফির আলাদা ধরনের শিক্ষার কথা বলেছেন। এমিল হবে কর্মঠ, সাহসী, আত্মবিশ্বাসী আর সোফি হবে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল আদর্শ স্ত্রী ও মা। উনিশ শতকে কলকাতার সবচেয়ে প্রগতিশীল ব্রাহ্মসমাজও প্রায় রুশোরই মতো ভাবছেন। তত্ত্ববোধিনী লিখছেন—'স্ত্রী ও পুরুষ জাতির প্রকৃতির বিভিন্নতার নিমিত্ত দুইয়ের পক্ষে এক প্রকার শিক্ষার উপযোগিতা অসম্ভব। স্ত্রীপ্রকৃতি স্বভাবত হৃদয়প্রধান, পুরুষপ্রকৃতি স্বভাবত বুদ্ধিপ্রধান অতএব তাহাকেই প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা বলা যাইতে পারে যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হৃদয়ের উন্নতি এবং গৌণ উদ্দেশ্য বুদ্ধির উন্নতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ., এম. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য যেরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহা বুদ্ধিপ্রধান শিক্ষা, হৃদয়প্রধান শিক্ষা নহে, অতএব ঐ প্রকার শিক্ষা স্ত্রীজাতির উপযুক্ত শিক্ষা নহে।' এইসব দ্বিধা এবং পিছুটানের মধ্যেই ১৮৭৮ সালের ২৭ এপ্রিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট নারীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভের দরজা খুলে দিলেন। কাদম্বিনী এবং চন্দ্রমুখী বসু প্রথম মহিলা স্নাতক হবার সম্মান লাভ করলেন।

সাধারণভাবে শিক্ষা এবং নারীশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে অনিবার্য ভাবে সমাজে নারীর অবস্থানের ছকটা বদলাচ্ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে অনেক দ্বিধা, স্ববিরোধের জট আছে কিন্তু তাঁর লেখায় স্পষ্ট ধরা পড়েছে নারী সম্পর্কে চিন্তাধারার বদল। যুগসন্ধির কবি বলা হলেও ঈশ্বর গুপ্তের নারীভাবনায় প্রাচীনের অনুবর্তনই বেশি। ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিম বলেছেন, ‘যে শিক্ষাটুকু স্ত্রীলোকের নিকট পাইতে হয়, তাহা তাঁহার হয় নাই, যে উন্নতি স্ত্রীলোকের সংসর্গে হয়, স্ত্রীলোকের প্রতি স্নেহভক্তি থাকিলে হয়, তাঁহার তাহা হয় নাই।’ নীরদ সি চৌধুরীর অধিকাংশ মতামতই একপেশে কিন্তু ‘বাঙালী জীবনে রমণী’ গ্রন্থে তাঁর একটি মন্তব্য প্রাধান্য যোগ্য, তিনি বলেছেন মেয়েদের শিক্ষা করতে হবে এই ধারণা এবং মেয়েদের যে শিক্ষা করা যায় এই ধারণা বাঙালি সমাজে প্রায় একসঙ্গে এসেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র ‘সাম্য’ প্রবন্ধটি নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন এমনকি জন স্টুয়ার্ট মিলের প্রসঙ্গ উঠলে পরবর্তীকালে তিনি বলেন, ‘এক সময় মিলের আমার উপর বড়ো প্রভাব ছিল, এখন সেসব গিয়াছে।’ ‘সাম্য’ প্রকাশিত অভিমত পরবর্তীকালে তিনি আর প্রচার করতে চাননি এটি ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু তাতেই গ্রন্থটির মূল্য কমে যায় না। ‘সাম্য’ উনিশ শতকীয় মনন চর্চার একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানমনস্কতার যে পরিচয় বঙ্কিম এই গ্রন্থে দিয়েছেন তার তুলনা পাওয়া ভার। মেয়েদের সামাজিক অবস্থানের ওপর প্রকৃতপক্ষে সব দিক দিয়ে তিনি সম্মানী আলোকপাত করেছেন এবং অগ্রিয় সত্য ভাষণে তিলমাত্র কুণ্ঠিত হননি। যদিও বিধবাবিবাহ সম্পর্কে নির্দিষ্ট হতে পারেননি কিন্তু এটুকু বলেছেন, ‘বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল।’ কীভাবে বঙ্কিম এই প্রবন্ধে নারীর সংকটগুলিকে দেখেছেন কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে তা লক্ষ করা যাক,

‘একজন গৃহকর্ম লইয়া বিদ্যাশিক্ষায় বঞ্চিত হইবে, আর একজন গৃহকর্মের দুঃখে অব্যাহতি পাইয়া, বিদ্যাশিক্ষায় নির্বিঘ্ন, হইবে, ইহা স্বভাবসঙ্গত হউক বা না হউক, সাম্যসঙ্গত নহে।’

‘পুরুষের যত প্রকার দৌরাশ্রয় আছে, স্ত্রী পুরুষে যত প্রকার বৈষম্য আছে, তন্মধ্যে ... স্ত্রীগণকে গৃহমধ্যে বন্য পশুর ন্যায় বদ্ধ রাখার অপেক্ষা নিষ্ঠুর, জঘন্য অধর্মপ্রসূত বৈষম্য আর কিছুই নাই। আমরা চাতকের ন্যায় স্বর্গমর্ত্য বিচরণ করিব, কিন্তু ইহারা দেড়কাঠা ভূমির মধ্যে পিঞ্জরে রক্ষিতার ন্যায় বদ্ধ থাকিবে।’

‘পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় বিধিগুলি অতি ভয়ানক ও শোচনীয়। পুত্র পৈতৃক সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ অধিকারী, কন্যা কেহই নহে। পুত্র কন্যা উভয়েরই এক ঔরসে, এক গর্ভে জন্ম; কিন্তু পুত্র পিতৃমৃত্যুর পর পিতার কোটি মুদ্রা সুরাপানাদিতে ভস্মসাৎ করুক, কন্যা বিশেষ প্রয়োজনের জন্যও তন্মধ্যে এক কপর্দক পাইতে পারে না’।

‘একজন স্ত্রী সতীত্ব সম্বন্ধে কোনো দোষ করিলে সে আর মুখ দেখাইতে পারে না; হয়তো আত্মীয়স্বজন তাকে বিষপ্রদান করেন; আর একজন পুরুষ প্রকাশ্যে সেইরূপ কার্য্য করিয়া রোশনাই করিয়া, জুড়ি হাঁকাইয়া রাত্রিশেষে পত্নীকে চরণরেণু স্পর্শ করাইতে আসেন।’

‘সর্বনিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোক ভিন্ন এদেশীয় স্ত্রীগণ উপার্জন করিতে পারে না। অনাথা বঙ্গবিধবাদিগের অন্নকণ্ঠ লোকবিখ্যাত।’

‘পুরুষকৃত ব্যবস্থাবলির উদ্দেশ্যই তাই; যত প্রকার বন্ধন আছে, সকল প্রকার বন্ধনে স্ত্রীগণের হস্তপদ বাঁধিয়া পুরুষ পদমূলে স্থাপিত কর—পুরুষগণ স্বেচ্ছাক্রমে পদাঘাত করুক, অধম নারীগণ বাঙালিসম্পত্তি করিতে না পারে।’

মনে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রমর হিন্দুনারীর মজ্জাগত সংস্কার সদর্পে তুচ্ছ করে স্বামী গোবিন্দলালকে লিখতে পেরেছিল ‘যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি; যতদিন তুমি বিশ্বাসী ততদিন আমারও বিশ্বাস।’ ‘সাম্য’ প্রবন্ধের উদ্ধৃত অংশগুলি তো প্রখরতায় তুলনীয় রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের দীপ্ত রচনাগুলির সঙ্গে। ১৩১১’র ভাদ্রে ‘নবনূর’-এ রোকেয়া লিখেছিলেন বিস্ময়জনক ধর্মী ‘আমাদের অবনতি’। নারী এবং সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কটিকে নির্মোহ ভঙ্গিতে তিনি যেভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন তা আজও আমাদের আমূল কাঁপিয়ে দেয়, ‘আমরা যখনই উন্নত মস্তকে অতীত ও বর্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখনই সমাজ বলে, ঘুমাও ঘুমাও, ওই দেখ নরক, মনে বিশ্বাস না হইলেও অন্তত আমরা মুখে কিছু না বলিয়া নীরব থাকি। আমাদেরকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ওই ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।’

ফিরে আসি উনিশ শতকের শেষ দিকে, নবজাগ্রত চৈতন্য এবং শিক্ষার ধাক্কায় আমাদের সনাতনী সমাজের আচার-সংস্কারের ভিত টলে উঠেছিল এবং তার চিহ্নগুলি খুব স্পষ্টভাবেই আঁকা হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাসে। বাঙালির আত্মসংকট, আত্মানুসন্ধান এবং স্বাধীন ব্যক্তিত্বের অভিলাষ কীভাবে দেখা দিচ্ছিল আর তারই পটে নারীর সামাজিক পারিবারিক অবস্থান কীভাবে বদলাচ্ছিল একটি গল্পকে তার উদাহরণ হিসেবে নিচ্ছি। গল্পটির নাম ‘ত্যাগ,’ রবীন্দ্রনাথ গল্পটি ‘সাধনায়’ প্রকাশ করেছিলেন ১২৯৯, বৈশাখে। গল্পের নায়ক হেমন্তের পিতা স্বগ্রামের প্যারিশংকরকে সমাজে পতিত করেন এবং দেশছাড়া করেন। প্যারিশংকর অদ্ভুত উপায়ে এক নির্মম প্রতিশোধ নেন। কুসুম নামী একটি সুন্দরী কায়স্থ বালবিধবাকে কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যা বলে চালিয়ে দেন, তার সঙ্গে হেমন্তের প্রেম ও পরিণয়ে সাহায্য করেন। তারপর হেমন্তের বোনের বিয়ে স্থির হল এবং যথারীতি প্যারিশংকর আস্তিনের তলা থেকে গোপন সংবাদটি প্রকাশ করে সহর্ষ ভাংচি দিলেন। গল্পের শেষ অংশটির সঙ্গে ‘দেবীচৌধুরানী’র তুলনা করলে কালের পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রফুল্ল আশ্রয় চাইতে এসেছিল স্বশ্রম হরবল্লভের কাছে, প্রফুল্লর মা-র নামে মিথ্যা কলঙ্ক দিয়েছিলেন প্রতিবেশীরা। হরবল্লভ পুত্রবধূকে গ্রহণ করতে রাজি হননি। হরবল্লভ আর ব্রজেশ্বরের কথোপকথন লক্ষ করা যাক,—‘বাপু, তোমার তিন সংসার মনে আছে?.... প্রথম বিবাহ মনে হয়—সে একটা বাপ্পীর মেয়ে?’

ব্রজ নীরব ছিল এবং বঙ্কিম প্রশংসা করেই বলেছেন। ‘বাপের সাক্ষাতে বাঁশ বছরের ছেলে—হীরার ধার হইলেও সে কালে কথা কহিত না—এখন যত বড় মুখ ছেলে, তত বড় লম্বা স্পীচ ঝাড়ে।’ যদিও নারীর প্রতি নারীর সহানুভূতি লক্ষ করতে তাঁর ভুল হয়নি। ব্রজেশ্বরের মা প্রফুল্লকে গ্রহণ করতেই চেয়েছিলেন কিন্তু হরবল্লভের পুত্রের প্রতি নির্দেশ ছিল কড়া, এর ওপর আর আপিল চলে না, ‘তুমি আজ রাতে তাকে ঝাঁটা মেরে তাড়াইয়া দিবে।’ মনে যন্ত্রণা নিয়েও সম্ভবত ‘পিতা স্বর্গ’ ইত্যাদি স্মরণ করে ব্রজেশ্বরের প্রফুল্লকে বিদায় দিয়েছিলেন। ‘ত্যাগ’ গল্পে হেমন্তের বাবা হরিহর মুখুষ্যেও একই রকম জোরালো রায় দিয়েছিলেন, ‘অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে, আর সময় দিতে পারি না। মেয়েটাকে ঘর হইতে দূর করিয়া দাও।’ হেমন্ত উঠিয়া গিয়া পিতাকে বলিল,

‘আমি কীকে ত্যাগ করিব না।

হরিহর গর্জিয়া উঠিয়া কহিল, জাত খোয়াইবি?

হেমন্ত কহিল, ‘আমি জাত মানি না।’

‘তবে তুই সুদূর হয়ে যা।’

দেবী চৌধুরানীর সমাজপট শেষ অষ্টাদশ শতাব্দী, প্রায় একশো বছরের এ পারে, ‘ত্যাগ’-এর

কালানুক্রমিক, পরিবর্তনটি কিন্তু বৈপ্লবিক। পুরুষের মনে নারীর জায়গার এই স্থানবদল মেয়েদের এগিয়ে দিতে সাহায্য করেছে। ‘একরাত্রি’ গল্পটি (১২৯৯) মনে করা যাক, শৈশবসঙ্গিনী সুরবালাকে এক প্রলয় রাতে একবারের মতো কাছে পেয়েছিল নায়ক, একটি ছোট্ট দ্বীপে তারা কেবল দুজন, —“আজ সমস্ত বিশ্বসংসার ছাড়িয়া সুরবালা আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আমি ছাড়া সুরবালার আর কেহ নাই।’ প্রচলিত সামাজিক সম্পর্কের হুক চুরমার করে দিয়েছে ‘একরাত্রি’ গল্পের আশ্চর্য রোমান্টিকতা। বিদ্রোহিনী গিরিবালাকে আমরা পেলাম ‘মানভঞ্জন’ গল্পে। এই গল্পে আছে বাবু কালচারের দাপটে সে যুগে কলকাতার ধনীবাড়িতে মেয়েদের চূড়ান্ত অপমানের ছবি। গোপীনাথের মতো ধনীব্যক্তিদের অনেকরই বহু উপপত্নী থাকত, একনিষ্ঠ দাম্পত্যে তাদের রুচি ছিল না। গিরিবালার অসাধারণ সৌন্দর্যের তিলমাত্র দাম দিত না গোপীনাথ। তার হৃদয়েশ্বরী অভিনেত্রী লবঙ্গ স্টেজের ওপর চমৎকার মুর্ছা যেতে পারে। প্রত্যাখ্যাত গিরিবালা নিজে নাটকে নেমে স্বামীর ওপর ভয়ংকর প্রতিশোধ নিয়েছে। নষ্টনীড়ের চারু বা চোখের বালির বিনোদিনী এসেছে নতুন যুগের নারীর আনন্দ বিষাদ, আশ্রয়-আবিষ্কার নিয়ে।

বুদ্ধদেব বসু চোখের বালিতে বিনোদিনীর পরিণতি নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। বিহারীর বিবাহ প্রস্তাব বিনোদিনী ফিরিয়ে দিয়েছিল বটে কিন্তু আমরা প্রায়শ ভুলে যাই সমাজসেবায় সে বিহারীর কর্মসঙ্গিনী হতে চেয়েছিল। বিহারী রাজি হতে পারেনি কারণ তার মধ্যে পিছুটান, সংস্কারের জট অনেক প্রবল। বিনোদিনীর দুঃসাহসিক প্রস্তাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সামাজিক পারিবারিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রতিবাদী মেয়েটির সতেজ আধুনিকতা। পরবর্তী কালে চতুরঙ্গের দামিনীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নারীর আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সাধনাকে আরো এগিয়ে দিয়েছেন। মনে পড়বে যোগাযোগের কুমুর তীব্র আঞ্চলিক সংকট, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সাধনা।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মেয়েরা ভালোভাবেই লেখালেখির জগতে এসেছেন। যে লাঞ্ছনা এবং অপমান যুগ যুগ ধরে নীরবে তাঁরা সহ্য করে এসেছেন তা প্রতিবাদযোগ্য মনে করেছেন। শরৎকুমারী চৌধুরানীর ‘আদরের না অনাদরের’ গল্পে দেখছি ঘাটে মেয়েদের আলোচনা।

‘বংশরক্ষার জন্য বৌয়ের আদর নইলে পরের মেয়ে ঘরে এনে জঞ্জাল বহিত নয় জগৎ জুড়ে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের আদর কম। ছেলেটি হয়েছে বলতে দশ হাত বুক হয় — শুনতে কেমন। ঘটাঘটি অমোদআহ্লাদ হয়। সাত ছেলে হলেও অরুচি নেই। মেয়েগুলো কেবল মিথ্যা বহিত নয়।’ কীভাবে পিতৃতন্ত্র সুকৌশলে মেয়েদের স্বজ্ঞাতবিশেষ্যী শত্রুভাবাপন্ন বানিয়ে তোলে তার ছবি এই ঘাটের আলাপে লেখিকা প্রচ্ছন্ন রেখে দেন। ১৮৮৯ সালে কৃষ্ণভাবিনী দাস প্রোজ্জ্বল সাহস ও স্বচ্ছ যুক্তিবোধ নিয়ে উচ্চারণ করেন, স্ত্রী ও পুরুষের, গুণ বলে যা যা কীর্তিত হয়, তার অধিকাংশই সমাজ কর্তৃক আরোপিত।

‘উভয়ের মধ্যেই মানবচরিত্র ও স্বভাব এক প্রকার। তবে জগতের সৃষ্টি হইতে দুই জাতি বরাবর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় জীবনযাপন করিয়াছে; ভিন্ন ভিন্ন অভ্যাসে অভ্যস্ত হইয়াছে; ভিন্ন প্রকার শিক্ষা লাভ করিয়াছে ও ভিন্ন ভিন্ন কাজে উৎসাহ পাইয়াছে, প্রতি জাতি ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে বিশেষরূপে শিক্ষিত ও পারদর্শী হইয়াছে, সেই কারণে উহাদের মানসিক ভাবের এত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আর সেই জন্যই ‘এটা পুরুষের কাজ’, ‘ওটা স্ত্রীলোকের কাজ’ ‘ওটা পুরুষের গুণ’ ‘ওটা স্ত্রীর গুণ’—এইসব কথা ও ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।’ কৃষ্ণভাবিনীর সমমনস্ক আরো বেশ কয়েকজন লেখিকা দেখা দিলেন। এই প্রবন্ধের পরিসরে সকলের কথা অবশ্য বলা যাবে না। জ্যোতির্ময়ী দেবীর ‘নারীর কথা’ ১৩২৮-এ ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়ে আলোড়ন তুলেছিল। কামিনী এবং জড়বস্তু কাঞ্চনকে এক গোত্রে ফেলে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের

মতবাদের বিরোধিতা ছিল তাতে। পাঞ্জির বিধিনিষেধের তালিকায় চূড়ান্ত অপমানজনক ‘স্ট্রীটেলমংস্যমাংস সন্তোষ নিষেধ’ বচনটির প্রতিবাদ ছিল।

মেয়েদের আত্মপ্রকাশ ঘটছিল ধীরে ধীরে। রবীন্দ্রনাথের ‘স্ট্রীর পত্র’ গল্পের মৃণালের কথা আমাদের মনে পড়বে। চারদিকের স্তব্ধ বাধা পার হয়ে এই অগ্রগতির ইতিহাস একই সঙ্গে যন্ত্রণার ও আনন্দের। স্বর্ণকুমারী দেবী, শান্তা দেবী, সীতা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের রচনায় দেখা দিল চেতনার নব দিগন্ত। কিন্তু সমাজের বৃহদংশে তখনও যে জমট বাঁধা অন্ধকার পরবর্তীকালে আশাপূর্ণা দেবী তাঁর দলিলীকরণ ঘটিয়েছেন প্রথম প্রতিশ্রুতি ও সুবর্ণলতা উপন্যাসে। এরই মধ্যে দেশে শুরু হয়েছে স্বাধীনতা আন্দোলন। মেয়েরা যোগ দিয়েছেন সম্ভ্রাসবাদী আন্দোলনেও। দুটি বিশ্বযুদ্ধ, ত্রিশের দশকের মন্দা, ফ্যাসি ও নাৎসি শক্তির উত্থান ও পরাক্রম, সাম্যবাদের প্রচার—বিভিন্ন চিন্তাধারার স্রোত ও প্রতিস্রোত চলছিল। এই প্রসঙ্গে বলা যায় সুলেখা সান্যাল ও সাবিত্রী রায়ের রচনার সম্পূর্ণ মূল্যায়ন হয়তো এখনও হয়নি।

বাঙালি সমাজজীবনে চল্লিশের দশককে বলা যায় ঝড় আর বিপর্যয়ের সময়। দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্ত সমস্যা চেনা জীবনের ছক বদলে দিল। অর্থনৈতিক চাপে ভেঙে গেল সংস্কারের বেড়া। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প নিয়ে সত্যজিৎ রায় অসাধারণ ‘মহানগর’ চলচ্চিত্রটি করেছিলেন। কিন্তু এই বিপন্ন সময়ের মহাকাব্যিক রূপায়ণ ঘটেছে ঋত্বিক ঘটকের ‘মেঘে ঢাকা তারা’য় — নীলকণ্ঠ এক নারীর কাহিনিতে। তখন পরিবারকে বাঁচাতে মেয়েরা জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন শিক্ষা, শ্রম যেকোনো হাতিয়ার নিয়ে। কিন্তু তার মধ্যে আবার ফিরে আসছে শোষণের ছক। দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের বাজ্ঞনাকে এনেছেন ঋত্বিক —পরিবারের বেদিমূলে বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে নীতাকে। তবে এইসব ভাঙচুরের মধ্য দিয়েই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, স্বনির্ভরতার স্বাদ পেয়েছেন মেয়েরা। তাদের নতুন সামাজিক সংস্কার রচিত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় জীবিকার্জন ও সংসার দু-দিকের চাপে আজকের নারীর একটি কঠিন সংকট আছে। সন্তান পালনে সম্পূর্ণ নিবেদিত লালয়িত্রী নারীর রোল মডেল সমাজ বদলাতে ইচ্ছুক নয়। স্বামী, সন্তান, পরিবার মেয়েদেরও মানবিক অস্তিত্বের ভর, অন্যদিকে শিক্ষাগত উচ্চাশা, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, স্বাধীন জীবিকার দাবিও ফেলে দেবার নয়। কীভাবে এই দুটি দিকের সমন্বয় করা যায়? মাতৃত্বের জন্য নির্দিষ্ট চার মাস ছুটির পর পুরো সময়ের জন্য কাজে ফিরছে একটি মেয়ে। অনেকের কাছে মনে হতে পারে দারুণ অগ্রগতি, fantastic progress. কারণ আগে ওই কাজে ব্যয়িত হত মায়ের জীবনের কুড়ি বৎসর। মেয়েরাই আজ যেন ধন্দে পড়েছেন কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক। এমনকি ডেবেরা ফালোসের মতো কেউ কেউ বলছেন, ‘Progress such as this is a step not toward liberation but toward enslavement to career that has been the least attractive aspect of masculine success.’ তবে কি সংসার এবং জীবিকা এই দুটির মধ্যে যে-কোনো একটিকে নির্বাচন করতে হবে? সমস্যাটি মেটাতে হবে ব্যক্তিগত স্তরে? অনিবার্য প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে সংসার ধরে রাখার সব দায় কি মানবীর? এই চাপানউতारे বিবাহ এবং পরিবার আদিম এবং অপরিহার্য দুটি প্রতিষ্ঠান প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়াচ্ছে। স্নায়ুযুদ্ধের আঁচ লাগছে অসহায় শিশুসন্তানের অস্তিত্বে। আসলে অন্তর্গত ছকে সমাজ এখনও পরিবর্তনবিমুখ। নারী পুরুষের লড়াই নয়, সহযোগিতা ও সমবেদনাই একবিংশ শতাব্দীর ভাবনা হওয়া উচিত। মেয়েরা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেবী নয়। রক্তমাংসের সাধারণ মানুষী, দশপ্রহরণধারিনী হয়ে দশ হাতে সব কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। বেটি ফ্রিডান যথার্থ বলেছেন, ‘They need a basic restructuring of the workplace and of the home, and innovative services

from community and society — from the corporations and businesses where they work, from their husbands at home and above all from government.'

পুরানো পথে মেয়েরা আর ফিরবে না, তারা ডানায় রৌদ্রের গন্ধ পেয়ে গেছে। এই শতাব্দীতে সমাজের সঙ্গে মেয়েদের বোঝাপড়ার নতুন ইতিহাস নিশ্চয়ই রচিত হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণের জন্যই নারীপুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা আজ একান্ত জরুরি। প্রবন্ধ শেষ করতে চাই কবিতা সিংহর 'আমি সেই মেয়েটির' কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করে। বেতুন কলেজ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে প্রকাশিত এই কবিতাটিতে কালান্তরের পথে মেয়েদের যাত্রার ছবিটি আঁকা আছে।

আমি প্রণাম জানাই সেই প্রথম আগুনকে
যার নাম বর্ণপরিচয়
সেই অগ্নিশুদ্ধ পরম্পরাকে
সেই সব পুরুষ রমণীকে
যাঁরা উনবিংশ শতাব্দীর অন্ধকারের হাতলে
জ্ঞানের শিখা জ্বালিয়ে
এক জন্মেই আমাকে জন্ম-জন্মান্তরের
দরোজা খুলে দিয়েছেন।

আমি আজ চরিত্রের দিকে যেতে যেতে খুলে ফেলছি
পণ দিয়ে কেনা বিবাহের ঝুটো গয়না
সংস্কারের বেনারসী
আমাকে ভুলিয়ে রাখার পানের বাটা
জর্দার কৌটো
আমাকে পায়াতারি করানোর জন্য পিতা স্বামী স্বশুরের পদস্থ পদবী

আমি আজ প্রেমের জন্য ফেলে যাচ্ছি আরাম
স্বোপার্জিত শাকসব্দের জন্য ফেলে যাচ্ছি ক্রীতদাসীর চর্বচোষ্য
জেগে থাকার জন্য ফেলে যাচ্ছি ভাতঘুম
যন্ত্রণার জন্য ফেলে যাচ্ছি সুখ
জ্ঞানের জন্য ফেলে যাচ্ছি অক্ষতা
আনন্দের জন্য ফেলে যাচ্ছি সাফল্য
অমৃতত্বের জন্য ঐশ্বর্য
আমার হতে জ্বলছে দিশারিদের শিক্ষার মহান আগুন
আমিই সেই মেয়েটি আপনারা নিজের দর্পণে দেখে
আমাকে চিনুন।

শিল্প ও সাহিত্য বীতশোক ভট্টাচার্য

পশু শিল্পসাহিত্য রচনা করতে পারে না, মানুষ পারে। পশু শিল্পসাহিত্য চর্চা করতে পারে না, মানুষ পারে। মানুষের শিল্পসাহিত্য রচনা চর্চার ইতিকথার শুরু প্রাগৈতিহাসের সময় থেকে। হাজার সাতশ বছর আগে আফ্রিকার পাহাড়ে মানুষেরা পশু ও মানুষ একে আর খোদাই করে গিয়েছে। হাজার সতেরো আগে পাশ্চাত্যের গুহার গায়ে শিকারি মানুষেরা আনুষ্ঠানিক দরকারে মেটে রংগুলোর জোরালো আঁচড়ে জানোয়ারগুলোর ছবি স্পষ্ট প্রাণবন্ত ও সুন্দর করে একে রেখে গিয়েছে। হাজার ছয় বছর আগে ভারতে বেদ রচিত হয়েছে, মেসোপটেমিয়ার মন্দির গড়ে উঠেছে, মিশরে নলখাগড়ার বাঁশি বাজতে শুরু করেছে। হাজার পাঁচ বছর আগে ক্রিটে যাঁড়ের লড়াইএর চলন হয়েছে। মিশরে স্ফিংস জিজ্ঞাসার মতো জেগে উঠেছে, জেগে উঠেছে রহস্যময় সিঙ্কুসভাতার শিল্পসাহিত্য : আশুনে-পোড়ানো ইটে তৈরি দুর্গ বাড়ি স্নানাগার শস্যাগার, উৎকীর্ণ পাথর, ব্রঞ্জ কপার টেরাকোটার বড়ো ছোটো মূর্তি, পাঠ উদ্ধার করা যায় নি এমন লিপি সম্বলিত শিলমোহর। এইসব স্থাপত্য ভাস্কর্য শিল্পসাহিত্যকে একটি তোড়ায় বাঁধা যাবে কোন সূত্রে?

প্রায় দুহাজার বছর আগে রোমে যখন মুকাভিনেতার ট্রাজেডির অনুষ্ঠান করছে, সেনেকার লাতিন নাটক আবৃত্ত হচ্ছে, চিনে সংগীত-সংসদ গঠিত হয়েছে, গঠিত হয়েছে মেক্সিকোর সূর্যমন্দির, ব্রঞ্জের শিল্পবস্তু নির্মাণ করেছে ভারতীয় জৈনেরা, তখন ওভিড রচনা করছেন মেটামরফসিস। গ্রিসের রোমের বেবিলনের এমনকি প্রাচ্যের মিথ ফোকলোর এমনকি ইতিহাসেরও তালগোল পাকানো কাব্যকে এপিক বলতে দ্বিধা হয় নি। দেশের ঐক্য নেই, কালের ঐক্য নেই, না থাক। বৈচিত্র্যের ঐক্য আছে, রয়েছে রূপান্তরনের একটিই সূত্র: সেখানে রূপান্তরের ফলে মানুষ গাছ হয়ে যায়, মেয়ে হয়ে যায় নক্ষত্র, পশু হয়ে যায় পাথর, আর পরিবর্তনীয়তার এই সূত্রে সব সংগতি, সমূহ বিপর্যাস, সমস্ত অসংলগ্নতা সুযমায় সংহতিতে সৌন্দর্যে মহত্ত্বপূর্ণভাবে ফুটে ওঠে, ফলে ওঠে। আড়াই হাজার বছর আগেকার গীতায় (৭.৭) বলা হয়েছে : সূতোয় যেমন করে মণিসমূহ গাঁথা হয় সেরকমভাবে সব কিছুই আমাতে অনুগত। সব শিল্পসাহিত্য অনুগত যাতে সেই সূত্রটি কী? প্রথম কি দ্বিতীয় শতকের খরোষ্ঠী লিপিতে গাঙ্কারী প্রাকৃতে লেখা ভারতের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিটি ধর্মপদ-এর, বার্চগাছের একটি ছালে রয়ে গেছে এই প্রকীর্ণ লিখন : নিপুণ মালাকর যেমন পুষ্প প্রচয়ন করে সেরকম কে সুদেশিত ধর্মপদ চয়ন করবে। মণির হোক বা ফুলের হোক, মালাগথনবিকল্প প্রাচীন ভারতের চৌষট্টি কলার একটি।

শিল্প ও সাহিত্যের বিচিত্র ও জটিল সম্পর্ক সাহিত্যের অন্তরঙ্গ বিষয় হলেও সাহিত্যতত্ত্বের বহিঃপ্রসঙ্গ মনে হয়। সাহিত্যের তত্ত্বের সঙ্গে যেমন সমাজ রাজনীতি দর্শন বিজ্ঞান এসবের বহিরাশ্রয়ী সম্বন্ধ এও তেমনি। নাচ গান ছবি স্থাপত্য ভাস্কর্য এ সমস্ত থেকে কবিতা প্রেরণা পেতেই পারে। ক্যান্টীয় নাচ, কাদম্বরী দেবীর ছবি, তাজমহল রবীন্দ্রনাথের রচনায় অভিঘাত হানতে পারে। প্রকৃত ব্যক্তি ও বস্তুর মতো শিল্পকর্মও এভাবে কবিতার প্রসঙ্গ হয়ে ওঠে। নিশাকালে নদীতীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির এবং ভরসেলস নগরে রাজপুরী ও উদ্যান বিষয়ে মধুসূদনের সনেট রয়েছে। এক্ষেত্রে শিবমন্দির যত চেনা ভাসাই-এর প্রাসাদ উদ্যান বাংলাভাষী পাঠকের তত অচেনা। অপরিচয় এভাবে অনভিপ্রেত দূরত্ব সৃষ্টি করে। ক্লদ লরেনের ছবি কিটসের ওড অন এ গ্রিশন আর্নএর প্রেরণা হয়েছিল। সে ছবির অনুলিপি বা সে-আর্ন যিনি চোখে দেখেন নি, গ্রিক স্কলতেল মদের নানাধরনের পাত্রের থেকে ভস্মাধারকে যিনি আলাদা করে দেখতে শেখেন নি, তাঁর পক্ষে ওই

ওডের মর্মস্ব হওয়া কঠিন। অরফিউস ইউরিদিসের ছবি দেখে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা লিখেছিলেন কিন্তু রিলকের মতো তিনি গ্রুপদি পাশ্চাত্য শিল্পকলায় জন্মান নি, বস্তুর সে তন্ময় ধ্যান তাঁর ছিল না, আর রিলকের কল্পনাপ্রতিভার বল তো ছিলই, ফলে তাঁর অরফিউসের প্রতি নিবেদিত সনেটগুচ্ছ সমুদ্রীর্ণ কবিতা হয়েছে। বিষ্ণু দেব কবিতায় পিৎসিকাটোর ঘূর্ণির উল্লেখ পাওয়া গেছে। যে সব বাংলাভাষী পশ্চিম অপেরা শোনেন নি, শুনলেও তারযন্ত্রে কখন আঙুলের টান পড়ছে, আর কখনও সংকেতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কখন ছড়ের তান উঠছে তার তারতম্য ধরবার মতো কান তৈরি করে উঠতে পারেন নি তাঁদের কাছে ঐ ইতালিয় বাদনের পরিভাষা কোনও ব্যঞ্জন্য বহন করে আনবে না। কবিদের চিত্র এবং চিত্রকর বিষয়ে বিশেষ পছন্দ ও বিশেষ ধারণা থাকতে পারে, কিন্তু তাঁদের রচনার সঙ্গে ঐসব অভিমত ও তত্ত্বের অম্ময় সাবধান হয়ে করা দরকার। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে যামিনী রায় বিষয়ে সম্ভর্ষ রচনা করেছেন, বুদ্ধদেব বসু কবিতা লিখেছেন। তিনজনের মধ্যে কার কবিতার সঙ্গে যামিনী রায়ের ছবির কোন দিক দিয়ে কতটুকু যোগ রয়েছে এ প্রশ্নে সতর্ক হতে হয়। বিষ্ণু দেব কবিতায় যামিনী রায় না গোপাল ঘোষ কে বেশি প্রেরণা সঞ্চার করেছেন এরকম প্রশ্নও এখানে আনুষঙ্গিক হয়ে আসে। রং সম্পর্কে গ্যোটের নিজস্ব তত্ত্ব কাব্যকে কীভাবে রঞ্জিত করেছে? মাইকেলএঞ্জেলোর কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথের ছবি কী একইরকমভাবে উৎকর্ষের সীমায় পৌঁছেছে? উইলিয়ম ব্রেক ও ডি এইচ লরেন্সের কবিতা ও ছবি কী একই এলাকাভুক্ত? এমন সব প্রশ্ন এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

উলটোদিকে সাহিত্য ছবি ও গানের বিষয় হতে পারে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ এর ভালো নমুনা। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা পরে গীতিকরূপ পেয়েছে। গীতিকবিতা আর গীতিনাট্য মূর্ছনার যোগে একাকার হয়েছে। রেনাসেঁসের ইতালির ছবিতে দেখা যাচ্ছে হুদ বন পাহাড়ের রমণীয় পরিবেশে পুরুষ মহিলারা কোলে খাতা রেখে ম্যাদরিগল গাইছেন, ইতালির সে-প্রেমের কবিতা বা গান হয়তো মারেনসিও বা মন্টেভার্ডির মতো ইতালিয়েরই রচনা। এইখানে আইকনের প্রসঙ্গ আসে। আইকন গীতিকবিতা এবং ছবিকে এক সূত্রে বাঁধে। রেনাসেঁসের রচনায় আইকনের ব্যঞ্জন্যগর্ভ উদাহরণ প্রচুর। গীতগোবিন্দে অনুপ্রাসের যে রণন সেই স্বরছবি বা টোনকালারে ধ্বনির প্রতিমায়ন ঘটেছে। ম্যাদরিগলের ছবিটিতে ঐ খোলা খাতাও চিহ্নের প্রতিমায়ন, পাশ্চাত্য স্বরলিপি চোখে ছবির আভাষ বয়ে আনে। শিল্পের প্রতীক এরকম করে সাহিত্যের সম্পর্ক ও প্রভাব অঙ্গীকার করে নেয়।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের চিত্র ও সংগীতের সক্রিয় ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। সাহিত্য ছবি হতে চায়, পাশ্চাত্য কংক্রিট কবিতায় প্রত্যক্ষ ছবি আছে, ভালো কাব্যের গুণ নেই। দেবুসির অর্কেস্ট্রার প্রেরণায় রচিত ফনের দিবাস্বপ্নে মালার্মে যে সাংগীতিক ব্যঞ্জন্য আরোপ করতে চেয়েছেন তা কবিতাটিকে অনেকটাই দুর্বোধ্য করেছে। ছবি ও গান এবং ছবি বা গানের উৎস থেকে সাহিত্য তার উৎসাহ ভরে নিক এ ব্যাপারে কোনও কোনও আলোচকের পছন্দ নয়। তাঁরা ঐক্য নয়, বিভাজনের পক্ষপাতী। কিন্তু সাহিত্যের আলপথ ধরে চলতে চলতে ছবি এবং গানের মাটিতে পা পড়ে থাকে এটুকু অস্বীকার করবার উপায় নেই। বাস্তবে কবিতা কখনও মূর্ছনার বিভঙ্গে বা বর্ণিকাভঙ্গের শুদ্ধতায় পৌঁছতে পারবে না। কেউ হয়তো বলবেন মোহিতলালের কবিতা ভাস্কর্যধর্মী। যেন হিমশীতল শ্বেতপাথরের নিস্তকতায় সুস্পষ্টভাবে সমাহিত। কিন্তু মোহিতলালের কবিতা তো আবেগে সন্তপ্ত, শীতল নয়। শাদা হাসির প্রতীক, মোহিতলালে হাসি নেই। মোহিতলাল স্তব্ধ নন, সশব্দ। মোহিতলালের মন্ত্রমন্ত্র বচনভঙ্গি প্রতিটি পদপাত পৃথকভাবে চিনতে সাহায্য করে, এইমাত্র।

রবীন্দ্রনাথ বাণভট্টর রচনায় চিত্রশৃঙ্খলের উল্লেখ করে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যসমালোচনায় এক নতুন গতির সঞ্চার করেছিলেন। রঘুবংশ থেকে প্রেরণা নিয়ে হয়তো ভবভূতি তাঁর উত্তররামচরিত-এ ভিন্ন ধরনের পিকচার-গ্যালারি খুলে বসেছেন। বৈষ্ণব পুরুষ কবিরা যেভাবে রাধার শরীরের ক্রমাঙ্কিত বর্ণনা দিয়েছেন দৃষ্টিবিজ্ঞানীর মত মানুষের চোখ সেভাবে পরপর দৃষ্টব্য বস্তুতে পড়ে না। সমারসেট মম বলেছিলেন যে, কোনও কোনও কথাসাহিত্যিক চরিত্র চিত্রিত করতে গিয়ে ব্যক্তির চেহারা পোশাক এসবের বর্ণনায় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্যয় করেন, কিন্তু তাতে কোনও ফল হয় না। কবিতায় বাক্যপ্রতিমা বা কল্পচিত্রের গুরুত্বপূর্ণ ও সক্রিয় ভূমিকা ক্রমশ প্রধান স্বীকৃতি পেয়েছে।

পালকির গান বা রানার কবিতায় পালকিবাহক বা রানারের চলার সুর কতটা ধরা পড়েছে তার নিরূপণ এখন আরও কঠিন। গীতিকবিতার গীতিময়তা সাংগীতিক মূর্ছনা থেকে আলাদা ব্যাপার। সংস্কৃতে স্বরধ্বনির অনুশ্রাস স্বীকৃতি পায় নি, কিন্তু সংস্কৃত কবিতা বিন্যাসে ছন্দে স্পন্দে অতুলনীয়ভাবে ব্যঞ্জিত হতে পেয়েছে। ভেরলেনএর মতো প্রতীকবাদী কবিরা কবিতাকে প্রাসঙ্গিক যুক্তিগ্রাহ্য তাৎপর্যপূর্ণ গঠন ও বয়নের বিপরীতে শুদ্ধ সুরের কোঠায় তুলে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁদের সে সাফল্য বা ব্যর্থতা সংগীত বা কবিতা কারও নয়। ডাক্তার জিভাগো বই-এর শেষে জিভাগোর কবিতা রচনার নিহিত সুরটি বেঁধে দিতে চেয়েছে। এই উপন্যাসের চলচ্চিত্র-রূপে লারার থিমটি বেজে উঠেছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তর অর্কেস্ট্রায় আঠেঁরো শতকি হার্পসিকর্ড বেজে চলছে না, বরং আধুনিক ভায়োলিন চেলো পিয়ানো পিকোলো ফুট হ্যারিনেট হার্প হর্ন ট্রমপানি ট্রামপেট ট্রমবোন পারকাসন বাজছে : বিশ শতকের পশ্চিমি অর্কেস্ট্রাই এখানে বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। এ চাইনিজ কোর্ট অর্কেস্ট্রা নয়, রবীন্দ্রনাথ ও সুনীতিকুমার যা শুনেছিলেন সেই জাভানিজ গামেলান আসাম্বল নয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সুধীন্দ্রনাথের অর্কেস্ট্রাও দীর্ঘকবিতায় ব্যবহৃত পুনরাবৃত্ত মোটিফ এবং এর ভাব সংস্থানের বৈপরীত্য ও সুষমায় সমন্বিত।

চর্যাগান বৈষ্ণবগান শাস্ত্রগান এসব কবিতা গীত হওয়ার জন্যই রচিত হয়েছিল। আধুনিক কালেও রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল নন্দর প্রমুখ কবি ও গীতিকার একই ব্যক্তি। কিন্তু তাঁদের ক্ষেত্রে কবিতা রচনা ও গীতি রচনা কোনো সমসাময়িক ও সংলগ্ন প্রক্রিয়া কিনা তা যথাযথভাবে বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য গীত হওয়ার পূর্বে সংলাপও সেখানে সুরে সমর্পিত। বৈষ্ণব পদাবলির প্রাথমিক বিভাজন ঘটেছিল রাগতাল অনুযায়ী, কিন্তু যে একগুচ্ছ বৈষ্ণবগানকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে সেটি গান রসকীর্তন রূপে শুনলে তাদের সৌন্দর্য যে বহুগুণিত হয়ে প্রকাশ পাবে এমন নয়। সংহত সংবদ্ধ রূপের জন্যই যে গীতিকবিতা গীতিমূল্য পায় এমন নয়, বরং দেশি বিদেশি অনেক গান আছে যাদের কথা শাদামাটি কিন্তু গান হয়েই সাধারণত সেগুলি সাফল্য পেয়েছে। ভালো কবিতা সুরে অর্পিত হলে আরও ভালো হয় কিনা এ বিষয়ে বুদ্ধদেব বসু ও আবু সয়ীদ আইয়ুবের অমীমাংসিত বিতর্ক ছিল। এই অনুযুগে মনে পড়ে আইয়ুব বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য প্রত্যাশিত সাফল্য পায় না তার কারণ গীতি পরিবেশনের তুলনায় নৃত্যের উপস্থাপন গুণগতভাবে দীন হয়ে পড়ে। শ্রেষ্ঠ কবিতার অভিযাত্রা তাই কবিতার দিকে, শ্রেষ্ঠ সংগীত তাই মূর্ছনায় আত্মস্থ। কবিতা এবং সংগীতের তুল্যমূল্য অভিঘাতের কথা কেউ যদি বলেন তাহলে তা যতটা না নান্দনিক নিরিখ তার থেকে অনেক বেশি আত্মগত বিচেনার বিষয় হয়ে পড়ে।

তত্ত্ব এবং প্রয়োগের দূরত্ব শিল্প ও সাহিত্যের মিলনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। সংস্কৃত সাহিত্যের ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের আলোচনা হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্যে গ্রিক ও রোমানদের সাহিত্যই ক্লাসিক্যাল।

ভারতের ধ্রুপদি সংগীত, শাস্ত্রীয় সংগীত বা মার্গসংগীতকে সে অর্থে ক্লাসিক্যাল বলা যাবে না। বেদ ঋত্বির দ্বারা বাহিত, সামগানের পরম্পরাও স্বীকৃত, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের বাস্তব রূপটি আমাদের অনায়ত্ত। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে নৃত্য নাট্য সংগীতের আলোচনা রয়েছে, শিল্পসাহিত্যের ভাবগত রসগত তাত্ত্বিক বিচারের কথা মনে রেখেও বলতে হয়, প্রাচীন সংগীত ও প্রাচীন নৃত্য কেমন ছিল তার বাস্তব পরিচয় আমাদের জ্ঞানা নেই, কিন্তু প্রাচীন সাহিত্য বেদ প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির দিক থেকে আমাদের আলোচনার বিষয় হতে পারে।

শিল্পসাহিত্য বাহন না বাহিত? ব্যাপ্তবাহিনী দেবী বাঘকেই বহন করে আছেন, প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্যে এমন দেখা যাচ্ছে। একই রচয়িতা যখন শিল্পী ও সাহিত্যিক যেমন রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা ও ছবি মূলত ভিন্নমুখী। নীরদ সি চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের ছবিকে ছবি বলতে অস্বীকার করেছেন, কেতকী কুশারী ডাইসন ও বিষয়ে একেবারে ভিন্ন মত পোষণ করেন। শিল্পী রামকিঙ্করের জীবননির্ভর উপন্যাসের গদ্যকার সমরেশ বসু এবং চিত্রকর বিকাশ ভট্টাচার্য দুজনে ভিন্ন মেজাজের শিল্পী। রামকিঙ্করের সঙ্গে বিকাশ ভট্টাচার্য একেবারেই মেলেন না। মনে পড়ছে, ঋত্বিক ঘটক তাঁর কিছুটা সমধর্মী রামকিঙ্করের জীবননির্ভর তথ্যচিত্র রচনা করছিলেন। জীবননির্ভর চিত্র, কথাসাহিত্য ও তথ্যচিত্র রচনার ধারাবাহী ঐতিহ্যের পূর্বনির্ধারিত পটভূমিতেই এই শিল্পী সাহিত্যিকেরা না চাইলেও বন্দী, রূপারোপের এই বন্ধন সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা শক্ত। রামকিঙ্করের ভাস্কর্য রবীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্র ভাস্কর্য বালজ্যাক অভিনব বস্তুনির্মাণের উদাহরণ, কিন্তু তা বেশির ভাগ মানুষের সমর্থন পায় না।

দেশকালের পটে শিল্পসাহিত্যের মিলিত আলোচনার একটি স্বীকৃত পন্থা আছে। কিন্তু সময়সমাজের পটভূমিতে সৃষ্ট সব শিল্পসাহিত্যে সমান ধর্ম খুঁজে পাওয়া যাবে না। সোভিয়েত দেশের শিল্পসাহিত্যে সমাজতন্ত্রী বাস্তবতার যে ধার্য নিরিখ তাতে তলস্তয় চেখভ বুনিন পাস্তেরনাক প্রমুখের রচনার সুবিচার সম্ভব হবে না। সমাজতন্ত্রী বাস্তবতার আদর্শ সোভিয়েত দেশে রাষ্ট্রনায়কদের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে, পশ্চিমবাংলার অপসংস্কৃতি নামের একটি অপশব্দের নিরিখে শিল্পসাহিত্যের বিচারের ব্যবস্থা কয়েক দশক আগেও ছিল, আজ আর নেই। যামিনী রায় সাংস্কৃতিক পুনরুৎপাদনকে যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে একটি ছবির নান প্রতিলিপি সুলভে মধ্যবিশ্বের হাতে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। হুসেনের শতক ছবি লক্ষ টাকায় বিক্রির জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মেদিনীপুর শহরের কাছে কর্ণগড়ের মন্দিরে রামেশ্বর শিবায়ন লিখেছিলেন। এ শহরে এখন শিবরাত্রিতেও শিবায়নপালাগায়কেরা বায়না পান না; বাংলার মধ্যযুগের বিরল এই পাথরের মন্দিরের স্থাপত্য অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের প্রয়োজন অনুভূত হয় না। রামেশ্বরের শিবায়নে শিবের খেতমজুর ভীমের বিরাট ভূমিকা আছে, এবং মেদিনীপুর শহরে এখনও বেশ ঘটা করে ভীমের মূর্তি গড়ে পূজা করা হয়ে থাকে। যুগধর্মের নিরিখে শিল্পসাহিত্যের মিলিত বিশ্লেষণে বিপদ আছে। মোহিতলাল বাংলা নবযুগের যে আদর্শ রচনা করেছেন সে আদর্শে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের সাহিত্য বা ছবির নান্দনিক পরিমাপ হতে পারে না। নন্দলাল কংগ্রেসের জন্য স্বাভাবিক জীবন্ত ও সুন্দর চিত্রমাতা রচনা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু মহাত্মার বিশ্বাস ছিল নিসর্গপ্রকৃতির মধ্যখানে আত্মস্থ ভারতীয়ের জন্য আলাদা করে কোনও ছবির প্রয়োজন নেই।

সুতনুকা প্রভুলেখে অস্ত্রত একজন রূপদক্ষের নাম পাওয়া গেছে। যে রূপি বা মুদ্রা তৈরি করে সে রূপদক্ষ এবং মুদ্রাও শিল্প, এবং শুধু সমুদ্রগুপ্তর বীণাবাদন উৎকীর্ণ মুদ্রাই শিল্প নয়। কিন্তু সংস্কৃতসাহিত্যের বিচারে মুদ্রা যেন বিজ্ঞানেরই বিষয়। ভারতীয় শিল্পী-সাহিত্যিকের অনামিক রচনাও পরম্পরাবাহী, ঐতিহ্যের এই ধারা বহন করা পারিবারিক প্রজন্ম শিল্পসাহিত্যের ঐতিহ্যকে

ভেঙে গড়ে এগিয়ে নিয়ে যায়। ঠাকুরবাড়ি রায়চৌধুরী বাড়ির গল্পে ঘরানার ইতিকথা শেষ হয়ে যায় না। নির্মলকুমার বসু, ধৃষ্টিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পুপুল জয়াকর ও মীরা মুখোপাধ্যায় ঘরানার এই ভূমিকা ও উৎকর্ষের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

অন্তর্দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতার মূলে সাহিত্য ও সব শিল্প একসঙ্গে দেখবার নান্দনিক চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। পাশ্চাত্য থেকে ঋণ নেওয়া ক্লাসিক্যাল রোমান্টিক রেনাসেন্স ইত্যাদি শৈলীতে সৃষ্টিসমূহকে বর্গীকৃত ও সুবিন্যস্ত করবার চেষ্টাও সফল হতে পারে নি। মিলান কুন্দেরা তাঁর উপন্যাসের সাংগীতিক গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এই কুন্দেরাই আবার বলেছেন যে, যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও উপন্যাস Kitsch সংস্কৃতির ভাবালু জনপ্রিয় কুৎসিত সৌন্দর্যের শ্রোতে ভেসে যেতে বাধ্য। বস্তুত কিছু শিল্পসাহিত্যের স্পষ্ট পৃষ্ঠপট ও স্পষ্ট অংশগুলো লক্ষ্যগোচর হয়, কিছু শিল্পসাহিত্য শিথিলতর রচনা ও আচ্ছন্ন সীমারেখার সৃষ্টি বলে প্রতীয়মান হয়। মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলীকে যদি প্রথম শ্রেণির রচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে জীবনানন্দের রূপসী বাংলাকে দ্বিতীয় শ্রেণির রচনা বলতে হবে। কিংবা জীবনানন্দের রূপসী বাংলাকে যদি দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করতে হয়, যামিনী রায়ের বাংলার ছবিকে প্রথম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ভাবা যাবে। এভাবে ছবির পারিভাষিক বিবেচনা সাহিত্য ও শিল্পের সংলগ্নতাকে হয়তো কিছুটা প্রত্যক্ষ করে দেখাতে পারবে। কিন্তু জীবনানন্দের রূপসী বাংলাকে কি কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও জসীমউদ্দীনের কবিতার সঙ্গে একটিই বন্ধনীতে স্থান দেওয়া যাবে? যদি না দেওয়া যায়? কেন যাবে না? এই জাতীয় প্রশ্নের বোধহয় কোনও সরলতরল সদুত্তর নেই।

মূলত সাহিত্যানির্ভর আলোচনায় শিল্পসমূহের শাখায়িত ব্যাপ্তি দেখা যায়। বিশেষত সংগীত ও চিত্রের প্রসঙ্গ এ সমস্ত আলোচনায় পুনরাবৃত্ত হয়। ন্যায়চর্চায় দেহলিদীপ ন্যায়ের কথা বলা হয়েছে। একটিই আলো দেহলিতে থেকে ঘর ও বাইরেকে আলোকিত করে। শিল্পসাহিত্যের আলোচনা সেই দেহলিদীপের আলো হয়ে উঠতে চায়। একদিকে নন্দনতান্ত্রিকের সঙ্গে অন্যদিকে সাহিত্যের ঐতিহাসিক আলোচকের সঙ্গে তাকে যোগ রক্ষা করে চলতে হয়। এ জাতীয় আলোচনা তৌলন সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠতে পারে। পাশ্চাত্যে নাটককে আনুষ্ঠানিক শিল্প বলে সাহিত্যের থেকে পৃথক করে ধরা হয়। গীতগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাঙ্গালীকপ্রতিভার আলোচনায় এমন বিভাজন অস্বস্তিকর মনে হতে পারে। ব্রেস্টের কবিতা নাটকীয়ভাবে গান বাজনার যোগে পরিবেশিত হতে দেখা গেছে, আবার সুকুমার রায়ের মতো অদ্ভুত অঙ্কন যোগেও উপস্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে ভেদরেখা নির্ণয় করা শক্ত। পথের পাঁচালী চলচ্চিত্রের পঞ্চাশ বছরে বিভূতিভূষণের উপন্যাস ও সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রের মাঝখানকার ভেদরেখা অনেকখানি মুছে গেছে। অথচ পার্থক্যও তো আছে। রবীন্দ্রনাথ ওবেরামঅরগাঁউতে যে যিশুজীবনীর ঐতিহ্যগত অভিনয় দেখেছিলেন এবং তারই অভিঘাতে পরে যে চিত্রনাট্যধর্মী শিশুতীর্থ লেখেন তা আর তিমিরবরণের শিশুতীর্থের পাঠকশ্রোতার মনে একই প্রভাব না বিস্তার করতে পারে। এক্ষেত্রে এমন উভযোজী পথেই শিল্পসাহিত্যের আলোচককে অগ্রসর হতে হয়। শিল্প-সাহিত্যের মূল্য স্বাশ্রয়ী এ কথা তর্কাতীত। কিন্তু একই সঙ্গে বিভিন্ন শিল্পকে আলোকিত করবার জন্য সাহিত্যের দীপ সাহিত্যের দর্পণটির প্রয়োজন, এ কথায় বোধহয় কোনও বিতর্ক নেই।

শিল্পসাহিত্যের সামগ্রিক আলোচনা নন্দনতন্ত্রের নির্বিশেষ বিমূর্ততায় যতটা না প্রকাশিত হয় স্রষ্টা ও উপভোক্তার সম্পন্ন যোগে বিশেষ রচনার সৌন্দর্যবিশ্লেষণে তার থেকে নিবিড় ও গভীরভাবে প্রকাশিত হতে পারে। ভাব ও রূপের এমন সব বিশেষ আলোচনার ক্রমপুঞ্জিত পরিচয় ভাবনার ইতিহাস রচনার উপযোগী উপাদান হয়ে ওঠে। নীহাররঞ্জন রায়ের শিল্প ও

সাহিত্যআলোচনার মধ্যে এই পথটি খুঁজে পাওয়া যায়। আনন্দ কুমারস্বামী ও মূলকরাজ আনন্দের রচনা পাশাপাশি রেখে দেখলে এই দৃষ্টিকোণের পার্থক্য স্পষ্ট হয়। শিল্পের তুলনায় সাহিত্য কম জনপ্রিয় এবং শিল্পের তুলনায় সাহিত্য কম ইন্দ্রিয়বেদী জেনেও এঁরা শিল্পসাহিত্যের সুস্পষ্ট ও প্রয়োজনীয় আলোচনায় অগ্রসর হতে চেয়েছেন। একজনের ভাববাদী ও অন্যজনের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি শিল্পসাহিত্যকে কীভাবে সফল করে তুলেছে তা দেখার বিষয়। নীহাররঞ্জন রায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যখন প্রাচীন বাংলা ও বাঙালির আলোচনা করেছেন তখন সাহিত্যের ইতিহাস শিল্পের ইতিহাস মিশে গিয়েছে। কিন্তু সংগীতের ইতিহাস স্বেভাবে মেশেনি। শার্দেব বা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দর প্রাচীন ভারতীয় সংগীত সংক্রান্ত আলোচনা আরও একদেশদর্শী। শিল্পসাহিত্যের তুলনামূলক ইতিহাস আলোচনা এছাড়া দুর্লভ কর্ম। বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের মতো মনীষী তাঁদের নিজস্ব ধরনে এ জাতীয় আলোচনার অধিকারী ছিলেন। পরবর্তীকালে নিবেদিতা ও নলিনীকান্তর মতো আলোচকদের মধ্যে ঐ প্রজ্ঞাদীপ্ত উত্তরাধিকার লক্ষ্য করা গিয়েছে। তাঁদের আলোচনার মধ্যে হয়তো পদ্ধতি উল্লেখযোগ্যভাবে নেই, কিন্তু সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক পটভূমি উদার ও গভীরভাবে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে বিবেকানন্দের অভিঘাত নিবেদিতার রচনায় কীভাবে সক্রিয় তা বিশেষ আলোচনার বিষয়—কেননা এই তুলনায় শিল্পসাহিত্য ভাষাগত ব্যবধান অতিক্রম করে এগিয়ে এসেছে। বিবেকানন্দের সঙ্গে সংগীতের সম্পর্ক, নিবেদিতার সঙ্গে ভাস্কর্য চিত্রকলার সম্পর্ক—শিল্পসাহিত্যের তুলনাত্মক আলোচনা এই ভাবেও করা সম্ভব।

শিল্পসাহিত্যের আলোচনার সচল-স্থাপু, মুক্ত-বদ্ধ, ঐক্য-বৈচিত্র্য এ জাতীয় দ্বিক-সম্পর্কে অধিত হতে পারে। কিন্তু এক শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত পরিভাষা নির্বিচারে অন্য শিল্পে প্রযুক্ত হতে পারে না। কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দ যে অর্থে ব্যবহৃত স্থাপত্য ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে নিশ্চয় সেই অর্থে তা ব্যবহৃত হতে পারবে না। রাজেশ্বর মিত্র গ্রামগেয় সামগানের উল্লেখ করেছেন। সামগান বৈদিক যুগের বলে সে গানকে ধ্রুপদি সংগীত বলতে আমরা প্রলুব্ধ হব। কিন্তু গ্রামগেয় শব্দটি তার লোকাযত মূলটি নির্দেশ করছে ফলে তা ধ্রুপদি সংগীতের স্বভাবের বিরোধী। ধ্রুপদি রচনার বৈশিষ্ট্য যে সুষমা ও সংহতি তা যেমন এই শিল্পে বর্তমান তেমন অন্য শিল্পেও তার অস্তিত্ব আছে এমন সম্ভবত্বের সূত্রে অবশ্য সাহিত্য ও শিল্পকর্মকে যুক্ত করে দেখানোর একটি অবশ্য রয়েছে।

শিল্পের ইতিহাস ও সংগীতের ইতিহাস থেকে সাহিত্যের ইতিহাসের শিক্ষণীয় কিছু নেই এমন কথা বলা যাবে না। ধ্রুপদি শব্দটিই শিল্পসংগীতের অনুশঙ্গ বহন করেছে। যে কোনও সাহিত্যসমালোচনা তন্ন তন্ন করে দেখলে চোখে পড়বে তাতে এমন অনেক পরিভাষা আছে যা মূলত শিল্পসংগীত সম্পর্কেই ব্যবহৃত হয়েছিল। বুদ্ধমূর্তি ভারতের দৃশ্যপটে সম্মুখায়িত হয়ে এসেছে। এর ফলে ফারসি বুদ্ধবাচক বৃত্ত শব্দটিই সাধারণভাবে মূর্তি অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকল। কিন্তু অন্য দেবতাদের মতো বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণের আগে বুদ্ধের ধ্যানই অধিকার লাভ করেছে। দশাবতার দশমহাবিদ্যা রাগমালা ইত্যাদির চিত্রণ প্রাথমিকভাবে প্রধানভাবে এ-সব মূর্তির ধ্যানমন্ত্রের উপর নির্ভরশীল।

শিল্পের বিশুদ্ধি এবং সাহিত্যের বিশুদ্ধি রক্ষা করে পরস্পরের মধ্যে মিলন ঘটানো সম্ভব নয়। সংকরায়ন বা মিশ্রণের ফলে নতুন শিল্পরূপ নতুন সাহিত্যরূপ জন্ম নিতে পারে। পটের ছবি ও গান, বাউলের নাচ, বাজনা ও গান, মূল গায়নের গানের সুর তোলা, আবৃত্তির তাল রক্ষা, যাত্রায় বিবেকের গানের মধ্যে এই জাতীয় লৌকিক মিশ্রণের নমুনা আছে। হিম্পানি অপেরা, রুশ ব্যালে, মার্কিন কার্টুন এই ধরনের সংমিশ্রিত শিল্পরূপ রচনা করেছে। সংশ্লিষ্টধর্মী শিল্পরূপই যে সব থেকে জনপ্রিয় পূর্বকার নাটক এবং এখনকার সিনেমা টিভির চলচ্চিত্র তার সবথেকে

ভালো প্রমাণ। প্রায় সব শিল্পসাহিত্যই এদের সংশ্লেষের অঁওতার মধ্যে পড়ে। অপেরাধর্মী চলচ্চিত্রের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা শিল্পসাহিত্যের নিবিড়তর সংশ্লেষে উৎপন্ন। সাউন্ড অব মিউজিক-এর মতো অপেরাধর্মী চলচ্চিত্র প্রত্যহেব গদ্যময় সংলাপকেও কিরকম স্বাভাবিকভাবে সুরওয়াল্য করে তুলেছিল তা দেখবার বিষয়।

শিল্পের পারস্পরিক অন্তর-প্রবেশের এবং শিল্পসাহিত্যের ঐক্যসাধনের মূর্তিমান সাক্ষ্যরূপে পিকাসো গ্যাটে মাইকেলএঞ্জেলো রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের নাম করা হয়ে থাকে। একই শিল্পী-সত্তা একই সময়ে নাকি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শিল্প ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় কীভাবে অধিকার স্থাপনে সমর্থ হয়েছিল তা এক অশেষ জিজ্ঞাসা। ডি এইচ লরেন্স একটি উপন্যাস মনের মতো না হলে তা ফের গোড়া থেকে শুরু করতেন, লরেন্সের ছবির ক্ষেত্রেও কি একই পদ্ধতি অনুসৃত হত? আবেগতপ্ত শারীরিকতার দর্শন তাঁর সাহিত্যে ও শিল্পে কি সমান স্থান অধিকার করেছে? পিকাসোর সাররিয়েলিস্ট কবিতা ও তাঁর অধিবাস্তবিক চিত্রকর্ম কি একই নিরিখে বিচারের উপযুক্ত বিষয়? মহৈশ্বর্যময় রচয়িতার প্রতিভার নানা দিকের বিচ্ছুরণ এভাবে চোখ ধাঁধিয়ে দিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ নানা রঙ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যতটা অসহিষ্ণু নানা ছায়ের শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ততটাই সতর্ক—প্রতিভার এমন আপাত বৈপরীত্যও চোখে না পড়ে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ শিল্পআলোচক সাহিত্যআলোচক। কিন্তু তাঁর রচিত শিল্প এবং তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের সঙ্গে কি ঐ শিল্পআলোচনা সাহিত্যআলোচনা সব সময় মসৃণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি ও সমালোচনার মধ্যে বিরোধ অসংগতি ও স্ববিরোধিতা আছে, কিন্তু তাদের আপাত-বিরোধ ছদ্মঅসংগতি এবং ভাবের উভযোগিতা বলে ব্যাখ্যা করা চলে।

আবৃষ্টিযোগ্য সব কবিতা ভালো কবিতা নয়। শব্দু মিত্র বা কাজী সব্যসাচীর মতো শিল্পীর আবৃষ্টিতে তত ভালো কবিতা নয় এমন রচনাও ভালো কবিতারও প্রভামণ্ডল পেয়ে যায়। কবিতা শব্দনির্ভর, সেখানে শব্দের প্রয়োগ গদ্যের ব্যবহারের থেকে স্বতন্ত্র। ধ্বনিসমতা অনুগ্রাস পুনরাবৃষ্টি প্রতিধ্বনিসৃষ্টি প্রতীকায়ন ও অধিবাস্তবিকতার আশ্রয়ে কবিতা বিশুদ্ধ ও স্বাধীন উচ্চারণে পরিণতি প্রত্যাশা করে। কিন্তু পাঠযোগ্য আবৃষ্টিযোগ্য এমনকী মনে মনে পড়বার বা ভাববার যোগ্য যে কোনও কবিতা কিন্তু কখনও ভাবার জাল কেটে মুর্ছনার মতো উড়ে যেতে পারে না। যে শব্দ দিয়ে কবিতা লেখা হয় সেই শব্দ দিয়েই কবিতার সমালোচনা হয়।

এই নির্ভর কবিতাকে একই সঙ্গে সাফল্য ও ব্যর্থতা এনে দেয়। কিন্তু ছবি বা স্থাপত্য বা ভাস্কর্য ধ্বনিত শিল্প না হলেও সশব্দ সমালোচনা ছাড়া তা আলোচনার কোনও উপায় নেই। ছবি দিয়ে ছবির সমালোচনা করা হয়তো সম্ভব কিন্তু সেই চিত্রভাষা স্রষ্টা ও উপভোক্তা উভয়কেই আয়ত্ত করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায় নামটি যেমন গদ্যময় মনে হয় শেষের কবিতা নামটি সেইরকম কাব্যময় লাগে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তাঁর চার অধ্যায়কে যেন কাব্যময় উপন্যাস রূপেই গণ্য করা হোক, এবং তাঁর শেষের কবিতা যত না কাব্যসুরভিত তার থেকে বেশি শাণিত শব্দপ্রয়োগে নিপুণ। তারশব্দরের কবি উপন্যাসে একজন কবির কথা আছে। সমরেশ বসুর দেখি নাই ফিরে উপন্যাসে একজন শিল্পীর কথা আছে। এইজন্য কবি-কে কাব্যগুণযুক্ত এবং দেখি নাই ফিরে-কে শিল্পগুণযুক্ত এমন ভাবা সমস্যার সরলীকরণ হবে।

জাতীয় ঐতিহ্য পুরাণ প্রতিমার মধ্যবর্তিতায় শিল্প থেকে শিল্পে রূপান্তরণ ঘটাতে সমর্থ হয়। পালযুগের এক অভিলেখে বাগীশ্বরী মূর্তির পায়ের কাছে স্বর্ণব্রীহিবর্ণা শ্রীদেবীর প্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে। এই শ্রী সরস্বতী এবং এই শ্রী লক্ষ্মীও। শিল্পের সঙ্গে সৌন্দর্যচেতনা কল্যাণভাবনা এভাবে

মিশে যায়। যিনি বাগীশ্বরী তাঁকে ধনধান্যের ঈশ্বরী ভাববার মধ্যে কোনও বিরোধ থাকে না। গুপ্তযুগের পর্বতাকৃতি দেওগড় বিষ্ণুমন্দিরের মধ্যে ভাস্কর্যের উদাহরণ, পাথরের জীবন্ত হয়ে ওঠার উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের অহল্যার প্রতি কবিতাতেও পাথর জীবন্ত হয়ে উঠেছে। শিল্প এভাবেই প্রাণবন্ত হয়। জাতককাহিনী রামকথা এমনি করে শুধু ভারতে নয় এশিয়ায় শিল্পসাহিত্যের বাহনে পারস্পর্যে ও বৈচিত্র্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। মামলপুরমের পল্লবশিল্পে গঙ্গাবতরণের দৃশ্যটি বিশাল ও মহৎপূর্ণভাবে উৎকীর্ণ ছিল। প্রবাসী সাহিত্যিক লোকনাথ ভট্টাচার্য এ দৃশ্যটি দেখেছেন, গঙ্গা তাঁর আশৈশব প্রিয়, গঙ্গাবতরণ উপন্যাসে এ দৃশ্য অভিঘাত হেনেছে গাঙ্গেয় উপত্যকার সহৃদয় মানুষের থেকে এ ব্যবহার প্রত্যাশিত।

ভারতীয় শিল্পসাহিত্যের সংস্কৃতিনির্ভর বা শাসকনির্ভর কালানুক্রমিক বিন্যাস, সাহিত্য নাটক চিত্র সংগীত স্থাপত্য ভাস্কর্য এসবের স্বতন্ত্রবিন্যাস সুবিধাজনক হলেও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করতে পারে। চ্যাগীতি পাল সেন যুগের সাহিত্য, পাহাড়পুর পাল সেন যুগের শিল্প—এধরনের উচ্চারণের মধ্যে যেন বলা হচ্ছে এঁরা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন কিন্তু বাস্তবে তা হয়তো সত্য নয়। শিল্পসাহিত্যও এদেশে সমগ্রতায় লক্ষিত হওয়ার বিষয়। চ্যাগীতিকে তার ধর্ম ও দর্শন থেকে, অঙ্কিত মণ্ডলকর্ম ও রাগতালবদ্ধতা থেকে পৃথক করে দেখা যাবে না। ব্রতকথাকে আলপনা থেকে পৃথক করে দেখালে অপূর্ণতার দোষ দেখা দেবে। টেরাকোটার ভাস্কর্যকে মন্দিরস্থাপত্য থেকে পৃথক করে দেখানো অনুচিত হবে। সংস্কৃতির যে বৃহত্তর পটভূমিতে যে আচার অনুষ্ঠান সমন্বিত হয়ে কোনও শিল্পসাহিত্য বিকশিত হয়েছে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে সেই শিল্পসাহিত্যের আলোচনা হলে তা নিষ্প্রাণ হতে বাধ্য। বৈষ্ণবপদাবলি বৈষ্ণবদের কিন্তু শাস্ত্র সৌরেরা এমন কি মুসলমান কবিরাও পদাবলি রচনা করেছেন, তাই ধর্মনির্বিশেষে পদাবলির যে মিলিত কাব্যভাষা রচিত হয়েছিল সেদিকে দৃষ্টি ফেরানোর প্রয়োজন হবে। বাউলরা পটুয়ারা তো কোনো বিশেষ ধর্মশ্রেণীভুক্ত নয়। আসলে, আমাদের শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে আধুনিক ধারণা পাশ্চাত্য না আরও স্পষ্ট করে বললে ইংরেজদের থেকে গৃহীত ধারণা। সংস্কৃতির বীক্ষা ও সমীক্ষার উপযোগী বিদেশি দৃষ্টিকোণ কখনও যথাযথ বিবেচনা করতে পারে না। ওদের আঁট আমাদের শিল্প-ললিতকলা এক নয়, ওদের লিটারেচার আমাদের সাহিত্য এক নয়। সাহিত্যদর্পণ ছাড়া, পনেরো শতকের একটি গ্রন্থনামে সাহিত্য শব্দের ব্যবহার ছাড়া, সাহিত্য শব্দের জোড়ালো সমর্থনের আর কোনও সাক্ষ্য নেই। আমাদের সাহিত্যকে কাব্য বলা হয়েছে। আর্টের যে দামযুক্ত নান্দনিকমূল্য তাতে আমাদের অনেক বস্তুগত ও আত্মগত সংস্কৃতির বিকিকিনি সম্ভব ছিল না, অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মনির্ভর শিল্প বিক্রয়যোগ্য নয়, বরং স্বাশ্রয়ী মূল্যেই তারা মূল্যবান। আমাদের শিল্পসাহিত্যের স্রষ্টারা আধুনিক পূর্বকাল পর্যন্ত অনেকেই অনামা, কিন্তু স্বতন্ত্র স্রষ্টার সমর্থ ও অভিনব অভিজ্ঞান যা তাঁরা রেখে গেছেন তা গুরুত্বপূর্ণ। কোনও মন্দির কোনও কাব্য কার পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত তার সম্ভ্রান্ত উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু শিল্পীকবির চিহ্ন অনামিক থেকে গেছে। কৃষ্ণচন্দ্রের আনুকূল্য না পেলে ভারতচন্দ্র হয়তো অমদামঙ্গল রচনা করতেন না, আরও নতুন ধরনের কোনো কাব্য রচনা করতেন, রাজার আনুকূল্য তাঁর রচনার সৃষ্টিকে প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির দিক থেকে নিধারিত করেছে। শিল্পসাহিত্যের দেশজ ইতিহাসের সামগ্রিক রচনা তাই এ মুহূর্তের প্রয়োজন। পাশ্চাত্যের শিল্পসাহিত্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ধারণার সঙ্গেও আমাদের মেলে না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অজস্র পুঁথি ঐ ধারণার সারস্বত প্রতিবাদ। অন্য দেশের শিল্পসাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যোগ স্থাপিত হয়ে চলে ভিন্ন সূত্রে। রামকথা বাংলার পাশাপাশি ভারতের নানা ভাষা ও শিল্পে, ভারতের বাইরে মালয়েশিয়া তাইল্যান্ডে বিচিত্ররূপে প্রচারিত হয়। বুদ্ধবাদের যোগে চ্যাগীতি নেপালে

পাওয়া যায়, তিব্বতে তার চর্চা চলে, চীনে জাপানে বৌদ্ধসাহিত্য ধর্মদর্শনের আলোচনায় তার উল্লেখ অস্বাভাবিক মনে হয় না। পণ্যনির্ভর অতিআধুনিক সভ্যতাও আমাদের সব কিছুকে বাণিজ্যিক মূল্য দিতে পারে না। জন্মান্তরের ধারণায় লালিত এই দেশে প্রাচীন ভারতীয় ধারণা ছিল যে, কবি শিল্পীদের পুনর্জন্ম হয় না। সৌন্দর্যই তাঁদের ব্রহ্মপদ দেয়। রবীন্দ্রনাথ এ-সুন্দরকে সম্বোধন করে বলেছেন: এই জন্মে ঘটালে মোর জন্মজন্মান্তর। চিহ্নবিদ্যার সহায়তায় শিল্পসাহিত্যলীন সৌন্দর্যসূত্রের অতি-আধুনিক অন্বেষণ চলেছে, সংগঠন-শাস্ত্র হয়তো বলবে, নানা শিল্পসাহিত্যের উপরিতলের তলার স্তরে এক নির্বিশেষ শিল্পভাষা আছে। সেই তলশায়ী ভাষাই আমাদের অস্বিষ্ট। এ বিষয়ে জেনবাদের ভূমিকাও সক্রিয় হতে পারে।

‘রক্তকরবী’র নন্দিনী : ঈশানীর আর্কেটাইপ

প্রতিনাথ চক্রবর্তী

আধুনিক সাহিত্যে, বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে মিথ ব্যবহারের যে আত্যন্তিক প্রবণতা দেখা দিল তার অন্যতম কারণ বোধ করি মেটাফিজিক্যাল অ্যাগোনি। মানুষের অনিবেদিত সত্তা পুরাণের এই পুনর্ব্যবহারের মধ্যদিয়ে যেন ছুঁতে চাইল তার ফেলে আসা জীবন ও সংস্কৃতির দূরতর শিকড়। তাছাড়া আত্মবিস্তৃতির আকাঙ্ক্ষাও তাকে প্রাণসর করল এই পথে। অজস্র দূরত্ব ও ডাইমেনশনগত নানা পার্থক্য সত্ত্বেও জেমস জয়েসের লিওপোল্ড ব্লুম ছুঁয়ে ফেলল ‘ওডেসি’-র ইউলিসিসকে। লিওপোল্ডের জৈবিক সমস্যা ও সংকট হয়ে উঠল ইউলিসিসের সমস্যা ও সংকটের সমান্তরাল। ফলে লিওপোল্ডের সাধারণত যেন মুক্তি পেয়ে গেল মহাকাব্যিক ইউলিসিসের বিরাটত্ব ও অসাধারণত্বের মধ্যে। উভয়েই হয়ে উঠল অস্তহীন মানব প্রবাহের অংশভাক।

ব্যক্তিক এই বিস্তৃতির পাশাপাশি দৈশিক ও কালিক বিস্তৃতির আকাঙ্ক্ষাও আধুনিক সাহিত্যিককে প্রণোদিত করল মিথ ব্যবহারের ক্রিয়ায়। ‘ইউলিসিস’ উপন্যাসের ছোট্ট ডাবলিন শহর প্রতীকী তাৎপর্যে একাকার হয়ে গেল ‘ওডেসি’র সরীসৃপ-সংকুল সুবৃহৎ সমুদ্রের সঙ্গে। এবং তখন দেশ (Space) তার সীমা অতিক্রম করে পৌঁছে গেল দিক্চিহ্নহীন অসীমে। আবার বিশ-শতাব্দীর লিওপোল্ডের সমস্যা যখন বিনিময় যোগ্য হয়ে ওঠে ওডেসিয় কালের ইউলিসিসের সমস্যার সঙ্গে, তখন বিশেষ কাল উত্তীর্ণ হয়ে যায় নির্বিশেষ কালে। লিওপোল্ডের বিংশ শতাব্দী ও ইউলিসিসের ওডেসীয় কাল উভয়েই তখন হয়ে ওঠে অনাদ্যন্ত মহাকালের অঙ্গীভূত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ প্রবন্ধে একেই বলেছিলেন, ‘ক্ষণকালের জন্য উপলব্ধি করিয়া ক্ষুদ্র পরিধি হইতে মুক্তি লাভ’, বা ‘সুপ্রত্যক্ষ নরনারী’-র জীবনকে ‘ঐতিহাসিক রঙ্গভূমির মধ্যে স্থাপন করা’। কেন না, এর মধ্যে দিয়েই ধরা পড়ে ‘চিরন্তন মানব ইতিহাসের নিত্য সত্য’^১।

‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’-এর (আশ্বিন, ১৩০৫) প্রায় ১৪ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ‘কবি য়েটস’ (ভাদ্র, ১৩১৯) প্রবন্ধটি। ইয়েটসের সাহিত্যে পুরাণের পুনর্ব্যবহার সম্বন্ধে সেখানে তিনি লিখেছিলেন—

আজ যখন কোনা কবি বিশ্বকে আপনার বেদনা দিয়ে অনুভব করেন তখন তার ভাবার সঙ্গে মানুষের পুরাতন ভাষার মিল পাওয়া যায়। এই কারণে বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের পৌরাণিক কাহিনী আর কোনো কাজে লাগে না; কেবল কবির ব্যবহারের পক্ষে তা পুরাতন হল না। মানুষের নবীন বিশ্বানুভূতি ঐ কাহিনীর পথ দিয়ে আনাগোনা করে ঐখানে আপন চিহ্ন রেখে গিয়েছে। অনুভূতির সেই নবীনতা যার চিন্তকে উদ্‌বোধিত করে সে ঐ পুরাতন পথটাকে স্বভাবতই ব্যবহার করতে প্রবৃত্ত হয়। কবি য়েটস তাঁর কাব্য সৃষ্টির আরম্ভে আয়র্লণ্ডের সেই পৌরাণিক পথ দিয়ে নিজের কাব্যধারাকে প্রবাহিত করেছেন^২।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও সেই ‘পুরাতন পথ’-কে অসংখ্যবার অজস্রভাবে ব্যবহার করেছেন তাঁর সাহিত্যে। ‘রক্তকরবী’ তারই অন্যতম প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

‘রক্তকরবী’-তে পুরাণের সূত্রে ব্যাখ্যার প্রসঙ্গটি ধরিয়ে দিয়েছিলেন কবি নিজেই। নানাদিক থেকে নাটকটির রামায়ণী-ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন তার ‘প্রস্তাবনা’ অংশে। এবং নন্দিনী সম্পর্কে সেখানে তিনি বলেছিলেন:

....তার (রাবণের) দেবদ্রোহী সমৃদ্ধির মাঝখানে হঠাৎ একটি মানবকন্যা এসে দাঁড়ালেন, অমনি ধর্ম জেগে উঠলেন। মৃত নিরস্ত্র বানরকে দিয়ে তিনি রাক্ষসকে পরাস্ত করলেন। আমার নাটকে ঠিক এমনটি ঘটে নি, কিন্তু এর মধ্যেও মানবকন্যার আবির্ভাব আছে^{১৭}।

নাটকে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম কবি যে ‘মানবকন্যা’ অর্থাৎ নন্দিনীকে ব্যবহার করলেন তার নেপথ্যে শুধু রামায়ণের সীতার অনুষ্টিই ছিল না—ছিল Collective unconscious-এর সূত্রে চলে আসা দুর্গার আর্কেটাইপও। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রামায়ণেও আছে রাবণবধের জন্যে রামচন্দ্রের দুর্গোপজ্ঞার কথা। দুর্গার সঙ্গে সীতার অভিন্নতা ধরা পড়ে যখন দেখি সীতার অন্যতম প্রতিশব্দ হুল ‘উমা’। আবার ‘নন্দিনী’ শব্দও দুর্গার অন্যতম প্রতিশব্দ। সীতার সঙ্গে আছে শস্যের যোগ। স্বল্পেদে সীতা কৃষির অধীশ্বরী:

অর্বাচী সুভগে ভব সীতে বন্দমহে ত্বা।

যথা নঃ সুভাগাসসি যথা নঃ সুফলাসসি॥ (৪। ৫৭। ৬)

ইন্দ্রঃ সীতাং নি গহ্নাতু তাং পৃথানু যচ্ছতু।

সা নঃ পয়স্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাম্॥^{১৮} (৪। ৫৭। ৭)

শুরু যজুর্বৈদে সীতা হল লাস্তল পদ্ধতি—‘যুতেন সীতা মধুনা সমজ্যতাং বিংশৈর্দৈবৈরনুমতা মরুস্তিঃ’^{১৯} (১২। ৭০)। যজ্ঞের জন্য ভূমি কর্ষণকালে লাস্তল-রেখায় রাজা সীতাকে প্রাপ্ত হন। সীতা তাই Fertility Myth এর স্বগোত্র। সেই সূত্রে নন্দিনীও। এবং এই Fertility Myth-এর সূত্রেই এরা অধ্বিত হয়ে যায় ভারতীয় মিথ অহল্যা বা ঋষ্যশৃঙ্গ, মিশরীয় মিথ Isis-Osiris-এর বা গ্রীক মিথ Demeter-Persephone প্রভৃতির সঙ্গে।

লক্ষ্মীয়, বাংলাদেশে যে শারদীয়া দুর্গাপূজা প্রচলিত তার অন্যতম অঙ্গ নবপত্রিকার পূজা। নবপত্রিকায় কন্দলী, দাড়িম্ব, হরিদ্রা, বিষ্ণু, অশোক, জয়ন্তী প্রভৃতি যে নটি পত্রিকা থাকে ধান তার অন্যতম। শরৎকালে এবং বিভিন্ন পত্রিকা প্রভৃতি শস্যের সহযোগে দেবী পূজিতা হন বলে অনেকে দুর্গাকে শস্যের দেবী হিসেবে মনে করেন। ফ্রেজারও জানিয়েছেন :

In some parts of India the harvest-goddess Gauri is represented at once by an unmarried girl and by a wild balsam plants which is made up into the figure of a woman and dressed as such with mask, garments and ornaments. Both the human and the vegetable representative of the goddess are worshiped, and the intention of the whole ceremony appears to be to ensure a good crop of rice.^{২০}

এবং তখন শস্য-সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে অনেকটা একাকার হয়ে যান দুর্গা। ‘চন্দ্রী’তেও দেবীর সম্পর্কে বলা হয়েছে—‘...সৈব লক্ষ্মীবৃদ্ধিপ্রদা গৃহে’।^{২১}

দুর্গার এই শস্যানুসঙ্গ আরও স্পষ্টতা পায় ‘শাকম্বরী’ নাম থেকে। শাকম্বরী শব্দের ব্যাখ্যায় ‘লক্ষ্মীতন্ত্রে’ আছে :

শাকম্বরী শতাক্ষী সা সৈব দুর্গা প্রকীর্তিতা।

উমা গৌরী সতী. কালিকেশা চ পার্বতী^{২২}॥

আর শাক শব্দের ব্যাখ্যায় দেখি :

পত্রমূলকরীরাগ্রফলকাণ্ডাহিরাজকাঃ॥

ত্বক্ পুষ্পং কবকং চেতি শাকং দশবিধং স্মৃতম্^{২৩}॥

অর্থাৎ পত্র, মূল, মরুদেশস্থ বৃক্ষবিশেষ, অগ্র, ফল, কাণ্ড, অস্থিরাঢ়ক, ত্বক, পুষ্প, কবক—
এই দশ প্রকার শাক।

‘রক্তকরবী’-র নন্দিনীর সঙ্গে শস্য-ভাবনার যোগ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখি ফসল
কাটার গান শুনে তার ‘প্রাণ কাঁদে’ বা তার পরণে আছে ‘ধানী রঙের কাপড়’।

‘রক্তকরবী’ নাটকে রাজার বিপরীতে শক্তি ও প্রেরণার মূল উৎস হিসেবে আছে নন্দিনী।
অশুভ শক্তিকে বিনাশ করার কাজে কবি ব্যবহার করেছেন নারী-শক্তিকে। নারীকে কবি যে প্রবল
ও অজ্ঞেয় শক্তির আধার হিসেবে ভাবেন তার দূরতর উৎস রয়েছে আমাদের বেদ, পুরাণ ও
তন্ত্র প্রভৃতিতে। বেদে পুরুষ দেবতার প্রাধান্য থাকলেও ঋগ্বেদের ‘দেবীসূক্তে’ যখন দেবীর স্বরূপ
প্রসঙ্গে বলা হয় :

অহং রুদ্রেভির্বসুভিঃচরাম্যহ—

মাদিতৌরুত বিশ্বদেবৈঃ।

অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহ —

মিত্রাঙ্গী অহমশ্বিনোভা^{৩৩} ॥ (১০।১২৫।১)

—তখন তাকে বিশ্বশক্তির আধার বা কেন্দ্র বলেই প্রতিপন্ন করা হয়।

পুরাণে আছে নারী শক্তির অপ্রতিহত প্রভাব—বিশেষ করে দেবী ভাগবতে, কালিকাপুরাণে
ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে। এমনকি শ্রীমদ্ভাগবতে দেখি গোপীদের ‘কাত্যায়নী’ (যা দুর্গার অপর নাম)
পূজার প্রসঙ্গ। আর তন্ত্রে প্রধান উপাস্য শক্তিই হল স্ত্রী শক্তি। স্ত্রীলিঙ্গবোধক সব কিছুই সেখানে
শক্তির প্রতীক হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এবং সে শক্তির সংখ্যা অজস্র। তার মধ্যে প্রধান হল
দশমহাবিদ্যা।

যক্ষপুরীতে আসার আগে নন্দিনীর নিবাস ছিল ঈশানী পাড়ায়। ‘রাজার ঐটো’দের মধ্যে অনুপ
শক্লুকে দেখে সে চিৎকার করে ডাক দেয় :

- অনু - প, শক্লু -, এই দিকে চেয়ে দেখো, এই আমি, তোমাদের নন্দিন,
ঈশানী-পাড়ার নন্দিন।

ঈশানী শব্দের অন্যতম অর্থ দুর্গা। লক্ষ্য করতে হয়, ‘রক্তকরবী’ নাটকে যে দশটি খসড়া
পাওয়া যায় তার প্রথম থেকে তৃতীয় খসড়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সংলাপে কবি ব্যবহার করেছিলেন
‘নিশানী’ শব্দটি। এইসব খসড়ায় নন্দিনী উচ্চারণ করেছে—‘আমি নিশানী পাড়ার নন্দিন’।
কিন্তু চতুর্থ খসড়া থেকে মুদ্রিত পাঠ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে ‘ঈশানী’ শব্দটি।
প্রসঙ্গত আমাদের এও মনে রাখতে হয় যে প্রথম থেকে চতুর্থ এবং অষ্টম ও দশম খসড়া
কবির নিজের হাতের লেখা। অন্য খসড়াগুলি কবির স্বহস্ত লিখিত না হলেও কবি কর্তৃক
সংশোধিত ও পরিমার্জিত। অর্থাৎ চতুর্থ খসড়ায় কবি যে ‘নিশানী’র বদলে ‘ঈশানী’ শব্দ
ব্যবহার করেন—তা সচেতন প্রয়োগ বলেই ভাবতে হয়। তাছাড়া তারপর থেকে আরো ছটি
খসড়া কবি কর্তৃক লিখিত বা সংশোধিত হলেও সে সব ক্ষেত্রে শব্দটির কোন পরিবর্তন
ঘটানি তিনি। এসব থেকে আমাদের বুঝতে হয় নন্দিনীর অনুষঙ্গে সচেতনভাবেই ‘ঈশানী’
শব্দটি রাখতে চেয়েছেন কবি। ‘নিশানী’ শব্দের আভিধানিক অর্থ পতাকাধারী। নন্দিনীর
সহায়তাতেই যে মানুষ ও মনুষ্যত্বের বিজয়-পতাকা উর্ধ্বে উত্তোলিত হবে, তার আভাস আছে
নাটকের পরিণতিতে। সেজন্যেই নাটকের শেষে ফাণ্ডাল ও বিগুর মুখে উচ্চারিত হয় এই
জয়ধ্বনি—‘জয় নন্দিনীর জয়!’ অন্যদিকে রাজার অনুষঙ্গেও আছে এক ধ্বজা। নাটকের

অস্তিমে রাজা ভেঙে ফেলেছে সেই ধ্বজা এবং ছিড়ে ফেলেছে তার কেতন। কিন্তু রাজার সে ধ্বজা অনেকাংশে মানুষ ও সভ্যতার বিকৃতির প্রতীক। সেজন্যই সে ধ্বজদণ্ড ‘একদিকে পৃথিবীকে অন্যদিকে স্বর্গকে বিদ্ধ করেছে’। কিন্তু ‘নিশানী’র পরিবর্তে কবি যখন নন্দিনীর অনুষঙ্গে ‘ঈশানী’ শব্দটি ব্যবহার করেন তখন কল্যাণময়তার মাত্রা বৃদ্ধি পায় অনেক বেশি করে। ঈশানী বা দুর্গার কল্যাণময়তার প্রসঙ্গে ‘চণ্ডী’-তে কখনও বলা হয়েছে :

সর্বোপকারকরণায় সদাচিহ্ন^{১৪}।।

কখনো বা :

দেবী দেবশরীরেভ্যো জগৎত্রয়হিতৈষিনী^{১৫}।

আবার কখনো বা:

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে^{১৬}।

এই কল্যাণময়ীরূপের অনুষঙ্গে অনেকটা চলে আসে Great Mother আর্কেটাইপ। ঈশানী বা দুর্গা নিখিল বিশ্বের জননী স্বরূপা—‘মাতর্জগতোহবিলস্য’^{১৭}। ‘রক্তকরবী’র নন্দিনীর যে ‘রাজার ঐটো’দের জন্য প্রাণ কাঁদে বা পালোয়ানকে সে যে বাঁচাতে চায় সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে—তার মধ্যেই ধরা পড়ে তার শুশ্রূষাকারিণী মাতৃরূপের প্রকাশ। সেই মাতৃরূপ স্পষ্ট হয়ে আছে নাটকের প্রথম খসড়ায়। ভেতরে ভেতরে দুর্বল ও বিভগ্ন রাজাকে নন্দিনী সেখানে বলে :

আমি তোমাকে বাঁচাতে চাই, মা যেমন ছেলেকে বাঁচাতে চায় নিজেকে দিয়ে।

G. S. Kirk-ও তাঁর সিদ্ধান্তে ঈশানী বা দুর্গার অনুষঙ্গে এসব ভাবনাকে মিলিয়ে নিয়েছিলেন এইভাবে :

Moreover the Harappa civilization of the Indus valley, which flourished during the third and second millénie, cultivated a goddess of Great Mother type seems to have passed into Hindu myth as Parvati, the consort of Shiva, later to be known as the Divine Mother of the Universe^{১৮};

ঝঞ্ঝেদে ‘ঈশান’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ঐশ্বর্যবান অর্থে। প্রথম মন্ডলের একষট্টি সূক্তে আছে—‘ঈশানকৃদাশুযে দশস্যন্তুর্বাতিয়ে গাধং তুর্বাণিঃ কঃ’^{১৯}।। (১।৬।১।১১)

দ্বীলিঙ্গে এই ঈশান অর্থাৎ ‘ঈশানী’ শব্দের অর্থ দাঁড়ায় ‘ঐশ্বর্যবতী’ বা ‘ঐশ্বর্যময়ী’। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ঈশানীর অনুষঙ্গে এই ঐশ্বর্য বা প্রাচুর্যের বিষয়টি লক্ষ্য করেছিলেন ফ্রেজারও:

Thus at Oodeypoor in Rajputna a festival is held in honour of Gouri, or Isani, the goddess of abundance.^{২০}

আর ‘ঐশ্বর্য’ শব্দের অর্থ শুধু ধন বা সম্পদ নয়, ‘ঈশ্বরের কৰ্ম বা ভাব; ঈশ্বরত্ব, দেবত্ব, বিভূতি’^{২১}। ঈশ্বর যঐশ্বর্যময়। ফলে ঈশানী শব্দের অনুষঙ্গে নন্দিনীর উপর অনেকখানি অরোপিত হয় দুর্গার দেবত্ব বা ব্যাপ্ত্যর্থ কল্যাণময়ী রূপের ভাবনা। সম্পদের অনুষঙ্গে ঈশানী শব্দের ব্যবহার আমরা পেয়ে যাই রবীন্দ্রনাথের ‘শুশ্রূষন’ গল্পেও। সেখানে সম্যাসীর তুলট কাগজে যে ছড়াটি লেখা ছিল তার শেষ দুটি চরণ :

ঈশান কোনে ঈশানী

কহে দিলাম নিশানী

কিন্তু ‘রক্তকরবী’তে কবি ঈশানী পাড়ার মেয়ে নন্দিনীকে প্রতিষ্ঠা করেন যক্ষপুত্রীর প্রভূত জড়সম্পদ বা ‘মরা ধন’-এর বিপরীত প্রাণৈশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী হিসেবে।

লক্ষণীয়, দুর্গা শব্দের প্রতিটি বর্ণের আছে এক একটি নির্দিষ্ট অর্থ—‘দকার দৈত্যনাশ, উকার বিঘ্ন নাশ, রকার রোগনাশক, গকার পাপনাশ ও আকার ভয়-শত্রুনাশ’^{২২}। অর্থাৎ ঈশানী বা দুর্গা শুধু অসুরনাশিনী নয়—তিনি বিঘ্ননাশিনী ও ভয়নাশিনীও। নন্দিনীর সেই বিঘ্ননাশিনী ও ভয়নাশিনী রূপের প্রকাশ আছে নাটকের বিভিন্ন উক্তিতে:

নন্দিনী (অধ্যাপকের উদ্দেশ্যে) — ‘আমি জালের বাধা মানিনে, আমি এসছি ঘরের মধ্যে ঢুকতে!’

নন্দিনী (বিশুর উদ্দেশ্যে) — ‘আমি এসেছি, এখান থেকে তোমাকে বের করে নিয়ে যাব। সোনার শিকল ভাঙব’।

বিশু (নন্দিনী উদ্দেশ্যে) — ‘তুমি যখন এখানকার রাজাকে পর্যন্ত টলিয়েছ তখন তোমাকে ঠেকাবে কিসে’?

নন্দিনী (পালোয়ানের উদ্দেশ্যে) — ‘আমি সর্দারের রাগকে ভয় করি নে’।

আবার ‘ঈশানী’ শব্দে লেগে আছে ঈশানকোণ-জাত মেঘের অনুষঙ্গও—যে মেঘে থাকে ঝড়ের পূর্বাভাস। ঈশানী পাড়ার নন্দিনীও যে ‘রক্তকরবী’ নাটকে পরিবর্তনের ঝড় বয়ে আনবে তার আভাস ধরা পড়ে এই নামটির মধ্যে। আমাদের মনে রাখতে হয়, রাজাও তার ঘরে নন্দিনীর আগমন প্রসঙ্গে এক ঝড়ের কথা উচ্চারণ করেছিল সন্নত আবেগে :

যেদিন পালের হাওয়ায় তুমি অনায়াসে আসবে সেইদিন আগমনীর লগ্ন লাগবে। সে হাওয়া যদি ঝড়ের হাওয়া হয় সেও ভালো।

দুর্গার উদ্ভব সম্পর্কে ‘চণ্ডী’তে বলা হয়েছে—সমস্ত দেবতার শরীর থেকে সঞ্জাত ত্রিলোকব্যাপী অনুপম তেজোরশি একত্রিত হয়ে একটি অপরূপ নারী মূর্তি ধারণ করল। এই মূর্তি হলেন দুর্গা। অতঃপর বিভিন্ন দেবতা নিজ নিজ অস্ত্রের দ্বারা সুসজ্জিত করলেন দেবীকে। এঁদের মধ্যে বজ্রধারী ইন্দ্র দিয়েছিলেন তাঁর বজ্র। ‘চণ্ডী’র দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাইশ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে:

বজ্রমিহ্রঃ সমুৎপাদ্য কুলিশাদমরাধিপঃ।

দদৌ তস্যৈ সহস্রাক্ষো ঘণ্টামৈরাবতাদ্ গজাৎ^{২৩}।

নন্দিনীর ক্ষেত্রেও আমরা সরাসরি লক্ষ্য করি এই ইন্দ্র ও তাঁর বজ্রের অনুষঙ্গ। নাটকে নন্দিনী সর্দারকে বলে :

বিদ্যুৎ শিখার হাত দিয়ে ইন্দ্র তাঁর বজ্র পাঠিয়ে দেন। আমি সেই বজ্র বয়ে এনেছি, ভাঙবে তোমার সদারির সোনার চূড়া।

এই বজ্র বয়ে আনার সূত্রে বা অশুভ শক্তিকে বিনাশের এষণার সূত্রে নন্দিনীর মধ্যে আমরা অনেকখানিই পেয়ে যাই দুর্গা-ভাবনার প্রকাশ।

সামান্য পরে সর্দারও নন্দিনীকে সম্বোধন করেছে ‘ওগো ইন্দ্রদেবের আশুন’ বলে।

আশুনের অনুষঙ্গে এর আগে রাজাও দেখেছে নন্দিনীকে। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে বলেছে :

নন্দিনী, তোমার ভিতরেও আছে আশুন, রাঙা আশুন, একদিন দাহন করে তাকে বের করব, তার আগে নিশ্চুতি নেই।

অনেক আগে নাটকের প্রায় প্রথম পর্বে গোকুলও নন্দিনীকে দেখেছিল রাঙা আলোর মশাল হিসেবে। এসব অগ্নি-ভাবনা আমাদের অনায়াসে উপনীত করে দুর্গা-কল্পনার কাছে। ‘চণ্ডী’র সূচনাতেই দেবী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—‘অগ্নিস্তম্ভম্’^{২৪}। অর্থাৎ দেবীর তত্ত্ব হল অগ্নি।

‘চণ্ডী’র ঐ অংশেই দেবীর শক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে—‘নন্দা শক্তিঃ’^{২৫}। অর্থাৎ দেবীর শক্তি

হল নন্দা। চকিতে আমাদের মনে পড়ে নাটকের রাজাও নন্দিনীকে কখনো কখনো ডেকেছে ‘নন্দা’ বলে। রাজা ও নন্দিনীর প্রথম কথোপকথনে রাজা নেপথ্য থেকে নন্দিনীর উদ্দেশে বলে:

নন্দা, শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু বারে বারে ডেকো না, আমার সময় নেই, একটুও না।

নন্দিনী ও রাজার দ্বিতীয় কথোপকথনে রাজা নন্দিনীর উদ্দেশে করুণ স্বরে বলে:

সামনে তোমার মুখে চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো চুলের ধারা
মৃত্যুর নিস্তক্কা বর্ণা। আমার এই হাতদুটো সেদিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম
পেয়েছিল।

চুল ও মৃত্যুর এই কল্পনাগত সাযুজ্য আমাদের আবারো পৌঁছে দেয় দুর্গা-ভাবনার কাছে।
দেবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনায় ‘চণ্ডী’র দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে—‘যাম্যেন চাভবন্ কেশা’^{২৬}।
অর্থাৎ যমের তেজে গঠিত হয়েছে তাঁর কেশপাশ। যম মৃত্যুর দেবতা। তাই রাজা যখন নন্দিনীর
চুলে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করে বা চুলের গভীরে হাত ডুবিয়ে মরবার আরাম-পাওয়ার কথা বলে
তখন তাতে দুর্গার আর্কেটাইপাই প্রকাশ রূপ লাভ করে।

‘চণ্ডী’ বর্ণিত দুর্গার শিরে ও বক্ষে আছে সমুদ্র-প্রদত্ত অম্লান পদ্মের মালা—‘অম্লানপঙ্কজাং
মালাং’^{২৭}

‘রক্তকরবীর নন্দিনীর মাথায় বা বুকে কোন পদ্মের মালা নেই ঠিকই, কিন্তু পদ্মপাতায় ঢেকে
সে কুন্দ ফুলের মালা এনেছিল রাজার জন্যে। পরে সে সর্দারকেও দিয়েছে কুন্দফুলের মালা।
এবং নন্দিনীর দেওয়া সে মালাও রয়েছে অম্লান। গৌসাই সর্দারের ঘরে সেই মালা দেখে বলেছে:

বিষয়ী লোকের হাতে পড়েও তার শুভতা স্নান হল না।

নন্দিনীর মধ্যে সৌন্দর্য ও ভয়ঙ্করতার এক সমন্বিত রূপকে প্রত্যক্ষ করেন অধ্যাপক। তাই
নন্দিনীকে তিনি বলেন : ঐ রক্ত-আভাষ একটা ভয়-লাগানো রহস্য আছে—

নন্দিনী—আমার মধ্যে ভয়?

অধ্যাপক—সুন্দরের হাতে রক্তের তুলি দিয়েছে বিধাতা।

গোকুলও প্রায় একইভাবে দেখেছে নন্দিনীকে। সরাসরি নন্দিনীকেই সে বলে :

সর্বনাশী তুমি। তোমার ঐ সুন্দর মুখ দেখে যারা ভুলবে তারা মরবে। ...ভয়ংকরী,
ওরে ভয়ংকরী।

চন্দ্রাও নন্দিনীকে বলে :

সর্বনাশী। ...তোর ঐ সুন্দর মুখখানা দেখে আমি ভুলি নে।

আর রাজার মুখে শুনি :

বিধাতা তোমাকেও রূপের মায়ার আড়ালে অপরূপ করে রেখেছেন। ...কোমল বলেই
কঠিন।

দুর্গা-কল্পনাতেও আছে ললিত ও কঠোরের, ভীষণ ও সুন্দরের যুগলক রূপ। ‘চণ্ডী’র চতুর্থ
অধ্যায়ে দেখি :

কেনোপমা ভবতু তেহস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্যতিহারি কুত্র।
চিন্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্ৰয়োব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েহপি।।^{২৮}

সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।

যানি চাত্যন্তঘোরাণি তৈ রক্ষাশ্রাংস্তথা ভুবম্।^{২১}

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ এ দুটি শ্লোকের অনুবাদ করেছেন এইভাবে:

দেবি, অন্য আর কাহার সহিত আপনার এই পরাক্রমের তুলনা হইতে পারে? আপনার সৌন্দর্যের তুল্য শত্রুভীতিজনক অথচ এত মনোরম সৌন্দর্যই বা কাহার আছে? বরদে, হৃদয়ে মুক্তিপ্রদ কৃপা এবং যুদ্ধে মৃত্যুপ্রদ কঠোরতা ত্রিভুবনে একমাত্র আপনাতেই পরিদৃষ্ট হয়।^{২২}

দেবি, ত্রিভুবনে আপনার যে-সকল সৃষ্টিস্থিতিকারিণী সৌম্য-মূর্তি ও সংহারকারিণী রুদ্রমূর্তি বিরাজিত, সেই সকল দ্বারা আমাদেরকে ও সমস্ত জগদ্বাসীকে রক্ষা করুন।^{২৩}

আপাত বিপরীততার (binary opposition) গভীরে রবীন্দ্রদর্শন যে পূর্ণতা খুঁজে পায়, বা যে বৈপরীত্যের সমন্বয়ে সৃষ্টির পরম কারণ হিসেবে জানে—তা যেমন আছে দুর্গায় তেমনি নন্দিনীতে।

বাংলাদেশের অনেক দুর্গাপূজায় আজও একটি প্রচলিত প্রথা হল বিসর্জনের পূর্বে নীলকণ্ঠ পাখি উড়িয়ে দেওয়া। প্রচলিত লোকবিশ্বাস এই যে, নীলকণ্ঠ পাখি কৈলাসে মহাদেবকে দুর্গার ফিরে যাওয়ার সংবাদ দেয়। ‘রক্তকরবী’ নাটকেও আমরা দেখি নীলকণ্ঠ পাখির পালকের সূত্রেই নন্দিনী পেয়েছে রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হওয়ার সংবাদ। বিস্মকে সে বলে:

নন্দিনী—মনের মধ্যে খবর এসে পৌঁছেছে, আজ নিশ্চয় রঞ্জন আসবে।

বিস্ম—নিশ্চয় খবর এল কোন্ দিক থেকে?

নন্দিনী—তবে শোনো বলি। আমার জানলার সামনে ডালিমের ডালে রোজ নীলকণ্ঠ পাখি এসে বসে। আমি সঙ্গে হলেই ধ্রুবতারাকে প্রশ্নাম করে বলি, ওর ডানার একটি পালক আমার ঘরে এসে যদি উড়ে পড়ে তো জানব আমার রঞ্জন আসবে। আজ সকালে জেগে উঠেই দেখি, উস্তরে হাওয়ায় পালক আমার বিছানায় এসে পড়ে আছে। এই দেখো আমার বুকের আঁচলে।

নন্দিনীর বুকের মধ্যে রঞ্জনের আগমনীর সুর ধ্বনিত হয় এই নীলকণ্ঠ পাখির পালকের অনুসঙ্গে।

‘আগমনী’ শব্দটি বিশেষ দ্যোতনা বহন করে বাঙালীর দুর্গোৎসবকে ঘিরে। বৎসরান্তে উমার পিতৃগৃহে আগমনকেই বলা হয় আগমনী। শাস্ত্র সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট ধারা হল আগমনী গান। অনেকে বলেন ‘দেবী দুর্গার এক নাম আগমনী’^{২৪}। ‘রক্তকরবী’ নাটকে রাজার সংলাপেও আছে ‘আগমনী’র সুর। নন্দিনীর উদ্দেশে সে আবেগময় কণ্ঠে বলে :

আমার অনবকাশের উজ্জান ঠেলে তোমাকে ঘরে আনতে চাই নে। যেদিন পালের

হাওয়ায় তুমি অনায়াসে আসবে সেই দিন আগমনীর লগ্ন লাগবে।

নাটকের পরিণতির নিরিখে আমরা জানি, সেই আগমনীর লগ্নে বোধন ঘটাবে রাজার মনুষ্যত্ববোধের, তার হৃদয়ে অধিবাস হবে সহজ প্রাণ ও সহজ প্রেমের। এবং তখন সে বলতে পারবে :

আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক, সম্পূর্ণ মারুক

—তাতেই আমার মুক্তি।

কিংবা বলবে:

এত দিনে মরবার অর্থ দেখতে পেয়েছি—বেঁচেছি।

নান দূরত্ব ও অজ্ঞত পার্থক্য সত্ত্বেও আমাদের এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে ‘লিপিকা’র ‘আগমনী’র কথা। সাতমহলা বাড়ির ঐশ্বর্য বা লাঠিসড়কি-পাইক-বরকন্দাজের মধ্যে নয়, মন সহজ প্রাণ ও সহজ প্রেমের স্পর্শ পেয়েছিল ‘শরৎপ্রভাতের শুকতারা’^{৩৩}, ‘শিউলিবনের শিউলিফুল’^{৩৪} ‘ভোরবেলাকার দোয়েল পাখি’^{৩৫} আর শিশুর খিল্খিল হাসির মধ্যে। এবং তাতেই তার অন্তরে এসে পৌঁছেছিল ‘আগমনীর সুর’^{৩৬}।

সূত্র নির্দেশ :

- ১-৪. ঐতিহাসিক উপন্যাস, দশম খণ্ড, রবীন্দ্রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ফাল্গুন ১৩৯৫, পৃ. ৩৭১-৭২।
৫. কবি য়েটস, দ্বাদশ খণ্ড, রবীন্দ্রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৌষ ১৩৯৬, পৃ. ৫৫৪।
৬. রক্তকরবী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনিভাগ, পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৩৯৪ পৃ. ১১৬।
৭. ঋগ্বেদ-সংহিতা (প্রথম খণ্ড), হরফ প্রকাশনী, ১৪ আষাঢ় ১৩৮৩, পৃ. ৪৫২।
রমেশচন্দ্র দত্ত ঋক্ দুটির অনুবাদ করেছেন এইভাবে :
হে সৌভাগ্যবতী সীতা! তুমি অভিমুখী হও, আমরা তোমাকে বন্দনা করছি, তুমি আমাদের সুন্দর ধন প্রদান কর ও সুফল প্রদান কর। (৪।৫৭।৬)
ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করুন, পুষা তাঁকে পরিচালিত করুন, তিনি জলবতী হয়ে বৎসরের পর বৎসর শস্য দোহন করুন। (৪/৫৭/৭)
৮. গুরু ও কৃষ্ণ যজুর্বেদ-সংহিতা, হরফ প্রকাশনী, ১৭ আশ্বিন ১৩৮২, পৃ. ৯১। বিজ্ঞানবিহারী গোস্বামীকৃত অনুবাদ—‘বিশ্বদেব ও মরুদগণের অনুমতিক্রমে সীতা (লাঙ্গল পদ্ধতি) মধুর জলের দ্বারা সিদ্ধ হোক’।
৯. The Golden Bough—Sir James Frazer, Wordsworth Editions Ltd., 1993, p. 420.
১০. শ্রীশ্রীচণ্ডী, সম্পা, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, নবম সংস্করণ (পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৪১২), পৃ. ৩৪২ (১২।২৪)
১১. তদেব, পৃ. ৩২২।
১২. তদেব, পৃ. ৩২১।
১৩. ঋগ্বেদ-সংহিতা (দ্বিতীয় খণ্ড) (হরফ প্রকাশনী, ২৮ ভাদ্র ১৩৮৩, পৃ. ৬২০)। জাহ্নবী চক্রবর্তীকৃত ঋক্‌টির অনুবাদ — ‘একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য ও বিশ্বদেবগণরূপে আমিই নিখিল বিশ্বে পরিভ্রমণ করি; মিত্র ও বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আমিই ধারণ করি।’
১৪. শ্রীশ্রীচণ্ডী, সম্পা, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, নবম সংস্করণ (পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৪১২), পৃ. ১৬৫ (৪। ১৭)
১৫. তদেব, পৃ. ১৭৫ (৪। ৪০)।
১৬. তদেব, পৃ. ৩০৫ (১১। ১০)।
১৭. তদেব, পৃ. ৩০০ (১১। ৩)।
১৮. Myth. : Its meaning And Functions In Ancient And other Cultures – G.S. Kirk, The Cambridge University Press, 1970 ; P. 209-210.
১৯. ঋগ্বেদ-সংহিতা (প্রথম খণ্ড)—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য একাডেমী, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৮, পৃ. ৪৯৫।
২০. The Golden Bough—Sir James Frazer, Wordsworth Editions Ltd., 1993, p. 343.

২১. বঙ্গীয় শব্দকোষ (প্রথম খণ্ড)—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য একাডেমী, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৮, পৃ. ৪৯৫।
২২. তদেব, পৃ. ১১১৮।
২৩. শ্রীশ্রীচণ্ডী, সম্পা, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, নবম সংস্করণ (পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৪১২), পৃ. ১১২ (২।২২)।
২৪. তদেব, পৃ. ৫৫।
২৫. তদেব, পৃ. ৫৫।
২৬. তদেব, পৃ. ১০৮ (২।১৪)।
২৭. তদেব, পৃ. ১১৫ (২।২৮)।
২৮. তদেব, পৃ. ১৬৮-৬৯ (৪।২২)।
২৯. তদেব, পৃ. ১৭০ (৪।২৬)।
৩০. তদেব, পৃ. ১৬৮-৬৯।
৩১. তদেব, পৃ. ১৭০-৭১।
৩২. শাস্ত্রপদাবলী ও শক্তিসাধনা—শ্রী জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, ডি. এম. লাইব্রেরী, পঞ্চম সংস্করণ—মহালয়া, ১৩৮২, পৃ. ৩।
- ৩৩-৩৬. লিপিকা, আগমনী, রবীন্দ্ররচনাবলী, নবম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, চৈত্র ১৩৯৪, পৃ. ৬৬৫-৬৬।

‘অন্তর্জলী যাত্রা’-র ভাষা : নিজস্ব সঙ্কেতে সময়ের দাগরাজি

চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত

॥এক॥

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের পরবর্তী কোনো এক সময়ের প্রেক্ষিতে ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ উপন্যাসের কাহিনি লিখেছিলেন কমলকুমার মজুমদার। কাহিনিটির ঘটনাকাল উনবিংশ শতাব্দীর ওই নির্দিষ্ট সময়কালেরই যে, সে বিষয়ে উপন্যাসটিতে একাধিক সূত্র ও তথ্য পাওয়া যায়—

(ক) সহমরণ/সতীদাহ প্রথাপালন আইন করে নিষিদ্ধ করেছিলেন লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯-এ। কিন্তু তারপরেও সরকারি বিধিকে এড়িয়ে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা যে ঘটেনি এমন নয়, বিশেষত থানা-পুলিশ এড়িয়ে সতীদাহের ব্যাপার যে মাঝে মাঝেই ঘটেছে, তৎকালীন সংবাদপত্রের সূত্রে তা জানা যায়। ঠিক এই ভাবেই আলোচ্য উপন্যাসেও সহমরণের যে ঘটনা প্রস্তাবিত (বা সম্ভাব্য) ছিল, তারই সূত্রে কাহিনিতে জ্যোতিষ ঠাকুরের মুখে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি প্রণিধানযোগ্য উক্তি শোনা গেছে। কখনো বা “কোম্পানীর রাজস্ব”, তাই “ঘোর কলি”-কালে “সহমরণে যে পুণ্য আছে” তাতে মানুষের বিশ্বাস না থাকা এবং অবশেষে আইন ভাঙলে “মামলা রুজু” হবার আশঙ্কা—এই সব বক্তব্যের মাধ্যমে কাহিনিতে নির্দিষ্ট সময়গত পরিবেশটিকে ধার্য করা যায়।

(খ) সহমরণের ঘটনা প্রস্তাবনার সূত্রেই যশোবতীর সম্ভাব্য সহমরণের যে কল্পদৃশ্যটি এই উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে, সেটির সমতুল্য বহু বিবরণ ষোল্লদশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকের পত্র-পত্রিকায় খুঁজে পাওয়া যায়। “চারিভিতে ছোঁড়া” লাল সুতোয় বাঁধা কলাগাছ, দশমহাবিদ্যার আলোখ্য চারিদিকে, ফুলমালা, ধানের কঙ্কণ, খইয়ের নহর, হরিধ্বনি, কাঁসর ঘন্টা, ঢাকের বাজনা, “সতী”র মাথায় ছোঁয়ালোর জন্য থান-থান সিঁদুরের স্তূপ, ধূমায়িত চিতার ওপরে শাঁখা-নোয়া, কড়ি, সোনা-রূপো ছুঁড়ে দেওয়া, সশব্দে মস্তপাঠ ইত্যাদি যে সব প্রাসঙ্গিক চিত্রায়ণ আছে এই উপন্যাসে, তা একান্তই বাস্তবসম্মত। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে কমলকুমার প্রদত্ত এই বর্ণনা ডিরোজিওর ‘দ্য ফকীর অব জঙ্গীরা’ কাব্যে সতীদাহভিত্তিক যে বিবরণ রয়েছে তার সঙ্গে খুব সামঞ্জস্যপূর্ণ। স্মরণযোগ্য, ডিরোজিও-র কাব্যটি ১৮২৮ সালে যখন লেখা হয়, তখন সতীদাহ পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত। ডিরোজিও স্বয়ং সতীদাহের বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছিলেন, সুতরাং তাঁর কাব্যে যে বর্ণনা রয়েছে, তার বাস্তবভিত্তি একান্তভাবেই নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য হতে পারে।

(গ) নির্দিষ্ট সময়কালটিকে উপন্যাসে আরো একটি সূত্র থেকে বোঝা যায় ঐ সময়কালে “ঘাটের মড়া”-র সঙ্গে বালিকা অথবা কিশোরীর বিয়ে দিয়ে কুলীনের কুলরক্ষার ঘটনা ছিল অবিরলসংখ্যক। টেকচাঁদ ঠাকুরের “আলালের ঘরের দুলাল” গ্রন্থে মর্যাস্তিক শ্বেষের সঙ্গে এমন একটি সংলাপ দেওয়া হয়েছে এক কুলীন বিধবার মুখে, যে আরেক কুলীনকন্যাকে বলছে “তোরা তবু স্বামী বেঁচে আছে। আমার যাঁর সঙ্গে বে হয়, তাঁর তখন অন্তর্জলি হচ্ছিল।” ঠিক একইভাবে কমলকুমার উপন্যাসে দেখিয়েছেন কীভাবে কুলীন লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁর অভঙ্গ-নৈক্য বজায় রাখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে নিজের ষোড়শীকন্যা যশোবতীকে অন্তর্জলীগত মুমূর্ষু সীতারাম চট্টোপাধ্যায়ের হাতে সম্প্রদান করেন, দায়মুক্তির অভিলাষে।

(ঘ) লক্ষ্মীনারায়ণের এই “ধর্মকার্যে” সায় দিতে অনিচ্ছুক হন কবিরাজ বিহারী এবং শ্মশানের

ডোম বৈজুনাথ। জলজ্যাস্ত তরুণীর অনিবার্য বৈধব্য ও সম্ভাব্য সহমরণের ব্যাপারটা মানবিকতার যুক্তিতে মানতে পারছেন না কবিরাজ; বৈজু ডোমের আপত্তির কারণ অবশ্য ভিন্ন—তার কারবার মৃত মানুষ নিয়ে; জীবন্ত মানুষের দাহকার্য দেখতে তার মানস বৈরাগ্য সৃষ্টি হয়। মধ্য-উনিশ শতকের উদারপন্থী কিছু বাঙালি বুদ্ধিজীবী সহমরণের নৃশংসতার প্রতিবাদ করেন ধর্মের যুক্তি না মানতে পেরে। কবিরাজ বিহারীনাথকেও এখানে তাদেরই প্রতিভূ বলে মনে করা যেতে পারে। বিশেষত, অনন্ত জ্যোতিষী যখন তাঁকে বিদ্রূপ করে বলেন, “কবিরাজ মশাই আপনার নাতির স্বপ্নের কোন এক আত্মীয় (নাকি) ফিরঙ্গীভাষা জানে, তাই আপনি ...” অর্থাৎ সে আমলের সংকীর্ণ মানসিকতায় বিদেশি শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই ধর্মদেবী হবে, এমনটাই ভাবা হতো যে, এই উক্তির মাধ্যমে সেই প্রেক্ষিতটিই ফুটে উঠল।

- (ঙ) কমলকুমারের ভাষার একটি অনন্য ‘আর্কেইক’ (সেকেন্ডে) শিল্পশৈলী তাঁর সমস্ত লেখার মধ্যেই পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু এই উপন্যাসে সেই ভাষারীতির প্রয়োগ সবচেয়ে বেশি। যে পটভূমিকায় উপন্যাসটি লেখা, তার সঙ্গে মানানসই করেই ভাষারীতিটি গড়ে উঠেছে। রামমোহন-ডিরোজিওর অচির-পরবর্তী এবং যুবক বিদ্যাসাগরের সমকালের প্রেক্ষিতে রচিত এই উপন্যাসের ভাষায় তাই একদিকে বর্ণনার ক্ষেত্রে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের পোশাকি ভাষা প্রয়োগ হয়েছে, আর অন্যদিকে সংলাপ বা মুখের ভাষায় (বিশেষত বৈজুনাথের) প্রায়-সমকালীন আলালী ছাঁদের ভাষা, শব্দ ইত্যাদির ব্যবহার একে প্রেক্ষাপটের সঙ্গে মানানসই করে তুলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই উপন্যাসে যে দু-ধরনের ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, অনেকের মতে তার একটি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের ভাষার সমতুল। কিন্তু সম্ভবত এই বিচারটি দুরাশ্রয়ী, কারণ বাংলাগদ্যের এই প্রত্নপ্রতিম চেহারাটি কমলবাবু জোর করে ব্যবহার করেছেন প্রেক্ষাপটটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতেই, পক্ষান্তরে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের ক্ষেত্রে এ ধরনের ভাষার ব্যবহার ছিল অনিবার্য, কারণ তাঁর সামনে গদ্যভাষার কোনো মডেল ছিল না, বরং তিনি ও তাঁর সমসাময়িকেরাই একটা মডেল তৈরি করেছিলেন। ফলত, কমলকুমারের ব্যবহৃত দু-ধরনের ভাষারীতি সম্পর্কে এটাই বলা সমীচীন যে, ঐ নির্দিষ্ট সময়কালটিকে গড়ে তুলতেই তিনি এই জাতীয় ভাষার প্রয়োগ করেছেন।

॥ দুই ॥

এইভাবেই এই উপন্যাসটিকে পূর্বোক্ত নানান সূত্রের সাহায্যে হয়ত পর্বচিত্র বা ‘পিরিয়ড পীস’ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। এদের মধ্যে সব চেয়ে কার্যকরীভাবে যে সূত্রটি এই উপন্যাসের সময়কালটিকে চিহ্নিত করতে পারে তা সম্ভবত এতে ব্যবহৃত বিশিষ্ট ভাষারীতিটি। বর্তমান নিবন্ধে, তাই সেই সূত্রটি (ঙ) নিয়ে বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষা করা হবে দুটি ভাগে:

(ঙ/১) প্রথম বর্গে উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষা কীভাবে ঘটনাকাল ও সময়কে প্রতিফলিত করছে, তার নিরীক্ষা।

(ঙ/২) দ্বিতীয় বর্গে পর্বচিত্র-সুলভতার দায়িত্ব পালন করার অতিরেকে এই বিশিষ্ট ভাষারীতি কেমনভাবে কমলকুমার মজুমদারের অনন্য নিজস্বতার স্বাক্ষর হয়ে উঠেছে সেটির বিশ্লেষণ।

প্রথমে ভাষার পর্বচিত্রসুলভতার আলোচনা করি:

ঙ/১.১ “সে ক্রোনোক্রমে আপনকার চক্ষুর্দ্বয় তুলিয়া সেই অপূর্ব রমণীকে অবলোকন করিতে

গিয়া আকস্ম নবীন অতি সূক্ষ্ম স্পন্দনের বিভূতি দেখে, যাহা দিব্যচক্ষুর অন্তর্গত, যা কাব্য মনসার চিত্রস্বরূপ”। (পৃ: ১১২/১৯৬২ সংস্করণ)

ঙ/১.২ “সে একটি ঝাঁপা হইতে খানিক তাড়ি নিজের মুখে ঢালিয়া মত্তব্য করিল, “যাঃ শালা—পাকা ঘুটি বুঝি কাঁচে গো” (পৃ: ৫৯/এ)

... প্রথমটি তৎকালীন ‘সাধু-গদ্য’ এবং দ্বিতীয়টি সেকালের চলতি গদ্যের ঢঙে লেখা, যা অভিনিবিষ্ট পাঠককে কাহিনির উপজীব্য ঘটনাকালের ইঙ্গিত দেবে।

‘অম্বয়প্রয়োগ, শব্দ ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রেও কমলকুমার ওই আর্কেইক ভঙ্গীই গ্রহণ করেছেন: ঙ/১.৩. “এই সসাগরা বসুন্ধরা তাঁহার জন্য বাঁচিয়া থাকুক, ইহাদের দিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত কাজ আছে—কেননা তিনি সংস্কার আচ্ছন্ন—এমত মনে হয় নাই।” (পৃ: ৩২/এ)

—‘সসাগরা’ জাতীয় বিশেষণ, ‘ইহাদের’ সর্বনাম ব্যবহার এবং বাক্যের মধ্যে উপবাক্য (‘কেননা আচ্ছন্ন’) ইত্যাদি আধুনিক বাংলাগদ্যের রীতিসম্মত নয়, এ পদ্ধতি একান্তভাবেই উনিশ শতকীয়।

ঙ/১.৪ শব্দ ব্যবহারেও এই মানসিকতা লক্ষণীয়। বহুক্ষেত্রেই কমলকুমার নানান অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগ করেছেন। যেমন ‘অধুনা’ (= এখন), ‘অনার্য’ (= অবোধ), ‘গতিক’ (= কাজকর্ম), ‘হেবল্জ’ (= নির্মীলিত) ইত্যাদি।

দেখাই যাচ্ছে যে, স্টাইল, গদ্য-অম্বয়, শব্দ-ব্যবহার সহযোগে কমলবাবু এই বিশিষ্ট ভাষার প্রয়োগের মাধ্যমে সে সময়ের কাহিনি ও তার সঙ্গে সুসমঞ্জস আবহ ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন অনায়াসে।

।। তিন।।

ঙ/২ কিন্তু এই সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে ‘অন্তর্জলী যাত্রা’-য় ব্যবহৃত ভাষা কীভাবে কমলকুমারের একান্ত নিজস্বতার স্বাক্ষর বহন করছে, আলোচনার অতঃপর সেইটিই বিচার্য।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাধু-গদ্য ও চলিত আলালী-ঢঙের যে দুই ধরনের ভাষারীতি এ কাহিনিতে প্রয়োগ করা হয়েছে তা শুধুই প্রেক্ষাপটকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে। কমলকুমার সে আমলের ভাষাকে নকল করেননি, তার প্রত্নকাঠামোটিকে গ্রহণ করেছেন মাত্র। ফলত সে আমলের ভাষার সঙ্গে এই উপন্যাসের ভাষার যে খানিকটা সাদৃশ্য দেখা যায় তা বাক্যের অম্বয় ও শব্দের প্রয়োগের ক্ষেত্রে। কিন্তু যেখানে এই আপাত-সাদৃশ্যকে অতিক্রম করে কমলকুমার নিজস্বতায় মণ্ডিত করেছেন ভাষাকে, সেখানে ভাষায় এসেছে বিচিত্র চিত্রল-তা যা সেকালীন গদ্যে ছিল একান্তই অপ্রাপ্য। সে আমলের বর্ণনাত্মক ভাষার মডেলের একঘেয়েমিকে নস্যাৎ করে ‘অন্তর্জলী যাত্রা’র লেখক ভাষাকে স্থপতির মতো গঠেছেন এবং চিত্রশিল্পীর মতো বর্ণে ও রেখায় ঝঙ্ক করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে কমলকুমার ভাষার মাধ্যমে মনের একটা বিশেষ স্তরকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন, যা বোধকে স্পন্দিত করে। যতিচিহ্ন কমিয়ে, অপ্রচলিত হয়ে যাওয়া অর্থের শব্দ প্রয়োগ করে, স্বীকৃত অম্বয়বিধিকে অতিক্রম করে তাঁর ভাষা নিজস্বতায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে বারেবারে। ‘খেলার পুতুল’ নামে একটি গল্পের মুখপাতে তিনি লিখেছিলেন, ‘ঠাকুর করুন, যাহাতে আমরা অতীব গ্রাম্য—আমাদের নিজের জীবনের ঘটনা সরলভাবে লিখিয়া ব্যস্ত করিতে পারি’। এই বক্তব্যের সঙ্গে আপাতভাবে তাঁর ভাষা সমধর্মী নয় একেবারেই, অন্তত বর্ণনার ক্ষেত্রে। তাই হয়ত বলা

যেতে পারে “গ্রাম্য, সরল” মানুষদের জীবনের বোধগত মানসকে তিনি ব্যক্ত করতে চেয়েছেন
জটিল, বুদ্ধিব্যঞ্জিত ভাষায়। তাঁর ভাষাচিন্তা সম্ভবত এই দ্বন্দ্বিকতারই লব্ধফল।

কমলকুমার ভাষার অধ্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যাকরণের বিধিনিষেধ মানেননি তার কারণ তিনি সেটিকে
খুব একটা প্রয়োজনীয় বলে মনে করেননি। তাঁর প্রধান মানসিকতা ছিল ভাব ও ভাষার একাত্মীকরণ
ঘটানো। তাই স্বেচ্ছায় তিনি ভাষায় এনেছিলেন আপাত-অসংলগ্নতা, কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল
ঐ আপাত-বিশৃঙ্খল ভাষার মধ্যেই ক্রিয়াশীল থাকে একধরনের সহজ, স্বাভাবিক অনুভব, যাকে
অধ্যয়ের বিধিনিষেধে বাঁধতে গেলে তা কৃত্রিমতা-দোষে দুষ্ট হয়। এই সচেতনভাবে বিধিভঙ্গ-করা
ভাষা সম্পর্কে কমলবাবু নিজেই বলেছেন “ভাষাকে যে আক্রমণ করে, সেই ভাষাকে বাঁচায়”।

॥ চার ॥

অভিনব ভাবনাসূষ্ট নতুন প্রকরণের এই যে ভাষা ‘অন্তর্জালী যাত্রা’-কে উপলক্ষ করে তিনি
উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন তার বাঞ্ছিত মূল্যায়ন করতে গেলে এ উপন্যাসে ব্যবহৃত দু-ধরনের
গদ্যকে আলাদা ভাবে বিচার করতে হবে:

ঙ/২.১ বর্ণনায় ব্যবহৃত স্থাপত্যধর্মী গদ্য যা চিত্রশিল্পসুলভও।

ঙ/২.২ সংলাপে ব্যবহৃত লৌকিক গদ্য যা গঙ্গাতীরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের
বাগ্মীরতিভিত্তিক।

কয়েকটি প্রাসঙ্গিক নিদর্শন :

ঙ/২.১.১ “আমাদের স্নেহের এ জগৎ নশ্বর, তথা চৈত্ররক্ষ অগণন অক্ষকার সকলই, মৃন্ময় এবং
অনিত্য; তথাপি ইহার, এই জগতের, স্থাবর ও জঙ্গমে পূর্ণিমা”। (পৃঃ ২১/ঐ)

ঙ/২.১.২ “যশোবতী বসিয়া আছেন। তিনি যেন বা ত্রিগুণাঙ্ঘিক মায়ার দ্বারা পীড়িতা নহেন।
অথবা অস্বাভাবিক স্তম্ভন তাঁহা হইতে অপহৃত হইয়াছে। সম্মুখে উদার গঙ্গা ইদানীং
চন্দ্রালোকে বেলোয়াড়ী”। (পৃঃ ৬১/ঐ)

ঙ/২.১.৩ “আলো ক্রমে আসিতেছে। এ নভোমন্ডল মুক্তাফলের ছায়াবৎ হিমনীলাভ। আর অল্পকাল
গত হইলে রক্তিমতা প্রভাব বিস্তার করিবে, পুনর্বীর আমরা, প্রাকৃতজনেরা পুষ্পের
উষ্ণতা চিহ্নিত হইব।” (পৃ ১/ঐ)

ঙ/২.১.৪ “তাহার গুণ্ঠদ্বয় কম্পিত হইল—সঙ্গে সঙ্গে বনাস্তুরাল চমকিত সবুজতা ফুঁসিয়া উঠিল,
অন্তঃসস্তা সর্পের গর্ভপাত হইল। শ্রাবণ মেঘের কিশোর বজ্রসকল দিম্বাগুলো ইতস্ততঃ
ছুটাছুটি করিতে লাগিল”। (পৃ ৭৭/ঐ)

ঙ/২.১.৫ “একটিমাত্র চোখ, হেমলকে প্রতিবিম্বিত চক্ষুসদৃশ, তাহার দিকেই, মিলন অভিলাষিণী
নববধূর দিকে চাহিয়াছিল, যে চক্ষু কাঠের, কারণ নৌকাগাত্রে অক্ষিত, তাহা সিঁদুর
অক্ষিত এবং ক্রমাগত জলোচ্ছ্বাসে তাহা সিক্ত, অশ্রুপাতক্ষম, ফলে কোথাও এখনো
মায়া রহিয়া গেল”। (পৃ. ১৬৭/ঐ)

ঙ/২.১.১ এবং ঙ/২.১.২ এই দুটি উদাহরণেই একটি আধ্যাত্মিক মাত্রা থাকায়, প্রত্যাশিতভাবেই
এদের গঙ্গীর ভাবটির সূত্রে স্থাপত্যসুলভ গাঢ়পিনদ্রতা সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া শব্দবিন্যাস
ও অর্থ-অনর্থের উপলক্ষেও ধ্বনির ঘনত্ব সূচিত হচ্ছে।

পক্ষান্তরে ঙ/২.১.৩, ঙ/২.১.৪, ঙ/২.১.৫ এই তিনটি উদ্ধৃতিতে এসেছে চিত্রসুলভতা যা নিছক
বর্ণনা নয়। “মুক্তাফলের ছায়াবৎ হিমনীলাভ”—“অল্পকাল পরে রক্তিমতা”—“পুষ্পের উষ্ণতা”
(ঙ/২.১.৩) ক্রমান্বয়ে উচ্চারিত হয়ে একধরনের সিনেস্থেসিয়া (বা অনুভূতির সংশ্লেষণ) সৃষ্টি

করেছে। অর্থাৎ শব্দচিত্রের মাধ্যমে বিচিত্র বর্ণবিন্যাসের সৃষ্টির পাশাপাশি কবিতার মতো ইন্দ্রিয়-সংবেদনা ও অনুভব করা যাচ্ছে।

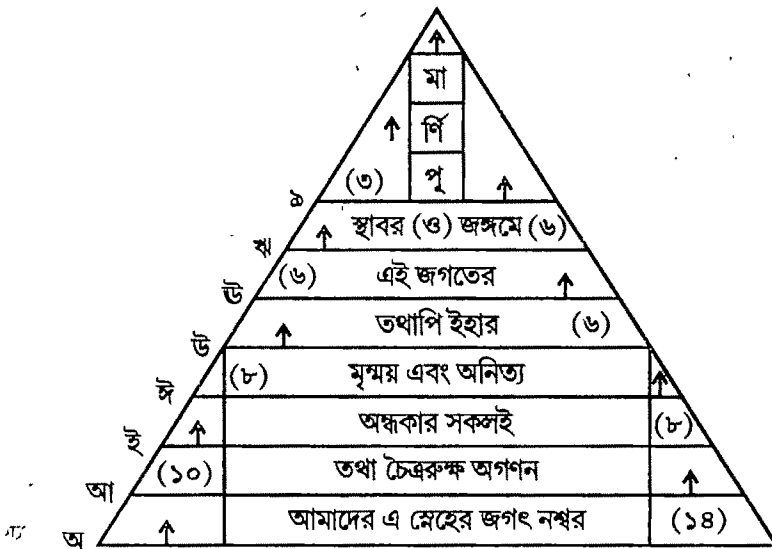
বর্ণনা ভাষায় চিত্রময়তার পাশে কাব্যিক সংবেদনা পাওয়া যায় পরের উদাহরণেও “চমকিত সবুজতা”—“অন্তঃসত্তা সপের গর্ভপাত”—“কিশোর বঙ্কসকল” (ঙ/২.১.৪) প্রভৃতি চিত্র-অনুষঙ্গ তারই ব্যঞ্জনাধর্মী।

সর্বশেষ উদ্ধৃতিটির (ঙ/২.১.৫) চিত্রল-সংকেত আবার একান্তভাবেই বাস্তব পর্যবেক্ষণের সূত্রজাত। এই প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করা একান্ত প্রয়োজনীয় : “ক্যানিং-এর ঘাটের বর্ণনা দিতে গিয়ে অজস্র ডিটেলের মধ্যে নৌকার গায়ে আঁকা চোখ, নদীর অস্থির জলে তার প্রতিফলন, এবং সেই জল উছলে উঠে সেই চোখকে জলসিক্ত করার বর্ণনা ‘অন্তঃজলী যাত্রা’র অন্তিম ইমেজ হিসেবে ব্যবহার করবার বহু আগে কমলবাবুর মুখে শুনি (‘কমলবাবু’/‘কমলকুমার ও অন্যান্যস্মৃতি’, সম্পা. সুরত রুদ্র, ১৯৮৮, পৃ. ১৪৮)—এই অসাধারণ শব্দে গাঁথা চিত্রের অনুষঙ্গে এবং মানবিক সংবেদনাময়। “হেমলকে—প্রতিবিস্তিত চক্ষু”—এই জটিল চিত্রকল্পের অনুষঙ্গে অবচেতনে স্পন্দিত হয় সঙ্কেটিসের আত্মহননের প্রসঙ্গ যার অন্তরালে ছিল সামাজিক অন্ধ সংস্কার। তাই এই চিত্রকল্প প্রয়োগের মাধ্যমে যশোবতীর ট্রাজেডিরও মুখ্য হেতু ছিল যে ঐ সামাজিক অন্ধ সংস্কারই, তাই যেন কমলকুমার চিহ্নিত করে দেন এতে। কিন্তু তারই সঙ্গে “কোথাও এখনো মায়া রহিয়া গেল” বলে কাহিনিটি শেষ করে কমলবাবু আবারও ছবির সূত্রে মনের সেই বিশেষ স্তর—যা বোধকে স্পন্দিত করে—তাকেই উন্মোচিত করেছেন। এইভাবে চিত্রধর্মের অকল্পিতপূর্ব ব্যঞ্জনা কমলকুমারের ভাষার মধ্যে বর্ণ ও রেখার পাশে সূক্ষ্ম অনুভূতির মাত্রাও সূচিত করেছে নিঃসন্দেহে।

॥পাঁচ॥

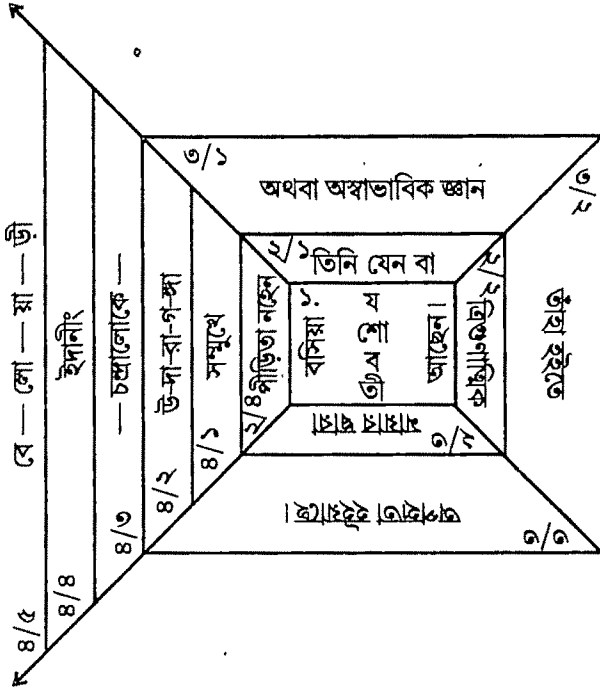
বর্ণনার ভাষার এই স্থাপত্যধর্ম ও চিত্রধর্মকে দুটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে এরপরে দেখে নেওয়া যেতে পারে। প্রথম রেখাচিত্রে ব্যবহৃত হয়েছে ঙ/২.১.১ উদ্ধৃতাংশটি এবং দ্বিতীয় রেখাচিত্রে ব্যবহৃত হয়েছে ঙ/২.১.২ উদাহরণটি।

রেখাচিত্র ১/ স্থাপত্যধর্ম



— বাক্যের অন্তর্গত স্বাভাবিক ছেদগুলিকে অভিনিবেশের সঙ্গে অনুসরণ করলেই ধীরে ধীরে এই প্রাকার-কল্প বাক্যগঠনটি পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই স্থাপত্যধর্মী বাক্য-বন্ধন কবিতায় বহুসময়ে পাওয়া গেলেও, গদ্যে এ জিনিস খুব দুর্লভ। অক্ষর এবং মাত্রার সম্পর্ক কবিতায় অনিবার্য হলেও, গদ্যে প্রায় তা অপ্রাপ্য। এখানে সেই বিরলপ্রায় ব্যাপারটি প্রাপ্য। এখানে পাওয়া যাচ্ছে অর্ধকলাবৃত্ত-সুলভ মাত্রা-বিন্যাস : অ = ১৪, আ = ১০, ই = ৮, ঈ = ৮, উ = ৬, ঊ = ৬, ঋ = ৬, ৯ = ৩ মাত্রা। “পূর্ণিমা”তে প্রাকার শীর্ষের গম্বুজচূড়া — দীর্ঘস্বর ‘আ’-তে স্থিত হয়ে ব্যাপ্তির বোধ সৃষ্টি করেছে। ভাবের দিক থেকেও এটি একান্তই মানানসই : দীর্ঘ বিস্তৃত স্বরের মাধ্যমে বিস্তীর্ণ পূর্ণজ্যোৎস্নালোকের ছড়িয়ে পড়ার চিত্রব্যঞ্জনা সৃষ্টি হচ্ছে।

রেখাচিত্র ২/ চিত্রধর্ম



এই উদ্ধৃতিটি চারটি সরল বাক্যে গঠিত (যথা : ১, ২, ৩, ৪)। এতে কেন্দ্রীয় বাক্যটি হল “যশোবতী বসিয়া আছেন।” (১) একে ঘিরেই বাকি তিনটির বিন্যাস ঠিক পরবর্তী বাক্যটি “তিনি যেন বা ত্রিগুণাত্মিকমায়ার দ্বারা পীড়িতা নহেন।” (২/১, ২/২, ২/৩, ২/৪) যশোবতীর অন্তর্লোকের পরিচায়ক বলে কেন্দ্রীয় বাক্যটির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা সবচেয়ে বেশি। তাই এর অবস্থান কেন্দ্রের ঠিক পরেই। এর পরের বাক্যটি (৩/১, ৩/২, ৩/৩) “অথবা স্বাভাবিক জ্ঞান তঁহা হইতে অপহৃতা হইয়াছে” এটি যশোমতীর বহিরাঙ্গিক অভিব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে দ্বিতীয় অর্থাৎ অন্তরঙ্গ বাক্যটির পরে ব্যবহৃত রেখাচিত্রের বাইরের প্রান্তের প্রায় কাছে। শেষবাক্যটিতে (৪/১, ৪/২, ৪/৩, ৪/৪) স্থাপত্যধর্মের পাশে পাশে চিত্রল-তাও ব্যঞ্জিত। তিন অক্ষরের ‘সম্মুখের’ পর ‘উ-দা-র-গ-ঙ্গা’-র ব্যাপ্তি পাঁচটি অক্ষরেই সুস্পষ্ট। আর রেখাচিত্রের সর্বশেষ স্তরে “বে-লো-য়া-ডী”-র (৪/৫) বিকিমিকি ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলতে তার ঠিক আগে ব্যবহৃত হয়েছে ধ্বনিবন্ধকারময় শব্দগুচ্ছ ‘স্ম’ (৪/১), ‘ঙ্গা’ (৪/২), ‘ঙ্গা’ (৪/৩), ‘নীং’ (৪/৪) ইত্যাদি তাছাড়া

যশোবতীর বসে থাকার কেন্দ্রিক বদ্ধতা থেকে ধীরে ধীরে কিভাবে উদ্ধৃতিটি ‘উদার’ শ্রেণিতে উন্মুক্ত হচ্ছে সেটিও এই রেখাচিত্রের মাধ্যমে ব্যঞ্জিত হচ্ছে।

॥ ছয় ॥

ঙ/২.২ এরপর সংলাপের ভাষার কথা, সেখানে কমলকুমার একান্তই শল্পমূলগত। বৈজ্ঞানাতের মুখে তিনি যে ধরণের সংলাপের বিন্যাস করেছেন, তা বস্তুতপক্ষে একান্তই লোকভাষা। ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত’ গ্রন্থে পরমহংসদেবের যেসব তাত্ত্বিক উক্তি সংকলিত করেছেন ‘শ্রীম’ তার সমধর্মী অনেকগুলি কথাই এখানে বৈজ্ঞান মুখে উচ্চারিত:

ঙ/২.২.১ “খোল বড় ভালবাসি গো।”

ঙ/২.২.২ মানুষ এক অচিন গাছ, মানুষ বড় ডাগর জীব।”

ঙ/২.২.৩ “যে মানুষ নিজে ভস্ম হতে চায়, সে এ সোনার ত্রিভুবন জ্বালাতে পারে গো।”

ঙ/২.২.৪ “শুকনা ডালে পাখি দুটো বড় হিমসিম খায়।”

ঙ/২.২.৫ “আমি ভাবের পাগল নই, ভবের পাগল।”

ঙ/২.২.৬ “ঘটাকাশ ভাঙলেই পটাকাশে মিলবে, হিসেব মিলে যাবে।”

বৈজ্ঞানাতের সবকটি উক্তিই শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তির প্রত্যক্ষ আদলেই রচিত। কমলকুমার যে বলেছিলেন “এই গ্রন্থের ভাববিগ্রহ রামকৃষ্ণের” তারই স্পষ্টতম প্রকাশ দেখি বৈজ্ঞানাতের এইসব সংলাপে। বৈজ্ঞানাতের সংলাপের ভাষায় মূলত প্রতিফলিত হয়েছে ভাগীরথী-তীরবর্তী চব্বিশ পরগণার গ্রাম্যভঙ্গীটিই “লিভিয়ে”, “লিচয়”, “অল্ল্যায়”, “কিস্তক”, “বুললাম”, “হরিনুট”, “বিট্লে”, “কেনে”, “দুখালে” ইত্যাদি শব্দব্যবহার তারই নির্দেশন। লৌকিক বাগ্মীরতির মতোই কিছু শ্লথরুচির শব্দও তাই বৈজ্ঞান অক্রেশে ব্যবহার করেছে। এছাড়াও সীতারামের মুখে “দুব” যশোবতীর মুখে “হি গো”, হরোরামের মুখে “মাড়ভেতো” ইত্যাদি লৌকিক প্রকরণের শব্দও এই উপন্যাসের আঞ্চলিকতা-ধর্মই সূচিত করে।

প্রকৃতপক্ষে ব্যবহৃত ভাষায় ‘গ্রাম্যসরলতার’ যে দাবী কমলকুমার করেছিলেন (‘খেলার পুতুল’ স্মর্তব্য) সেই উপাদান এই চরিত্রগুলির সংলাপেই প্রাপ্য। কবিরাজ, জ্যোতিষী ও পুরোহিতের ভাষায় খানিকটা প্রত্যাশিত পরিশীলন থাকলেও মুখ্য তিনটি চরিত্র যশোবতী, সীতারাম ও বৈজ্ঞানাতের ভাষা একান্তই মৃত্তিকাসংলগ্ন। মাটির গন্ধমাখা কয়েকটি সংলাপ প্রাথমিকভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে:

ঙ/২.২.৭: “যা শালা পাকা ঘুটি বুঝি কাঁচে গো”। (বৈজ্ঞানাত)

ঙ/২.২.৮: “হারে এত ডালপালা, দাঁত মাজতে একটো ভাঙলে পাক্সি রে।” (ঐ)

ঙ/২.২.৯: “তুমি কি ভাবো ঐ ঘাটের মড়া তুমার সোয়ামী”? (ঐ)

ঙ/২.২.১০: “নরকের কীট হয়ে জন্মাবি খল” (যশোবতী)

ঙ/২.২.১১: “আই গো দেখেছ মরণদশা, আমার একেবারে খেয়াল নেই গো।” (ঐ)

ঙ/২.২.১২: “ঘাগী — পটানী ফাজিল — গঙ্গা ডুবে মর গা” (সীতারাম)

ভাষাবিজ্ঞানী দ্য সসুর কথিত ‘লা পারোল’ অর্থাৎ যথার্থ লোকভাষার নির্দেশন এই সংলাপগুলি যার সমতুল অজ্ঞস নির্দেশন পাওয়া যায় কেরীর ‘কথোপকথন’-এ ও পরবর্তীকালে ‘ছতোমী’ ও ‘আলালী’ গদ্যেও।

দীর্ঘ আলোচনার শেষ পর্বে এসে দেখা যাচ্ছে যে বর্ণনা-অংশ ও সংলাপ—এই দুই বর্গের ভাষায় প্রয়োগে প্রকট ভিন্নতা লক্ষণীয়। বর্ণনা-অংশের ভাষার মধ্যে তৎসম শব্দ ও দুরূহ অর্থ প্রয়োগের যে ব্যাপকতা রয়েছে, সংলাপে ঠিক তার বিপরীত প্রবণতাটি বিদ্যমান। বর্ণনাংশে আধ্যাত্মিক গান্ধীর্ষ ও সংলাপে লৌকিক তরলতা এ দুয়ের সহাবস্থান ভাষাশিল্পী হিসেবে কমলকুমারের অনন্যতা নির্দিষ্ট করেছে। এ দুয়ের এই অবিচ্ছেদ্য অবস্থিতি তাই কমলকুমার মজুমদারের ঐকান্তিক স্টাইলের অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে, যা নিছক পর্বচ্ছিন্ন-সুলভতার গুণী পেরিয়ে গেছে। একথা ঠিকই যে আলোচনার গোড়ায় এই উপন্যাসের পর্বচ্ছিন্নসুলভতার নানান সূত্রের অন্যতম তথা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসেবেই এই ভাষাকে গণ্য করা হয়েছিল। কিন্তু কথাসাঙ্গে এসে সেই উল্লেখযোগ্যতা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, কারণ প্রথাসিদ্ধতার প্রত্নকাঠামোটাকে শুধুমাত্র বজায় রেখে যে দুঃসাহসী নিরীক্ষা করেছেন কমলকুমার তাতে এই ভাষা হয়ে উঠেছে একান্তভাবে তাঁরই নিজস্ব। কোনো পূর্বসূত্র, কি পর্বচ্ছিন্নসুলভতা সেখানে নিতান্তই প্রাস্তিক।।

মঙ্গলকাব্যের চেনা মুখ অচেনা মানুষ

স্বাতিকথা চন্দ্রবর্তী

এমনটাতো হয়েই থাকে। যাদেরকে চিনি বলে স্থির জানি, কখনও কখনও তাদেরই বড় অচেনা লাগে। চেনা মানুষের আড়াল থেকে যখন কোনও অচেনা মানুষ বেরিয়ে আসেন, তখন বিশ্বাস অবিশ্বাসের আলো আঁধারিতে পৃথিবীটার রং বদলে যায়—বড় বিস্ময় লাগে। অথচ এমনটাই তো হবার কথা। একজন মানুষের পরতে পরতে যে হাজারো মানুষ। একটি মুখ সারা দিনে কত না মুখ হয়ে কথা বলে, মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে যায় চোখের ভাষা। আমি চিনি গো চিনি তোমারে বললেই কি একজন মানুষকে সম্পূর্ণ চেনা যায়! মানুষ নিজেকেই বা কতটুকু চেনে। তাই নিরন্তর খোঁজার পালা, চেনা মুখের আড়ালে অচেনার অন্বেষণ।

মঙ্গলকাব্যের বিষয় আশয় নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে বিস্মিত করেছেন কিছু মানুষ। অবিমিশ্র সাদা মানুষ আর অবিমিশ্র কলো মানুষ যে হয় না, এ সত্য আমাদের জানা। তবু ব্যক্তিপুজায় বিশ্বাসী মানুষ প্রিয় মানুষের চেহারার কালো দিক দেখতে পায় না, চায় না বলেই পায় না। অথচ নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে ভালো মন্দসহ একটা গোটা মানুষ ধরা দেয়। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের এমন অনেক গোটা মানুষের ছবি এঁকে গেছেন, ভালো মন্দ সাদা কালোয় গড়া বাস্তব পৃথিবীর সব জ্যাস্ত মানুষ, জিয়ন্ত দেবদেবী।

শুরু করা যাক চাঁদ সদাগরকে দিয়ে। চাঁদ ছাড়া এমন করে কেই বা নাড়িয়ে দিতে পেরেছেন একটি জাতির সমগ্র চৈতন্যকে। বণিক চন্দ্রধর বাঙালির স্বপ্ন পুরুষ, বীর্যবন্তর প্রতীক পুরুষ চাঁদ পেরেছিলেন জীবনযুদ্ধে হারতে হারতেও মানুষকে জেতার স্বপ্ন দেখাতে। মধ্যযুগের দৈবমুখিন ভাগ্যনির্ভর একটা আধা কুঁজো জাতির সামনে বণিক কুলপতি চাঁদ যখন বুক চিতিয়ে দেবী মনসার বিরোধিতায় নামেন, বাংলার চণ্ডীপুণ্ডে তখন ঘোর বিস্ময়ে মানুষগুলো অভিভূত হয়ে শোনে সেই কাহিনি। একে একে চাঁদ হারাচ্ছেন তাঁর গুয়াবাড়ি, তাঁর যত্নলব্ধ মহাজ্ঞান, তাঁর একান্ত ভরসার সঙ্গী ধনুস্তরী, বুঝতে পারছেন বিপদ খাঁড়ার মতো মাথার ওপর ঝুলছে। তারপর একে একে নিবিছে দেউটি। মনসা-বিরোধিতার ফল ফলল হাতে হাতে। ছয় পুত্র হারালেন চাঁদ। দেবতার সঙ্গে বিবাদ কি মানুষের সাধ্য? হয়তো নয়, চাঁদও নিশ্চয় তা জানতেন। তবু সব জেনে শুনেই স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন। চাঁদ ভাঙেন তবু মচকান না। ভবিষ্যতের আশা ছয় পুত্র নির্মূল। তাতে কী, জান তো আছে। চালাও পানসি মাঝ দরিয়া। বান্দিয়ার ছেলে ঘরে বসে কখনও ভাগ্যের দোহাই দেয় না, ভাগ্যকে নিজের হাতে ভাঙে গড়ে, ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। অতএব সুদূর দক্ষিণ পাটনে পাড়ি দিলেন চাঁদ এবং ভরা ডুবি হল, যা দেবদ্রোহিতার অপরাধে অনিবার্য ছিলই। তবু থামানো গেল না মানুষটাকে। কী একটা অসীম অদম্য প্রাণশক্তিতে ঠিক ঘুরে দাঁড়ালেন চাঁদ। এবার নতুন আশা, বালা লখিন্দর। কে বলেছে চাঁদের সব গেছে? সবই তো আছে — সংসার, সন্তান, এমনকি মনসার সঙ্গে পুরনো শত্রুতাটাও, একদম ঠিকঠাক। চ্যাংবুড়ি কানি বলেছে বিয়ের রাতে শিবরাত্রির সলতে লখাইকে খাবে। সুতরাং নতুন চ্যালেঞ্জ। লখাইয়ের বিয়ে। জগৎ টুঁড়ে বার করলেন যোগ্য পাত্রী বেঙ্কলাকে, গড়লেন নিশ্চিত বাসর ঘর। ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া বাজিয়ে মনসার নাকের ডগা দিয়ে হাজার হাজার বরযাত্রী নিয়ে শোভা-যাত্রা করে বিয়ে দিলেন ছেলের। শেষ রক্ষা অবশ্য হলনা। বাসর ঘরের সুতোর সমান হিঙ্গপথে কালসাপ ঢুকে কেটেই ছাড়ল লখাইকে। আত্মবিশ্বাসে এবারে যেন সামান্য টান চাঁদের, তবু কানির উচ্ছিষ্ট মড়া থেকে গাঙুরের জলে ভাসানোর আয়োজনে ভাটা পড়ল না। এবারে শুধু মৃত পুত্র নয়, সঙ্গী সদ্য বিবাহিতা জীবিত

পূত্রবধূ বেঙ্কলা, সাধ করে যাকে ঘরে এনেছেন চাঁদ। আশ্চর্য বিড়ম্বিত জীবন চাঁদের। বৈচে থেকে এসব চেয়ে চেয়ে দেখতে হয়। বুক ফাটে তবু বাইরে শব্দহীন, নইলে কানি হাসে যে! পৌরুষেরও কি জ্ঞাত রঞ্জে হয়। চাঁদ এভাবেই একা এবং একা। তাঁর অটল ব্যক্তিত্বকে যুগের সীমায় আটকানো যায় না, চাঁদ তাই কালোস্ত্রীর্ণ পুরুষ। কাহিনির পরিণতিতে দেবীর চরণে তিনি ডান হাতে ফুল দিলেন না বাঁ হাতে ফুল দিলেন, সে ভাবনায় আর যাই হোক, তাঁর সংগ্রামটা মিথ্যে হয়ে যায় না। এই চাঁদের সামনে মাথাটা আপনি নুয়ে আসে। শুধু মধ্যযুগ নয়, আধুনিক কালও সদাগরের এই হিমালয়সদৃশ দৃষ্ট পৌরুষের সামনে ঝুঁকেছে। একালের নাট্যকারের কলমেও তাই ‘চাঁদ বণিকের পালা’ লেখা হয়। কিন্তু এই দেখায় কোথাও যেন একটা ফাঁক থেকে গেছে। চাঁদকে মহিমময় করে তুলতে গিয়ে স্তবস্তুতির আড়ালে গোটা মানুষটাকে আর ভাল করে দেখা হয়ে ওঠেনি। অথচ মধ্যযুগের কবিরা চাঁদকে আলোয় কালোয় মিশিয়েই গড়েছিলেন।

কথায় বলে চাঁদে কলঙ্ক আছে, যা চাঁদের ভূষণ। চাঁদ সদাগরও এমন অনেক কাজ করেছেন যা তাঁকে আপাতভাবে কলঙ্কিত করেও তাঁর চরিত্রে নানা Dimension এনে দেয়। চাঁদ সদাগর যে রক্ত মাংসের মানুষ, এ কথা ব্যক্তিপূজক ভক্ত ভুললেও কবিরা ভোলেননি। চাঁদ তাই মধ্যযুগের যথার্থ প্রতীক পুরুষ, যিনি নিজে কামুক, কিন্তু প্রবল সন্দেহপ্রবণ, বাড়াবাড়ি মাত্রায় হিসেবি, অসম্ভব দান্তিক, প্রজাপীড়ক সামন্তপ্রভু, সূচতুর ব্যবসাদার, ধনলোভী এবং লাম্পটের প্রশ্রয়দাতা। এ হেন চাঁদকে কখনও কখনও সহ্য করা কঠিন। আর তখনই বোঝা যায় মনসামঙ্গল কবিদের মুসিয়ানা— একটা ধরা বাঁধা কাহিনির নির্দিষ্ট পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেও যাঁরা চরিত্রচিত্রণে চমকে দিয়ে গেছেন।

চাঁদ সদাগর কামুক ছিলেন, এ কথা পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ—সব বঙ্গের ছোট, বড়, মাঝারি, সব কবিই লিখেছেন। ভক্তজনেরা বলবেন, বহুগামিতা তো মধ্যযুগীয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুরুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। কথাটা ঠিক। তবে সব কিছুই তো একটা সময় অসময় আছে। মনসার কোপে সব খুইয়ে এমনকি মানও খুইয়ে পেটভাতায় চাষ খাটা চাঁদ যখন অনেক কষ্টে মাত্র চারপণ কড়ি জোগাড় করেন, তখনও তিনি পত্নী সনকার আগে নটী বাড়ি যাবার ভাবনা ভাবেন—

‘এক পণ কড়ি দিয়া ক্ষৌর শুদ্ধ হব।

এক পণ কড়ি দিয়া দই চিড়া খাব।।

এক পণ কড়ি দিয়া নটীবাড়ি যাব।

এক পণ কড়ি নিয়া সনকারে দিব।।’ (বিজয় গুপ্ত)

অতএব নটীবাড়ি প্রত্যাগত চাঁদ দীর্ঘদিন পর দেশে ফিরলেন। বাণিজ্যে লক্ষ্মীতো মিললই না, বরং সর্বস্ব খুইয়ে নিঃস্ব হলেন চাঁদ। তবু সেই চূড়ান্ত দারিদ্র্যেও তাঁর নটী-আসক্তি চাঁদকে অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছে। একদিকে নারীলুপ্ততা, অন্যদিকে প্রবল সন্দেহপ্রবণতা, মানবচরিত্রের সম্ভাঙ্গত এই binary opposition একটি সাধারণ সত্য। পুরুষ যত উচ্ছৃঙ্খল, নারীর কাছে তত সতীত্বের দাবি। যুগপুরুষ চাঁদ তাই ঘরে ফিরে যুবক লখিম্বরকে দেখেই সন্দেহের আগুনে জ্বলে ওঠেন—

‘সর্জ্যা হইতে উঠিল সুন্দর লখিম্বর।

বিছানে থাকিয়া দেখে রাজা চম্পধর।।

লোড় দিয়া চান্দো গীয়া লখাইর হাতে ধরে।

খড়্গা হাতে করি তবে চায় কটিবারে।।’ (নারায়ণ দেব)

কোনও প্রশ্ন নয়, সোজা মারধর। সামন্ত প্রভুরা প্রশ্ন করেন না। নিজের যা ঠিক মনে হয়,

সেই মতো কাজ করেন। লখিন্দর তাই প্রথম দর্শনেই পিতার হাতে মার খেল। মরেই যেত, যদি না মাঝখানে সনকা এসে দাঁড়াত। সনকার কপালেও অবশ্য বিনা দোষেই অপবাদ জুটল—

‘পরপুরুষ তুমি যে আনিয়াছ ঘর।

তোর পাণে চৌদ্দ ডিঙা তল হইল মর।।’ (নারায়ণ দেব)

মানুষ এমনটাই। নিজের মাপে পৃথিবীটাকে মাপতে চয়। চাঁদের জীবনে পত্নীর অনুপস্থিতিতে অন্য নারী থাকে বলে সনকার ক্ষেত্রেও সেটাই ভেবেছেন তিনি।

‘কহ ২ সোনাই তুমি কহত সর্বর।

কথাকার কুমার তর মন্দির মাঝার।।’

‘বিষ্ণু বিষ্ণু’ উচ্চারণ করে সনকা লখিন্দরের সত্যকার পরিচয় দিলেও সন্দেহ যায় না চাঁদের। বাধ্য হয়ে সনকাকে দেখাতে হয় স্বামীর দেওয়া নিদর্শন পত্র। লখাইয়ের পঞ্চমাস গর্ভকালীন অবস্থায় চাঁদ বাণিজ্য যাত্রা করেছিলেন। তার আগে স্ত্রীর একান্ত অনুরোধে সোমাই পন্ডিতকে দিয়ে লেখালেন নিদর্শন পত্রটি। সোনাই ভেবেছিলেন সমাজে কথা উঠলে হয়তো কোনদিন এই পত্রের প্রয়োজন হতে পারে, ভাবতে পারেননি সমাজ নয় তাঁর স্বামীর সন্দেহ নিরসনে সুদূর ভবিষ্যতে এই পত্র তাঁর কাছে আসবে। তাই চাঁদ যখন তাঁকে বলেন সন্তানের ব্যাপারে তাঁর কিছু স্মরণে নেই, এসব সনকার ছলনা, তখন সনকা আর থাকতে পারেননি। অভিমানে, ক্ষোভে, রোষে একটা কাজই করেছেন—‘পত্র ফেলাইয়া তারে দিল ততক্ষণ।।’ কোনও কথা নয়, শুধু একটা পত্র ফেলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ রাখলেন মধ্যযুগের এই নারী। অথচ চাঁদের কাছে সনকার এই অভিমান কোনও মূল্যই পায়নি। বরং পরম তাচ্ছিল্যে বাম হাত দিয়ে চিঠিটা নিয়েছেন চাঁদ, প্রদীপ টেনে ভালো করে সাক্ষী সাবুদ, সই, সোমাই পন্ডিতের হস্তাক্ষর, সন তারিখ—সব খুটিয়ে খুটিয়ে হিসেব মিলিয়েছেন—

‘বাম হাত দিয়া তবে পত্রখান লইল।

প্রদীপ নিকটে নিঞ চাহিতে লাগিল।।

দিন ক্ষোণ মাস পুনি সাক্ষি চারিজন।

দেখিলেক পত্রে আছে সোমাইর লিখন।।’ (নারায়ণ দেব)

নারীর প্রতি এত তাচ্ছিল্য আর এত সন্দেহ! এ চাঁদ কোন চাঁদ! মনে রাখতে হবে এই চাঁদই কিন্তু শুধু নারীর রূপে মুক্ত হয়ে মহাজ্ঞান হারিয়েছিলেন। সে ক্ষেত্রে মধ্যযুগ কোনও প্রশ্ন করে না পুরুষকে, শুধু নারীকে জবাবদিহি করতে হয়।

চাঁদ সদাগর বেহিসাবি মাত্রায় হিসেবি ছিলেন। লখিন্দরের মৃত্যুর পর যখন কলার মাঞ্জুষ গড়ার সময় এল, তখনও বেঙ্কলার প্রস্তাবে ইতস্তত করেন চাঁদ। বড় মানুষের মধ্যে যে অনেক ছোট মানুষও বাস করেন, এই চাঁদ সেই সত্যটাকে তুলে ধরেন।

‘চান্দো বলে এক দুঃখ মৈল সাত বেটা।

তাহা হইতে অধিক দুঃখ কলা জাইব কাটা।।’ (নারায়ণ দেব)

চাঁদ বণিক মধ্যযুগের সামন্তপ্রভু। রাজা না হয়েও অর্থকৌলীন্যে রাজার সমান। সুতরাং সামাজিক প্রতাপে তাঁর সমতুল ব্যক্তি চম্পক নগরে যে কেউ ছিল না, এ কথা বলাই বাহুল্য। তাই যে কোনও ক্ষেত্রে চাঁদের কথাই ছিল শেষ কথা। মনে পড়ে, সব হারিয়ে দীর্ঘ বারো বছর পর চাঁদ যেদিন দেশে ফিরলেন, সেদিন চম্পক নগরে ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠল। চাঁদের চৌদ্দ ডিঙায় চম্পক নগরের প্রতিটি ঘরেরই কেউ না কেউ ছিল। বারোটা বছর ধরে তারাও

প্রতীক্ষায় দিন গুনেছে কবে ফিরে আসবে স্বজন। অবশেষে চাঁদ ফিরলেন, আর তাঁর সাথে সেই ভয়ঙ্কর বার্তা—কেউ ফিরবে না। কালীদহের জলের অতল তলে সবাই নিখর হয়ে গেছে চিরকালের জন্য। এর পরের চিত্রটা তো একটাই হতে পারে—চম্পক নগর জুড়ে শুধু কান্না—

‘দুঃখ রোল চম্পক নগর।

চৈন্দ ডিঙা কিবা হৈল ভাগি সাজি কথা রইল

কান্দে প্রজা ভূমির উপর।।

সোমাইর মাও কলাবতি বাসুদেব জার পতি

ক্রন্দন করয়ে বড় সোকে।

কার মৈল বাপ ভাই কার মৈল জামাঞী

বেড়িয়া কান্দয়ে বড় দুক্ষে।।

মনেত উঠিয়া দুক্ষ দুই হাতে কুটে বুকব

দসে বিসে একত্র হইয়া।

জাহার স্বামী মৈল সে সোকে পাগল হৈল

হাতের সম্ব ফেলহিল ভাঙিয়া।’ (নারায়ণ দেব)

এই কান্না কিন্তু অচিরেই থামিয়ে দিলেন চাঁদ। তিনি প্রভু, তাঁর ইচ্ছাতেই সব। প্রজাদের কান্নায় পদ্মার সুখ—এই ভাবনাতেই অস্থির চাঁদ। এর আগেও সোমাইরা যখন মরছিল, মরতে মরতেও সাধুর গঞ্জনা শুনতে হয়েছিল তাদের, কারণ কেউ কেউ চাঁদের বিরুদ্ধে দুটো কথা বলেছিল। আর দীর্ঘবছর বাদে তাঁদের যখন দুটো চোখের জল জুটল, সেইটুকু প্রাপ্যও তাদের পেতে দিলেন না চাঁদ। সামস্ত প্রভুর থাবা থামিয়ে দিল ক্রন্দনরত কণ্ঠ—

‘ক্রন্দন শুনিয়া চান্দ দস্ত কড়মড়ি।

জত লোক কান্দে মারে দোহাতিয়া বাড়ি।।

চান্দোর ক্রোধ দেখিয়া লোক চমকিত যেন।

নিষন্দে রহিলা সোক তেজিয়া ক্রন্দন।।’ (নারায়ণ দেব)

সামস্তপ্রভু চাঁদের এই ঔদ্ধত্যের কথা উত্তরবঙ্গের কবিদের কলমেও ধরা পড়েছে। তবে কবি জীবন মৈত্র যে ভাবে চাঁদকে লাম্পট্যের প্রশ্রয়দাতা হিসাবে চিত্রিত করেছেন, তা সত্যিই অভিনব। উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যধারায় লখিন্দরের মাতুলানী গমন প্রসঙ্গটি প্রত্যেক কবিই এনেছেন। বালা লখিন্দর তখন আর বালা নেই, পূর্ণ যুবক। ‘নারী’ স্বপ্নে-জাগরণে আচ্ছন্ন করেছে তাকে। এদিকে মাতা সনকা পুত্রের বিবাহ দেবেন না বলে পণ করেছেন, কারণ বিবাহের পর বাসরেই সর্পাঘাতে পুত্রের মৃত্যুযোগ। এই অদ্ভুত টানা পোড়েনে বেচারি লখাইয়ের স্বপ্ন প্রায় চুরচুর। এমন এক সময়ে তার চোখে নেশা ধরল তার মামি। এক্ষেত্রে মামির কোনও দোষ ছিলনা, দোষ গুণ যা সব লখিন্দরের চোখে। লখিন্দর স্বপ্ন দেখে মামিকে, স্বপ্নে তাঁর সমর্থনও পায় সে। অতএব সকাল হতেই স্নানের ঘাটের পথে মামির কাছে প্রেমের প্রস্তাব। প্রস্তাব শুনে হতচকিত মামি স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাখ্যান করেন ভাগ্যকে, ফলত জোর করে মাতুলানী গমন করে লখাই। ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল বিস্ময়বসনা কৌশল্যা কেঁদে পড়েন ননদিনী সনকার কাছে। কোনরকমে ভ্রাতৃবধূকে শান্ত করে সনকা ছোটেন স্বামী চন্দ্রধরের কাছে। পুত্রের কুকীর্তির কথা সবিস্তারে শোনার পর ‘জিও জিও’ বলে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন চাঁদ। তাঁর কাছে এমনটাই স্বাভাবিক। সামস্তপ্রভু নিজের নিয়ম নিজে বানান, নীতিবাক্য সেখানে ধোপে টেকে না। বিলাসী, নারীলোভাতুর যৌবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে পুত্রের মধ্যে আত্মপ্রতিকৃতি দেখেই বোধহয় আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন।

যৌবনে ভাটা পড়লেও অতিরিক্ত ভোগপ্রবণতা যে তাঁর রক্তকে আজও চঞ্চল করে তোলে, তাঁদের আচরণই সে কথা বলে দেয়—

‘শুনি বলে সদাগর ভাল ভাল লখিম্বর
বাছা বড় কর্ম করে লখাই।
গিয়াছিল মামীর কাছে কামে তোর ভয় আছে
জিও জিও বাড়ুক তোর প্রমাই।’

মাতুলানীগমন করে লখাই এত বড় কাজ করে ফেলেছে যে পিতা হয়ে এহেন কীর্তিমান পুত্রের পরমায়ুর শ্রীবৃদ্ধি চাইছেন চাঁদ, যাতে ভবিষ্যতে এমন কর্ম সে আরও করতে পারে।

চন্দ্রধর সদাগর পাক্সা ব্যবসায়ী। এককে দশ করতে তাঁর জুড়ি নেই। অর্থবান মানুষটি অর্থ ভালোবাসেন। প্রভূত উপার্জনও করেন। ইস্টদেবতা শিব তাঁকে কম কিছু দেননি। কিন্তু ওই যে, যার যত আছে তার তত আরও আরও খাঁই। পুত্র লখিম্বরের বিবাহ উপলক্ষে চাঁদের এই অর্থগৃধুতার পরিচয় দিয়েছেন কবি নারায়ণ দেব, বড় মোক্ষমভাবেই দিয়েছেন। উজ্জানী নগরের পান্টি ঘর সাহে বান্যা ও সুমিত্রার একমাত্র কন্যা বেঙ্কলার সঙ্গে লখিম্বরের বিবাহ স্থির হল। সমানে সমানে ঘর। সুতরাং সাহে বান্যা দান কিছু কম দিলেন না। পঞ্চহরিতকি দিয়ে কন্যা সমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে সাহে আর যা দিলেন, নারায়ণদেবের অনুসরণে তার ফর্দটা এরকম—

পালে পালে রাজহংস, একশতটি কর্পূর ভরা সোনা রূপার দোলা, পালকি, বাণিজ্য করার জন্য সাতটি ডিঙা, সোনারূপার খাট, দুলিচা গালিচাসহ বিছানা, সোনারূপার জিন পরানো একশত ঘোড়া, অজস্র সোনার মোহর, প্রচুর দাস দাসি, সোনার টেপা কড়ি।

এ তো গেল জামাইয়ের দান। এছাড়াও চম্পক নগরের প্রতিটি অধিবাসীকেও যৌতুকে মুড়ে দিয়েছিলেন সাহে কন্যা। কিন্তু এতো করেও চাঁদের মন পাননি তিনি। দান দেখে চন্দ্রধর বলেছিলেন, এতে চম্পকনগরীর লোকেরা হাসবে, শুধু তাই নয়, টান মেরে এইসব দান ফেলে দিয়েছিলেন চাঁদ—‘চান্দো দান ফেলায় সিঁচিয়া।’ অর্থাৎ চাঁদ যে চিরাচরিত সামাজিক ব্যাধি পণপ্রথার মতো নিকৃষ্ট প্রথার প্রবল সমর্থক ছিলেন, এই চিত্র তাকেই সমর্থন করে। বিবাহের মতো সামাজিক অনুষ্ঠানে, যেখানে হাজারো মানুষের উপস্থিতি, সেখানে সমমর্যাদার মানুষকে বিপন্ন করার মধ্যে কোথাও একটা ত্রুর চোরা আনন্দ বোধহয় লুকিয়ে থাকে। চাঁদের মতো মানুষ সে আনন্দটুকু ছাড়তে নারাজ। এ ছাড়াও চাপ দিয়ে যৌতুকের মাত্রাটাও যথেষ্ট বাড়িয়ে নেওয়া যায়। এক্ষেত্রে যেমন বেঙ্কলার মাতা সুমিত্রার পরামর্শে কন্যার সুখের জন্য সাহে রাজা ঘরের যাবতীয় সোনাদানা এবং একশ তালুকবিশিষ্ট একটি জমিদারি উপহার দিয়েছিলেন জামাতাকে, অথবা বকলমে চাঁদকে। বলাই বাহুল্য, এ সব ঘটনা চাঁদকে উজ্জ্বল করে না।

বণিককুলোত্তম চন্দ্রধরকে ছোট করা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। একটি মানুষের সার্বিক পরিচয় দিতে মধ্যযুগের কবিরা যে কার্পণ্য করেননি, তারই কিছু নিদর্শন এখানে তুলে ধরা হ’ল। চাঁদের ব্যক্তিত্ব, পৌরুষ, ঋজুতা কোনকিছুই এইসব ঘটনায় মাত্রাতিরিক্ত ঢাল খায় না, কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এ সবও অতি স্বাভাবিক ঘটনা; বরং বিপরীতে ভালো মন্দ মিশিয়ে চরিত্রটি প্রথিত পূর্ণতা পায়। চাঁদের কথা শেষ করব তার সন্তান স্নেহের একটি নিদর্শন দিয়ে।

ঘটনাটি হল লখিম্বরের বিবাহের সম্বন্ধস্থাপন। ছটি ছেলে মৃত চাঁদের, অবশেষ বিন্দু লখাই। জন্মমুহুর্তে জ্যোতিষী তারও মৃত্যুনিদান হেঁকে রেখেছেন, বিবাহ রাত্রেই বাসরে হবে লখিম্বরের মৃত্যু। অথচ যৌবনে পুত্রের বিবাহ না দিলেই নয়। পুত্রকে কোলে বসিয়ে লক্ষ চুষনে ভরিয়ে দেন চাঁদ। আবার কর্তব্যও তাড়িত করে তাঁকে। সুতরাং শুরু হয় পাত্রীর সন্ধান। যেমন তেমন

পাত্রী হলে চলবে না। পাত্রীকে হতে হবে সর্বসুলক্ষণযুক্ত। খুঁতখুঁতে চাঁদ তাই প্রায় শাক বাছ মাছ বাছার মতো করে পাত্রী বাছেন। ভাট একে একে সাতটি কন্যার সন্ধান দিলেন, সাতটিকেই বাতিল করলেন চাঁদ। প্রথম পাত্রী কেশব রুদ্রের কন্যা ‘জগতদুঃখভা’, বাতিলের কারণ কাশ্যপ গোত্র এবং এক গোত্রে বিবাহ হয় না। দ্বিতীয় পাত্রী ভাস্করের কন্যা শশীরেখা, বাতিলের কারণ পিতার দুঃস্মৃতি, ‘তাই তার সঙ্গে কুটুম্ব নাই সাধ’। তৃতীয় পাত্রী প্রভুধর মণ্ডলের কন্যা পদ্মাবতী, বাতিলের কারণ চরম শত্রু মনসার নামে নাম—

‘বিস্ময় বলি সদাগর জিভাতে খাইল কামড়
সেই কন্যা নাই মোর কাম।
রূপে গুণে সুনি নিধি দিয়াও না দিল বিধি
সেহ হয় কানির সহনাম।’

চতুর্থ পাত্রী বিদ্যাধর-কন্যা পদ্মিনী, বাতিলের কারণ তারা মনসার উপাসক। পঞ্চম পাত্রী মহেশ্বরের কন্যা রত্নমালা। চন্দ্রধরের আপত্তির কারণ,

‘মহাদেবের মিত্র হয়/সেহ নহে উচিত আমার।’

ষষ্ঠ পাত্রী বীরসিংহ রায়ের কন্যা সোনকা। সেও বাতিল, কারণ লখাইয়ের মায়ের নাম। সপ্তম পাত্রী চন্দ্রকেতুর কন্যা চন্দ্রিকা, এও বাতিল, কারণ দেবী গৌরীর সমনামী, তিনি যদি বিরস হন ...অতএব। শেষ পর্যন্ত সাহে বান্যার কন্যা বেঙ্কলা।

ঘটনাটি সামান্য, কিন্তু ঘটনার অন্তরালে সন্তানের সার্বিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী স্নেহাতুর পিতার যে ছবিটি কবি নারায়ণ দেব এঁকেছেন, তা অনবদ্য। চাঁদ একজন মানুষ ছিলেন, দেবতা নন। আর দেবতারাও তো অহর্নিশ ভুল করেন, দেবোপম চাঁদও করেছেন, কিন্তু তাঁর রক্ত মাংসের চেহারাটিকে মধ্যযুগের কবিরা যে ভোলেননি, এখানে সেই কথাই বলার চেষ্টা করা হয়েছে।

চাঁদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছেন মনসা। চাঁদেরই মতো একাকী। মঙ্গল কবিদের চোখে মনসার malignant অস্তিত্ব শুধুই সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড়খাড় করে দেয়। কত বিচিত্র নামাবলীতে সাজিয়েছেন তাঁরা দেবীকে, জ্বরংকারী, বিষহরি, কানি, চ্যাংমুড়ি কানি, পদ্মা, নাগমাতা, পদ্মাবতী— শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধার এক মিশ্র আবহ সেখানে ভয়ভক্তিকেই তুলে ধরে। মনসা তাঁর কার্যসিদ্ধির জন্য জিহ্বাসার শেষতম সোপানে পা রাখতেও দ্বিধাম্বিত নন। মনসা তাই বিকর্ষক চরিত্র। তাঁর চাহনিতে বিষ, নিঃস্বাসে বিষ, সন্তাপও যেন বিষময়। বড় কঠিন, বড় নির্মম এক অস্তিত্ব কেবল আত্মঘোষণায় মুখর। চাঁদ সদাগরকে কোন কুক্ষণে তাঁর পূজাপ্রচারক হিসেবে মনে ধরেছিল, চাঁদের জীবনটাই তছনছ করে ছেড়ে দিলেন দেবী। বণিক চন্দ্রধরের ঔদ্ধত্যকে আপন দেবিত্বের মহত্ত্ব দিয়ে ক্ষমা করে দিতে পারেননি মনসা। একে একে কেড়ে নিয়েছেন চাঁদের জীবনধন সাতসাতটি সন্তান, কালীদহের জলে ডুবিয়েছেন তাঁর চৌদ্দ ডিঙা, হরণ করেছেন মহাজ্ঞান, চাঁদের উপবনকে বিষ উগরিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছেন। বিরুদ্ধ শক্তিকে এই ভাবেই বশে আনতে চেয়েছেন দেবী। মনসামঙ্গলের সব কবির হাতেই মনসা এমনই ক্রুর, নিষ্ঠুর, চক্রাঙ্গকারী, আপন স্বার্থের পরিপন্থী পথের কাঁটাকে সরাতে নির্মম। কিন্তু মনসা চরিত্রের সবটাই এমন ভাবলেশহীন বিষাক্ত নয়। মঙ্গল কবিরা এই বিষের উৎস সন্ধান করেছেন। কার্য-কারণসূত্রে গাঁথতে চেয়েছেন মনসার এই malignant কার্যকলাপকে। সুখের কথা, তাঁরা পেরেছেন। কাব্যের আনাচে কানাচে মনসার জন্য তাঁরা ছড়িয়ে রেখেছেন সহমর্মিতা। আপাতভাবে প্রকট না হলেও মরমীয়া কবিদের এই সহানুভূতিটুকু খুব একটা অপ্রত্যাশিত নয়।

একটি মেয়ে জন্ম নিল শুধু পিতৃ-ইচ্ছায়, জন্মকালীন মাতৃগর্ভের উষ্ণ স্নেহাশ্রয় গোড়াতেই জ্যোটেনি মেয়েটির কপালে। জন্মদাতা পিতা জানলেনও না তাঁর সন্তানের অস্তিত্ব। অথবা জানলেও আমল দিলেন না। পতিত বীর্যকে পদ্মপত্রে রেখে সরোবরের জলে হাত ধুয়ে ফেললেন শিব। ‘লইয়া বিকল মন নেহারে কমলবন/চিন্তিতে মনেতে অসোয়াস্ত।/সমুদ্র নেহারি বনে এড়িল কমল দলে/সরোবরে পাখালিল হস্ত।।’ (বিজয় গুপ্ত)। অতএব জন্মমাত্রই পরাশ্রয়ী মনসা। পাতালে নাগলোকে বাসুকীর গৃহে বড় হলেন, কিন্তু নাগকুলও কি অন্তর থেকে গ্রহণ করেছিল এই পরিত্যক্ত কন্যাটিকে? যদি করেই থাকে, তবে কেন তাকে যৌবনে আপন উৎস-সন্ধানে বেরোতে হয়? পরভূত জীবনের শিকড়ে বোধহয় যথাযথ মাটি ধরেনি। স্নেহের ঘরে হয়তো খামতি ছিল, অথবা কমতিটা মনসার তরফেই, গ্রহণ না করতে পারার কমতি, হয়তো কোথাও একটা গ্লানি ছিল, পরজীবীর গ্লানি! এই গ্লানিই তো মনসাকে পিতৃসন্ধানে টেনেছিল। অথচ ফল হ’ল উশ্টো। প্রথম যৌবনের রূপসী কন্যাকে দেখে কামগ্রস্ত হলেন স্বয়ং জন্মদাতা।

‘সিবে বোলে মোর বাক্য সুনহ সুন্দরী।

কথা হইতে কথা জাও কাহার কুমারী।।

তব রূপ দেখি মোর দহে কলেবর।

আলিঙ্গন দিয়া মোর প্রাণ রক্ষা কর।।’ (নারায়ণ দেব)

কালে হাত চাপা দিয়েছিলেন মনসা। পিতার মুখ দিয়ে প্রথম দর্শনেই এমনতর অশ্রাব্য কুকথা যে বেরোতে পারে, ধারণা ছিল না তাঁর। তাড়াতাড়ি আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। সন্দেহ ঘোচেনি শিবের।

‘সিবে বোলে যদি হও আমার কুমারি।

এহিঙ্কণে মূর্তি ধর দেখি এ তোমারি।।’

আর সহ্য হয়নি মনসার। বিয়াল্লিশ নাগে ভূষিতা হয়ে প্রথমেই বিষ-দৃষ্টি হেনে নির্জীব করে দিয়েছিলেন জন্মদাতাকে। এর নাম পিতা! জন্ম দিয়ে সন্তানের খোঁজ রাখে না, কোন কর্তব্য তো দূরস্থান, তারপর কুপ্রস্তাব, তাতেও শেষ নয়, কোথায় যেন পিতৃত্বকে অস্বীকারের চেষ্টা করেছেন শিব। যৌবনের সূচনাতেই জীবনের কুশ্রীতা দেখে ক্রোধে জ্বলে উঠেছিলেন মনসা। অবশ্য দেবগণের স্তুতিবচনে আবার ‘অমৃত নয়নে’ তাকিয়ে পিতাকে রক্ষাও করেন বিষহরী। তা বলে ক্ষতটা কিন্তু থেকেই গেল, সারল না। পিতা কন্যার ভয়েই হোক বা পিতৃস্নেহেই হোক বাড়ি আনলেন মনসাকে, একেবারে অনিচ্ছাসঙ্কেও কন্যার জিদের কাছে পরাভূত তিনি। তারপর শুরু হল আর এক প্রলয়।

মনসাকে গোড়া থেকেই পছন্দ করেননি বিমাতা চণ্ডী। প্রথমে সতীন আশঙ্কা, পরে আলটপকা এত বড় যৌবনবতী কন্যা ঘাড়ে এসে পড়ায় প্রবল বিরক্তি, আর তার থেকে অত্যাচারের সূচনা। মনসার ওপর চণ্ডীর প্রবল অত্যাচারকে বেশ ভালমতোই ঝঁকেছেন কবিরা। তবে ও ক্ষেত্রে বিজয় গুপ্তের কাব্যে চণ্ডী-মনসা বিবাদ বিসম্বাদের কাহিনিটিতে কোথায় যেন মনসার বেদনাদীর্ঘ জীবন কথাকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন কবি। মনসার প্রতি চণ্ডীর অত্যাচারে আর এক বিমাতা গঙ্গা যখন মনসার পক্ষ নেয়, তখন অকূলে কূল পেয়েছিলেন মনসা। চণ্ডী মানেননি—

‘কোপে ব্যাকুল দেবী বলে অহঙ্কারে।

চুল ধরি মনসারে মারে আরবারে।।

চণ্ডীর প্রহারে দেবীর শরীর জর্জর।’

এই মার সহ্য করতে না পেয়ে মনসা এবার যদি বিষ কামড় দিয়ে চণ্ডীকে ঘায়েল করেন, মনসাকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় কি? আপন অস্তিত্ব রক্ষায় সকলেরই অধিকার আছে। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে এসবের পরেই আছে পদ্মার বিবাহ কথা।

পদ্মাকে চণ্ডী না প্যারেন গিলতে, না প্যারেন ফেলতে। সূতরাং স্বামীর ওপর হুকুম—বিবাহ দিয়ে বিদেয় করো মেয়েকে। শিবও জগৎ চষে এক বিবাগী সম্ম্যাসীকে পাকড়াও করে ঝুলিয়ে দিলেন কন্যার গলায়, স্বামী মহাতপা জরৎকারও প্রায় বিনা দোষে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করলেন। স্বল্পকালীন এই দাম্পত্যও মনসার কাছে মধুর ছিল না। বিবাহ রাট্রেই তাকে ফুল তুলে আনার হুকুম করেন স্বামী। লম্বজায়, দ্বিধায় শঙ্কিত মনসা রাজি না হওয়ায় তর্জনে গর্জনে স্ত্রীকে শাসন করেন মুনিবর—

‘আর দেবের কন্যা হইলে কহিতে থুইতাম কথা।

দেবের বাড়ি দিয়া তোর মুই ভাঙিতাম মাথা।।’

নিজের অপমান তবু সহ্য হয়, কিন্তু পিতার অপমান কেমন করে সয় পদ্মা। জরৎকার যখন শিবের ঠাকুরালি নিয়েও অকথা কুকথা শোনান স্ত্রীকে, নিজেকে আর ধরে রাখতে প্যারেন না পদ্মা। আবার বিষ নেত্রপাত, আবার ‘ঢালিয়া পড়ন’, এবার জরৎকার। সকলের কথায় যদিও বা স্বামীকে আবার চাপা করে দেন মনসা, ভীত সঙ্কণ্ত জরৎকার কিন্তু ‘পদ্মা হেন ঘরণী মুনিরে নাহি সাঙ্গে।’ —বলে পালাতে চান। অবশ্য যাবার আগে কৃপাবশত স্ত্রীকে গর্ভবতী করে দিয়ে যান। এর পিছনে অবশ্য ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির তাগিদও ছিল। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এভাবেই নারীকে পেষণ করে স্বার্থপূরণ করেছে। মনসা তার দৃষ্টান্ত মাত্র।

বিমাতা চণ্ডীর উদ্দেশ্য সিদ্ধি হল না। মনসাকে বিদায় করা তো দূরস্থান, তার ওপর অন্তনাগের জন্ম। পাছে সন্তানবলে বলীয়ান হয়ে চণ্ডীকে তুচ্ছ করেন মনসা, সদ্যজননী বৃকের দুধ শুকিয়ে পাথর করে দিলেন চণ্ডী। ক্ষিদের ছালায় কাতর শিশুরা কাঁদছে, চণ্ডী হাসছেন। মনসা পাগলের মতো একবার চণ্ডীর কাছে, একবার পিতা শিবের কাছে ছুটছেন, যে করে হোক সন্তানগুলোকে বাঁচাতে একটু দুধ জোগাড় করে দাও পিতা, না হলে যে সন্তান বাঁচে না।

‘দুই চক্ষুর জল পদ্মার বহিয়া পড়ে বৃকে।

কান্দিতে কান্দিতে গেলা শিবের সম্মুখে।।’

এই পদ্মার মাতৃত্ব নিয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকে কি? পুত্র আস্তিককে পিতার সমতুল্য জ্ঞানী করে তুলতে তার যথার্থ শিক্ষার জন্য নিজের চোখের জলের পরোয়া না করে তাকে তিনি পাঠান মাতুলালয় নাগলোকে। মজার কথা, পুত্র বড় হতেই তার ওপর মায়ের অধিকার খাটল না, সূর্যসম দীপ্ত পুত্রটিকে পিতা জরৎকার কাছে টেনে নিলেন, আর নিঃস্বই থেকে গেল পদ্মার স্নেহব্যাকুল মাতৃহৃদয়।

নাগলোক, দেবলোক, পিতৃগৃহ—কোথাওই জায়গা হয়নি মনসার। বিমাতার প্রকোপে একটা চোখ গেছে, তবু এই শেষ আশ্রয়টুকু প্রাণ দিয়ে আঁকড়ে থাকতে চেয়েছিলেন পদ্মা। বলেছিলেন,

‘মায়ে ঝিয়ে বিসম্বাদ কে বা নাহি করে।

ক্লেশ সম্বরিয়া মাগো রাখহ আমারে।।’

—চণ্ডী শোনে না সে কথা। পদ্মা কাকুতি মিনতি করে, কিন্তু ‘ফিরিয়া না চাহে চণ্ডী দারুণ হৃদয়।।’ অতএব, বনবাসে যায় পদ্মা বনবাসে যায়। মনসাকে নির্বাসনে রেখে আসেন স্বয়ং জন্মদাতা, বিমাতাগ্রস্ত পিতা। কোথায়? না পাণ্ডববর্জিত সিজুয়া পর্বতে।

এমনটাই কি প্রাপ্য ছিল মনসার? সমাজ সংসার তার নিজের প্রাপ্যটুকু আদায় করে নিল, বিনিময়ে শুধু প্রত্যাখ্যান। কী দোষ করেছিলেন মনসা? নিজের জন্মের ওপর তাঁর হাত ছিল না। বিমাতা-ভীত পিতার স্নেহ পেয়েও পেলেন না দেবী, দেবকুলও বিশেষ সুনজরে দেখল না। বিবাহ হল বটে, কিন্তু সহধর্মিণী হয়ে স্বামীকে যথার্থ ধর্মাচরণে বৃত্ত করতে গিয়ে বিনিময়ে জুটল ভর্ৎসনা এবং স্বামী কর্তৃক পরিত্যাগ। সন্তান থেকেও স্নেহবুড়ুস্কু মাতৃত্ব শুধু বয়েই বেড়ালেন মনসা। জীবনে ঠেকতে ঠেকতে শিখলেন নিজের অধিকার কায়ম করতে হয় নিজেকেই। যদি কেউ দিতে না চায়, প্রয়োজনে কঠিন কঠোর হতে হয় বৈকি।

মনসার চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছিল। একদিন দুঃখিনী পদ্মা বলেছিলেন—‘জনম দুখিনী আমি দুঃখে গেল কাল। যেই ডাল ধরি আমি ভাঙে সেই ডাল।’—তখনও তিনি কাঁদতেন। একসময় বুঝলেন চোখের জলের মূল্য কেউ দেয় না। অতএব ভয় দেখাও! ভীষণ ভয়!

এমনি করেই রূপ থেকে রূপান্তর ঘটে এক জীবনেই। শুধু পদ্মার ত্রুরতাটাই মনে রাখব, বেদনাটা নয়, তা কি হয়! আর পদ্মাতো অন্যায্য কিছু চাননি। দেবকন্যা হয়ে দেবতাদের অধিকারের ভাগ চেয়েছিলেন, আর তাতেই যত বিপত্তি। মনসা দেখেছিলেন তাঁর ওপর বিমাতা চণ্ডীর অত্যাচারে দেবকুল নীরব, স্বামীর অন্যায় আচরণেও কারো মুখে কথা নেই, নির্বাসন দশের পরেও কোনও সহৃদয় দেবতা জুটল না, যিনি দেবলোকে একটু ঠাই দেন। ফলে মনসা বিষবর্ষণ করবেন না তো কি মধুবর্ষণ করবেন। সাগর মছন কালে বিষপান করে শিব মূর্ত্তি হলে, ‘চণ্ডিকা রণ্ডিকা’ হবেন জেনে (কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ) মনসা যদি একটু বেশি আনন্দিত হন, যদি সাময়িকভাবে ভুলে যান আসলে পিতা মরেছেন, তবে কি মনসার পক্ষেও একটু বেশি হয়ে যায়? আমরা কি ভুলে যাব এই চণ্ডিকার প্রসাদেই একটি চোখ চিরতরে হারিয়েছিলেন মনসা? তাই অল্পক্ষণের এই আনন্দটুকু না হয় পেলেনই এই সব হারানো দেবী। পরক্ষণে নিজেই আবার ছুটলেন বাপকে বাঁচাতে, পিতার চিতার ওপর থেকে সহগামিনী বিমাতাকে হাত ধরে নামালেনও।

মনসা এমনই। বারম্বার শিবের পরিত্রাণকারিণী। অপরেরও। বিপক্ষ যে মুহূর্ত্তে সামান্য নতশির, সেই মুহূর্ত্তে তিনি দ্রবীভূত মাতা। একবিন্দু পেলে তিনি দশবিন্দু উজ্জাড় করে দেন। বিপ্রদাস পিপলাইয়ের ‘মনসা বিজয়’ কাব্যে হাসান হোসেনের সঙ্গে সংগ্রামের পর বিপর্যস্ত হাসান যখন দেবীর চরণে প্রণত, দেবীর মাতৃহৃদয় তখন আকুল—

‘শুন আরে পুত্র নৃপতি হাসন। একান্ত জানিলু মনে তুমি ভক্তজন॥

মহাতুষ্টি কৈল তোরে সদয় হৃদয়। অনায়াসে বর মাগ যেই মনে লয়॥’

প্রসঙ্গত মনে পড়ে বিজয় গুপ্তর কাব্যের কমলা সুন্দরীর সঙ্গে মনসার সখি সংবাদ। দেবীর আসল উদ্দেশ্য চাঁদের শক্তি ধ্বংসেরি শঙ্কর গারুড়ির প্রাণনাশ। তার বিনাশকারী গুপ্ত কথা কমলার সাহায্যেই শুনেছিলেন মনসা। কমলা সখিকে বিশ্বাস করেছিলেন, ভাবেননি তাঁর কারণেই স্বামীর প্রাণনাশ। কিন্তু তা বলে সখি কমলাকে ঠকাতে চাননি পদ্মা। তাই ধ্বংসের মূল্যবান প্রাণ বিমাতা গঙ্গার কাছে সযত্নে গচ্ছিত রাখেন মনসা। ছুটে যান বিবাদগ্রস্তা কমলার কাছে।

‘সখী সখী বলি দেবী ডাকে মনে মন।

সইয়ার মরণ নাই না কর ক্রন্দন॥

আমার সইয়ারে থুইয়াছি ভাল স্থানে।

চান্দর বংশ নাশ করি জীয়াব আপনে॥’

অকারণে নয়, বিশেষ প্রয়োজনেই সাময়িকভাবে ধ্বংসেরিকে সরিয়েছিলেন মনসা। আবার সখিত্বের মর্যাদাও রেখেছিলেন তিনি।

তত্ত্ব বিভূতির মনসা দেবিত্বের আকাঙ্ক্ষায় নিতান্ত অভক্তজন চাঁদের কাছে বারবার প্রার্থী—
'কহো মোরে দেবী'। আদেশ নয়, একান্ত অনুরোধ। শিবভক্ত চাঁদকে আপন ভাই বলে কাছে
টানতে চাইছেন তিনি, আর বারবারই তাঁর স্নেহ প্রতিহত হচ্ছে প্রত্যাখ্যানে।

এমনি করেই মোহভঙ্গ হয়। বাস্তবের নির্মম কঠোর চেহারাটা বারম্বার দুয়ো দেয়, আপন
অবস্থানটাই নিজেকে ব্যঙ্গ করে, আর ধীরে ধীরে বদল ঘটে চেনা মুখের। চাঁদ বা মনসার চেনা
মুখ তাই আসলে আধো চেনা। পিছনের দিকে তাকালে দেখা যায় মঙ্গল কবির। কিন্তু এই কেন,
কখন, কীভাবে-র প্রশ্নস্বক জড়গুলোকে নিজেরাই সরিয়ে ছিলেন, যাতে আধো চেনার অস্পষ্টতা
থেকে স্পষ্ট হয় গোটা মানুষটা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপকমণ্ডলী, এখানে উপস্থিত অন্যান্য সুধীজন এবং বিভাগের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রিগণ। আমার বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে বিখ্যাত ব্যক্তির (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) নামাঙ্কিত বক্তৃতা ১৯৬৫ সাল থেকে যেটা চলছে, প্রথম বক্তৃতা দিয়েছেন সর্বজনমান্য শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার রায় এবং আমি মানসচক্ষে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, বক্তৃতা করছেন ঐ উন্নত, বিশাল পুরুষ এবং মাঝে মাঝে তাঁর বাবার গানের দু-একটা কলি গেয়ে শোনাচ্ছেন—এ যে কী অসাধারণ ব্যাপার হয়েছিল তা শুধু কল্পনাই করা যায়। এইভাবে সূত্রপাত হয়েছে। তারপরে যেসব বিখ্যাত ব্যক্তির, আমাদের যে সারস্বত সমাজ, সেই সারস্বত সমাজের প্রধান মুখ্য মানুষ যারা তাঁরা এই বক্তৃতা দিয়েছেন। তারপরে আমি এসেছি সেই বক্তৃতা দিতে কোনরকম প্রস্তুতি না নিয়ে। সম্পূর্ণ শূন্য এবং বলা যেতে পারে যে, গল্প করতে আসা ছাড়া আমি এটাকে আর কিছু বলতে পারছি না। নেহাতই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছে প্রায় ৩০ বছর, বাইরে অধ্যাপনা করেছে, বিভিন্ন কলেজে ১৩ বছর, মোট ৪৫ বছরের শিক্ষকতা। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়েছি, পূর্ণ অবসর গ্রহণ করেছি। যেহেতু এই ৪৫ বছরের অভ্যাস হচ্ছে ৪৫ দিনই পুরো বকর বকর করা, যে ভাবেই হোক না কেন, সেজন্য একটা সাহস মনের মধ্যে আছে, এঁরাও তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। এঁদের সামনে ৪৫ মিনিট কথা বললে এঁরা কিছু মনে করবেন না। এজন্যই সাহস করে আসা।

আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করেন, আপনি কোথাকার মানুষ। আমি ঠিক সোজা বলতে পারি না যে, আমি খুলনার মানুষ। তারপর সেটা ঠিক সত্যভাষণও হয় না। আমি জন্মেছি, যে বিভাজনটা আছে সেটা স্বীকার না করে কারও কোন উপায় নেই এবং যে বিভাজনটা ঘুচেই গেছে ১৯৪৭ সালের পর, ৫৭ বছরের কাছাকাছি হল এই ঘটনা ঘটে গেছে। আমরা যারা ৭০/৭৫ এর দিকে যাচ্ছি, তারা খানিকটা বলতে পারি যে, ব্যাপারটা কী। সেটা আজকে এখানে যারা উপস্থিত তাঁদের কোন স্মৃতিতেও নেই। জানি না, ইতিহাসে কতটা কী লেখা থাকে। কাজেই ইতিহাস ছাড়া শুকনো ঘটনা, মানব-মানবীর কোথায় কি ঘটছে, এটা কল্পনা করা একমাত্র তার ভিতর দিয়ে গেলেই সম্ভব হবে। যাই হোক সেই গল্প এখানে বলবার নয়। ঘটনা হচ্ছে, এই যে আমি এখান থেকে গিয়েছিলাম, খুলনাতে গিয়ে লেখাপড়া করেছি এবং সেটা ১৯৫৪ সালে, ঠিক ৫০ বছর হচ্ছে। আমি আমার ভারতীয় যে পাসপোর্ট এটাকে আমি স্যারেন্ডার করিনি। আমি চলে গিয়েছি পাসপোর্টটা রেখে। এটা এইজন্য যে আমার যেন মনে হয় যে আমি নিজে ইচ্ছে করে আনুষ্ঠানিকভাবে আমার ভারতীয়ত্ব এখানে ছিন্ন করলাম এটা বা নাই হল বরং এটা ভুলে যাবার চেষ্টা করি। সেইজন্যই আমি আমার পাসপোর্ট স্যারেন্ডার করিনি। জানি না, এতদিন পরে গোয়েন্দা বিভাগ এটাকে আমার অপরাধ বলবে কিনা। আমি কিন্তু আমার ভারতীয় পাসপোর্ট জমা দিয়ে যাইনি, ওটা রেখে দিয়েছি। এখানে যখনই আমি বলি, আমার বাড়ি তো ঢাকা, নোয়াখলিতে চট্টগ্রামে। তার মানে এ কীরকম একটা ওলোট-পালট অবস্থা। আমেরিকাতে যে কোন লোককে জিজ্ঞেস করলে কেউ বলবে, আমি আয়ারল্যান্ড থেকে এসেছি, কেউ বলবে ইংল্যান্ড থেকে এসেছি। তাদের আসাব সঙ্গে কোথাও কোন বেদনার যোগ আছে কিনা তা বলা কঠিন। কিন্তু আজকে আমার সঙ্গে যারা বসে আছেন, তাঁদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন যে, এই বলার পিছনে কী বেদনার এবং কী কষ্টের মহাসমুদ্র আছে। তাই আমার মনে হচ্ছে যে, আজকে যারা আছেন

তাদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলি। যে দেশে এখন কাটাচ্ছি, যে দেশটাকে এখন নিজের ভাগ্যের সঙ্গে, নিজের জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে নিয়েছি, এখন আমার রাষ্ট্র বলতে গেলে আমরা এখন বলতে পারি না, বলি বটে যে, আমি পৃথিবী রাষ্ট্রের নাগরিক কিংবা আমি ভারতরাষ্ট্রের নাগরিক, কিন্তু ও সবাই ভাবে যে ও কথার কথা। শেষ পর্যন্ত রাজনীতিবিদ যারা আমাদের দেশ কেমন করে চলবে, কেমন করে ভাগ হবে, ঠিক করে দিয়েছিলেন আমাদের সম্মতি না দিয়েই। ১৯৪৭ সালে যারা দেশভাগ করেছেন তাঁরা কখনো জনগণকে জিজ্ঞেস করে, সম্মতি নিয়ে ভাগ করেছেন—এটা বলা খুব কঠিন। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আজকে আমরা এই সমস্তটাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি। আমাকে আজকে বলতে হচ্ছে যে, আমি বাংলাদেশ নামক আরেকটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মানুষ। সেই রাষ্ট্রের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি, সেই রাষ্ট্রের একজন আধুনিক নাগরিক।

যদি ভারত বিভাগ এবং তারপর বাংলা ভাষার বিভাগের মত ঘটনা না ঘটত তবে এইসব প্রশ্ন ঠিক এই পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের কাছে আসত কিনা জানি না। একজন ইংরেজকে যদি বার বার জিজ্ঞেস করা হয় যে, আপনি কি ইংরেজ এবং যদি সে বলে ‘হ্যাঁ’, তবে সে কিসে ইংরেজ এটা কিন্তু তাকে সম্মান করতে হয় না। কি অদ্ভুত, বিচিত্র ইতিহাসের গতি যে, আজকে বাঙালিকে জিজ্ঞেস করতে হয়, সে কি বাঙালি? বাংলাদেশে এই দুর্ভাগ্য আরো অনেক বেশি। বাংলাদেশের মানুষ নিজেকে জিজ্ঞেস করে প্রথমে এটা ‘আমি কি বাঙালি? আরেকজন, আমাদের তোতাপাখির মতো পড়াচ্ছে ‘আপনারা বাঙলাদেশি’। এই দুটি শব্দ পাশাপাশি প্রচলন করা হয়েছে: একটির নাম ‘বাঙালি’ আরেকটির নাম বাংলাদেশি। বাংলাদেশের মানুষকে দুটো ভাগে বিভক্ত হতে হয়—হিন্দু-মুসলমানের বিভাজন তো আছেই, আর অন্য যত রকমের বিভাজনের কথা বলা হয়ে থাকে—সম্পদে, অর্থে বিস্তে—যতরকম ভাগের কথা আমি বলি না কেন এই ভাগগুলোর সঙ্গে আরো একটা ভাগ হচ্ছে ‘আপনি কি বাঙালি না বাংলাদেশি’? এই প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের কোন বাঙালিকে জিজ্ঞেস করা হয় না। সৌজন্য সংস্কৃতির প্রশ্নে একজন পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির আগ্রহটা অনেকটা অ্যাকাডেমিক—বাঙালিত্ব কি? কোথা থেকে এসেছে? এটাতে তার কোন স্ফোভ নেই, কোন জিজ্ঞাসা নেই। বরং এই স্ফোভ ও জিজ্ঞাসার মাঝখানে আজকের পৃথিবীতে কি ঘটছে, তার ফলে বাংলাদেশে কি ঘটছে, না ঘটছে, বাঙালিদের কোথায় কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে এটা নিয়ে তিনি ভাবতে পারেন। কিন্তু প্রতিনিয়ত তাঁকে জপতে হয় না যে, ‘আমি বাংলাদেশি নই আমি বাঙালি’ কিংবা ‘আমি বাঙালি, আমি বাংলাদেশি নই।’ এইজন্য এই সংস্কৃতির যে কথাটা আজ উঠেছে আমি গল্পের মতো করেই এই কথাটা বলব। আমি যাকে বলা যায় প্রস্তুত কোন বস্তুতা—সেটা হয়তো সময় পেলে করা যেত কিন্তু সে সময় পাইনি এবং আমি মনে করি না যে, সে ধরনের আলোচনায় খুব একটা লাভ হবে। আমি সাধারণভাবে যে দু-চারটি কথা তুলছি, ইচ্ছে হলে, যদি আজকে সময় থাকে তাহলে সেই প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তরের একটা জায়গা করতে পারেন, অল্পবিস্তর সেখানে পরস্পরকে বোঝার একটা চেষ্টা করা যেতে পারে। সেই কারণেই এই প্রশ্নটা তুলছি যে, সংস্কৃতির এই ব্যাপারটা আজকে কি ভিন্ন মাত্রায় আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে?

এখানে অনেক ছাত্র-ছাত্রী আছেন। প্রত্যেকেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এবং আজকে তাঁরা নিজেকে বাঙালি বলেন। কিন্তু একথা কি তাঁদের বলতে হয়? এই বলার পিছনে বা এই বলার সম্মুখে তাঁদের কোন বিঘ্ন আছে কি? আমার মনে হয়, তার উত্তর হবে না। অন্য একটা সমস্যা থাকতে পারে, বাঙালিত্ব নিয়ে অন্য প্রশ্ন থাকতে পারে যে, ‘আজকে আমরা কতটা বাঙালি থাকতে পারছি’? কতটা ভারতীয় হচ্ছে, কার কতটা দাবি? আমাদের ভারতীয়ত্ব আমাদের বাঙালিত্বকে সম্পূর্ণভাবে

কি গ্রাস করছে? আজকে বিশ্বায়নের ফলে অবিকল বাঙালি থাকা কি সম্ভব হচ্ছে? অবিকৃত, অবিকল, ঝাঁটি বাঙালি? অবশ্য এইগুলো কাকে বলে সেটাও বলা খুব কঠিন। তাছাড়া সেটাকে অঙ্ক কষে বোঝানো যায়—আমার তো এমন মনে হয় না। আমার নানান দ্বিধা এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে যে, বাঙালিত্ব বস্তুটি কি? সম্প্রতি আমার বন্ধু, ঘনিষ্ঠ মোটামুটি, তিনি আমাদের বিদ্বৎসমাজে পরিচিত, এখানে যঁারা উপস্থিত আছেন তাঁরা হয়তো তাঁর নাম জ্ঞানেন—ড. গোলাম মুরশিদ। তিনি ‘হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি’ বলে একটা বই লিখছেন। সেখানে তাঁর কথাগুলি ভারতবর্ষের অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব—কথাগুলো বড়ো লাগে। চাকুরিজীবী বাঙালি, অকর্মণ্য বাঙালিকে ঠাট্টা করার জন্য এই কথা তুলেছেন। কথা হচ্ছে এটা কি তাহলে আমরা বলতে পারি বাঙালির মূল লক্ষ্য? নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা মনে রেখে এই প্রশ্নটি যদি জিজ্ঞাসা করি, তাহলে আমার খটকা লাগে এই কথাটা নিয়ে যে, এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার মতো পরিবেশ ও পরিহিতির জরুরীত্ব কি আজকে আছে? আমি বাঙালি, কীসে বাঙালি—আমার জ্ঞানার দরকার নেই। লোকে বলছে, আমার পরিবার বলছে যে, আমি বাঙালি—এই অর্থে আমি বাঙালি। আমার এর বেশি জিজ্ঞেস করাও দরকার নেই। এটা কি তাই? বাঙালিত্ব কি চর্চা করা দরকার? চর্চা করে কি বাঙালিত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো যায়? আরো বেশি করে বাঙালি হওয়া যায়? এইসব প্রশ্ন অনেকে করেছেন। এখানে যে সব বড় বড় বোধ আছে, বড় বড় নদীকে সবলে তাদের গতি ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ওদিকে যাবি না, এদিকে যেতে হবে, অত জল যাবি না, এত জল এদিকে যাবি। নদীগুলো নিয়ে এটা করতে হয়েছে, আমাদের বাংলাদেশে বাঙালি সংস্কৃতিকে ঠিক এইরকম একটা জায়গায় এনে দাঁড় করানো হয়েছে। তোমাকে ঠিক করতে হবে তুমি বাঙালি না বাংলাদেশি? কীসে বাংলাদেশি তা জানি না। আমরা তো অনেক কিছুই জানি না, বলে দিই আব কী। তো সেজন্যই আমার বরাবরের খটকা তা এখনও আছে যে, বাঙালিত্ব কি? কিন্তু আমি মনে করি এই প্রশ্নের সম্মুখীন না হলেও চলে কিন্তু বাংলাদেশের বাঙালিকে ঐ প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার দরকার আছে। অনেকে এ বিষয়ে চর্চা করেছেন—উত্তরগুলো আমি কিন্তু ঠিকমতো পাচ্ছি না। আমার কাছে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে কথা বলাটা সবচেয়ে বেশি জরুরী। সেখানে আমরা বাঙালি সংস্কৃতি বলতে কি বুঝছি, গোলাম মুরশিদের বইটা বেরোলে হয়তো এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা বইটা দেখতে পাবেন। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে সেখানে সমাধান কিছু মিলবে না। এর কাছাকাছি একটা বিষয় নিয়ে বিতর্ক আছে। আমি প্রথমেই বলেছিলাম সংস্কৃতি সম্বন্ধে খটকার কথা। অর্থাৎ এ সমস্ত ব্যাপক অনিশ্চয়ত্বক বিশাল ব্যাকরণ কিছু নয়, যাতে কিছুতে সুচিহ্নিত করে একটা সংজ্ঞা দিয়ে বলা যায় যে, এটাকে বলে—‘সংস্কৃতি’। কাজেই বাংলাদেশের সংস্কৃতি দূরের কথা, আদৌ সংস্কৃতি বলছি কাকে।

সংস্কৃতির কোনো একক সংজ্ঞা কি আমরা দিতে পারছি যে, এটাকেই আমরা বলছি সংস্কৃতি? তারপরে আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশের সংস্কৃতি। আমার কাছে এর জবাবটা নেই, আমার মনে হয় এই জবাবের কোন প্রয়োজন নেই। সংস্কৃতির সংজ্ঞা কি তা না জেনেই আমরা সাংস্কৃতিক জীবন-যাপন করতে পারব। যদি বলা হয় ঐক্যবদ্ধ সংস্কৃতি, আমি প্রথমেই বলব বাংলাদেশের সংস্কৃতির জায়গাটা একবার দেখুন তো। প্রথম কথা তার বৈচিত্র্যের কথা যদি বলে বাংলাদেশের সংস্কৃতি কী তা না জেনে সচরাচর আমরা যে ভাবে বুঝি তাতে বাংলাদেশের সংস্কৃতির কোন সংজ্ঞা খুঁজে পাব না। কিন্তু এটা বলা যাবে যে, এর বৈচিত্র্যের কোন শেষ নেই। বাংলাদেশি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রথমেই একটা বড় কথা, যে কথাটা এখন উড়ছে (বাংলাদেশের সাহিত্যের ক্ষেত্রেও উড়ছে) যে, বাঙালি জনসাধারণের একটি বিরাট অংশ হচ্ছে মুসলিম সম্প্রদায়। একথাও

অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, ৮০০ বছর ধরে ভারতবর্ষ এবং মোটামুটি ভাবে প্রথম সেও প্রায় ৮০০ বছর হয়ে গেল বাংলাদেশের মুসলিম শাসকরা বিদ্রিশরা আসার আগে পর্যন্ত ছিল। তারা অন্য ধর্মাবলম্বী ছিল। কি বিচিত্র mixed reality তৈরি হয়েছে, এই ৮০০ বছরের মধ্যে। ধর্মাস্তর ঘটেছে এবং তা, ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক দিক থেকে কী রকম পার্থক্য তৈরি হয়ে গেছে। যে হিন্দু মুসলমান হয়েছে, সে সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মুসলমান হয়েছে না কি কলমা পড়া মুসলমান হয়েছে, তার সাংস্কৃতিক পরিচয় কি অবিকৃত থেকেছে? ঠিক অনুরূপ ভাবে আমি যদি বলি, আসল অধরিটি ছিল ব্রিটিশের হাতে; তাতে শাসক ছিল মুসলিম কিন্তু তাদের ধর্ম এবং বাংলার বাইরে থেকে নানান রকমের খাদ্য, পোশাক ও সাহিত্য নানা জাতের জিনিস এসেছে। সে জিনিসগুলো কি বাঙালিদের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটে নি? আর যদি বৈচিত্র্যের কথা বলি, এই একটা সংস্কৃতি, এই কথাগুলো এখন উঠছে মুসলিম-বাঙালি সংস্কৃতি, হিন্দু-বাঙালি সংস্কৃতি। এখানে সেজন্য কোন প্রশ্ন আমাদের সামনে নেই। কিন্তু বাংলাদেশে এটা আছে এবং সেই কারণেই আমার মনে হয় যে, একটা সাধারণ প্রবাহকে যদি দুটোর মাঝখানে একটা বাঁধ দিয়ে দিই তাহলে সেগুলো ফুলে ওঠে। ঠিক তেমনি করে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবিকল সেই জিনিষটাই হচ্ছে, প্রশ্নগুলো উঠছে, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও উঠছে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তো উঠছেই। খুব এলোমেলো একটা অবস্থা। আমার মনে হয় যে, বাংলাদেশে বাংলা গদ্য বদলে যাবে। একদল লেখক তাঁরা বলছেন, বাংলা গদ্য আর আগের মতো লেখা হবে না। আমরা বহুদিন এখানে আবার মাঝখানে যাকে বলা যায় যে, প্রায় ২০০ বছর বিদেশী পরিবেশের শাসনটাও তো ঘটেছে।

এই বিদেশী উপনিবেশের শাসন এরও তো একটা সাংস্কৃতিক রকমের প্রভাব বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে ঘটেছে। এই সমস্ত জায়গা থেকে বাঙালি মুসলমানকে মোটামুটি, সরিয়ে রাখা হয়েছে, কাজেই আজকে বাংলাদেশের যে সংস্কৃতি তার পর ভিন্নতর চরিত্র তৈরি হয়নি। আমি প্রথমেই মনে করি সংস্কৃতির ভাগগুলো খেয়াল করা দরকার। সংস্কৃতির সঙ্গে শিল্প সম্পর্ক পরিষ্কার করা খুব কঠিন। বহু লোক সংস্কৃতি চর্চা করেন, সঙ্গীতের চর্চা করেন। আমরা সহজেই বলে দিতে পারি যে, ইনি বিশুদ্ধ একটা সংস্কৃতির বাহক। কিন্তু আমাদের গ্রামজীবনে, হাজার হাজার বছরের গ্রামজীবনে আমাদের দৈনন্দিন লৌকিক ব্যবহারের যে মিশ্রণ, যে সব জিনিসগুলো মিশে আছে সেগুলি কি সংস্কৃতির অংশ নয়? সেও তো সংস্কৃতিরই অঙ্গ। আমি সেজন্য আমার ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞেস করি যে যখন একটা নারকোল কুড়বার জন্য একটা কুড়ানি তৈরি করা হয়, তার একটাই কাজ হচ্ছে নারকেল কুড়ে দেবে, কিন্তু বহু জায়গায় তার তলায় ঘুঙুর লাগানো থাকে কেন? সেটা কুড়তে গেলে বুনবুন আওয়াজ করে কেন? চাল মাপার জন্য কুনকে আছে—পিতলের, বাঁশের বা বেতের কুনকে আমরা দেখি। কিন্তু সে কুনকেটা বিনা কারণে যিনি করেন, তার পিছনে নজ্রা করে দেন কি কারণে কোন দরকারে? আচ্ছা সে জিনিষটাকে আমরা সংস্কৃতির ভিতরে আনি না বাইরে রাখি? তাই সংস্কৃতির এমন একটা স্তর আছে, যে স্তরটা সম্বন্ধে কোন আলোচনা নেই, আলোচনার দরকার নেই। সচেতনতাও নেই। তাহলে কি আমরা বলতে পারি না, সংস্কৃতিচর্চা আর জীবনচর্চা একই বস্তু। সংস্কৃতির কোনো আলাদা অস্তিত্ব কিছু নেই। এখানে আমি হিসেব করে দেখেছি সমাজে যত বিচ্ছিন্নতা, তার সঙ্গে হিসেব করে তত রকমের সংস্কৃতি। কলকাতার বাঙালি তার সংস্কৃতি খুঁজতে গেলে শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, সংস্কৃতিবান কলকাতার বাঙালি প্রথমেই খুঁজবে উনিশ শতক। উনিশ শতক খুঁজতে তার সাহিত্য খুঁজবে। এই যে ঔপনিবেশিক, যেটাকে আমরা রেনেসাঁস যুগ বলছি, সেটাকেই আমরা উনিশ শতকের জাগরণ যুগ বলছি। উনিশ শতকের সংস্কৃতি তো বলছি। এই ২০০ বছরের ইতিহাসই বাঙালির সংস্কৃতির ইতিহাস এটা একদিক থেকে

গুরুত্ব দাবি করে। যে-সংস্কৃতিকে দেখার বিচ্ছিন্ন জায়গা নয়। তার মানে সমাজে বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংস্কৃতির বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়া অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং সেইজন্যই বোধ হয় সংস্কৃতিকে কখনোই দূর থেকে বিচার করা যাবে না। স্বাজাত্যকে যেমন আলাদা করা যায় না, আকাশ থেকে যেমন তার নীলত্বকে আলাদা করা যায় না, ঠিক তেমনি মানুষ যেভাবে তার জীবনটা যাপন করছে এই জীবনটা থেকেও তার সংস্কৃতিকে আলাদা করা যায় না। ঠিক এই জায়গাগুলিতে মানুষ অন্য সব প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র। কোন ইতর প্রাণীর সাংস্কৃতিক জীবন ধারণ করার প্রয়োজন নেই। কারণ সংস্কৃতিটার সমান বয়স হয়ে যাচ্ছে মানুষের সচেতনভাবে বাঁচার বয়সের সঙ্গে। আমাদের যাবতীয় সংস্কৃতিচর্চাকে অনেক বিস্তারিত করতে পারি, অনেক পিছনে নিয়ে যেতে পারি। এবং যে বিচ্ছিন্নতা সমাজে তৈরি হচ্ছে সেই বিচ্ছিন্নতাকে একটার পর একটা আমরা অতিক্রম করতে পারি। ঐখানে গিয়ে যদি পৌঁছাতে পারি তাহলে আমি বলতে পারি যে, ধর্ম নিয়ে আমার বিতর্ক করার প্রয়োজন হবে না। আমার জীবন যাপনই আমার সংস্কৃতি। আমার জীবন যাপনকে প্রতিনিয়ত আমি উন্নত করার চেষ্টা করি কিংবা বলা যেতে পারে যে, মানুষ হিসাবে যে প্রজাতির মধ্যে আমি আছি, এই প্রজাতির যতগুলো সম্ভাবনা আছে, সমস্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত করা, সম্পূর্ণ করা, বড় করা এটাই বোধ হয় আমাদের সংস্কৃতি। এই জায়গাটা, এখান থেকেই ব্যাখ্যা করতে পারলে তখন সঙ্গীত স্পষ্ট হয়ে উঠবে, তখন বোঝা যাবে যে, কোন গান কেন স্পর্শ করছে, কোন গান কেন মনে হচ্ছে চিরায়ত, চিরকাল। কেন বলি যে রবীন্দ্রনাথের গানের বয়স নেই। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু অনেক আগেই হয়ে গেছে। আমাদের কেন জানি মনে হয়, যতদিন বাজলি থাকবে, ততদিন রবীন্দ্রনাথের গানও থাকবে, D. L. Roy এর গান থাকবে—একথা আমরা কেন বলি? একটু ভাবলেই তো বোঝা যায়, আর হয়তো এখানে যাঁরা আছেন তাঁরা ভাবেন এত ভাবার দরকার কী আছে। ভাবার দরকার এই জন্যই যে মানুষ শেষপর্যন্ত ভাবে। যে মানুষ ভাবে না সে তত কম মানুষ। আজকের পৃথিবীতে সংস্কৃতিটাই হচ্ছে, ভাবটা ভুলে যাও, কেবল ভোগটা কর। আমি একজায়াগয় বলেছি কথটা আধুনিকতার প্রসঙ্গে—ভাবটা ভুলে যাও, প্রতিটি জিনিসকে ভোগ কর কিন্তু সেটাও বেশীক্ষণ নয়, সেটাকেও নতুন কর। আজকের পণ্যের মূল কথা হচ্ছে, আমাদের কোন স্মৃতি রাখার দরকার নেই। আমাদের জীবন-যাপনে অতীতের কোন নিদর্শন রাখার দরকার নেই। আমাদের জীবন-যাপনে অনুসরণের আদর্শ রাখার দরকার নেই। আমাদের সমস্ত সভ্যতা এখানে এসে ঠেকেছে যে, সন্দেহ কর, সংগ্রহ কর, ভোগ কর, ফেলে দাও, স্মৃতিটাও রেখো না, আর আমার যে উশ্টো কথা মনে বয়, আমার মনে হয়, সংস্কৃতি যে জাতির স্মৃতি, সংস্কৃতি তো আর কিছুই নয় জাতির নিজের স্মৃতি। আর আমরা যখন সংস্কৃতিবিহীন হই, তখন আমরা স্মৃতিহীন হই, স্মৃতিভ্রংশ হওয়া ও স্মৃতিহীন হওয়া যে কী ভয়াবহ মানুষের অধঃপতনের মূল। প্রতিটা পল প্রতিটা মুহূর্ত আমি ভোগ করে যাব। আমার তো মনে হয় ভোগের মুহূর্তে ভোগের উপভোগ ঘটে না। ভোগের উপলব্ধি ঘটে ভোগ হয়ে যাবার পর, আমি যখন রসগোপ্তা খেয়ে আনন্দিত হই, তখন খেতে খেতে আমার মনে হয় না এটা আমার আনন্দ। আমার মনে হয় পরে, ‘হ্যাঁ খেয়েছিলাম’। অর্থাৎ আমরা যাবতীয় ভোগকে উপলব্ধি করি অতীতকে রোমন্থন করার মধ্য দিয়ে। আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে কাজে লাগাই আমাদের দূর স্মৃতিকে কাজে লাগিয়ে এবং সেটা সবচাইতে বড় করে লাগাতে পারি যদি তবেই সেটা হবে কাজের কাজ। আমি বিশ্বাস করি, মানুষের সম্ভাবনার কোন শেষ নেই এবং এখানে বাংলাদেশে কত ক্ষুদ্র একটা জায়গা, কিছু কিছু লোক কথাগুলো তুলছে, চাইছে, যে কথাগুলো তোলার সাধারণভাবে কোনো অর্থ হয় না। এই কথাগুলো তারা তুলতে চাইছে। আমি

এই কথাটা ঘোষকের মতো, প্রচারকের মতো বলতে চাই যে, মানুষ নিজেকে কেবলই সমৃদ্ধ করবে অর্থাৎ আলাদা করে শুছিয়ে অপরটাকে আমার করে ভাববো। এই অপরটাকে আমার বলার চেষ্টা করাতে দুই বাংলা তো দূরের কথা, আমি সমগ্র পৃথিবীকে আমার করতে রাজি আছি। এতে আমি প্রাচ্য-প্রতীচ্য কিছুই বাদ দেব না। কী করে সব কিছু বিচ্ছিন্ন হচ্ছে সেকথা তো বলবার চেষ্টা করলাম। আমার তো একথাও মনে হয় যে, মুদ্রিত অক্ষর আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিতে ছেদ ঘটেছে। আমার তো তাই মনে হয়, কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলমের কতগুলো কপি তাঁর আমলে, তাঁর জীবতকালে বা তাঁর মৃত্যুর বহু বহু বছর কতগুলো ছিল? আজকের লিখিত সাহিত্য যে গণ্ডির মধ্যে এসে গেছে তার সঙ্গে নিরক্ষরতার সম্পর্ক এসে গেছে। অর্থাৎ আমরা সংস্কৃতিকে কেবলই ছোট করে বলছি। কে হোমার জ্ঞানার কোন দরকার নেই। হতে পারে একজন, হতে পারে দশজন। কে ব্যাস ও কে বাস্মিকি দেখার দরকার নেই। হতে পারে একজন, হতে পারে দশজন। এটা বলে দেবারও দরকার নেই। এই যে কথাটা বলতে পারা, গোটা একটা সাহিত্য একটা ‘জনগণ’ সেই রচনা করেছে, গোটা জনগণ ভোগ করছে কী করে ভোগ করছে? গাওয়া হয় যে, পুরো রামায়ণটাই তো গীত। পুরো রামায়ণটাই তো লব-কুশের গান, সে তো সঙ্গীত। হোমারের ইলিয়াড ওডিসির সময় শোনা যায়, চারণ কবি তখন গেয়ে বেড়াত। এইসব নিয়ে কাহিনীও আছে। তাহলে যখন গেয়ে বেড়াচ্ছে উৎকৃষ্ট সে সৃষ্টি রামায়ণ, মহাভারত ভারতবর্ষে, ইউরোপে, ইলিয়াড-ওডিসি তারও অংশীদার হতে চেয়েছে সমস্ত মানুষ। এই যে মানবধর্মী ইতিহাস মুদ্রিত অক্ষরের মাধ্যমে যত ছাপছি তত আমরা যারা আর পড়তে পারি না, যারা এতকাল কানে শুনছিল, বুকে অনুভব করছিল, যাদের তৃতীয় নেত্র তৈরি হচ্ছিল। অন্ধ হলেও তাদের আরেকটা চোখ খুলে যাচ্ছিল। এই রকম শত শত চোখ, নতুন চোখ দেখেছে আর গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে Collective Consciousness-কে রূপ দান করেছে। কাজেই আমার মনে হয় যে, সংস্কৃতির জগতে ভেদের প্রাচীর আমরা রচনা করেছি। সেই কারণেই আমরা ইতর শ্রেণীর মানুষকে ইতরশ্রেণী বলি। কিন্তু এখানে উঁকি মারলে দেখা যাবে, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ যা করতে পারে নি, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, ইতর শ্রেণী তাই করেছে। যে গাছতলায় একটা পাথর দিয়ে গাছটাকে পুজো করা হচ্ছে, আমাদের এই আধুনিক মননে তাদেরকে মনে হয় যে, এরা তো একেবারে বর্বর—আমি এর বিরুদ্ধে। মধ্যবিত্তের সমস্ত সংস্কৃতি যে তৈরি হয়েছে এটার মধ্যে কৃত্রিমতা, অল্পবিস্তর সীমাবদ্ধতা যুক্ত হয়ে আছে, কিন্তু পিছনের দিকে যখন তাকাই তখন মনে হয় মানুষের সমাজে জীবন-যাপনের যদি কোন মৌলিক বিরোধ থেকে না থাকে, যদি যৌথ জীবনটা অব্যাহত থাকতে পারে তবে সংস্কৃতিও অব্যাহত থাকবে। আজকে কি ফিরে যেতে পারবো? আজকে কি ছাপাখানাগুলো তুলে ফেলতে পারবো? আজকে কি অক্ষরগুলো ভুলে যেতে পারবো আমরা? আজকে কমপিউটারগুলো কি নষ্ট করে ফেলতে পারব? এগুলো তো আমাদের সবকিছুই করেছে, ভুল বুঝছি আমরা, বিশ্বায়নকে আমরা ভুল বুঝছি। বিশ্বায়নের সবচাইতে বড় প্রতিবন্ধক দরজা খুলে দেবার পরিবর্তে দরজা বন্ধ করে দেওয়া। বিশ্বায়নের দরজা যদি খুলে দেওয়াই হয়, তবে কী কারণে কিছু কিছু দেশ আণবিক অস্ত্র তৈরি করে মালিক হবে? আর আমি তৈরি করতে গেলে, আরেক অস্ত্রধারী দেশ বলবে তুমি তৈরি করতে পারবে না। তাহলে বিশ্বায়ন খুলে দেখায় না। তুমিও পারমাণবিক অস্ত্র বানিয়েছ, আমিও পারমাণবিক অস্ত্র বানাব। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ কিছু দেয়নি, সব বন্ধ করে দিয়েছে। আর ব্যাপক বিপুলভাবে পকেট ভারী করার জন্যে এক জামা সবাইকে পরতে হচ্ছে, জামার কোন সাইজের দরকার নেই। এই তো বিশ্বায়নের অর্থ! এই তো পণ্যায়নের অর্থ! আমি মনে করি এখানে যারা

উপস্থিত আছি এবং পদ্মার ওপারেও যাঁরা আছেন তাঁরা সকলেই বাঙালি সংস্কৃতির অংশীদার। এটাকে একমাত্র সংজ্ঞায়িত করি জীবন-যাপনের সুবিধার্থে। তাকে বুঝতে গেলে বিশেষায়িত করা যেতে পারে। আমরা ফিরে যেতে পারি চর্যাপদের আমলে, সেন আমলে, মুসলিম আমলে, চৈতন্যের আমলে। গিয়ে দেখতে পারি জীবন-যাপনের সঙ্গে কেমন করে সংস্কৃতি জড়িয়েছে। বাংলাদেশের বাংলাদেশীরা বিশেষীকরণ জিনিসটাকে একটা চরম মাত্রা এনে দিয়েছে। কল্যাণপন্থী বিশ্বায়ন থেকে আজকে আমরা ক্রীতদাসের বিশ্বায়ন এনে ফেলেছি। এখানে কোন প্রতিবাদ প্রতিরোধের জায়গা নেই। এইখানে এসে দেখিয়ে হয়তো ভারতবর্ষের মতো এত বড় দেশ, তার সংস্কৃতিকে ভারতীয় সংস্কৃতি বলি, তাকে খুঁজতে গেলে ভারতীয় সংস্কৃতি পাওয়া যাবে না—বাংলাদেশের সংস্কৃতি যেমন পাব, উড়িষ্যার যেমন সংস্কৃতি পাব, তেমনি মহারাষ্ট্রের সংস্কৃতি পাব, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতি পাব। এই সংস্কৃতি আমাদের ধারণ করে রেখেছে। সেই থেকে আমরা আজ পর্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃতির অংশীদার, কিন্তু তার মধ্যে কোন্ ভারতীয়ত্ব এটা খুঁজে বার করতে হবে। বেশি ভাল হচ্ছে জীবনের সঙ্গে লগ্ন হয়ে দেখা, জীবনের কাছে চলে যাওয়াটা। এখানে এসে আজকে আমার মনে হচ্ছে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি সমস্ত জায়গাতে এমন একটা নৈরাজ্য যে, আমরা ঠিক জায়গাটাকে চিনতে পারছি না, বুঝতে পারছি না। আমরা কিছু বলতে গেলেই বলা হচ্ছে তোমরা পুরানো কালের মানুষ। তোমরা এই যুগটাকে বুঝতে পারছো না। এখন এগিয়ে যেতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। আমার সবসময়ে জিজ্ঞাস্য থাকে যে, কেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে? কেন সামনে যেতে হবে? এই দৃষ্টিভঙ্গিটার সঙ্গে আমার মনে হয় যে, সংস্কৃতির সঙ্গে একটা মৌল বিরোধ দেখা দিয়েছে। এর কী করে সমাধান হবে আমি জানি না। কিন্তু সচেতন থাকলে আমরা যদি মনের ভিতর কিছু একটা তৈরি করতে পারি যেটাকে আমরা বলতে পারি সদর্থ, আমাদের জীবন-যাপন, সমাজ গঠন, শিল্প-সাহিত্য প্রস্তুতিকরণ—সমস্ত কিছু মধ্য সদর্থ বা অর্থ আরোপ করতে পারি। তবেই মনে হয় আজকের এই যে সংকট এটা আর থাকবে না। আমি বাংলাদেশের সাহিত্য নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে কিছু বলতে চাইছি না। আমরা কিন্তু একটা শিকড়ের সন্ধান পেয়েছি। সেই শিকড়ের সন্ধান এখানেও কি ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছে—এই প্রশ্নের এখনই কোনো উত্তর পাওয়া যাবে না। কিন্তু মনে করি এইসব সমস্যা আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়েছে, আমাদের নতুনভাবে শিকড়ের সন্ধানে নামতে হবে। আমাদের শিকড়ে ছিল মুসলিম ধর্মকৌশল। উনিশ শতক তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক তথ্য নিরপেক্ষ একটা সংস্কৃতি তৈরি করার ফলে আমাদের সংস্কৃতির যে ঐশ্বর্য যেটা মুসলিম সংস্কৃতি সেটা এর মধ্যে যুক্ত হয়নি। অতএব আমরা সমস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা পিছিয়ে গিয়ে আমাদের শিকড় খুঁজে পাই। আমাদের প্রচুর নাটক হচ্ছে। এ নাটকগুলোর মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় যে, পুরাতান্ত্রিক জায়গায় গিয়ে আমরা উপস্থিত হচ্ছি, সেজন্য আমরা খুঁজে দেখার চেষ্টা করছি। কিন্তু এ কি বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রক্রিয়া, এ কি একরকমের খোলস পাশ্টাবার চেষ্টা, এটা কি উপরিতল থেকে বদলায়? আমাদের অতীতের সঙ্গে বর্তমানকালের যে যোগ এই যোগটা কীরকম ভাবে আমরা আনতে চাই এবং কোনটাই বা কাম্য? আমি নিশ্চয়ই বলব না সমস্ত পাকারাস্তা তুলে দিয়ে এখানে গোরুর গাড়ি ও এক হাঁটু কাদা তৈরি করে দিলে আমরা প্রাচীন বাংলাদেশে ফিরে যাব, কিংবা ঐ রকম একটা যাত্রা দল, যেটা দশটা, এগারোটা, বারোটা বাজছে কিন্তু জমিদারবাবু পানাহার শেষ করে আসতে পারেন নি, যেই মাত্র এলেন ও একটা চেয়ারে বসলেন তারপর যাত্রা শুরু হল—আমি সে যাত্রাতেও ফিরে যেতে পারবো না। প্রতিটি ঘটনা দুবার ঘটে—একবার ঘটনা হিসাবে আরেকবার ঘটনার কার্যকেচারা হিসাবে, এই ফিরে যাবার দিকে আশ্রয় প্রচেষ্টা আজকে দেখতে পাই, আমার সন্দেহ

হয়, এই ফিরে যাওয়াটা কি ক্যারিকেচার ফিরে যাওয়া? আর ফিরে যদি না যেতে পারি তবে কেমন করে গ্রহণ করবো? কেমন করে অতীতকে বর্তমানের কাজে লাগাবো। আমি বলি যে, আমরা ফিরে যেতে পারি না। আবার রবীন্দ্রসঙ্গীত লিখতে পারিনা। আমাদের মূল কথা হল রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করেই আমাদের যেতে হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন। সেই সম্পদ থেকে আমরা কোন বস্তু গ্রহণ করবো? আমাদের সমস্ত বাঙালি সংস্কৃতিকে বর্তমানে কীভাবে সৃজনশীল করে বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি? সেটা আমাদের কাছে খুব বড় প্রশ্ন। সাহিত্য একটা খুব বিশাল ক্ষেত্র। সঙ্গীত নিশ্চয়ই একটা খুব বড় জায়গা। চিত্রকলা নিশ্চয়ই বড় জায়গা। এই প্রচেষ্টাগুলিকে সঠিক পথে যাবার উপায় কী? সেটা কি কেউ বাতলে দিতে পারে? আমি নিজেই তা বাতলাবার আগে কেবল প্রশ্নগুলো উত্থাপন করে যাই। যদি আর কেউ সেটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন তবেই আজকের ভাষণ ধন্য হবে।

৬ ডিসেম্বর ২০০৪-এ প্রদত্ত।

দীনেশচন্দ্র সেনের স্বীকৃতিধন্য এই বক্তৃতার জন্য আহূত হয়ে আমি সম্মানিত। তবে স্মরণ হচ্ছে, এই সম্মান বইবার সামর্থ্য কি আমার আছে। তার উপর যা বিষয় বেছেছি তারও দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই। তবে পরোক্ষ যোগ বোধ করি একটু আছে। যে-বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ছিল দীনেশচন্দ্র সেনের আজীবন সাধনার ধন, তার পাঠই হয়তো প্রশস্ততর হয় তুলনামূলক সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কাছে আমি ঋণী। সাহিত্যপাঠের যে আদর্শে আমি বিশ্বাসী, আর যার চর্চায় আমার এতদিন কটল, তাই নিয়ে তাঁরা আমায় বলবার সুযোগ দিয়েছেন। আশা করি তাঁদের প্রত্যাশা আমি অংশত পূরণ করতে পারব। তাঁরা তো তাঁদের স্নাতকোত্তর বাংলা পাঠক্রমে এক বিশেষ পত্রের মাধ্যমে, অনেকদিন ধরেই তুলনামূলক সাহিত্যচর্চা করে আসছেন। যখন শশিভূষণ দাশগুপ্ত এর সূচনা করেন তখন তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের বহির্বিশেষজ্ঞ, বুদ্ধদেব বসুর অন্যতম পরামর্শদাতা। শুনেছি সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের আধুনিক ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যের বিভাগগুলির যৌথ উদ্যোগে এক তুলনামূলক ভারতীয় সাহিত্যের পূর্ণ পাঠক্রম প্রবর্তনের প্রয়াস করছেন। এই সাধু প্রয়াসকে অভিনন্দন জানাই। যে মনীষীর নামাঙ্কিত হর্ম্যতলে এই বক্তৃতা, এই প্রয়াস তাঁরই এক কৃতির উদ্ভবায়িকারী। যা তিনি ছিয়াশি বছর আগে শুরু করেছিলেন তাই যেন আজ সম্পূর্ণ হতে চলেছে। এই হর্ম্যতলেই ভারতীয় সাহিত্যসমূহের এক সম্মিলিত পঠনবিধি রচিত হচ্ছে।

আরো কোন কোন জায়গায় যে এমন পঠনবিধি ভাবা হয়নি বা হচ্ছে না তা নয়। কিন্তু এই বিধির কোনো একমেবদ্বিতীয় রূপ নেই। বিবিধ স্থানে বিবিধ স্থানীয়তা আছে, সংলগ্নতার চেহারাও বিবিধ স্থানে বিবিধ। কিন্তু এটা যতক্ষণ জানি যে আমরা বহুভাষী আর ভাষায়-ভাষায় সম্পর্ক সর্বত্র সরল নয়, ততক্ষণ ভাবনা নেই। ভারতীয় সাহিত্যের ঐক্য-অনৈক্য নিয়ে অনেক তর্ক হয়েছে। সাহিত্য অকাদেমি একসময় জোর ঐক্যের সওয়াল করতেন; এখন হয়তো সেই সওয়াল তেমন করেন না, ভিন্নতার বা বহুত্বের মর্যাদা দেন, কিন্তু তাঁদের লক্ষ্য এখনও মিলন। আর সেই মিলনসাধনে সম্প্রতি পথ দেখিয়েছেন শিশিরকুমার দাশ, ১৯৯১ ও ১৯৯৫-তে প্রকাশিত তাঁর 'ভারতীয় সাহিত্যের সমন্বিত ইতিহাস' এর অষ্টম ও নবম খণ্ডে—কালক্রম ১৮০০-১৯১০ ও ১৯১১-১৯৫৬। তিনি ভারতীয় সাহিত্যকে এক ধরে নিয়ে এগোননি বরং উস্টোটাই করেছেন: সাহিত্য অকাদেমি স্বীকৃত সাহিত্যসমূহকে পাশাপাশি রেখে তাদের সাম্য-অসাম্য আবিষ্কার করেছেন। তাঁর এই দুই খণ্ড ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তাদের বিশদ কালপঞ্জি—তিনি বছর ধরে ধরে সাহিত্যসংক্রান্ত তথ্যাবলির ক্রম অনুসারে তাদের সম্মিলন করেছেন। আর তার ভিত্তিতেই তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ রচিত হয়েছে। তিনি যাকে ভারতীয় সাহিত্যে বলছেন তা তাঁর এই সিদ্ধান্তসমূহেরই সারাৎসার। এবং ভারতীয় সাহিত্যের ঐক্য-অনৈক্য নিয়ে অদ্যাবধি যে তর্ক হয়েছে তার এক নিষ্পত্তিও তাতে আছে। ফলিত তুলনামূলকতার এমন দৃষ্টান্ত সহজে মেলে না! তুলনামূলকতা বা তুলনামূলক সাহিত্য কী তা নিয়েও তর্ক এতাবৎ মন্দ হয়নি। এর যোড়োপে উদ্ভবের ইতিহাস যাঁরা লিখেছেন তাঁরা শিল্পবিপ্লবে যেভাবে বাজারের বিস্তার ঘটেছিল তার দৃষ্টান্ত নিয়েছেন। সাহিত্যে-

সাহিত্যে তুলনার কথা তখনই উঠল যখন এক ভাষার বেড়া ডিঙিয়ে আরেক ভাষার পাঠকদের কাছে পৌঁছে গেল সেই সাহিত্য। তার নির্ভর যেমন মূল ভাষা তেমনি অনুবাদও। গ্যোটে তাঁর মতো করে এই কথা বুঝেছিলেন, এবং ১৮২৭-এ যখন তাঁর তরুণ শ্রোতা পেটার একারমান্কে জাতীয় সাহিত্যের বদলে বিশ্বসাহিত্যের আবির্ভাব বার্তা শুনিয়েছিলেন, তখন তাঁর প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিল এক চীনে আখ্যানের অনুবাদ পাঠ। আর তার পরে পরেই, গ্যোটে'র সেই বার্তার অপেক্ষা না-করেই, ফ্রান্সের বিদ্বৎসমাজের কেউ কেউ 'লিডেরাত্যুর কঁপারে'-র কথা বলতে শুরু করেছেন। প্রথম তুলনামূলক সাহিত্যবিচারের উদাহরণ হিসেবে যে-ফরাসি সম্ভর্ভের উল্লেখ করা হয়, তার বিষয় ছিল মধ্যযুগের ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যের তুলনা। আর আমরা তো জানিই যে ম্যাথু আর্নল্ড ওই ফরাসি কথার ইংরেজি করেন 'কম্পারেটিভ লিটারেচার'। এবং 'কম্পারেটিভ লিটারেচার' কথাটা যে ১৯০৭-এই ভারতে পৌঁছে গেছে তার প্রমাণ আমাদের মনে আছে সদ্য প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে এ বিষয়ে বক্তৃতার আমন্ত্রণ। রবীন্দ্রনাথ পরিবর্তে বলেছিলেন 'বিশ্বসাহিত্য'র কথা, সেভাবেই তিনি দেখেছিলেন এই নতুন সাহিত্যপাঠকে। অবশ্য আমরা এও জানি যে তাঁর 'বিশ্বসাহিত্য' গ্যোটে বা 'কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেস্টো'র মার্ক্স-এঙ্গেলসের বিশ্বব্যাপী সাহিত্য নয়, তা গ্রাম্যসাহিত্যের বিপরীত বিশ্বজনীন সাহিত্য। এ যে নিত্যন্ত ভাববাদ নয়, এর পেছনে যে তাঁর স্বাদেশিকতা তথা ভারত গৌরবও আছে, তা বলা হয়তো বাহুল্য নয়। তাঁর বিখ্যাত 'শকুন্তলা' প্রবন্ধটি এর আগেই লেখা হয়ে গিয়েছিল।

'শকুন্তলা' অবশ্য তুলনামূলকতারই নিদর্শন যেমন তার আগের বঙ্কিমরচিত 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা' প্রবন্ধটিও—দুটিই দুই ভাষার রচনায়-রচনায় সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নিরূপণ। সম্পর্কের খতিয়ান যেমন তেমনি সাদৃশ্যসম্বন্ধও যে তুলনামূলকতা তা অবশ্য ফরাসি তুলনাবিদে'রা প্রথম মানেননি। তাঁদের কাছে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ব্যতীত আর—সব কিছুই ছিল বিসংবাদিত। অপর পক্ষে সাদৃশ্যকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল এক নতুন সাহিত্যোতিহাসবোধ, উনিশ শতকের রুশ দেশে যার প্রবক্তা ছিলেন আলেক্সান্দর ভেসেলোভস্কি। তাঁর মতে সব সাহিত্যই কতকগুলি নির্দিষ্ট ধাপ বা ঘাট পেরোয় যার পরম্পরা সর্বত্রই এক। সুতরাং দুই বা ততোধিক সাহিত্যের তুলনা হবে ধাপ বা ঘাট নির্ভর; সময়ের যে ব্যত্যয়ই থাক না কেন ধাপ বা ঘাটের কোনো ব্যত্যয় হবে না। এর মধ্যে যে ডার্বইন-শোভন অভিব্যক্তিবাদ কাজ করছিল তা স্পষ্ট। তবে সম্পর্ক বা সাদৃশ্য যাই হোক না কেন, তুলনামূলকতার প্রথম শর্ত যে একাধিকতা তা সর্বমান্য। সেই একাধিকতার রূপ যেমন একের বহিবর্তী অধিককে নিয়ে, তেমনি একের অন্তর্বর্তী অধিককে নিয়েও। যান্ত্রিকতার স্থান নেই ওখানে। ফরাসিরা যে ক-খ-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করছিলেন, অর্থাৎ কেবল দেখছিলেন ক-র খ-র উপর কী প্রভাব বা খ-র ক-কে কীভাবে গ্রহণ, অর্থাৎ কেবল প্রভাবের-গ্রহণেরই হিসেবনিকেশ করছিলেন-তার সংকট সোচ্চার হয়ে উঠেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর য়োরোপে-মার্কিনে। তথাকথিত তুলনাই যে একমাত্র পছন্দ নয় কিংবা রচনার রন্ধনশালায় কী ঘটে তাই শুধু নয় বিবেচ্য, একথা স্বরণ করিয়ে দিতে লাগলেন কেউ কেউ। আর সেই সময়েই যে পূর্ব য়োরোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছিল পশ্চিম য়োরোপের আর তার ফলে দিগন্ত খানিক বদলে গিয়েছিল, তাও তো ভুলবার নয়। অন্যদিকে মার্কিনও যে তার ফরাসি-প্রভাবিত প্রত্যক্ষবাদী প্রবণতা ঘুচিয়ে, হয়তো বা কিছুটা জার্মান প্রেরণায়, নতুন মাত্রা আনছিল তুলনামূলকতায়, তা-ই বা কী করে ভুলি! অবশ্য এক শিল্পের সঙ্গে আরেক শিল্পের বন্ধন বিচারের এই নবীন আগ্রহের আতিশয্যে কেউ কেউ আবার সাহিত্যে-ইতিহাস বা সাহিত্যে-দর্শনেও বন্ধন খুঁজতে চাইলেন, যা সাহিত্যের স্বভাবেরই নিহিত। বস্তুত, বরাবরই কিছু আক্ষরিকতা তুলনামূলকতার ঔদার্যে বেড়ে

উঠেছে, সেই ঘাস না উপড়ে এগোনো যায় না। আর ঔদার্য যেমন একদিকে তুলনামূলক সাহিত্যের জোর তেমনি অন্যদিকে তার দুর্বলতাও।

যদি এমন হত যে আমার সাহিত্য তার আপন সীমাতেই আবদ্ধ, কোনো অন্য সাহিত্যের সংস্পর্শে তাকে আসতে হচ্ছে না, তাহলে তার পঠনপাঠন হত বিশুদ্ধ, তাতে তুলনামূলক পদ্ধতির কোনো প্রয়োগই হত না। কিন্তু এমন সাহিত্য দুর্লভ। তাঁর ‘অদুসি’ কাব্যে হোমার এক সমুদ্রবান্ধব অতিথিবৎসল দেশের কথা বলেছেন যাদের উপর অভিশাপ ছিল যে যদি কখনও তারা অদুফেয়ুসকে আশ্রয় দেয়, তাহলে তাদের সমুদ্রতীর তারা হারাবে, হারিয়ে হয়ে উঠবে এক দুর্লভ্য পাহাড়ে-ঘেরা অন্তরীণ ভূখণ্ড। অভিশাপ ইতিহাসের উন্টোপথে হাঁটে। সেই দেশের কথা আর কেউ জানবে না। ভলতেয়ারের কঁাদিদ-কাঁকাবো দৈবাৎ এসে পড়েছিল এলদোরাদোতে, পাহাড়ের অস্ত্রতন্ত্রেব শ্রোতবিনীতে উৎক্ষিপ্ত হতে হতে—এসে তাদের অনেক লাভও হয়েছিল, কিন্তু যেহেতু সেই সোনার দেশ ভাবীকালহীন, তাই তাদের ফিরেও আসতে হয়েছিল, প্রায় জাদুবলেই, উৎক্ষেপণে পাহাড়ের প্রাচীর পেরিয়ে, আর যে-স্বর্ণবালুকা তারা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল তার কিঞ্চিৎমাত্রই ছিল অবশিষ্ট। এলদোরাদোর প্রশংসায় আমরা পঞ্চমুখ হব, কিন্তু এলদোরাদো তো ইতিহাসের বাইরে, লুঠেরার স্বপ্ন মাত্র, ঔপনিবেশিকের অনায়ত্ত। উপনিবেশ বলব সুরিনামকে যেখানে কঁাদিদ-কাঁকাবো শেষ অবধি এসে পৌঁছয়। উপনিবেশসূত্রেই হোক বা বাণিজ্যহেতুই হোক বা পারম্পরিকতার কাবণেই হোক, ভাষায়-ভাষায় সাহিত্যে-সাহিত্যে বিয়োগের চেয়ে সংযোগই অধিক, আর সেই সংযোগে যে অনেক সময়ই প্রভুত্ব কয়েম থাকে তার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। যাঁরা সংস্কৃতির স্বাবলম্বিতার বার্তা রটান তাঁদের নৃতত্ত্বে সমাজতত্ত্বে ফাঁকি নেই, কিন্তু সেই স্বাবলম্বন যে শেষ পর্যন্ত পর্যুদস্ত হয় এবং সংস্কৃতি হয় আক্লাস্ত, তারও খবর কি তাঁরা রাখেন না? হোমারের ফাইয়াকিয়া বা ভলতেয়ারের এলদোরাদো ছাড়া কিছুই নেই ইতিহাসের বাইরে। আর ইতিহাসের অন্তর্গত হয়ে থাকা মানেই তো সংযোগ, দখলদারি, সংমিশ্রণ, সংস্করণ তথা কারকতা। একদা প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে তুলনাবিদেতা উচ্চ-নীচের প্রস্তাব করেছিলেন, অর্থাৎ বলতে চেয়েছিলেন প্রভাব বয়ে চলে উঁচু থেকে নিচুতে। এই ভেদ এখন উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তার প্রধান নির্ণেয়, তার অন্তরালবর্তী অনুপুঙ্খ আমাদের অস্থিষ্ট। এখন কারকতার তত্ত্বে মন না দিয়ে আমাদের ইংরেজি চর্চাকে আমরা বুঝতে পারি না, তা লেখালেখিতেই হোক বা পড়াশুনোতেই হোক। এখনও আমাদের আপন লেখালেখি বা পড়াশুনোতেও কি কারকতার আভাস নেই! এখনও আমাদের ভাবনা-বিশ্ব অধিকৃত, আমাদের ‘আমরা’ অনেকটাই অনুবাদিত। এই ‘অনুবাদে’র মর্ম না বুঝে নিজেদের আমরা কী করে বুঝব!

কিন্তু উত্তর-ঔপনিবেশিকতার উত্তেজনায় আমরা আমাদের পুরোনো সংযোগের কথা ভুলে যাব না। তুলনামূলকতার এক মস্ত দায় সেখানে। যেমন চীনের সঙ্গে কী আদানপ্রদান হয়েছিল তার বুদ্ধিজি আমাদের পুরো জ্ঞানতে হবে। এই যে কেউ কেউ বলেন কোনো কোনো বৌদ্ধ ভারতীয় কাহিনি এখন টিকে আছে শুধু চৈনিক রূপান্তরে, তার সত্যতা যাচাই করতে হবে। অথচ আধুনিকতার টান তো কেবল রামমোহনের কাল থেকে আমাদের নয়, চোঁটা মে-র পরের চীনেরও। তাই রবীন্দ্রনাথকে যখন ডাকল চীন, তার বুদ্ধিজীবীদের এক বড়ো অংশ তখন তাঁকে চাইল এশীয় আধুনিকতার প্রতিভূরূপে দেখতে। আর রবীন্দ্রনাথের কাছে চীন ছিল সেই প্রাচীন মহাদেশ যার ভারতের সঙ্গে অটুট যোগ ছিল। ১৯২৪-এ সেই প্রাচীনের বার্তাই তিনি শোনালেন, আর তা শোনাতে গিয়ে যে তিনি আধুনিকতাকামী চীনের কাছে এক ‘বিতর্কিত অতিথি’ হয়ে দাঁড়ালেন, সেই কথা কি আমরা মনে রাখব না! আর ১৯১৬-তে যখন জাপানে গিয়ে তার

মেইজি-পরের পাশ্চাত্যায়নের প্রেক্ষিতে তার প্রাচ্য অতীতের কথা তাকে মনে করিয়ে দেন তিনি, তখন তাঁকে অনেকেই সেখানে ভুল বোঝেন। এবং ওই ভুল বোঝার টানে দূলে ওঠেন এক অনেক পরের মার্কিন ঐতিহাসিকও, যিনি রবীন্দ্রনাথের এই চীন-জাপান সংযোগে দেখতে পান এক সংকীর্ণ প্রাচ্যতা বা এশীয়তা যা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ। তাই সংযোগের কতটা সুমিত আর কতটা ভুল বোঝাবুঝি তা বিচারের ভার তুলনামূলক সাহিত্যের উপর। চীন-জাপানের তুলনায় শ্যাম-কাম্বোজের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক হয়তো আরো প্রত্যক্ষ। তার পুনর্নিরূপণে কি আধুনিকতা অনুরূপ অন্তরায়, নাকি তার চিত্র একটু আলাদা। অন্যদিকে পারসিক ও আরব্য যোগাযোগ কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে তা নিয়ে কী করে নিশ্চূপ থাকে তুলনামূলক সাহিত্য। ম্যাক্স ম্যুলারের সেই কথা-র বিদেশযাত্রা বিষয়ক রোমাঞ্চকর সম্ভর্ড তাতে কি কিছু যোগ করবার আছে আমাদের। অন্তত সম্প্রতি ‘আরব্যরজনী’-র প্রথম অনুবাদের তিনশো বছর পূর্তি উপলক্ষে এই প্রতীতি কি জন্মায়নি যে ভারতীয় গল্পের পাশাপাশি আরো অনেক প্রাচ্য গল্প আছে এতে, এমনকী এর গল্পবন্ধনীও হয়তো বা নিতান্তই ভারত থেকে আমদানি নয়, এক অতিপ্রাচীন ও অতিসরল মিশরী প্রকরণ থেকে কালক্রমে উদ্ভূত! উপরন্তু, মূলগ্রন্থ মুদ্রণ ও তার নানাবিধ অনুবাদ-অনুসরণ থেকে কি এটাই প্রমাণ হয় না যে, যে-সব গল্প আমরা এখন থেকে পারস্যে-আরবে পাঠিয়েছি তাদেরই কোনো কোনোটি আবার আমাদের কাছে ফিরে আসছে!

এই ফিরে আসার আরেক মজার দৃষ্টান্ত একবার দিয়েছিলেন এক দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ বন্ধু। তিনি কথা বলছিলেন অনুবাদের সদস্য নিয়ে। প্রসঙ্গত মনে করিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথের ‘তুমি সম্ভার মেঘমালা’-র ‘স্বকৃত ইংরেজি অনুবাদের ভিত্তিতে (আসলে সম্ভবত সেই ইংরেজি অনুবাদের এম্পানিওল অনুবাদের ভিত্তিতে) তরুণ পাবলো নেরুদা এক প্রেমের কবিতা লেখেন। সংকলিত হয় তাঁর ‘কুড়িটি প্রেমের কবিতা ও একটি হতাশার গান’-এ। সেই কবিতার (সেই বইয়েরই) এম্পানিওল থেকে ইংরেজি করেন মার্কিন কবি ডব্লিউ. এস. মেরুইন। আর প্রধানত মেরুইন পড়ে তার এক বাংলা অনুবাদ করেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ‘নেরুদার প্রেমের কবিতা’-য় তা স্থান পায় (তখনও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অনুবাদ করেননি যার তিনি আবার দুটি রূপ দিয়েছেন)। আমাদের দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ বন্ধু এই বাংলা থেকে ইংরেজি থেকে এম্পানিওল থেকে ইংরেজি থেকে বাংলার উদাহরণ উপস্থাপিত করে প্রশ্ন করেছিলেন: শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ‘আবার আকাশে গোখুলি বেলায়’ কি রবীন্দ্রনাথের ‘তুমি সম্ভার মেঘমালা’-র বঙ্গানুবাদ? এমন বর্তুলতা যে অনাদ্র মেলে না তা নয়—ভারতীয় কথাকলি থেকে য়োরোপীয় রঙ্গ থেকে মার্কিনি রঙ্গ থেকে নব্য ভারতীয় রঙ্গের কথাও শোনা যায়। কিন্তু সর্বত্রই সমান রাজনীতি হয়তো বর্তায় না, সকল সংস্কৃতির রপ্তানি-আমদানি হয়তো একই প্রভুত্বের বশবর্তী হয় না। আর অনুবাদ যেহেতু ভাষায়-ভাষায় সেতুবন্ধন, তাই তার কৃৎকৌশলও অবশ্যবিচার্য, শুধু এটুকু দেখলেই চলে না যে দুটি ভাষার একটি বৃহৎ অন্যটি ক্ষুদ্র। বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্রে কিংবা ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে গমন কীভাবে ঘটে উঠছে তা কি কম জ্ঞাতব্য, বিশেষত যখন উদ্দিষ্ট পাঠকের অধিকার একটি ভাষাতেই, দুটিতে নয়। বলা বাহুল্য ইত্যাকার বিবেচনার ভার তুলনামূলক সাহিত্যের উপর। বস্তুত অনুবাদের মতো প্রত্যক্ষ তুলনামূলকতার ক্ষেত্র খুব বেশি নেই। আর অনুবাদ যে কেবল বিদেশী ভাষা থেকেই হয় তা নয়, স্বদেশের এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদের পরিমাণও খুব কম নয়। যাকে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টি বলেন আদানপ্রদান, তার উদ্দেশ্যই তো তা-ই, যদিও অনেক সময়ই তার জন্য এক মধ্যবর্তী তৃতীয় ভাষাকেও বেছে নেওয়া হয়, যেমন হিন্দি বা ইংরেজি। তবে উন্টোটাও বিরল নয়, সরাসরি এক ভারতীয় ভাষা থেকে অন্য ভারতীয় ভাষায় রূপান্তর। আর ভারতীয়

সাহিত্যসমূহের সম্যক পরিচয় পেতে তো আমাদের অনেকটাই এমনি অনুবাদের উপর নির্ভর করতে হয়। তাকাটি শিবশঙ্কর পিলেই তাঁর জীবনের শেষপাদে যে বৃহৎ আখ্যান রচনা করেন (যাকে নিয়ে এক দীর্ঘমেয়াদি টেলিভিশন সিরিয়াল করেছিলেন সত্য) সেই ‘কয়ার’-এ কথিত কেরলেব ভূমিনির্ভর গ্রামীণ সমাজের দুশো বছরের পরিচয় পেতে যদি কেউ কেউ আমরা মলয়ালম শিখি, তার চেয়ে ভালো আর কী! কিন্তু যতদিন না যথেষ্ট মলয়ালম শিখব ততদিন পড়ব না, কেননা অনুবাদ মূলের বিকার, এই ভেবে যদি বসে থাকি তাহলে ‘কয়ার’ এর কোনো পরিচয়ই হয়তো পাব না। আর অনুবাদে কোনো সাহিত্যপাঠই হয় না, এই কথারও তেমন যুক্তি নেই। মূল পাঠ হয় না বটে, কিন্তু মূলনির্ভর এক ভগ্নপাঠ অবশ্যই হয়। এমনকী বাগর্থবাদীরাও অনুবাদের বিদূষণ করবেন না। তার উপর আমাদের দৈনন্দিন সাহিত্যপাঠের সঙ্গে পাঠক্রমের কোনো যোগ নেই তাও বোধকরি অভিপ্রেত নয়। আর অনুবাদ যে আমরা পড়ি, এবং পড়ে আনন্দও পাই, তা তো অস্বীকার করা যাবে না। যেমন আপন ভাষার লেখা আমরা পড়ি, যেমন দ্বিতীয় এক ভাষার লেখা, কখনও কখনও তৃতীয় এক ভাষার লেখাও, তেমনি অনুবাদও আমাদের দৈনন্দিন পাঠের অন্তর্গত। পাঠক্রমে তার অন্তর্ভুক্তি তাই অজাচার নয়, যদি না আমরা অনুবাদকেই মূল বলে ভুল করি, অর্থাৎ আমরা যদি অনুবাদহেতু মূল থেকে পাঠের কী দূরত্ব ঘটছে সে বিষয়ে সচেতন না থাকি।

তবে অনুবাদপাঠে যে এখনও আমরা ঔপনিবেশিকতা বা দাস্য থেকে মুক্ত হতে পারিনি, তার প্রমাণ অ-নিংরেজ সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদে আমাদের অগাধ বিশ্বাস আর তুলনায় তার ভারতীয় ভাষার অনুবাদে ঘোর অবিশ্বাস। গ্রীক ট্রাজেডি আমরা ইংরেজিতে পড়তে অভ্যস্ত, কিন্তু বাংলায় পড়তে ঈষৎ দ্বিধা-ওই জগতের বাংলা প্রতিভাস কি সম্ভব! ইডিপাস যে অয়দিপাউস এই কথা বোধকরি আমাদের প্রথম চীৎকার করে শোনালেন শম্ভু মিত্র, আর শিশিরকুমার দাশ আরো কাছে এলেন মূলের, অয়দিপাউস, স্ফীতপদ। তাঁর ‘বন্দিনী’ যে কোনো ‘উইমেন অব ট্রয়’-এর চেয়ে কম নয়, তা কি আমরা সহজে মানি! কিংবা যখন তিনি গ্রীক লিরিকের বঙ্গানুবাদ করেন তখন কি মন দিয়ে পড়ি সে-বই, যার নাম ‘বহু যুগের ওপার হতে’! প্রশ্নটা অভিমানের নয়, প্রশ্নটা আমাদের উত্তর-ঔপনিবেশিক ভাবনা-সাপেক্ষ। আরেকটু কাছের দৃষ্টান্ত যদি নিই তবে কবীর অনুবাদের কথা বলব। যদি মূলে সবটা বুঝতে না পারি তাহলে ইংরেজির দ্বারস্থ না হয়ে এখন রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কবীর-বীজক ও অন্যান্য কবিতা’-র বাংলা পড়ব। বা মরাঠি সম্ভব কবিতার যে-অনুবাদ তিনি করছেন তাতে আমাদের প্রয়োজন মিটতে শুরু হবে। এমনি আরো দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। তার একটি নবনীতা দেবসেনের ‘শতক বচন’, কন্নড় বীরশৈব বচনের অনুবাদ, যদিও তিনি কন্নড়পাঠে সাহায্য নিয়েছেন এক কন্নড়ভাষী বীরশৈব বিশেষজ্ঞের। পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদনের কয়েকটি অলিখিত শর্ত বোধকরি অনুবাদককে মানতে হয়। তার একটি নিশ্চয়ই মূলানুগ হওয়া। কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁকে সুখপাঠ্যও হতে হয়। এই মূলগমন ও সুখপাঠ্যতার দ্বন্দ্ব যিনি যত বেশি মেটাবেন তিনি তত ভালো অনুবাদক।

কবীর, মরাঠি সম্ভব কবিকুল ও কন্নড় বীরশৈব মানে তো সেই ভক্তির জগৎ যা ভারতীয় তুলনামূলকতার এক শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। এত বড়ো ও এত বহুমুখী আন্দোলনপর্যায় আর বোধহয় ঘটেনি। আর তার দেশ-কালের কথা মনে রাখলে উত্তরপুরাণের ভক্তিশ্লোককে বেশ অপ্রতুল লাগে। জন্ম দ্রাবিড় দেশে অর্থাৎ তামিলনাড়ুতে, কর্ণাটকে বৃদ্ধি, মহারাষ্ট্রে কিছুদিনের স্থিতি, গুজরাতে লয়, বৃন্দাবনে পুনর্জন্ম-ভক্তি তো শুধু এই নয়, ভক্তি আরো অনেক স্ফোট, আরো অনেক পথরেখা। এই শ্লোক যিনি বেঁধেছিলেন তিনি হয়তো বা পশ্চিম ভারতের কবি ছিলেন বা বৃন্দাবনবাসী হলেও

গৌড়ীয় নন। ভক্তির সমন্বিত ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি। আপন আপন ভাষার বা অঞ্চলের ইতিহাস ঢের আছে, কিন্তু একের কথা বলতে গিয়ে যে অন্যের কথা সবসময়ে ভাবা হয়েছে তা নয়। চৈতন্যদেবের সর্বপ্লাবী বৈষ্ণব আন্দোলনের দলিলরূপী চরিতসাহিত্য পড়ে বা বৃন্দাবনের গোস্বামীদের তত্ত্বকথা শ্রবণ করে আমরা গৌড়ীয় ভক্তির সব অনুপুঙ্খ অবগত হই, কিন্তু পার্শ্ববর্তী অসমের সম্মান সর্বপ্লাবী বৈষ্ণব আন্দোলন তথা শঙ্করদেব বিষয়ে প্রায় কিছুই শুনি না। অথচ এমন একটা জন্ম সময় ছিল তখন আর এমন দুর্বীর ছিল তীর্থরাজ্য ও তীর্থসলিলের আকর্ষণ যে ভক্তির এ-মার্গে ও মার্গে খালি বিয়োগ নয়, যোগও হত। সমন্বিত ইতিহাস লিখতে বসে সেই যোগবিয়োগের কথা লিখতে হবে বইকি। নিষ্ঠুর ভক্তি যেমন ছিল তেমনি সগুণ ভক্তিও তো ছিল। আর সেই সময়কার হিন্দুচিন্তায় শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদই একমাত্র নিয়ামক ছিল না, তাঁর ভারতদর্শনের পাশাপাশি অন্য ভারতদর্শনও ছিল। ছিলেন বিশিষ্টদ্বৈতবাদী রামানুজ যিনি আলওয়ারদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিষ্ণুর সঙ্গে শ্রী-কে যুক্ত করেছিলেন, ছিলেন মধ্ব যিনি শঙ্করকে মনে করতেন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও যিনি ভাগবতের মহিমা মেনে নিয়েছিলেন, ছিলেন নিম্বার্ক যিনি রাধা নাম প্রচার করেছিলেন, ছিলেন বল্লভ যাঁর কাছে ভাগবতই ছিল প্রামাণ্য ও যিনি ভক্তিতে প্রেম সঞ্চার করেছিলেন। গীতার শঙ্করভাষ্যের সঙ্গে জ্ঞানদেবের ‘ভাবার্থদীপিকা’র প্রভূত পার্থক্য ছিল। অন্যদিকে কবীর-গুরু রামানন্দ ও গুরু নানক ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদ ঘোচাতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া ভক্তির ছিল সুফী সংযোগ, নাথ সংযোগ। নারী ভক্তির নিদর্শনও নিতান্ত কম ছিল না। আলওয়ার অশ্বালকে দিয়ে গুরু যাঁর রুঙ্গনাথ বিষ্ণুর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু কাবেরী তীরের শ্রীরঙ্গম মন্দিরে রঙ্গনাথপ্রিয়া মুসলমান রমণী বিবি নাচিয়ারেরও তো ঠাই হয়েছিল। চেন্নামল্লিকার্জুন শিবে সমর্পিতা অক্সা মহাদেবীর কথা বা দূর কাশ্মীরের শিব-পাগল লালদেবের কথাও তো মাথায় রাখতে হবে। আর সেই সঙ্গে রাজপুত কন্যা মীরার কথাও যিনি কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়ে চিতোর থেকে দ্বারকা, আবার দ্বারকা থেকে বৃন্দাবনে তাঁর পথরেখা অঙ্কিত করে দিয়েছিলেন। ভাবতে হবে ভক্তির সঙ্গে নারীমুক্তির কী সম্পর্ক ছিল বা কতটা জাতিভেদ ঘোচাতে পেরেছিল ভক্তি। উড়িসি মন্দিরের বিষ্ণু যে তাঁর মন্দিরে প্রবেশাধিকার বঞ্চিত এক ‘দাসাইয়া’ কণকদাসের কীর্তন শুনে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন ও তার দর্শননিমিত্ত যে মন্দির গায়ে এক ছিদ্র ফুটে উঠেছিল, সেই ‘কণকনকিন্দী’র কাহিনি কি কেবলই লোককথা? এই সবই আমাদের মনে রাখতে হবে, মনে রাখতে হবে আরো অনেক ভক্তের কথা, শুধু নাম নয় পদাবলীও, পরিব্রজও। বস্তুত এক বহুস্তর মানচিত্র আমাদের অঙ্কন করতে হবে, তাতে থাকবে সকল পন্থার অধিকার ও আসন, সেই সঙ্গে সকল পুত স্থানের নির্দেশ—যেমন ওয়ারকারীদের বিটঠল-নন্দিত পন্দরপুর, তেমনি আরো হাজারো মন্দির, হাজারো পুণ্য ঠাই, বাসবাম্মার স্মৃতিধন্য কুড়লসঙ্গম, তেমনি সমুদয় অনুভবমগ্ন যেখানে বীরশৈবদের সমাগম হত, আর শুধু তা-ই নয়, অস্থির সব পদরেখাও—কোন পথ দিয়ে কোন ভক্ত কোথায় পৌঁছেছিলেন, কোথায় কার নাথযোগীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, কোথায় কে সুফী দরবেশের দর্শন পেয়েছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি সব মধ্যকালীন শ্রুতিসমুচ্চয়। আর এই সবই কর্তব্য তুলনামূলক সাহিত্যের গবেষকের যে প্রয়োজনবোধে জ্ঞানের অন্যান্য প্রকোষ্ঠেও প্রবেশাধিকার পাবে। জ্ঞানের কারণেই যে ঘটনা সংস্থাপন ও অভিজ্ঞতা সঞ্চার নয়, ঘটনাসংস্থাপন ও অভিজ্ঞতা সঞ্চারের প্রয়োজনেই জ্ঞান, এই কালজ্ঞান তার আছে। তাই সংজ্ঞার্থনিরূপণেই মাত্র ব্যাপ্ত না থেকে সে সাহিত্যসংস্কৃতির রহস্য বুঝবারও চেষ্টা করবে।

তার মানে এই নয় যে তুলনামূলক সাহিত্যের কোনো নিজস্ব ব্যাকরণ নেই। আছে। সাহিত্যে সাহিত্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের পরিমাপ নিবন্ধন এক তত্ত্ব যে একদা তৈরি হয়েছিল তার আভাস

আগে দিয়েছি। প্রভাব ও গ্রহণ ছিল সেই তত্ত্বের মূল। প্রভাব সূচীমুখ—এক ভাষার লেখকের অন্য ভাষার লেখকের উপর বা এক ভাষার রচনার অন্য ভাষার রচনার উপর প্রভাব ঘটতে পারে, কিন্তু তা যখন ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে, বিশেষ থাকে না সাধারণ হয়ে ওঠে, তখন তাকে ব্যাকরণত প্রভাব না বলে অভিঘাত বলাই ছিল রীতি। আর গ্রহণ পরিগ্রহণ প্রভাব-অভিঘাতের উল্টোপিঠ। বিশেষ ও সাধারণে সেখানেও একটা তফাৎ সম্ভব, কিন্তু গ্রহণ-পরিগ্রহণের বেলা জরুরি প্রশ্ন স্থায়িত্বের, কতটা টিকল আর হয়তো গ্রহীতাকে খানিক পাস্টে দিল, সেই প্রশ্ন। প্রভাব ও গ্রহণের এই প্রত্যক্ষবাদী ধারণার পাশাপাশি এক নতুন ধারণা এসে তাদের একটু নাড়িয়ে দিয়েছে—তা আন্তর্ভবনের ধারণা। বয়নের ভেতর যখন অন্য বয়ন ঢুকে থাকে তখনই আমরা আন্তর্ভবনের কথা বলি, এবং সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে বেশির ভাগ বয়নেই কিছু আন্তর্ভবন থাকে। কোথাও কোথাও তা হয়তো উন্মুক্ত, কোথাও কোথাও গুপ্ত। মিস্টন যখন বলেন, *Things unattempted yet in prose or rhyme*, তখন তাঁর সময়কার অনেক পাঠকই জানতেন তিনি ইতালীয় কবি আরিওস্তোর ‘অর্লান্দো ফুরিও কো’-র উপক্রমণিকা থেকে একটি উক্তি প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করে দিচ্ছেন। পঙক্তিটি হল ‘*Cosa non detta in prosa, mai ne in rima*’। তুলনীয় মনোভাব আমি দেখি ‘রঘুবংশের’ গোড়ায়, যেখানে তাঁর কাব্যবিষয়ের প্রস্তাব করেই কালিদাস আপন অক্ষমতার কথা বলছেন: ‘কঃ সূর্যপ্রভববংশ কঃ চান্নবিষয়ামতিঃ’। মাত্র এক ‘মন্দ কবিশঃপ্রার্থী’ তিনি। তাঁর অবস্থা তিনি পরপর দুটো উপমায় স্পষ্ট করে দিচ্ছেন, একটি, ভেলায় করে সমুদ্র পেরোনো, অন্যটি বামন হয়ে উঁচু ডাল থেকে ফল পাড়বার প্রয়াস। কিন্তু এর পরেই একটি উপায় তিনি ভাবেন, যার সঙ্গে মিস্টন আরিওস্তো থেকে আহরণ করে যা করেছেন তার আদর্শত অমিল নেই। ‘অথবা কৃতবাগ্ধ্বারে বংশেংগ্নিন পূর্বসূরিভিঃ’। মণী বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্র স্যোবাস্তি মে গতিঃ’। বাম্মীকি—ব্যাসকে যে তা বলতে হত না তা বলা বাহুল্য, হোমারও বলেন না। আর হোমারের অনুসরণ তো পরবর্তী কবিরা অনেকেই করেছেন, এমনকী বাঙালি কবি মধুসূদনও। দাণ্ডের ‘দিভিনা কম্মেদিয়া’তে একটি ক্ষুদ্র উপাখ্যান আছে, এতে তির্যগ্ভাবে হলেও উত্তরসূরীর পূর্বসূরীর সঙ্গে সংযোগের এই বার্তা পৌঁছে যায়। নরকের প্রথম বৃত্তে যেখানে কেবল পুণ্যবান বা অপাপস্পষ্ট অ-খ্রিস্টীয়দের অবস্থান, সেখানে ভার্জিলের সঙ্গে যেতে যেতে দাণ্ডে চার মহাত্মাকে দেখতে পেলেন—তাঁরা হোমার, হোরাস, ওভিদ ও লুকান। ভার্জিল পঞ্চম হয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আর ভার্জিলের অনুগামী হিসেবে দাণ্ডেও সেই দলে গৃহীত হলেন, যেন তিনি যষ্ঠ। একে ব্যাঙ্গ বললেও এর মর্ম অগ্রাহ্য নয়।

আন্তর্ভবন তথা পূর্বসূরী-উত্তরসূরীর কথা বলতে বলতে আমরা পৌঁছে গেছি তুলনামূলক সাহিত্যের আরেক প্রধান ক্ষেত্রে। তা সাহিত্যবিধ সংক্রান্ত, অর্থাৎ সাহিত্যের যে নানাবিধ প্রকার বা রূপ আছে সেই সংক্রান্ত। এই বিধ সম্পর্কে ভাবতে গেলেই আমার মলিয়েরের ‘হঠাৎ নবাব’-এর ভাষাশিষ্কার কথা মনে পড়ে যায়, যেখানে হঠাৎ-হয়ে-ওঠা ভদ্রলোক জুর্দগীর দর্শনশিক্ষক তাকে বললেন, ভাষা দুই প্রকার, গদ্য ও পদ্য; আর গদ্যের বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি যখন আরো জানালেন যে দৈনন্দিন সব কথাবার্তার বাহন তা-ই তখন জুর্দগী বলে উঠল, তার মানে চল্লিশ বছর ধরে আমি খালি গদ্যই বলে আসছি! সংস্কৃতশাস্ত্রে অবশ্য গদ্যপদ্যের সঙ্গে চম্পূরও স্থান আছে। অন্যদিকে দু-রকম কাব্যের কথা ভাবে শাস্ত্র: শ্রব্য ও দৃশ্য। আর শ্রব্যের যেমন নানা ভাগ আছে, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, দূতকাব্য ইত্যাদি, তেমনি দৃশ্যেরও আছে দশটি রূপ যার মধ্যে নাটক ও প্রকরণ প্রধান। পাশ্চাত্য কাব্যবিধের জনক আরিস্ততল শিল্পের প্রকারভেদ করেছেন তাঁর অনুকৃতি তত্ত্ব অনুযায়ী, অর্থাৎ অনুকৃতির রূপ, উপাদান, উপায় ও লক্ষ্য অনুযায়ী। কোথাও

তফাৎ রূপ অনুযায়ী, গুরু কিংবা লঘু, কোথাও তফাত উপায় অনুযায়ী, কখন কিংবা প্রদর্শন, আবার কোথাও তফাত উপাদান অনুযায়ী, কাব্য কিংবা সংগীত কিংবা দিথুরাস্থ, যেখানে কথা সুব ও নাচ তিনই আছে। লক্ষ্য সর্বত্রই এক, আনন্দ। বলা বাহুল্য কোনো বৈশ্বিকবিধ নেই : চীনে-জাপানে বা পারস্যে-আরবে স্বতন্ত্র সাহিত্যবিধ গড়ে উঠেছে। বস্তুত বিধ-র বৈচিত্র্য অপার। আর শ্রুতিনির্ভর কাব্যকলায় প্রকারভেদ অন্য। তবে বিষয়-বিষয় যে যোগাযোগ হয় তার প্রমাণ প্রভূত। পারস্যের গজল আমরা আপন করে নিয়েছি, তেমনি পাশ্চাত্য উপন্যাসও। যদিও তাতে আমাদের পুরাণ ও অন্য আখ্যানের মিশেল আছে। তাছাড়া হয়তো বা কথা, সুর ও অভিনয়, অর্থাৎ বয়ন-কথন, সুরসম্পাদন ও নৃত্য-নৃত্য সর্বত্রলভ্য। আর কাব্যের উদ্ভব যদি কৃষি থেকে হয়ে থাকে, তাহলে তার এই ত্রিবিধ রূপ বোধকরি মৌল।

সাহিত্যবিধের মতো সাহিত্যবস্তুও এক প্রধান ক্ষেত্র তুলনামূলক সাহিত্যের। তবে বস্তুবিচারের হেরফের অনেক। একদল বলেন, এ পশুশ্রম, আরেকদল বলেন, এটাই আসল, কারণ বস্তুই শেষ অবধি থাকে। বস্তু মানে আকাড়া বিষয় নয়, যুদ্ধ-মৃত্যু-প্রেম, প্রকৃতি-পূজা প্রভৃতি, বস্তু মানে অস্তুর্গত অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি। অবশ্যই উক্তি ছাড়া উপলব্ধি অপ্ৰকাশ্য, কিন্তু উপলব্ধি ছাড়া উক্তি তো অস্তঃসারশূন্য বাগাড়ম্বর। বাগর্থের অর্থই সেই বস্তু, সেই অস্তঃসার যাকে বাদ দিলে বাক্ অচল। এমনকী যদি ভরতকথিত রসসূত্রই নিই যা অভিনব গুণ্ডতে এসে এক অদ্বৈত ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ-র প্রস্তাব হয়ে দাঁড়াল, তাতেও কি বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারীর সম্মিলনে এক স্থায়ীভাবেরই রসনিষ্পত্তি ঘটছে না। এবং রস আট কি নয় কি দশ যাই হোক, তদ্ব্যত ভাবও তো আট কি নয় কি দশ। সেই ভাবই বস্তু। হয়তো কালের সঙ্গে সঙ্গে ভাবের সংখ্যাও বেড়েছে, যদিও নতুন নামে ডাকলেও রসের তাতে কোনো হেরফের হচ্ছে না। সমাজ-সংসার-পরিবার, সম্পর্কের ভাঙা-গড়া, সঙ্গ-নিঃসঙ্গতা, ক্ষুধা-শ্রম-পূজি-শোষণ রাষ্ট্র-বিদ্রোহ- রাষ্ট্রবিপ্লব দুর্ভিক্ষ-বাস্তবহীনতা, শঙ্কা-সংকট-প্রত্যয়-বিশ্বাস আত্মত্যাগ আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ-স্বপ্ন, ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু আমরা প্রতিনিয়ত পড়ছি আমাদের সাহিত্যে। তাদের নিয়ে সচেতন হয়ে ওঠাই বস্তুতাত্ত্বিকের কর্ম। আর তুলনামূলক সাহিত্য যেহেতু একপ্রকার ভাষাবন্ধন, তাই বস্তুতাত্ত্বিক ভাষায়-ভাষায় বস্তুর মিল-অমিল ঘটছে না হেরফের হচ্ছে তা দেখবেন। ১৯৪৭-এর বঙ্গভঙ্গের পর আমাদের বাংলা সাহিত্যের এক প্রধান অভিজ্ঞতা বাস্তবচ্যুতি। সেই সঙ্গে পাঞ্জাবও ভেঙেছিল। পাঞ্জাবি সাহিত্যে বাস্তবচ্যুতি কী চেহারা নিয়েছিল, সেই কৌতূহল কোনো-এক সময় আমাদের মেটাতে হবে। আর সিদ্ধুদেশ তো ভারতের মানচিত্র থেকেই হারিয়ে গেল! সিদ্ধিহিন্দুদের বাস্তবহীনতা, সেই সঙ্গে দেশ ব্যতিরেকী ভাষারক্ষার সমস্যা, কিঞ্চিৎ আলাদা। মুম্বইয়ের উপকণ্ঠ উলহাসনগরে একসময় অনেকগুলি উদ্বাস্তুশিবির বসেছিল। সেইসব শিবির ঘিরে স্কুল-কলেজও তৈরি হয়। একদা সেইসব স্কুল-কলেজে সিদ্ধিভাষীদের সংখ্যাই ছিল বেশি, এখন আর তা নয়; এখন এমনকী সিদ্ধি মা বাবার ছেলেমেয়েরা হিন্দি বা ইংরেজি মাধ্যমের প্রত্যাশী। সিদ্ধি ভাষাকে আমাদের অষ্টম তফসিলে গোড়া থেকেই অস্তর্ভুক্ত করা আছে, সিদ্ধি সাহিত্যে সাহিত্য অকাদেমিও বছর বছর পুরস্কার দেয়, কিন্তু সিদ্ধি পাঠকের সংখ্যা দিন দিন বোধকরি কমছে। বাস্তবহীনতার মতো আরো কিছু কিছু সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে ঢুকে সাহিত্যের বস্তু হয়ে উঠছে। নারী-চেতনা ও অধিকারবোধ তার একটি। দলিত ও অস্বাভাবিক অধিকারবোধ আরেকটি। আদিবাসী চেতনা আরো একটি। আর এইসব চেতনার একপ্রান্তে আছে শোষণ অন্যপ্রান্তে জাগরণ। এই সবই এখন বস্তু। বস্তুবাগীশ না হই, বস্তুমনস্ক হয়ে এদের মানচিত্র অঙ্কন আমাদের কর্তব্য।

সাহিত্যবিধ বা সাহিত্যবস্তুর মতো সাহিত্যেতিহাস ভাবনাও তুলনামূলক সাহিত্যের অন্তর্গত।

এক সাহিত্যের একনিষ্ঠ ইতিহাস রচনাতেও যে সমস্যা আছে, তা নিয়ে আমরা দিন দিন সচেতন হয়ে উঠছি। সাহিত্যেতিহাসে কালক্রম নিশ্চয়ই জরুরি, কিন্তু দেশের ঐক্য কতটা জরুরি! অর্থাৎ একই ভাষার সাহিত্য যদি ভিন্ন ভিন্ন দেশে উৎপন্ন হয় তাহলে কি তার একই ইতিহাস হবে, না ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস! বাংলাদেশী সাহিত্য কি বাংলা সাহিত্যেরই বাংলাদেশী শাখা নাকি ঈষৎ ভিন্ন এক সাহিত্য! কেউ কেউ ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন আর একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে বাংলাদেশী সাহিত্যের দুই জনন-কাণ্ড বলে ভাবেন। ধরা যাক আমরা ১৯৪৭-এর পরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখছি। আমরা কি সাতচল্লিশ থেকে বাহান্ন হয়ে একাত্তর পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে লেখা বাংলা সাহিত্য আমাদের উপাখ্যানে ঢোকাব, নাম দেব পূর্ব পাকিস্তানি বাংলা সাহিত্য; আবার বাহান্নর প্রেরণা সংবলিত একাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশে লেখা বাংলা সাহিত্যকেও আমাদের উপাখ্যানে গ্রহণ করে নেব, নাম দেব বাংলাদেশী সাহিত্য! সেই সঙ্গে পূর্বপাকিস্তানি সাহিত্যে বাংলার উপর খানিক উর্দুর শাসনও দেখতে পাব। অর্থাৎ, একটা তাত্ত্বিক প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদের হতেই হবে। সাহিত্য কি শুধু ভাষা, আঞ্চলিকতাসুদূরই ভাষা, নাকি স্বদেশও! পাঞ্জাবি কি এখনও এক সাহিত্য! আসল ভাষা ও ভূমির ঐক্য ধরে নিয়ে সর্বত্র এগোনোও যায় না। আমাদের ভাষাভিত্তিক রাজ্যপুনর্গঠন ছিল এক প্রশাসনিক সংস্কার, ভাষা ও ভূমির ঐক্যসংস্থাপন নয়। এক ভাষা ইংরেজির এখন অনেক স্বদেশ, তাই আর এক ইংরেজি সাহিত্য না বলে ইংরেজি সাহিত্যমণ্ডল বা সমূহ বলতে হয়। এম্পানিওল বা আরো কোনো কোনো ভাষার ক্ষেত্রেও তা-ই—হিস্পানি জগৎ বলে এম্পানিওল লেখা দেশগুলিকে একত্র করলেও তারা তো সাহিত্য লিখছে আলাদা আলাদা—এমনই লাতিন আমেরিকাকেও বোধহয় শেষ অবধি এক সামগ্রিক চিহ্ন বলেই ধরতে হয়। এইসব বিচিত্র মাত্রা নিয়েই সেই সাহিত্যেতিহাস যেখানে ভাষা মূলত এক কিন্তু স্বদেশ ভিন্ন (মূলত বলছি এই কারণে যে দেশের ভিন্নতার ফলে ভাষায়ও কিছু পরিবর্তন ঘটতে থাকে)। কিন্তু যেখানে অনেক ভাষা পাশাপাশি সাহিত্য রচনা করে যাচ্ছে? এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ সে ভারত, আর ভারতীয় সাহিত্যের ঐক্য-অনৈক্যের কথা আগেই বলেছি। সেইসঙ্গে শিশিরকুমার দাশের সমন্বিত ইতিহাসের কথাও বলেছি। এই সমন্বিত ইতিহাসের আগে কেরল সাহিত্য আকাদেমি থেকেও এক ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসের প্রয়াস হয়েছিল। করেছিলেন তার সম্পাদক কে. এম. জর্জ, তাঁকে সহায়তা করেছিলেন অনেকে। কিন্তু তাঁর পদ্ধতি ছিল যৌগিক। তিনি তখনকার তফসিলভূক্ত ভাষাগুলিকে নেন, কালক্রমকে কয়েকটি বৃহৎ অধ্যায়ে ভাগ করে নেন, তারপর সংকলনসাপেক্ষ সাহিত্যবিধগুলো ঠিক করে নেন, যেমন ছোটো কবিতা, বড়ো কবিতা, উপন্যাস নাটক ইত্যাদি। তারপর আলাদা আলাদা ভাষার সম্পাদকদের সাহায্যে বিশেষজ্ঞ বেছে নিয়ে তাঁদের দিয়ে সেই সেই ভাষার সেই সময়কার ও সেই সাহিত্যবিধর আখ্যান লেখান। ফলে পরপর অনেকগুলো আখ্যান সাজানো হয় যায়, ক্রম ভাষাভিত্তিক। ধরা যাক আমি জানতে চাই ভারতীয় উপন্যাসের ইতিহাস—পরপর সংস্থাপিত অধ্যায়গুলো থেকে আমাকে, ইতিহাসের পাঠক হিসাবে আমাকে, তা সংকলন করে নিতে হয়। কে. এম. জর্জ এই দুই খন্ডে বিভক্ত ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসের নাম দিয়েছিলেন ‘তুলনামূলক ভারতীয় সাহিত্য’। গ্রন্থে কোনো তুলনামূলকতা নেই, যদি না পরস্পর সংস্থাপনকেই তাই বলি। সত্যিকার তুলনামূলক ভারতীয় সাহিত্য শিশিরকুমার দাশের ‘ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস’, অষ্টম ও নবম খণ্ড। প্রসঙ্গত অন্য একটি ইতিহাস রচনার কথাও মাথায় রাখা যায়। আন্তর্জাতিক তুলনামূলক সাহিত্যসংস্থা প্রায় চারদশক ধরে যোরোপীয় ভাষায় লিখিত সাহিত্যসমূহের এক সামগ্রিক (ঠিক শিশিরকুমার দাশের অর্থে সমন্বিত নয়) ইতিহাস সংকলন করছেন। তাঁদের পদ্ধতি কিঞ্চিৎ নির্বাচন সাপেক্ষ, আগে

থেকে নির্ধারিত কতকগুলি অধ্যায় বা আন্দোলন বা লেখনরীতি নিয়ে অনেকে মিলে লিখছেন এই ইতিহাস। ভাষার কারণেই তাঁদের নানা ভুখণ্ডে যেতে হচ্ছে, উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকা তো বটেই, আফ্রিকাও। আর এশিয়াতেও তাঁদের আসতে হবে, কারণ ভারত-পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কার ইংরেজি লেখালেখির পঞ্জি তো নেহাত ক্ষুদ্র নয়।

ফ্রান্সে একসময় 'লিভেরাত্যুর কঁপারে'-র সঙ্গে 'লিভেরাত্যুর জেনেরাল' নামে এক পদ্ধতির প্রস্তাব হয়েছিল। আর বলা হয়েছিল সাহিত্যে-সাহিত্যে সম্পর্ক নির্ণয় যেমন 'কঁপারে'-র কাজ তেমনি সাহিত্যবিধি বা সাহিত্যবস্তু নিরূপণ বা সাহিত্যেতিহাস বীক্ষণ 'জেনেরাল'-এর কাজ। 'জেনেরাল'-এর ছায়া এখন কোথাও কোথাও রয়ে গেছে (একটি প্রখ্যাত মার্কিন বার্ষিকীর নাম এখনও 'ইয়ারবুক অব কম্পারেটিভ এন্ড জেনারেল লিটারেচার' যেমন জার্মান তুলনামূলক সাহিত্যসংস্থার নামের সঙ্গে 'আলগেমাইনে' কথাটা এখনও বুলছে)। কিন্তু কার্যত এখন প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সবই তুলনামূলক সাহিত্যের আওতায়। এমনকী সদ্যতন 'সংস্কৃতি পাঠ' বা 'কালচারাল স্টাডিজ'-এর সঙ্গেও তার মিলন ঘটছে। সংস্কৃতিপাঠ অবশ্য অনেক ব্যাপক, তাতে সমাজ-নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের কোনো কোনো ক্ষেত্রও অধিত হচ্ছে, সেই সঙ্গে আছে ভাষা ও সাহিত্যের বিবিধ বহির ক্ষেত্র, বিশেষ করে ভাষার সামাজিক মাপ-পরিমাপ ও সাহিত্যের প্রকাশ-পরিবেশন ও পরিগ্রহণ। এই শেষোক্ত-ক্ষেত্রে আছে সমাজ ও রাষ্ট্রের চোখে সাহিত্যের মূল্যায়ন যার ফাঁকে ফাঁকে অভিভাবকত্বও। সাহিত্য যে অন্যান্য গণমাধ্যমের মতোই এক মাধ্যম, এই কথা তুলবার কোনো অবকাশ নেই সংস্কৃতিপাঠে। তবে সংস্কৃতিপাঠের সঙ্গে তুলনামূলক সাহিত্যের যে মিলন ঘটছে তার কারণ বোধকরি সেই উদারতা যার গুণে সে গুণী, আবার যার দোষে সে দোষীও। তার সংজ্ঞার্থ ক্রমেই পাস্টে পাস্টে এসেছে। এক সময় সে এক মহোপাখ্যানের সামিল ছিল, এখন তার চারদিকে গড়ে উঠেছে আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যান। আধুনিকতার দূত হয়ে যে এসেছিল এদেশে, এখন সে হয়তো উত্তর আধুনিকতার সুহৃদ। এই মুহূর্তে কোথাও কোথাও তার ক্ষরণ নিয়েও কথা উঠেছে। তার একটা কারণ যদি এই হয় যে আলাদা আলাদা সাহিত্যের প্রতি পুরো মনোযোগ দেবার অবকাশ নেই, তাতে, বিধিবদ্ধ তুলনামূলক সাহিত্যে, তাহলে স্বত্ব্য যে আন্তঃসাংস্কৃতিক সাহিত্যপাঠের যে প্রয়াস শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক স্তরে, তাতে যুগপৎ বিশেষ ও সাধারণের প্রতি নজর দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া যদি এতদিনে পুরোনো হয়ে যাওয়া কতিপয় বিধি বর্জন করতে হয়, ক্ষতি কী। আর সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে, আমাদের মতো বহুভাষিক দেশে সাহিত্যসমূহের পারস্পরিক সংস্থান এতই স্বতঃ যে তুলনামূলক সাহিত্যই এখানকার সাহিত্যপাঠের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। তার কোনো ক্ষরণ এখানে নেই।

গল্প পড়ার কিছু অসুবিধে ও বাংলায় একটি গল্প

দেবেশ রায়

সত্যজিৎ রায়-এর শেষ সিনেমা ‘আগন্তুক’ গল্পটি জমে উঠেছিল একটা উদ্বেগকে ঘিরে। যে ছোটমামা আসছেন তিনি কি সত্যি সত্যি ছোটমামা? বেচারী ছোটমামাকে কয়েক লক্ষ টাকা দান কবে জানিয়ে যেতে হল, তিনি সত্যিই ছোটমামা। হিন্দিতেও এমন উদ্বেগ নিয়ে বেশ কিছু সিনেমা তৈরি হয়েছে। দিলীপকুমার অভিনয় করেছিলেন—‘রাম ঔর শ্যাম’-এ। অমিতাভ বচ্চনের একটা ছবি ছিল—‘মর্দ’। মনে হচ্ছে বিখ্যাত ‘পাকিজা’ ছবিটিতেও এমন এক লুপ্তপরিচয় উদ্ধার ছিল—অভিনয় করেছিলেন রেখা ও রাজকুমার।

এই ধরনের গল্পগুলিকে একটু-আধটু ভাগও করা যায়। কিছু গল্পে একটা সম্পর্ক আবিষ্কার ঘটে-যা আগে জানা ছিল না। কিছু গল্পে একটা হারিয়ে যাওয়া লোক ফিরে আসে—তাকে কেউ চিনতে বুঝতে পারেনা, সে-ও কাউকে চিনতে-বুঝতে পারে না। কিছু গল্পে একটা ভুল লোক ভাবা হয়—সে ভুল নিয়ে নানা গোলমাল বাধে। এমন আরো ভাগ করা যায়। এসব গল্পে পরিচয় ও সম্পর্ক নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয় বটে তবে তার মীমাংসাও ঘটে যায় কখনো সেন্টিমেন্টাল, কখনো কমিক কোনো ঘটনায়।

গল্পের এমন কাঠামোতে কখনো কখনো চিড় ধরে, কখনো কখনো ফাটল ধরে—কাঠামোর ভিতরে আঁটানো কোনো সম্পর্ক-অসম্পর্কের চাপে ও তাপে। চাপের ফলে কাঠামো কুঁচকে যেমন যেতে পারে, তেমনি ছিটকে যেতেও পারে। তাপের ফলে কাঠামো এমন-কী পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে। গেলে, থাকবে শুধু ভিতরটা, কাঠামো দিয়ে যা বাঁধা ছিল। তাপের ফলে বিস্ফোরণও ঘটতে পারে। ঘটলে, কাঠামোও ছাই হয়ে যাবে, ভিতরটাও ছাই হয়ে যাবে।

এটা আমি খেয়াল রেখেছি যে কাঠামোটাকে গল্পের কাঠামো বললেও, কাঠামো যাকে কাঠামো দিচ্ছে তাকে আমি কোনো নাম দিতে পারি নি। একবার বলেছি—ভিতর। আর একবার বলেছি—সম্পর্ক-অসম্পর্ক। কোনোটাই পরিভাষা হয়ে ওঠেনি। কী বলতে চাইছি সেটাও খুব পরিষ্কার হচ্ছে না।

পরিষ্কার হত কি, যদি আমি কিছু পরিচিত পরিভাষায় বলতাম। এমন পরিভাষা যা বুঝতে পাঠককে একটুও ভাবতে হয় না। অনেকদিন বলতে-বলতে শুনতে-শুনতে আমরা পরিভাষায় নিশানাটুকু পেয়ে যাই, যদিও পরিভাষার কাজ নিশানা তৈরি করা নয়, সংজ্ঞা বা নাম তৈরি করা।

যদি আমি লুপ্তপরিচয় উদ্ধারের এই গল্পগুলির ভিতরের চাপ ও তাপে নানা দুর্ঘটনার কথা এই ‘ভাষাতে বলি তাহলে কি আমার কথাটা ঠিক বলা হত ও কথাটা বোঝাও যেত ঠিকঠাক? এই থিমের কিছু কিছু গল্পের প্লট, ক্যারেক্টারগুলিকে এমন সিচুয়েশনে টেনে নিয়ে যায় যে গল্পের ফ্রেম ভেঙে যায়। ইংরেজি এই পরিভাষাগুলির বদলে কথাবস্তু, কাহিনীবস্তু, চরিত্র, পরিস্থিতি ও কাঠামো—এই চেনাজানা বাংলা শব্দগুলি যদি ব্যবহার করি, তাহলেও কি আমার এই কথাটা বলা হবে যে যাকে আমি গল্প বলতে চাইছি, তার বিষয় ও কাহিনীকে আলাদা করা যায় না, তার চরিত্র ও পরিস্থিতিকেও আলাদা করা যায় না? এমন কী তার কাঠামো বা ফ্রেম ও তার আধেককেও আলাদা করা যায় না। গল্প পড়তে গিয়ে এইসব টুকরো টুকরো

সব ভাগে গল্পকে ভাগ করার ফলে ইতিহাসের কোনো এক সময়ে হয়তো গল্প পড়া সহজ হত। এখন আর তা হয় না বরং এই অভ্যাস গল্পের অখণ্ড অস্তিত্ব হওয়ার পথে দুষ্টুর বাধা তৈরি করে। একটা ঘটনা মনে পড়ছে। ‘দুর্গেশনন্দিনী’ লেখা শেষ করে বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠালপাড়া-ভাটপাড়ার বিখ্যাত কয়েকজন সংস্কৃত পণ্ডিত ও ব্যাকরণবিদকে পাণ্ডুলিপিটি শোনান। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন—ভাষা শুদ্ধ হয়েছে কী না ও ভাষায় কোনো দোষ আছে কী না। পণ্ডিত মহাশয়রা সকলেই রচনাগুণে তখন মুগ্ধ। তাঁরা কেউ কেউ বললেন, গল্পের যাদুতে ভাষা আর মনে থাকে নি। কেউ কেউ বললেন, দু-একটি জায়গায় দোষ ঠেকছে কিন্তু সেসব জায়গা আরো মধুর হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র একটি নতুন ভাষায় প্রথম উপন্যাস লিখছেন। শ্রোতৃগণ বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম উপন্যাস শুনছেন। লেখকের অনিশ্চয়তা আর শ্রোতাদের বিস্ময় উপন্যাসের ফর্মকে প্রামাণিক করে তুলল। অনিশ্চয়তার বশে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস আর ভাষাকে পৃথক করেছিলেন। মুগ্ধ শ্রোতারা জানিয়ে দিলেন—এই দুইয়ের মধ্যে কোনো ফাঁক নেই। গল্প লেখা এতটাই বদলে গেছে এখন যে এই পুরনো পরিভাষায় প্রাচীন গল্প-উপন্যাসও আর পড়ে ওঠা সম্ভব নয়।

তা হলে কি নতুন পরিভাষায় আমার কথাটা বলতে কিছু সুবিধে হতে পারে? গল্পের কাঠামো আর ভিতর বলে গল্পের যে আকার তৈরি করতে গিয়ে আমি বিপাকে পড়েছি তা থেকে বেরিয়ে আসতে কি স্ট্রাকচার বা অবয়ব, পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজম বা উত্তর-অবয়ববাদ, ডিকনস্ট্রাকশন বা বিনির্মাণ, কার্নিভ্যাল বা মেলা, মেটাফিকশন বা অধিআখ্যান, সুরফিকশন বা অতি-আখ্যান, ম্যাজিক-রিয়ালিজম বা যাদু বাস্তবতা, পোস্টমডার্নিজম বা উত্তর-আধুনিকতা, অবজেকটিভ লিটারেচার বা বস্তুসাহিত্য, মাইনর লিটারেচার বা উপসাহিত্য, রিটউইন বা মাধ্যমিক, ম্যানিফেস্টো বা বহুপাঠ্যতা—এই নতুন পরিভাষাগুলি কোনো কাজে আসবে?

হ্যাঁ, অনেকটাই আসবে, নিশ্চয়ই ঐ থিম-প্লট-ক্যারেকটার থেকে অনেক বেশি কাজে আসবে। একটি নতুন পরিভাষা একমাত্র তখনই তৈরি হতে পারে, যখন প্রচলিত-পরিভাষায় নিহিত সক্রিয়তার বোধের এতটা বদল ঘটে যে অঙ্কের যষ্টি বা খঞ্জের ত্রাচ বা এমন কী কন্সট্রাক্ট লেঙ্গুও শরীরের ঘাটতি মেটাতে অব্যবহার্য হয়ে গেছে। তেমন অব্যবহার্য হওয়ার অনেক কারণই থাকতে পারে। লাঠি ফেলে পথের যে সব কম্পন অন্ধ-আমি জানতে পারতাম, সেই কম্পনগুলি বদলে গেছে আমি অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর। লাঠি তো হাতে নিয়েছিলাম অন্ধ হওয়ার আগের দৃশ্যের স্মৃতি থেকে। এখন রাস্তায় যে কারণে কম্পন উঠছে, তা আমার দেখা নেই। নতুন পরিভাষা নিশ্চয়ই কাজে আসবে—যা দেখতে পাচ্ছি না, পাই নি তা দেখতে।

যে নতুন পরিভাষাগুলি একটু বলা হল—সে সবই বাংলা ভাষায় সাহিত্য-আলোচনায় আকছার ব্যবহৃত। ইংরেজি শব্দগুলি দিতে হল কারণ সেই শব্দগুলি ধরে ধরে বাংলা পরিভাষাগুলি তৈরি হয়েছে, যদিও এই সব পরিভাষা ইংরেজিতে ব্যবহারে এসেছে ফরাসি থেকে অনুবাদ যা আমেরিকান-ইংরেজি থেকে ধারে। তার ওপর এই পরিভাষাগুলির অনেকগুলিই দার্শনিক পদ্ধতির নাম, প্রয়োগপদ্ধতির নাম নয়। কেউ যদি এক্সিটেনসিয়ালিজমে বিশ্বাস করেন তাহলেই তাঁর লেখায় সেই বিশ্বাস সঞ্চারিত হতে পারে বা তিনি যে বিশ্লেষণ করবেন সেখানে এই বিশ্বাস কী করে প্রয়োগ করবেন তার পদ্ধতি তিনি নিজেই আবিষ্কার করবেন। আমাদের আলাপ-আলোচনায় দার্শনিক বিশ্বাসের সংযোগ থাকে না অথচ এটা একটা পদ্ধতি হিসেবে বেশ লোভনীয় লাগে ও ব্যবহার করা যায়। সম্পূর্ণ আলাদা সমাজে, সম্পূর্ণ আলাদা চিন্তার ইতিহাসে ও সম্পূর্ণ আলাদা সৃষ্টিশীলতার দরবার থেকে এই পরিভাষাগুলোকে ধরে আছে যে ধারণা বা কনসেপ্ট সেগুলি

তৈরি হয়েছে। সেসবের সম্পর্কবিচ্যুত করে যদি আমাদের গল্প-উপন্যাস পড়ায় ব্যবহার করা হয়—তা হলে একটা কিস্তুত কাণ্ড ঘটবে। পদ্ধতির খাপে-খাপে আঁটাবার জন্যই আমাদের গল্প-উপন্যাসগুলিকে কাটছাঁট করতে হবে। তা ছাড়া এ পদ্ধতিগুলি তো নতুন কোনো ইলেকট্রনিক যন্ত্র চালানো নয়। নতুন কোনো পদ্ধতিতে গলস্টোন বের করা বা ছানি কাটা নয়। প্রায়োগিক বা তত্ত্ববিজ্ঞানে পদ্ধতির যে সর্বজনীনতা থাকতেই হবে, শিল্পসাহিত্যে কোনো প্রয়োগের তেমন কোন সর্বজনীনতা নেই। তেমন সর্বজনীনতা আছে—এটাই রটানো হয় যদিও। নইলে সমাজবিজ্ঞান বা সাহিত্য-সমালোচনার অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞরা মাইনে পাবেন না। ফলে, আমরা রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথামুতের মত মুখের কথা দিয়ে তৈরি আখ্যানকেও ইংরেজি অনুবাদ করে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে চাই এই কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় যে ও-বইটি এমন কী শিষ্ট বাংলাতেও ফিরে লেখা সম্ভব নয়।

অধ্যাপক-বিশেষজ্ঞদের মাইনে পাওয়ার কথায় কোনো ঈর্ষা নেই। আমি যখন কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে মাইনে নিয়েছি, অস্ত্রত ছত্রিশ বছর, তখন আমি আমার মাইনে রক্ষণ করে এসেছি সমাজবিজ্ঞান ও শিল্পসাহিত্যপাঠের তত্ত্বগুলিও বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত তত্ত্বের মত স্থায়ী ও সর্বজনীন এই কথা প্রমাণ করে—করে। এটা ইয়োরোপ-আমেরিকার আধিপত্য রক্ষা ও বিস্তারের পদ্ধতির অন্তর্গত। গল্প-উপন্যাস লেখা হতে পারে যে কোনো ভাষায়, বাংলাতেও, কিন্তু তা ঠিকঠাক পড়া যাবে একমাত্র ইয়োরোপ-আমেরিকার কালচারাল স্টাডিজ, উত্থাপিত নানা তত্ত্ব দিয়ে। এখন যে-বিদ্যাচর্চাকে বলা হয় কালচারাল স্টাডিজ, এককালে তাকেই বলা হত, ক্রিটিক্যাল স্টাডিজ, আরো এককালে বলা হত টেক্সট স্টাডিজ।

তা হলে ঘটনাটা কীরকম বিদ্যুটে হয়ে উঠছে না? আর, এই বিদ্যুটে ঘটনাই চলে আসছে না প্রায় দেড়শ বছর? একটু সাজানোর চেষ্টা করলে হয়তো ধরা পড়ে যাবে ঘটনাটা কতই বিদ্যুটে। যে-সব তথ্য বা গল্প-উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে ঐ ধারণাগুলি নতুন-নতুন করে তৈরি হয় ও বদলায় সেই তথ্য-ভিত্তিতে কোথাও এক রুতি অনিয়োরোপীয় তথ্য নেই। ধারণা বা কনসেপ্ট থেকে তত্ত্ব বেরচ্ছে। সেই ডাটাবেসে কোথাও এক ফোঁটা অনিয়োরোপীয় ডাটা নেই বা অনিয়োরোপীয় ডাটার ইনপুট নেই। মঙ্গলগ্রহে জ্বল থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু ইয়োরোপীয় তত্ত্ব কোনো অনিয়োরোপীয় তথ্যের ভিত্তি থাকতেই পারে না। এটা এত গভীরের সত্য যে—ইউরোপীয় ভাষাতেও যদি এমন কোনো তথ্য বা ঘটনা ব্যবহার করা হয় যে-তথ্য বা ঘটনা নিয়ে ইয়োরোপীয়, আমেরিকাকে ধরে, জ্ঞান-চর্চায় কোনো মতৈক্য নেই, তেমন লেখা নিয়ে সাহিত্য তত্ত্বের কোনো সূত্র তৈরি হয় না, এমনকী সেগুলি নিয়ে আলোচনা পর্যন্ত হয় না। দুটো মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। ১৯৯৩-এ সাহিত্যে নোবেল পেয়েছিলেন টোনি মরিসন। তিনিই এই প্রথম আফ্রিকা থেকে নতুন রাষ্ট্র আমেরিকায় ক্রীতদাস আমদানির গল্প লিখলেন। আফ্রিকার গ্রাম থেকে তুলে জাহাজের খোলে ভরে আমেরিকার পাড়ে ফেলা হল, এই মধ্যস্তরকে বলা হত মিডল প্যাসেজ। এই মিডল প্যাসেজের কথা আমেরিকার কোনো ইতিহাসে বা সমাজ-বিজ্ঞানের বইয়ে লেখা হয় না। মরিসন ব্ল্যাক জনগোষ্ঠীকে দুভাগ করেছেন। একভাগে আমেরিকারই আদিবাসী ব্ল্যাক। আর এক ভাগে আফ্রিকা থেকে আমদানি করা ব্ল্যাক—তাদের এখন বলা হয় অ্যাট্রেশ-আমেরিকান। মরিসন তাঁর উপন্যাসে হঠাৎ চমকে দিয়ে বলেছেন—আমাদের সবকিছুই আলাদা, আমরা আমেরিকান তো বটেই কিন্তু ইয়োরোপ থেকে আসি নি, আমাদের আনা হয়েছে অন্য মহাদেশ, আফ্রিকা থেকে, আমরা আমেরিকার আদিবাসী ব্ল্যাক নই, আমরা বাপ-মা-দেশ থেকে উপড়ে আনা দাসমজুর, ঐ সামুদ্রিক মধ্যপথে জাহাজের খোলে আমাদের স্মৃতি, আমাদের বাৎসল্য,

আমাদের সেক্স, আমাদের মেয়েপুরুষদের নারীত্বপৌরুষ, আমাদের স্বাধীনতাবোধ, আমাদের জ্ঞান ও সত্তা সবকিছু আলাদা হয়ে গেছে, আমরা অ্যাফ্রো-আমেরিকান।

ইয়োরোপীয় সাহিত্যতত্ত্বে যদি টোনি মরিসন-কে ডাটা হিসেবে ব্যবহার করতে হয়, তাহলে তো প্রথমে আমেরিকার রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নিতে হয় যে হ্যাঁ, সত্যিই, পশ্চিম আফ্রিকা থেকে আটলান্টিক পার করে দাসমজুরদের আমেরিকায় আনা হত—ওটাই মিডল প্যাসেজ। আর এমন সরকারি স্বীকৃতি পেলে টোনি মরিসন তত্ত্ব গ্রাহ্য হবেন।

আরো একটি উদাহরণ। ইমরে কারটেজ হাঙ্গারির ইহুদি। তিনি তাঁর কৈশোরে জার্মান নাৎসিদের কাছে গ্রেপ্তার হন ও অসউইৎস কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে তাঁকে যে গ্যাস চেম্বারে ঢুকতে হয় নি তার কারণ নেই কোনো। যেমন অকারণে মানুষ বেঁচে যায়, তেমন অকারণে তিনি বেঁচে ফিরে আসেন বুদাপেস্টে। কারটেজও সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন দু-এক বছর আগে। ইয়োরোপীয় শিল্পতত্ত্বের কোথাও কারটেজ-এর লেখাগুলিকে ধরা হয় নি। এখানে কোনো ইতিহাস চেপে দেওয়ার উদ্দেশ্য নেই। নাৎসিরা তো ইয়োরোপ ও আমেরিকার স্বীকৃত শত্রু। কিন্তু ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব এটা স্বীকার করতে চায় না যে ঐ বীভৎস ফ্যাসিবাদ ইয়োরোপের এনলাইটেনমেন্টের রাষ্ট্রচিন্তা থেকেই গজিয়েছিল। ইয়োরোপ ও আমেরিকার রাষ্ট্র ব্যবস্থাগুলি এখনো এনলাইটেনমেন্টের ধারণা থেকেই আর একরকম করে গড়ে উঠেছে। গণতন্ত্র, সংবিধান, মানবাধিকার এই সব নিয়ে আমেরিকার মাঝেমাঝেই অন্য এক দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রায় তার বন্ধুদেশগুলিরও সন্দেহ হতে পারে কারণ নাৎসিরা হাজার বছরের রাইখের জন্য যে-সংবিধান বানিয়েছিল, তার বার-আনি আমেরিকার সংবিধান থেকে টাকা আর সেখানেও ঐ সব ছিল—গণতন্ত্র, সংবিধান, মানবাধিকার। ইয়োরোপ-আমেরিকা তাই তার নতুন-নতুন শিল্পতত্ত্বে গ্যাস চেম্বারে হত্যাকে তথ্য হিসেবে ব্যবহার করতে চায় না—এগুলি নিয়ে তৈরি হয়েছে—স্মৃতি ও ট্রমার এক আলাদা তত্ত্ব। তাই কারটেজও আলোচিত নন।

যে-সব বিদেশী শিল্পতত্ত্বে সেই দেশেরই কোনো কোনো লেখককে পড়ে ওঠা হয় না সেই সব দিয়ে আমাদের ‘পদ্মানদীর মাঝি’, ‘পথের পাঁচালী’, ‘গোরা-চতুরঙ্গ’-ইত্যাদি নতুন করে পড়ে ওঠা সম্ভব?

এই বিদ্যুটের একটা উশ্টো দিকও আছে।

আমরা বাংলায় উপন্যাস লিখেছি কিন্তু কেন লিখছি, কী লিখছি, উপন্যাস বলতে কী বুঝি, কী পড়ছি—এই সব প্রশ্নের কোনো রীমাংসা করি নি। আমরা কোনো উপন্যাসতত্ত্ব তৈরি করে তুলি নি। কিছু সমালোচনা, কিছু মন্তব্য ও কিছু অন্য সাক্ষ্য থেকে আমরা এখন হয়তো বন্ধিমচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের আখ্যানতত্ত্ব তৈরি করে নেবার চেষ্টা করতে পারি। সে চেষ্টাও যে হচ্ছে, তা নয়। তবে এমন চেষ্টার সুফলতার কোনো শেষ নেই। বন্ধিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মত ঐশ্বর্যদের রচনায় পরোক্ষ সাক্ষ্য সঞ্চিত আছে কিন্তু অন্য লেখকদের রচনায় তো তেমন নেই। আমাদের গল্প-উপন্যাস আমাদের লেখকদের নির্মিত কোনো তত্ত্বভিত্তি পায় নি। এটা নিশ্চয়ই ইয়োরোপ-আশ্রয়িতার উৎকট প্রমাণ।

লেখকরা নাই করুন, সমালোচকরা তো করতে পারতেন। আমাদের সাহিত্য-সমালোচকরা সেই পরিমাণে মাত্র তাত্ত্বিক যে-পরিমাণে তাঁরা ইয়োরোপের তত্ত্বকে আমাদের সাহিত্যবিচারে ব্যবহার করেন ও সেই ব্যবহারের যুক্তিতে সেই তত্ত্বের সঙ্কোচন-প্রসারণও ঘটাতে পারেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, তার বেশি নয়। ফলে চিরকাল আমরা পড়ে এলাম ও বুঝে এলাম যে বন্ধিমচন্দ্র শৈবলিনীর মনোবিকলন ঘটিয়েছেন ও ‘রজনী’র অঙ্কত্বমোচনে ঝাড়ফুক ব্যবহার করেছেন।

শৈবলিনীর সক্রিয় স্মরণ ও তার প্রতিক্রিয়া কেন মনোবিবলন, কেন নিরাকরণ নয়—‘রামায়ণ’-এ যে-নিরাকরণ ঘটছে দশরথের বিলাপে বা ‘মহাভারত’-এ রাজা নলের আত্মকথা? এটা কে কবে ঠিক করে দিয়েছে যে একমাত্র বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাভেই রজনীর দৃষ্টি ফিরে আসতে পারে? এটাই বা কে কবে ঠিক করে দিয়েছে গল্প শেষ পর্যন্তই যুক্তি ও সম্ভাব্যতা মেনে চলবে? ‘রজনী’-র মত গল্পের শেষে বন্ধিমচন্দ্র তাঁর কাড়ফুঁকে বিশ্বাসের প্রমাণ হিসেবে রজনীর অন্ধত্ব সারিয়ে দিলেন না কি? তিনি অমন একটি কঠিন গল্পকে শেষ পর্যন্ত ইচ্ছে করে রূপকথাতোও তো মিলিয়ে দিয়ে থাকতে পারেন এমন একটা সঙ্কেত দিতে যে রজনীর শচীন্দ্রমুখী যাত্রা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাওয়া।

এই ব্যাখ্যাগুলি কিন্তু আমি দিচ্ছি না। কথাটা তুলেছি পাঠক হিসেবে আমাদের বিপদ বোঝাতে। সাহেবদের কাছে তত্ত্ব এনে যা পড়া হয়েছে, তা একেবারে স্থায়ী। আমাদের বেলায়।

এই পরিভাষাগুলির কোনো একটিও অনিয়োরোপীয় কোনো অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি নয়। পরিভাষাগুলির পেছনে যে-ধারণাকে স্পষ্ট করে তোলার তাড়া থাকে তার একটিও অনিয়োরোপীয় কোনো ধারণা নয়। যদি বোর্হেস বা ডেরিস লেসিঙ-এর মত কারো কারো দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার অভিজ্ঞতা থেকে ধারণা তৈরি হয়ে থাকে তাও ধারণা হিসেবে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে ইয়োরোপীয় কোনো ভাষায় আশ্রয়ে, এক্ষেত্রে স্প্যানিশ বা ফরাসি বা ইংরেজি। সংস্কৃত, আরবী ও পাবসিক ভাষার প্রচীন ঐশ্বর্যময় গল্প-আখ্যানের অলঙ্কারচর্চা থেকে ইয়োরোপীয় এই তাত্ত্বিকরা একটি শব্দও পরিভাষা হিসেবে নেননি। তেমন দরকারে তাঁরা গ্রিকে ও লাতিনে গিয়েছেন।

তা হলে কি গল্প-উপন্যাস লেখা ও গল্প-উপন্যাস নিয়ে চিন্তাভাবনা এমনই একটা ঘোঁট পাকিয়ে তোলেনি এখন, যে যার ইচ্ছে সেই গল্প-উপন্যাস লিখতে পারে, সে ভাষাতে, কিন্তু তারা কী লিখছে, কেন লিখছে, সোজা লিখছে না কী উল্টে লিখছে, কী হচ্ছে তাদের লেখায় ও কী হচ্ছে না - সে সব গুঢ় প্রশ্ন বিবেচিত হতে পারে একমাত্র ইয়োরোপীয় চিন্তায়, ভাষায় ও পদ্ধতিতে? তাও আবার, ইয়োরোপীয় তাত্ত্বিকরা অনিয়োরোপীয় কোনো গল্প-উপন্যাস অনুবাদে পড়েও কোনো তত্ত্ব পরীক্ষা করছেন—এমন নজির কুত্রাপি নেই।

গল্প-উপন্যাস লেখার ও পড়ার ও আলোচনার ঘোঁটটা এইরকম একটা ব্যবস্থা বা সংগঠন বা মঞ্চ বা শাস্ত্র হয়ে উঠেছে। একমাত্র ইয়োরোপীয় ভাষায় লেখা উপন্যাসের সাম্য থেকেই তৈরি হবে উপন্যাসতত্ত্ব—সে তুমি কলম্বিয়াতেই থাকো আর কলম্বোতেই থাকো আর লিসবনেই থাকো আর বার্বাডোজেই থাকো। এই তাত্ত্বিকরা ইয়োরোপের বাইরের কোনো গল্প-উপন্যাস পড়বেন না।

শিল্পকর্মে বা মননকর্মে এর চাইতে উগ্র ও নির্লজ্জ ফ্যাসিস্ত ব্যবস্থা আর কী হতে পারে? ক্ষমতার কেন্দ্র এমনই গভীরপ্রোথিত স্তম্ভ হয়ে উঠেছে—দুনিয়ার আমাদের মনে ও দুনিয়াছোড় ইয়োরোপের কর্মে যে আমরা যে-গল্প লিখি, তা আমরা নিজেরাই পড়ে উঠতে পারি না, আর যদি বা পড়ে ফেলি তাহলেও বুঝে ফেলার স্বাধিকার নেই। আমাদের লেখকদের সাহেবদের কাছে খাতাপরীক্ষা করিয়ে নিতে হয়—ভাষা ঠিক আছে তো?

এই দুই নৌকার ফাঁক দিয়ে আমাদের গল্পগুলি গলে যায়, ডুবে যায়, হারিয়ে যায়। আমাদের গল্পগুলি কী করে হারিয়ে যাচ্ছে, তার দুটো-একটা নজির না দিলে কথাটাকে আর গ্রাহ্য রাখা যাবে না। তেমন দুটো-একটা হারানোর হদিশ করার চেষ্টা করছি।

সেই সাবেক কাল থেকেই একটা গল্প বাংলায় থেকে-থেকেই উশকে ওঠে। উশকে ওঠা বলতে যেমন হঠাৎ আলোর ভাব আসে আমি তেমন বলতে চাইছি না। একবার ভেবেছিলাম—ভেসে

ওঠে বললে হয়তো বেশির ভাগ সময় ডুবে থাকার আভাস আসবে। হ্যাঁ, ডুবে থাকার আভাসটা দরকারি। যদি বলি—সেই সাবেক কাল থেকেই একটা গল্প বাংলায় ডুবে আছে—তাহলে কি এটাও বলা হবে যে মাঝেমাঝে ভেসে ওঠে? হ্যাঁ, হয়তো বলা হবে, তবে সবটা বলা হবে মনে হচ্ছে না। আমি বলতে চাইছি ডুবে-থাকাও, ভেসে-ওঠাও, ডুবে-যাওয়াও। কোনা ভাষাই কি, কী-বলব তার এতটা অস্থিরতা বইতে পারে? তাহলে, নিজেকে শোধরানো দরকার আগে, নিজের বলার কথাটা সাজিয়ে তোলা দরকার আগে। কিন্তু আমার বলার কথাটাই যদি এমন গোলমালে হয় যে শিশু বলে জলপ্রাণী জলের ভিতর থেকে একটুখানি নাক উচিয়ে শ্বাস টেনে গোল হয়ে ডুবে যায় যেমন, তেমন করে কোনো একটি গল্পের শ্বাস মাঝেমধ্যে শোনা যায় বা দেখা যায় বাংলায়, তাহলে শুধু একটা ক্রিয়া-পদের অভাবে কথাটাই আমাকে বদলে নিতে হবে? এইখানেই, এইখানেই, পরিভাষা বাঁচাতে পারত। বাঁচতেই কি পারত? না কী পার করে দিতে পারত? তেমন তো উছলে ওঠে, উদ্বেল হয়, বলসে ওঠে—এইসব শব্দ দিয়েই পার হওয়া যায়। তেমন পার হতে তো চাইছি। আমি তো পাড়ে বসে বরং দেখতে চাইছি বা দেখতে পাচ্ছি—একশ বছর ধরে একটা গল্প বাংলায় ঘাই মেরেই যাচ্ছে, অতল থেকে উঠে এসে উঠে এসে জলের ওপরের আলো ছুঁয়ে না-ছুঁয়ে লেজের একটা ঝাপটে ঘাই মেরে আবার অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। সে কি কোনো নিশানা দিয়েছিল? আমরা কি সে নিশানা বুঝতে পেরেছি? নাকী আকস্মিক বাতাসে, দূব কোনো স্রোতের সহসা দ্রাবনে, এই বিস্তারিত জলপ্রান্তরে বেলাবদলের আলোয় বিম্রাস্ত উজ্জ্বলতায়, সেই জলবিস্তারে চোখের নিমেঘে দেখার বাইরে বয়ে-যাওয়া খড়কুটো গাছলতা মৃত-জীবিত মানুষ ও পশুদেহের আবর্তিত বিকারে—আমাদের নজর গুলিয়ে গেছে এমন, যে আমরা ভুলেই আছি এই জলঅতলের কোনো গল্প ঘাই মেরে-মেরে একশ বছর পার করে দিচ্ছে শুধু সঙ্কেতগুলো পৌছে দিতে?

একটা তালিকা দিচ্ছি—সনতারিখ দিয়ে। সনতারিখ দেওয়ার কোনো দরকার ছিল না—সব সনতারিখই সবার জ্ঞান। যে কথাটিতে ঢুকবো এই তালিকা থেকে, তার জ্ঞানও সনতারিখের কালক্রম কোনো তেমন কাজে আসবে না। তবু সনতারিখে আমার কথার ঠাটঠমক হয়তো বাড়বে।

১৮৭২-এ ‘বঙ্গদর্শন’-এ বঙ্কিমচন্দ্র ‘ইন্দিরা’ লেখেন। বই বেরায় এক বছর পর। ১৮৯৩-তে পঞ্চম সংস্করণ বড়-‘ইন্দিরা’। ১৮৭৫-এ ‘বঙ্গদর্শন’-এ বঙ্কিমচন্দ্রের ‘রজনী’। বই বেরায় দু-বছর পর। ১৮৮৩-তে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘জাল প্রতাপচাঁদ’ বই বেরল ‘বঙ্গদর্শন’-এ ধারাবাহিক প্রকাশের পর। তাঁর ‘মাধবীলতা’ উপন্যাসটি বই হল ১৮৮৫-তে ‘বঙ্গদর্শন’-এ ধারাবাহিক হওয়ার পর। ‘বঙ্গদর্শন-নবপর্যায়’-এ ১৯০৫-এ শেষ হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের ‘নৌকাডুবি’ বই হয় ১৯০৬-এ। ‘মানসী’-তে প্রথম বেরিয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘রত্নদীপ’ বই হয় ১৯১৫-তে। ১৯২৯-এ জগদীশচন্দ্র গুপ্তের ‘অসাধু সিদ্ধার্থ’ উপন্যাস। ১৯৫৫-তেই বোধহয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান’। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প ‘গ্রহরা’ বেরিয়েছিল ১৯৫৭-তে।

১৮৭২ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত ৮৫ বছরে এই নটি গল্পে—সবগুলিই নভেল, শেষেরটি ছাড়া—একটিমাত্র গল্পই ঘুরেফিরে আসছে ঘটনা বদলে, নাম বদলে, সময় বদলে, কখনো ঘটনার ফল হয়ে, কখনো ঘটনা তৈরি করে। গল্পটি হল—একজন মানুষ তার স্বপরিচয়ের বদলে একটি জাল পরিচয়ের ভিতর ঢুকে পড়েছে। সে তার স্বপরিচয় ফিরে পেল কী পেল না—সেটা শেষ পর্যন্ত কোনো গল্পেই আর প্রধান কথা থাকল না। সবগুলি গল্পেই বিস্তারিত হয়ে উঠল—কখনো ছলপরিচয়ের বিবরণ, কখনো আত্মপরিচয়ের বিবরণ, কখনো সত্যপরিচয়ের ঘোষিত স্বীকৃতিতে

বাতিল হয়ে যাওয়া স্বপরিচয়ের বিবরণ। যে যা সে তা নয়, যাকে যা মনে করা হচ্ছে সে সেটা মেনে নিচ্ছে ও তেমনই হয়ে উঠছে। স্বপরিচয়ের এই অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা এই সবগুলি গল্পের গুঁড় ও প্রকাশ্য গল্প।

আমাদের সমালোচনার অভ্যস্ত পরিভাষায় বলা যেতে পারত - এই স্বপরিচয়-দিধার থিম থেকেই এতগুলি আখ্যানের গল্প তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন চরিত্র ও বিভিন্ন ঘটনায়। পরিভাষা-বর্জন করব বলেই যে এত সহজে যা বলা যেত তা সহজ করে বলছি না - তা নয়। এই পরিভাষাগুলি যে অর্থে পাকাপাকি গেঁথে গেছে তাতে এই এমন সহজসূত্রের ভিত্তিতে ধারণার একটি ছবি তৈরি হয়। স্বপরিচয়ে গোলমাল - এটাকে থিম ধরলে স্বামী হারিয়ে ফেলা, বৌ হারিয়ে ফেলা, জাল রাজপুত্র সাজা, জাল লোকসাজা, অন্য-পরিচয়ে পরীক্ষা দেয়া এই সব নানারকম মজার গল্পের নাটকে প্রটে 'শান্তিবিলাস'-এর খেলায় নানা রকমের লোকজন জড়িয়ে যায়, নানা সম্পর্ক অনৌচিত্যের বাঁধাধরা সীমায় এসে বেশ কৌতূহল তৈরি করে—ফুলশয্যার দরজায় কলাপাতার মতো অনুমোদিত গৃহস্থ কৌতূহল—শেষ পর্যন্ত কি বৌরানী ফাঁদে পা দেবেন (রত্নদীপ)?

স্বপরিচয়ের অস্থিরতা অনিশ্চয়তার গল্পগুলি লেখকরাও হয়তো কেউ কেউ ভেবে থাকবেন যে তাঁরা এমন একটি শান্তিবিলাসের গল্পই লিখছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমার তেমন ভেবে থাকতে পারেন। মানিক ও দীপেন্দ্রনাথ তেমন ভাবেন নি। প্রথম তিনজন তাঁদের গল্পগুলিতে—'রজনী' 'ইন্দিরা' 'নৌকাডুবি', 'রত্নদীপ'-এ গল্প বলেছেন একটা তির্যক ভাষায়। ঘটনার যে-বিবরণ লেখা হচ্ছে, সেই তির্যকগদ্যের ফলে সেই বিবরণে একটা আয়রনি গোপনে ছড়িয়ে পড়ছে। দুটো-একটা জায়গা তুলে দিলে হয়তো বুঝতে পারব গদ্যের তির্যকতা ও আয়রনির গোপনতা কীরকম পড়া হচ্ছে।

হীরালাল মদ খায় —তাহাও অল্পমাত্রায় নহে। শুনিয়াছি গাঁজাও টানে।... রামসদয়বাবু কোথায় কেরানিগিরি করিয়া দিয়াছিলেন। মাতলামির দোষে সে চাকরটি গেল। হরনাথ বসু, তাহার দমে ভুলিয়া লাভের আশায় তাহাকে দোকান করিয়া দিলেন। দোকানে লাভ দূরে থাক, দেনা পড়িল—দোকান উঠিয়া গেল। তারপর কোন গ্রামে বার টাকা বেতনে হীরালাল মাস্টার হইয়া গেল। সে গ্রামে মদ পাওয়া যায় না বলিয়া হীরালাল পলাইয়া আসিল। তারপর সে একখানা খবরের কাগজ করিল। দিনকতক তাহাতে খুব লাভ হইল, বড় পসার জাঁকিল—কিন্তু অশ্লীলতাদোষে পুলিশে টানাটানি আরম্ভ করিল—ভয়ে হীরালাল কাগজ ফেলিয়া রূপোষ হইল' (রজনী)।

'আর এক প্রকারের লোকের উপকারের চং উঠিয়াছে... বিধবার বিবাহ দাও, কুলীন ব্রাহ্মণের বিবাহ বন্ধ কর, অল্প বয়সে বিবাহ বন্ধ কর, জাতি উঠাইয়া দেও, স্ত্রীলোকগণ এক্ষণে গোরুর মত গোহালে বাঁধা থাকে—দড়ি খুলিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, চরিয়া খাক। আমার গোরু নাই, পরের গোহালের সঙ্গেও আমার বিশেষ সম্বন্ধ নাই' (রজনী)।

'ধনীর ধন কবির কাব্যের সমান কি? যাহারা ধনোপার্জন করিয়া বুড়া হইয়াছে, কাব্য হারাইয়াছে, তাহারাও ও কথা বলে না। কাব্যই সুখ। কেন না কাব্য আশা, ধন ভোগমাত্র। তাও সকলের কপালে নয়। অনেক ধনী লোক কেবল ধনাগারের প্রহরী মাত্র। আমার একজন আত্মীয় বলেন, 'ত্রেজুরি গার্ড', (ইন্দিরা)।

'রমেশ ডেকের কেরারায় বসিয়া ভাবিতে লাগিল, 'এমন করিয়া আর চলিবে না। ক্রমেই বিদ্রোহী কমলাকে লইয়া জীবনের সমস্যা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠিবে। এমন করিয়া কাছে থাকিয়া দূরত্ব রক্ষা করা দুরূহ। এবারে হাল ছাড়িয়া দিব। কমলাই আমার স্ত্রী—আমি তো ইহাকে স্ত্রী বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম।....

হেমেনলিনী ও রমেশের মাঝখানে একটা যুদ্ধক্ষেত্র পড়িয়া আছে। ...সেই যুদ্ধের কথা মনে হইলে তাহার ভয় হয়; জিতিবার কোনো আশা থাকে না। ...

অতএব দুর্বলের মতো আর দ্বিধা না করিয়া কমলাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিলেই সকল দিকে শ্রেয় হইবে...' (নৌকাডুবি)।

এই জায়গাগুলি খুব খুঁজে পেতে বের করতে হয়নি—বরং আমার স্মৃতিতে গদ্যের তির্যগতার ও আয়রনির আরো সব সরেস জায়গা আছে। সে সব খুঁজতে যাই নি। আমি কেবল এইটুকু অনুমান করতে চেয়েছি যে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমার গল্পটির ভ্রান্তিবিলাসের কৌতুককেই প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু প্রথমোক্ত দুইজনের গল্প কল্পনা করার শক্তি ও গল্প লেখার ক্ষমতা এমনই স্বাবলম্বী ছিল যে সে কৌতুককে তাঁরা তুচ্ছ হতে দিতে পারেন না। ভ্রান্তিবিলাসের কৌতুকে লোকজনের জড়িয়ে যাওয়া বুড়ো শালিকের ঘাড়ে বোঁয়া ওঠার মত কোনো ব্যক্তিগত বিকারের ফলে ঘটে নি। আবার নতুন শিক্ষা ও চিন্তার আধুনিকতার অতিরেকের ফলে সভ্যতা কাকে বলে তা ভেবে নিয়ে নতুন রকম ব্যবহারের নেকলিয়ানাতেও ঘটে নি। সেই কারণেই রজনী, শচীন্দ্র, হীরালাল, লবঙ্গলতা, 'ইন্দিরা'র উপসংহারের বরকে নিয়ে মেয়ে-মজলিশ, 'নৌকাডুবি'তে রমেশ, অক্ষয়, যোগেন্দ্র, অন্নদা, চক্রবর্তীখুড়ো, নলিনাক্ষ—এরা গল্পগুলিকে এতটাই বিশ্বাসযোগ্য ও সম্ভবপর করে তুলতে পেরেছে। বাস্তবতা নিয়ে আমাদের উচ্চতম শিক্ষিতদের মধ্যেও নানা অস্বস্তি ধারণা আছে। সে-ধারণায় বাস্তবতা যে কত রকমের হতে পারে তেমন বৈচিত্র্য সম্পর্কে কোনো আক্কেলজ্ঞান নেই। রমেশ ও কমলার এক মিথ্যা দাম্পত্যের সাক্ষ্য নিভৃতিতে এই নিয়েই যেন কথা হচ্ছিল।

'কমলা রমেশকে শিক্ষার সহিত আমোদ দিবার জন্য কহিল, 'আমার ভূগোল-প্রবেশে পৃথিবীর যে ছবি আছে, দেখিবে?'

রমেশ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া দেখিতে চাহিল। কমলা তাড়াতাড়ি তাহার বই আনিয়া রমেশের সম্মুখে খুলিয়া ধরিল। কহিল,—'এই যে দুটো গোল দেখিতেছ, ইহা আসলে একটা। গোল জিনিসের দুটো পিঠ কি কখনো একসঙ্গে দেখা যায়?'

রমেশ কিঞ্চিৎ ভাবিবার ভান করিয়া কহিল, 'চ্যাপ্টা জিনিসেরও দেখা যায় না।' আমাদের আধুনিক চিন্তাভাবনায় গোল ও চ্যাপ্টার এই বিবাদ এখনো ঘোচে নি। আরো একটা বিবাদও ঘোচে নি—কমলার আন্তরিকতা আর রমেশের ভান। রমেশ যে ইচ্ছে করে ভান করছে—একেবারেই তা নয়। ভান ছাড়া তার আপাত স্ত্রী-র সঙ্গে বিনিময়ের কোনো ভাষা তার জানাই নেই। যেমন—মদ্র পড়ে বিয়ে না করলে কি স্বামী-স্ত্রী হওয়া ও থাকা সম্ভব—এমনই একটি প্রাচীন, বাতিল অনাধুনিক ও মনুষ্যহিতার বিধান নিয়ে 'নৌকাডুবি' উপন্যাসটি লেখা এই ঐক্যমত্য উপন্যাসটি লেখার একশ বছর জুড়েই সিদ্ধান্ত হয়ে আছে। আমার একেবারেই জানা নেই, এই উপন্যাসটি নিয়ে কখনো কোথাও কোনা নিবন্ধ আলোচনা হয়েছে কী না। আরো জানা নেই—ঠিক এর আগের লেখা 'চোখের বালি'-র মহেন্দ্র একই রকম আধুনিকতা, ইচ্ছার অস্থায়িতা, বালস্বভাবের জিদ, নিজেদের নিয়ে ব্যস্ততা, নিজের কথা নিজের জ্ঞান অক্ষমতা, মন ও চিন্তার যে-কোনো অনুভবকেই সময়োচিত ভঙ্গির ভানের প্রকাশ করা এই সব নিয়ে 'নৌকাডুবি'তে রমেশ হয়ে উঠেছে কীনা, ও মহেন্দ্রের চাইতে রমেশ মাত্র তিন বছরেই একটু রায়ত্ববানও হয়েছে কীনা ও এই রমেশ আরো একটু দায়িত্ববান ও সজ্ঞান হয়ে এর পরের উপন্যাস 'গোরা'তে বিনয় হয়ে উঠেছে কীনা—এ সব কোনো খোঁজখবর কেউ করেছে কীনা।

'রজনী' কেন অন্ধ? এর উত্তরে আমরা ১৩০ বছর ধরে জেনে আসছি লর্ড লিটন নামের

এক সাহেবের একটি গল্পে এক কানা ফুলওয়ালি ছিল। রজনীতে সব মানুষজন নিজের নিজের কথা বলছে কেন? এর উত্তরেও ঐ ১৩০ বছর ধরেই শুনে এসেছি উইল্কি কলিল নামের আর-এক সাহেব আর-একটি গল্পে যার কথা তাকে দিয়ে বলিয়েছিলেন। ১৩০ বছরে এই খবরদুটি তো আমরা ভুলতে অসম্ভব পারতাম। বা অসম্ভব বলতে পারতাম—অন্ধতা কি দর্শনের ক্ষমতার অধীন না জ্ঞানের ক্ষমতার অধীন—এই দ্বিধা থেকে ‘রামায়ণ’ রচিত হয়েছে, অন্ধমুনি ও দশরথের উপাখ্যান। বা বলতে পারতাম—জাতক থেকে বেতাল পঞ্চবিংশতি পর্যন্ত তো শুধুই আত্মকথা—গাছ, নদী, পাহাড়-পর্বত, রাক্ষস, ভূত সকলেই তো আত্মজীবনীই বলে যাচ্ছে। ‘রজনী’ কেন অন্ধ এর উত্তর কি ‘নৌকাডুবি’তে কমলার বন্ধু শৈলই দিয়ে দিল।

‘তোর মতো বোকা মেয়ে তো আমি দেখি নাই। তোর চেয়ে কম বয়সে আমার বিবাহ হইয়াছিল—তুই কি মনে করিস লজ্জায় আমি আমার বরকে কোনো সুযোগে দেখিয়া লই নাই!’

কমলা কহিল, ‘লজ্জা নয় দিদি। আমার বিবাহের বয়স প্রায় পার হইয়া গিয়াছিল। এমন সময়ে হঠাৎ যখন আমার বিবাহের কথা স্থির হইয়া গেল, তখন আমার সমস্ত সঙ্গিনীরা আমাকে বড়োই খ্যাঁপাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। অধিক বয়সে বরকে পাইয়া আমি যে সাতরাজার ধন মানিক পাই নাই, তাহাই দেখাইবার জন্য আমি তাঁহার দিকে দৃকপাত মাত্র করি নাই। ...মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া যাঁহার হাতে পড়িলাম, যাঁহাকে স্বামী বলিয়া জানিলাম, তিনি আমার স্বামী নহেন’ (নৌকাডুবি)।

তা হলে গোলাকার জিনিশের যেমন অদৃশ্য অপারধ থাকে, চ্যাপ্টা বস্তুর থাকে একটা না দেখতে পাওয়া উন্টো পিঠ। যাকে যা ভাবা হচ্ছে, সে তা নয়। এখানে, যে ভাবছে আর যে হচ্ছে, তারা এক লোক নয়। আবার, যে নিজেকে যা ভাবছে, সে তা নয়। এখানে হয়তো ভাবা আর না হওয়া একই লোকের কর্তৃত্ব ঘটাচ্ছে। কিন্তু ভাবটাই বা কী হচ্ছে, হওয়াটাই বা কী হচ্ছে। রজনী ভেবেছিল শতীন্দ্রকে সে ভালোবাসে। অথচ শতীন্দ্র বস্তুটিকে সে জানেই না—ঐ কণ্ঠস্বর, গন্ধ আর একদিনের কয়েক ধাপ সিঁড়ি। রজনী একটি ধারণাকে ভালবেসেছিল। সে ধারণাটিকে আমরা একুশ শতকে ‘প্রেম’ বলছি কী না, জ্ঞানি না, কিন্তু অনেক বেশি শতক জুড়ে তাই বলা হত। রজনী সেই ধারণায় পৌঁছে গেছে, অথচ ধারণাটিকেও চেনে না, বস্তুটিকেও চেনে না। জ্ঞানের, তত্ত্বের, ধারণায় নিশানা ঠিকমত বোঝা হয়ে উঠছে না। আবার প্রমাণের, শরীরের, অভিজ্ঞতার নিশানাকেও শাস্ত্রবিধি ও সমাজরীতি অনুযায়ী মানা যাচ্ছে না। ধারণা আর প্রমাণের মধ্যে এই বিচ্ছেদ যখন একটা পুরনো রক্ষণশীল সমাজে ঘটে যায়—তখন, বিয়ের সময় স্বামীর মুখটা দেখে নেয়া বা ‘দৃকপাতমাত্র’ না করার বিপরীত দুটি ভঙ্গিই একজনের কাছে সমতুল্য হয়ে উঠতে পারে। ধারণা আর প্রমাণের মধ্যে এই বিচ্ছেদ যখন বুজ্ঞে যায়, যেমন ‘ইন্দিরা’তে, তখন স্বামীর যাচিত অথচ সমাজবিধির অননুমোদিত গোপন মিলনেও যাওয়া যায়। ইন্দিরা না-হয় তার স্বামীকে চিনতে পেরেছিল, তার স্বামী তো আর তাকে চিনতে পারে নি। আবার এই গোঁড়া, মনুশাসিত সমাজে কোনো জীবনযাপন থেকে কোনো সংস্কা তৈরি হয় না। রমেশ আর কমলার কলকাতা থেকে চলে আসা ও পশ্চিমে যাওয়ার পথে স্টিমারে-চরে যে রাস্পাত্যময় গার্হস্থ্য তাদের সম্পর্ককে অনিবার্য করে তুলল—কমলার ধারণাতে তা ধসে গেল কোনো চিহ্ন পর্যন্ত না রেখে। এটা লেখকের ঔপন্যাসিক কৌশলের অভাববশত ঘটে নি। ঘটেছে কমলার ভিতরে ধারণা ও প্রমাণের এমন বিচ্ছেদ থেকে যা অস্বীকার করা কমলার পক্ষে অসম্ভব।

আমার বলবার কথা শেষ হয়নি কিন্তু সময় শেষ হয়ে এসেছে। যা বলা হল না তার শুধু হেডিংগুলি বলে রাখি। এমনও তো হতে পারে, যাঁরা শুনলেন তাঁরাই কেউ এই কথাগুলি শোনাবেন।

১. উপন্যাস নিয়ে কোন ধারণার বশে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মনে হয়েছিল ‘জ্বাল প্রতাপচাঁদ’ লেখাটি উপন্যাস নয় ও তাঁকে ঐ গল্প নিয়ে উপন্যাস লিখতে হল ‘মাধবীলতা’?
২. ধারণা ও প্রমাণের ভিতর বিপুল বিচ্ছেদ থেকে যদি স্বপরিচয়ের এই অনিশ্চয়তার গল্প এসে থাকে, তাহলে, ‘রত্নদীপ’ -এর নায়ক থেকেই কি বদলে গেল? স্বপরিচয়ের অনিশ্চয়তা তার নিজের নেই, তার পরিচয় সম্পর্কে অনিশ্চয়তা আছে অপরের। না কী এই প্রকৃতির প্রথম লোক ‘রজনী’র ‘বঙ্গদর্শন’ পাঠের অমরনাথ?
৩. ‘অসাধু সিদ্ধার্থ’ আর ‘প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান’—এ কি স্বপরিচয়ের এই অনিশ্চয়তা আত্মসচেতন হয়ে উঠল? সেই আত্মসচেতনতা কি ‘প্রহরা’ গল্পের সময়ে আবার সমাজে ফিরে যাচ্ছে?

বিভাগীয় পাঠচক্রে প্রদত্ত ভাষণ

‘নখশিখ’ প্রসঙ্গ: মধ্যযুগের কাব্যে

রাবেয়া মঈন

রহস্যসম্ভবা রমণী বিশ্বের সকল কালের কবির কাছেই স্বপ্নসঙ্গিনী। কবি-কামনায় বন্দিতা তরঙ্গিনী এই তিলোত্তমার শিরের সিঁথিপ্রান্ত থেকে চরণের নখপংক্তি পর্যন্ত সবই কবির কাছে বিস্ময়কর। বিস্ময়কর তার দৃষ্টিপাত, তার হাস্যস্বকীত ওষ্ঠের দীপ্তি, বাহুর বিলাস, চলার ভঙ্গিমা। ‘তন্নী শ্যামা শিখরিদশনা’^১ বলে নারীশরীরের বন্দনা করতে করতে বিস্মিত কালিদাস বলেন, ‘যা তত্র স্যাৎ যুবতি বিষয়ে সৃষ্টিবাদ্যেব ধাতুঃ’^২—বিধাতা পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে যে প্রথমাকে তৈরি করেছেন, এ সেই। রমণীরূপের বিরতিহীন আরতি করতে করতে বিস্মিত রবীন্দ্রনাথ বলেন, ‘অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা’^৩। বিস্মিত চণ্ডীদাসের চোখে রমণী স্থির বিদ্যুৎ—‘খীর বিজুরী বরণ গোবী’^৪, বিস্মিত জায়সীর চোখে রমণী নিম্নলিখিত চন্দ্র- ‘নিহকলংক সসি বিহি নিরময়’^৫। কবিকুলের এই অনিঃশেষ বিস্ময় থেকেই জন্ম হয়েছে রমণীর রূপবর্ণন পদ্ধতি বা ‘নখশিখ’ প্রথার। পৃথিবীর সাহিত্যে সকল ভাষাতেই নারীর রূপবর্ণনার একটি মধ্যযুগীয় পদ্ধতি ছিল। আমরা ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। উক্ত সাহিত্যে চসারের ‘টুইলাস এ্যান্ড ফ্রেসিডা’ গ্রন্থে ফ্রেসিডার রূপ-বর্ণনা অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে কেশাগ্র থেকে আরম্ভ করে নখাগ্র পর্যন্ত যে রূপ-বর্ণনা আছে, তার সঙ্গে আমাদের দেশের মধ্যযুগের নারীরূপ- বর্ণনাপদ্ধতির একটি চমৎকার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তেমনি স্পেনসার তাঁর ‘দি ফেয়ারী কুইন’ কাব্যে যুবতী নারীর আপাদমস্তক রূপ বর্ণনা করেছেন।

আমরা যে নারীরূপবর্ণন পদ্ধতি বা ‘নখশিখ’ পদ্ধতির কথা বলছি তা হচ্ছে সংস্কৃত-অপভ্রংশ-হিন্দী-আরবী ও বাংলাভাষায় বিবৃত ‘নখশিখ’ পদ্ধতি। ‘নখশিখ’ হচ্ছে একটি কাব্যগত প্রথা। এই প্রথাটি ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে সংস্কৃত কবিরাই প্রথম প্রবর্তন করেন, মূলত কালিদাসই এর প্রবর্তক। কালিদাসের মূল উদ্দেশ্য ছিল নায়িকা-বর্ণনার সাহায্যে নায়কের জীবনের গতি স্থির করা এবং কাহিনীর মধ্যে একটি গতিবেগ সঞ্চারিত করা। ‘নখশিখ’—নখ থেকে শিখর অর্থাৎ পদনখ থেকে শিবোদেশের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাই হচ্ছে এর উপজীব্য। এই বর্ণনা চরণের নখপ্রান্ত থেকে ক্রমশঃ উর্ধ্বাভিমুখী হয়ে শিরোদেশের যে স্থান থেকে বিভক্ত হয়ে কেশরাশি দুপাশে নেমেছে সেই সীমন্ত-সীমা পর্যন্ত যেতে পারে কিংবা সিঁথিমূল থেকে ক্রমান্বয়ে নিম্নাভিমুখী হয়ে পদতলের নখরেখা পর্যন্ত নামতে পারে। আখ্যায়িকা কাব্যের মধ্যে যেখানে নায়ক-নায়িকার জীবনের প্রারম্ভ থেকে সমাপ্তি—সেখানে নখশিখের গুরুত্ব অনেক। নায়িকার নখশিখের বর্ণনা নায়কের সমগ্র জীবনকে আবিষ্ট করে ফেলে এবং আবিষ্ট নায়ক কাহিনীর বিকাশ ও ক্রমপরিণতি তৈরি করতে থাকে। নখশিখের বর্ণনা কবি কখনও নিজে করেন, কখনও দূতকে আবার কখনও নায়ককে কিংবা নায়িকাকে এই বর্ণনার ভার দেন। ‘কুমারসম্ভবম্’ কাব্যে কবি কালিদাস স্বয়ং ‘নখশিখ’ বর্ণনার দায়িত্ব নিয়েছেন। ‘পদ্মাবতী’ কাব্যে শুকদূত এবং ‘সন্দেশ-রাসক’ কাব্যে পথিকদূত এই দায়িত্ব পালন করেছে। ‘মৃগাবতী’ কাব্যে নায়ককে দেখা গেছে ‘নখশিখ’ বর্ণনা করতে।

বলেছি দেহরূপের বর্ণনা পদনখ থেকে ক্রমশঃ উর্ধ্বগ হয়ে কেশমূলের সিঁথিমূল পর্যন্ত যেতে পারে অথবা সিঁথিচিহ্ন থেকে ক্রমশঃ নিম্নগামী হয়ে চরণের নখগুচ্ছে যেতে পারে। আবার বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যাক। যারা প্রতিমা পূজা করে—প্রতিমা তাদের কাছে দেবত্বের প্রতীক। সুতরাং প্রতিমাকে সুন্দর, পরিচ্ছন্ন করে সম্মানপূর্বক ভজনা করা তাদের কর্তব্য বলে তারা মনে করে।

প্রতিমার পায়ে তারা প্রণাম ও অর্ঘ্য নিবেদন করে এবং প্রতিমার পায়ে পানির ধারা ঢেলে সে পানি পবিত্র স্থানে পান করে। এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, প্রতিমার পদযুগলই সাধকের কাছে প্রথম আরাধ্য অঙ্গ। আরাধনা এবং সেবার সকল মুহূর্তেই ভক্ত উপাসক পদদ্বয়কে স্পর্শ করেই অর্চনা করে থাকেন। সাধনার এই রীতির ফলে প্রাচীন কবিরা যখন দেবীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়েছেন তখন রূপবর্ণনা শুরু করেছেন পদযুগল থেকে। এটি একটি ভারতীয় সংস্কার। সংস্কৃত কাব্যেই প্রথম এভাবে রূপবর্ণনার প্রথা প্রচলিত হয়। আমরা কালিদাসের কাব্য যদি বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা করি তাহলে দেখতে পাবো যে কালিদাস দেবী এবং মানবী উভয়েরই রূপবর্ণনা করেছেন বিপরীত প্রক্রিয়ায়। দেবীর বর্ণনা হয়েছে পা থেকে আরম্ভ করে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হয়ে মস্তকের কেশরাশি পর্যন্ত; অন্যদিকে মানবীর বর্ণনা হয়েছে কেশরাশি থেকে ক্রমান্বয়ে নিম্নাভিমুখে অগ্রসর হয়ে পদনখ পর্যন্ত। বলতে হবে দুধরণের নখশিখ পদ্ধতির প্রচলন করে গেছেন কবি কালিদাস; একটি পদ্ধতি হচ্ছে দেবীবন্দনার অপরটি নায়িকা বন্দনার। দেবী যেহেতু ভক্তিপ্রদায়ক পাত্রী, সেহেতু ভক্ত তাঁর চোখের দিকে সরাসরি দৃষ্টিপাত করতে পারে না, সে আনত হয়ে তাঁর পদযুগল দর্শন করে মাত্র। দেবীর আশ্বাস পেয়েছে ভাবলে ক্রমশঃ দৃষ্টি উপরের দিকে তুলতে থাকে এবং অবশেষে শিরোদেশে গিয়ে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। এর ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়াটি হচ্ছে নায়িকার ক্ষেত্রে। নায়ক নায়িকার দৃষ্টির সঙ্গে নিজের দৃষ্টি মেলাতে চান, দৃষ্টি না মিললে তো প্রেম হবে না এবং আকর্ষণ সৃষ্টি হবেনা, তাই এক্ষেত্রে বর্ণনাটি শিরোদেশ থেকে পদনখ পর্যন্ত। তাছাড়া কালিদাস সর্বত্র সমগ্র শরীরের বর্ণনা করেন নি, প্রয়োজনবোধে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্নভাবে একই কাব্যে বিভিন্ন স্থানে শরীরী বর্ণনা এনেছেন। এর ফলে কখনও বর্ণনা হয়েছে শুধু কেশরাশির অথবা নয়নের অথবা গ্রীবার অথবা স্তনের। আবার হিম্মোলিত পদচারণার বর্ণনা এসেছে বিভিন্নভাবে। অর্থাৎ বলা যায়, কালিদাস সামগ্রিকভাবে রূপবর্ণনার একটা রীতি প্রবর্তন করেছিলেন। কালিদাস ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি, সে কারণে তাঁর রূপবর্ণনা ছিল বর্ণাঢ্য, অনুপম এবং চাতুর্যপূর্ণ। ‘নখশিখের’ বর্ণনায় পারদর্শী ছিলেন কবি কালিদাস। দেবীর রূপ বর্ণনায় কি ভঙ্গি অবলম্বন করতে হবে তা তিনি পরবর্তী কবিকুলের জন্য চিরকালের মত স্থির করে দিয়েছিলেন। যেহেতু দেবী অথবা দেবতাকে ভক্তেরা সন্ত্রম করে তাঁদের সম্মুখে বিনয়ে সঙ্কুচিত হয় এবং এমনভাবে তাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করে যেন তাঁদের মর্যাদা কখনও ক্ষুণ্ণ না হয় - তাই প্রথম দৃষ্টিপাত হয় দেবতার পাদপদ্মে, ক্রমান্বয়ে উর্ধ্বগামী হতে হতে ভক্তের দৃষ্টি অবশেষে পৌঁছায় দেবতার মুখপদ্মে - শিরের পুষ্পমালায়। পার্বতী হচ্ছেন দেবী এবং বিধাতা পার্বতীকে সৃষ্টি করেছিলেন শিবের উপযুক্ত সঙ্গিনী করে। তাই তাঁকে অপূর্ব রূপবতী করা হয়েছে এবং শিবের আরাধ্যা যাতে তিনি হন সে ব্যবস্থা করা হয়েছে। ‘কুমারসম্ভবম্’ কাব্যে কবি কালিদাস পার্বতীর স্তব করেছেন। এ কাব্যের প্রথম সর্গে পার্বতীর রূপবর্ণনা রয়েছে। আমরা ‘কুমারসম্ভবম্’ কাব্য থেকে দেবীবর্ণনার সেই সামগ্রিক প্রশস্তিটি নিম্নে বাংলা অনুবাদে উপস্থিত করছি :

“নবযৌবন উদয় হয়ে তাঁর সেই সময়োচিত শরীর তুলিকাক্ষিত চিত্রপটের ন্যায় এবং সূর্যকিরণ স্পর্শে প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় সর্বাসুন্দর হয়ে উঠলো।

তাঁর চরণযুগলের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখের শ্রী এমন রক্তবর্ণ যে, যখন তিনি ধরাতলে চরণ বিন্যস্ত করতেন তখন মনে হতো যেন সে নখ থেকে লোহিত বর্ণের রস নির্গত হচ্ছে। যখন তিনি চলে যেতেন তখন মনে হতো যেন পৃথিবীতলে স্থালপদ্ম প্রস্ফুটিত হয়েছে।

রাজহংসেরা নুপুরধ্বনি শিক্ষা করার অভিলাষে তথা নুপুরের ধ্বনি প্রতিদানরূপে ফিরে পাবার আশায় কুচভার নমিতাস্ত্রী পার্বতীকে বিলাসসুন্দর পদবিন্যাস শিক্ষা দিয়েছিল।

বিধাতা পার্বতীর শরীর নির্মাণের জন্য লাবণ্যের যে আয়োজন করেছিলেন তা তাঁর বর্তুল গোপুচ্ছাকার এবং নাতিদীর্ঘ মনোহর উরুযুগলেই নিঃশেষ হয়েছিল, পরে অবশিষ্ট অঙ্গ নির্মাণের জন্য বিধাতাকে নতুন লাবণ্য প্রস্তুতির প্রয়াস করতে হয়েছিল।

ঐরাবতের শুণ্ডের চর্ম কঠিন। কদলীতরু অত্যন্ত শীতল, সুতরাং এ দুটি সৌন্দর্যশালী হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও পার্বতীর উরুদ্বয়ের তুলনার যোগ্য হতে পারে না।

অতুলনীয়া পার্বতীর নিতম্বদেশের শোভা এভাবেই আমরা নির্ণয় করতে পারি যে, সে নিতম্ব নারীমাত্রের আশার অতীত মহাদেবের ক্রোড়দেশে স্থান পেয়েছিল।

পার্বতীর অতি সূক্ষ্ম রোমাবলী সুগভীর নাভিমণ্ডলের অভ্যন্তর পর্যন্ত প্রবেশ করেছিল, দেখলেই মনে হতো চন্দ্রহারমধ্যস্থিত ইন্দ্রনীলমণির কিরণমালা বস্ত্রের গ্রন্থি অতিক্রম করে দেখা যাচ্ছে।

ক্ষীণমধ্যা পার্বতীর কটিদেশ যম্ভবেদীর ন্যায়, সেই বেদীর নীচে যে মনোরম ত্রিবলী ছিল তা দেখে মনে হতো যেন নবযৌবন কামদেবের আরোহণের জন্য তিনটি সোপান প্রস্তুত করে রেখেছে।

সে কমল নয়ন পার্বতীর পাণ্ডুবর্ণ স্তনযুগল এবস্প্রকার পরিপুষ্ট হয়েছিল যে, যেন তারা পরস্পর পরস্পরকে পীড়া প্রদান করছে; এবং কৃষ্ণবর্ণ মুখবিশিষ্ট সেই স্তন দুটির মধ্যস্থলে অতি সূক্ষ্ম মৃণালসূত্র পর্যন্ত স্থানলাভে অপারগ ছিল।

অনুমান হয় পার্বতীর দুটি বাহু শিরীষকুসুম অপেক্ষা কোমল, কারণ কামদেব মহাদেবের নিকট পরাজিত হয়েও সেই বাহুযুগলকে মহাদেবের কণ্ঠপাশরূপে পরিণত করেছিল।

স্তনযুগলের দ্বারা উন্নত তাঁর যে বক্ষস্থল এবং সুগোল মুক্তাহার যা তিনি গ্রীবায়া ধারণ করতেন এরা পরস্পর পরস্পরের শোভা উৎপাদন করেছিল, যাতে সংশয় হতো যে বক্ষস্থলের ভূষণ মালা, না মালার ভূষণ বক্ষস্থল।

স্বভাবচঞ্চলা লক্ষ্মী যখন চন্দ্রে অবস্থান করেন তখন পদ্মে অবস্থানের সুখ অনুভব করতে পারেন না, আবার যখন পদ্মে অবস্থান নেন তখন চন্দ্রে অবস্থানের সুখসম্ভোগ করেন না। কিন্তু তিনি পার্বতীর মুখমণ্ডলে স্থান পেয়ে সে উভয় বিষয়েই যুগপৎ আনন্দ উপভোগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

যদি নবপল্লবের উপর শুভ্রবর্ণ পুষ্পরীক আদি পুষ্প সন্নিবিষ্ট হতো অথবা প্রবালের উপর মুক্তাফল সন্নিবেশিত থাকতো তাহলে এরা উভয়ে পার্বতীর রক্তবর্ণ দুই ওষ্ঠের উপর শুভ্রবর্ণ মধুর হাস্যের অনুকরণ করতে পারতো।

মধুরভাষিনী পার্বতী যখন অমৃতস্রাবী কণ্ঠে কথা বলতেন তখন কোকিলের রবও ছিন্নতন্ত্রী বীণার কণ্ঠের ধ্বনির ন্যায় ক্ষতিকণ্ঠের হতো।

আকর্ষণনয়না পার্বতীর চকিত দৃষ্টি ছিল বায়ুবিচলিত নীল পদ্মের মত। সেই দৃষ্টি তিনি হরিণীগণের নিকট শিক্ষা করেছিলেন, না হরিণীরাই তাঁর নিকট শিক্ষা করেছিল তা স্থির করা যায় না।

মনে হয় তাঁর সুদীর্ঘ সুশোভন ভ্রুযুগল অঞ্জন সহযোগে তুলিকা দ্বারা চিত্রিত হয়েছিল। যখন সেই ভ্রুযুগল বিলাসগুণে সঞ্চালিত হতো তখন কামদেব তাঁর ধনুর্বাণের সৌন্দর্যগর্ভ ত্যাগ করতেন।

যদি পশুপক্ষী প্রভৃতি তির্যক জাতির অন্তঃকরণে লজ্জাবোধ থাকতো তাহলে চমরী মৃগীগণ পার্বতীর পরম রমণীয় কেশকলাপ অবলোকন করে নিজেদের পুচ্ছলোমের প্রতি মমতা পরিত্যাগ করতো।

বোধহয় বিধাতা একাধারে সমুদয় সৌন্দর্য দর্শন করার ইচ্ছাতেই পদ্ম চন্দ্র প্রভৃতি যেখানে

যত উপমার দ্রব্য ছিল সে সমুদয় পার্বতীদেহের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে অতিযত্নে তাকে লালন করেছিলেন।”৭

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বর্ণনাটি দেবীর হলেও অলৌকিক নয়। এর মধ্যে লৌকিক আবেশ আছে এবং আবেগের শিহরণ আছে। তবে বর্ণনাটি পদনখ থেকে শিখরদেশ পর্যন্ত। কালিদাসের ‘মেঘদূতম্’ কাব্যে যক্ষপ্রিয়া হচ্ছেন মানববোধসম্পূর্ণ একজন দয়িতা—সুতরাং কবি তাঁকে দেবী হিসাবে বর্ণনা করেননি। ‘মেঘদূতম্’ কাব্যে রমণী শরীরের বর্ণনা এসেছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রসাবেশের প্রতীক হয়ে। তাই কখনও বক্ষের উচ্ছলতা বর্ণিত হয়েছে, কখনও কেশরাশির বিস্তার, কখনও নয়নের অপাঙ্গদৃষ্টি, কখনও নিতম্বের দোলায়িত ব্যঞ্জন। এভাবে কালিদাস সৌন্দর্যের একটি অক্ষয় সামগ্রী আমাদের উপহার দিয়েছেন। ‘রঘুবংশম্’ কাব্যটি কবি কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এটি একটি অসাধারণ মহাকাব্য। এই কাব্যের মধ্যে রমণী শরীরের বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে নানা ভঙ্গীতে—বিভিন্ন স্থানে। বিশেষ করে স্বয়ম্বর সভায় তাঁর সঞ্চরণ অলোকসামান্য।

কুমারগণ প্রার্থী হিসেবে স্বয়ম্বরসভায় সারিবদ্ধ হয়ে যখন বসেছিলেন তখন ইন্দুমতী তাঁদের প্রত্যেকের সম্মুখ দিয়ে হেঁটে গিয়েছেন। এক একজন রাজপুত্রের সম্মুখে ক্ষণকাল তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন। ইন্দুমতীর এই যে গতিবিধি এর একটি অসাধারণ বর্ণনা কালিদাস দিয়েছেন। কবি একস্থানে বলেছেন, অন্ধকার রাত্রে বিদ্যুৎ যখন চমকিত হয় তখন এক একটি অট্টালিকা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আবার পরমুহূর্তে তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়—তেমনি রাজকুমারী ইন্দুমতী যখন এক একজন রাজকুমারের সামনে ক্ষণমুহূর্তের জন্য দণ্ডায়মানা হচ্ছিলেন তখন আশায় সে কুমারের মুখ আনন্দোদ্ভাসিত হচ্ছিল—কিন্তু রাজকুমারী তাঁকে পেছনে রেখে যখন চলে যাচ্ছিলেন—তখন তাঁর মুখ অন্ধকারাচ্ছন্ন হচ্ছিল। অন্য একস্থানে আছে, যেমন সরোবরের মধ্যে তরঙ্গের ধারায় রাজহংস তার পশ্চাদ্দেশ দোলায়িত করে এগিয়ে চলে, তেমনি রাজকুমারী ইন্দুমতী তাঁর নিতম্বে কম্পন তুলে সামনের দিকে এগিয়ে চলছিলেন। এভাবে আমরা দেখি যে কালিদাস রমণীশরীরকে একটি আকর্ষণীয় বস্তু করেছেন এবং কামনায় মগ্নিত করে আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করেছেন।

কালিদাস এবং অন্যান্য সংস্কৃত কবিদের অনুসরণ করে এ দেশীয় সাহিত্য যখন রূপ পেতে থাকে তখন স্বভাবতই সংস্কৃত কাব্যের প্রভাব এ দেশের কাব্যের উপর পড়েছিল। বিশেষ করে হিন্দী অবধী ও অপভ্রংশ কাব্যের উপর এই ভাবটি উজ্জ্বলরূপে প্রতীয়মান হয়। বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকালে আমরা দেখি ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’ নারীশরীরের যথেষ্ট বর্ণনা এবং বৈষ্ণব পদাবলীতে রমণীরূপের অজস্র বর্ণনা। তবে এই বর্ণনাগুলো মূলত জয়দেবের সংস্কৃত কাব্য ‘গীতগোবিন্দম্’ নির্ভর। ‘গীতগোবিন্দম্’ যদিও রাধা এবং কৃষ্ণকে নিয়ে রচনা, তবুও এটিকে পুরোপুরি একটি মানসিক রিরংসাকাব্য বলা যায়। রিরংসাকাব্য এজন্য যে জয়দেব শ্রদ্ধা এবং বিনয়ের মধ্য দিয়ে রাধিকার শরীরকে বর্ণনা করেননি—করেছেন কামনা এবং আকর্ষণ উন্মোচনের মধ্য দিয়ে। জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দমে’ রমণীশরীরের অনুপম আকর্ষণীয় বর্ণনা আছে এবং সে বর্ণনা দেবীর নয়—মানবীর। জয়দেবের বর্ণনাগুলোই ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’ অনুসৃত হয়েছে। জয়দেবের বর্ণনাগুলোই বৈষ্ণব পদাবলীতে নতুনভাবে রূপ পেয়েছে। আমরা বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ পরীক্ষা করলে এবং বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-গোবিন্দদাস-জ্ঞানদাসের পদাবলী পরীক্ষা করলেই তা বুঝতে পারি।

কিন্তু ‘নখশিখ’ বলতে যা বোঝা যায় তা ‘গীতগোবিন্দমে’ও নেই, ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’ও নেই, বৈষ্ণব পদাবলীতেও নেই। জয়দেব তাঁর ‘গীতগোবিন্দমে’ মঙ্গলাচরণ করেছেন, বসন্তের বর্ণনা দিয়েছেন, অভিসারিকার বর্ণনা দিয়েছেন, বিরহিণীর বর্ণনা দিয়েছেন এবং রাধামাধবলীলার বর্ণনা দিয়েছেন। সে সমস্ত বর্ণনার মধ্যে কোথাও একস্থানে সামগ্রিকভাবে রূপবর্ণনা নেই। যেমন

বসন্তবর্ণনার মধ্যে একটি আবেশবিহীন রমণীর বর্ণনা আছে যে বর্ণনা হচ্ছে শূঙ্গারের আনন্দের বর্ণনা। অভিসারিকা-অংশে আমরা নখশিখের কিছুটা আভাস পাই—কিন্তু এটা ‘নখশিখ’ নয়—দেহসৌষ্ঠবের আভাসিত বর্ণনা মাত্র। আরম্ভে কবি বলছেন, “হে সখি তোমার হৃদয়েশ্বর মদনমনোহরবেশে রতিসুখসারভূত অভিসারে গমন করিয়াছেন। নিতম্বিনি! গমনে বিলম্ব করিওনা; তাঁহার অনুসরণ কর। তোমার পীনপয়োধর-পরিসর মর্দনের জন্য যাঁহার করযুগল সর্বদা চঞ্চল, সেই বনমালী ধীর সমীর-সেবিত যমুনা-তীরবর্তী বনে অবস্থিতি করিতেছেন।”^৮ —এ অংশটুকুতে আমরা ‘নখশিখ’ পাই না। পীনপয়োধর বললেই ‘নখশিখ’ হয় না। ‘নিগূঢ়নিতম্বিনি’ বললেই ‘নখশিখ’ হয় না। নারীর প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে উপমেয় নির্ধারণ করে উপমানবস্তু আকর্ষণ করে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য নির্মাণ করা—এবং নির্মাণকালে অলকাবলী থেকে চরণাঙ্গুলি পর্যন্ত ক্রমাবতরণ অথবা চরণাঙ্গুলি থেকে অলকাবলী পর্যন্ত উর্ধ্বগমন করা—‘নখশিখ’র এই যে বৈশিষ্ট্য, জয়দেবে তা পাওয়া যায় না। জয়দেবের রচনায় কামাবেশ আছে কিন্তু কাহিনীর ক্রমাগতিতে ‘নখশিখ’র যে গুরুত্ব তা নেই। মূলত জয়দেবকে অনুসরণ করতে গিয়েই বড়ু চণ্ডীদাস ও বৈষ্ণব পদকর্তারা কালিদাসের কালের সংস্কৃত ‘নখশিখ’কে অনুসরণ করেননি। বড়ু চণ্ডীদাস ও বৈষ্ণব কবিদের কাছে সমৃদ্ধিশালী এবং প্রিয় কবি হচ্ছেন একমাত্র জয়দেব—যে কারণে তাঁদের কালিদাসের কাছে পৌছানোর প্রয়োজন হয়নি। সে কারণে বৈষ্ণব পদাবলীতে ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রিরংসার আবেশ হিসাবে নারীদেহের বর্ণনা এসেছে। কাহিনীর গতিধারায় নখশিখ আসে নি। তাছাড়া কাহিনীকাব্য বলতে আমরা যা বুঝি বৈষ্ণব পদাবলী সেরকম কাব্য নয়—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাট্যভঙ্গিতে উপস্থাপিত, কাহিনীভঙ্গিতে নয়। যাও বা একটা কাহিনী শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে তাকে মুখ্য করা হয়নি, মুখ্য করা হয়েছে বরং রাধাকৃষ্ণের আকাঙ্ক্ষা এবং সম্মিলিত রভসবর্ণনাকে। নায়িকার আ-পাদশির বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে এমন অনেক চরণগুচ্ছ আছে কিন্তু সেগুলোকে নখশিখের মর্যাদা দেওয়া যায় না। কেননা সেই দেহবর্ণনায় কেলিলোলূপ কৃষ্ণের কামার্তি প্রকাশ পেয়েছে, নায়ক-নায়িকার প্রেমজীবন কিংবা সমগ্র জীবনে নখশিখের যে তাৎপর্য, এ নিছক দেহবর্ণনাগুলোতে তা নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বৃন্দাবন খণ্ডে^৯ রাধারতি উপভোগে আকুল কৃষ্ণ রাধার ফুলশরীর তৈরি করেছে, যেখানে শিরের কেশগুচ্ছ থেকে পায়ের নখপংক্তি পর্যন্ত ক্রমাবতরণ আছে—কিন্তু সেই বর্ণনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সেই বর্ণনায় রাধার চিকুর তমালকুসুম, নয়ন-নীল কুরুবক, নাসিকা-তিলপুঞ্জ, গণ্ডদেশ-মহ্মাপুস্প, অধর বাঙ্গুলী, কর্ণ-বকফুল, দশন-কুন্দ, বাহু-যুথিমালিকা, করতল অশোকস্তুবক, স্তন-স্থলপদ্ম, নাভিদেশ-নাগকেশর, জঙ্ঘা-কনককেতকী, চরণ-স্থলপদ্ম, অঙ্গুলি-চম্পাকলি, নখরাজি-শুলালপুস্প। কিন্তু ‘দেখো মৌ তোর ফুলশরীরে’ বলে এই যে ত্বরান্বিত রাধাদেহবর্ণনা করে গেছেন শ্রীকৃষ্ণ, এটা হচ্ছে রাধাকে আপন অভিপ্রায়ের অনুকূলে পাওয়ার জন্য রাধার তুষ্টিসম্পাদন চেষ্টা—এই দেহবর্ণনাকে নিজের ভোগাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির অস্ত্র হিসেবেই ব্যবহার করেছেন তিনি। আবার বাণ খণ্ডে^{১০} রাধা যখন নিজের কেশকে-বীর নীল, খোঁপাকে—মহাদেব, নয়নকে—মদনদেব, নাসাকে—গরুড়, গণ্ডদেশকে—পাগুরাজ, কর্ণদ্বয়কে—পাশ, ওষ্ঠকে—পুষ্পদণ্ড, স্তনদ্বয়কে—যুধিষ্ঠির, বাহুকে—দণ্ড, গ্রীবাতে—সুগ্রীব, নাভিকে—দৈত্যবাজ্জ বলি, নিতম্বকে—পৃথু, জঙ্ঘাকে—পুরু বলে অভিহিত করেছেন—তখন দেখতে পাই সেই আশিরচরণ আশ্বদেহরূপ বর্ণনার মধ্যে রয়েছে কেলিলুরু কৃষ্ণের দৌরাভ্য প্রতিরোধ চেষ্টা। বড় বড় বীরেরা রাধাদেহকে পাহারা দিয়ে রেখেছে, অতএব কৃষ্ণ যেন তাঁর কামাকাঙ্ক্ষা সংবরণ করে—এই হচ্ছে বক্তব্য। ‘কুমারসম্ভবম্’ কাব্যে কালিদাস যে অনন্যসাধারণ ‘নখশিখ’ রচনা করেছেন তার কোন স্বাদ আমরা উদ্দেশ্যমূলক এই দেহবর্ণনাগুলোর মধ্যে পাই না। ‘নখশিখ’ রচনার মধ্যে যে বিস্মৃতি, যে প্রযত্ন, যে সচেতন প্রয়াস প্রয়োজন—এ উদ্দেশ্যপ্রসূত এবং ত্বরান্বিত

দেহবর্ণনার মধ্যে তা নেই। তবে ‘নখশিখের’ যে ধরণ—মস্তক থেকে পদনখে ক্রমাবতরণ—সেই স্মৃতিটি বড় চণ্ডীদাসে এসেছে জয়দেব থেকে বাহিত হয়ে। জয়দেব পূর্বসূরী সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য থেকে ভাষা ছন্দ অলংকার ইত্যাদি কিছু সম্পদ অর্জন করতে পেরেছিলেন—লোকজীবনের কবি বড় চণ্ডীদাসের সে ক্ষমতা ছিল না। পূর্বসূরী সংস্কৃত কবিদের কবিভাবভূমি এবং কল্পনাপদ্ধতি বড় চণ্ডীদাসের পক্ষে সম্পূর্ণ অনায়ত্ত ছিল—তাই তিনি নায়িকার রূপ বর্ণনা পদ্ধতির খোলসটি ঋণ করেছিলেন, সৌন্দর্যপূজারী রূপতন্ময় কবির আত্মা তাঁর ছিল না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনতিপূর্বকালের কাব্য ‘গীতগোবিন্দম্’ থেকে তাঁর এই ঋণের পরিমাণ ছিল বেশী। ‘বৃন্দাবন’ খণ্ডের যে অংশটিতে বড় রাধিকার ফুলশরীর নির্মাণ করেছেন সেটির পূর্বরূপ পরিলক্ষিত হয় গীতগোবিন্দমের দশম সর্গে,^{১১} সেখানে দেখা যায় জয়দেব রাধার অধরকে বন্ধুক পুষ্প, কপোলকে মধুকপুষ্প, নয়নকে নীলপদ্ম, নাসাকে তিলপুষ্প এবং দন্তপঙ্ক্তিকে কুন্দপ্রসূন বলে উল্লেখ করেছেন। কামজর্জর কৃষ্ণ সেখানে রাধার অধরকে বন্ধুক পুষ্পের মত রক্তবর্ণ, কপোলকে মধুক কুসুমের মত স্নিগ্ধপাণ্ডুর দেখেছেন অর্থাৎ রাধাদেহকে কামমত্তরূপে দেখেছেন। অতএব সেখানে ‘নখশিখ’ রচনার কোনো প্রয়াস নেই। অর্জিত জ্ঞানের জন্য পদ্ধতিটি জয়দেবের জানা ছিল তাই তাঁর গীতগোবিন্দমে কোথাও কোথাও নখশিখের আভাসমাত্র পাওয়া যায় তবে কাব্যের প্রকৃতির কারণে সচেতনভাবে ‘নখশিখ’ রচনার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না।

দীর্ঘ আলোচনা শেষে অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে ‘নখশিখ’ বলতে যা বোঝায় তা গীতগোবিন্দমেও নেই, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও নেই, বৈষ্ণব পদাবলীতেও নেই। কালিদাসের অনুসরণে দেশীয় সাহিত্যে পূর্ণাঙ্গরূপে ‘নখশিখের’ প্রবর্তন করলেন সর্বপ্রথম অপভ্রংশ এবং অবধীভাষার কবিরা। আমরা ‘সন্দেশ রাসকে’র কবি আবদুর রহমানের বর্ণনায় রমণীর দেহসৌষ্ঠবের একটি অনুপম আলেখ্য পাই। দ্বাদশ শতকের অপভ্রংশ কাব্য ‘সন্দেশ রাসক’ একটি দূতকাব্য, যেখানে নায়িকার বিরহ-নিবেদনের বিচিত্র রসাব্বাদে আমরা মুগ্ধ হই। কালিদাসের ‘মেঘদূতম্’ কাব্যে মেঘকে দূত করে পাঠানো হয়েছে আর ‘সন্দেশ-রাসক’ কাব্যে দৌত্যকর্মের ভার দেয়া হয়েছে জনৈক পথিককে। এই দূতকাব্য ‘সন্দেশ-রাসকে’ ‘নখশিখের’ একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে, নিম্নে সেটি অনুবাদের মাধ্যমে পুরোপুরি উদ্ধৃত হলো:

“তার অলক অতি কুটিল, তরঙ্গিণীর সলিলকঞ্জালের মতো বক্র, কালিমায় অলিকুল মালার মতো। রাত্রির তমসানাশকারী অমৃতস্রাবী পূর্ণচন্দ্রের মতো উক্ত রমণীর মুখমণ্ডল নিম্নলক্ষ্যতায় সূর্যের প্রতিবিম্ব সদৃশ।

দীর্ঘতর রাগযুক্ত লোচনযুগল যেন অরবিন্দদল এবং তরুণ কপোল দাড়িম্বকুসুমপুঞ্জের ভাঁতির মতো সুন্দর।

তার বাহু মানসসরোবরে উৎপন্ন কোমল মৃণালের মতো।

স্তনদ্বয় পরস্পর যেন স্বজন এবং প্রস্তরের মতো। স্তন, নিত্য, উন্নত এবং মুখরহিত হবার কারণে প্রস্তরের মতো এবং সঙ্গমের পর অঙ্গকে আশ্বস্ত করে বলে স্বজনের মতো।

নাভিমণ্ডল পার্বত্য নদীর আবর্তের মতো গম্ভীর, সুস্বভাৱেহু কটিদেশ তরল গতিকে হরণ করে।

তার অতি রম্য উরু কদলীস্তম্ভেরও অধিক। সরস এবং সুমনোহর জঙ্ঘা বৃত্তাকার এবং নাতিদীর্ঘ।

চরণের অঙ্গুলি পদ্মরাজিসদৃশ, নখপংক্তিতে স্ফটিক ভাঁতি এবং কোমল রোমাবলীতে উদ্ভিন্ন কুসুমের মৃণালের ভাঁতি।

শৈলজা পার্বতীকে উৎপন্ন করার পর স্রষ্টা তার চেয়েও অধিক বিশেষত্বযুক্ত করে এ নায়িকার অঙ্গকে প্রকটিত করেছেন। কবিদের কেন অপরাধ হবে যখন স্বয়ং ব্রহ্মা পুনরুত্তিকে সৃষ্টি করেছেন।”^{১২}

অবধী ভাষায় রচিত কুতবনের ‘মৃগাবতী’তেও একটি প্রগাঢ় ‘নখশিখের’ বর্ণনা পাই। উক্ত বর্ণনার প্রথমার্শের চারটি স্তবকের অনুবাদ নমুনা হিসেবে আমরা নিম্নে উপস্থিত করছি :

“সে তার হাত দিয়ে কেশগুচ্ছ সংযত করে রেখেছিলো, তার সিঁথি আমি দেখেছি বা ছিলো অত্যধিক প্রাণঘাতিকা। তা ছিলো শ্বেতচন্দনলিপ্ত অথবা বলা যায় সেখানে মুক্তার এক পংক্তি সাজানো রয়েছে যেন। সে সুহাবনী পংক্তি যেন ঘন কালো বাদলের মধ্য থেকে জেগে উঠেছে। তার সিঁথিব জ্যোতির প্রকাশ এমন ছিলো যেন অন্ধকার রাত্রে বিচ্ছুরিত তারা। তার শিরোদেশে সিঁথিটি ছিলো খড়্গের ধারের মতো যার স্পর্শে মানুষ খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে। সে খড়্গ আমার মস্তকে পড়ে আমাকে দশ খণ্ড করে ফেললো, আমার হাত, মাথা, পা সব আলাদা হয়ে গেল। তুমি অমৃত সিঞ্চন করে আমাকে জীবন দিয়েছ, তাতেই তো আমি তার ভাব বা সৌন্দর্য বর্ণন করতে পারছি।”

“তার চিকুর ছিলো মেঘবর্ণের এবং অত্যধিক সুন্দর যার ফাঁদ গলায় পড়ায় নাগ রুগ্ন হয়েছিল। যখন সে তার চিকুরকে মুক্ত করছিলো, তখন একটি অপূর্ব চিত্র ফুটে উঠছিলো। বিচূর্ণিত কেশ যখন তার কপালে এসে পড়ছিলো, মনে হচ্ছিলো যেন কমল নাগিনীর সঙ্গে প্রেম করছে। যেই সে অলকাবলী দেখতো তার মধ্যেই বিবক্রিয়া হতো যার না ছিল ঔষধি, না ছিলো জড়ি, না ছিলো চিকিৎসক। তার কৃষ্ণিত কেশ শিরোদেশ থেকে পা পর্যন্ত নেমেছিলো যেন বিষাক্ত কালো ভুজঙ্গ। সে বিষ আমার সর্বশরীরে প্রবাহিত হয়ে আমাকে মুর্ছিত করলো। তুমি আমাকে প্রাণ দিয়ে নিরুজ্জ্বল বচনে যে প্রশ্ন রেখেছ তারই উত্তর আমি দিচ্ছি।

“তার ললাট ছিলো দ্বিতীয়ার চন্দ্রের মতো দীপ্ত যেন মীন রাশিতে চন্দ্রমা উদিত হয়েছে এবং সকল বিশ্ব তা দেখছে। তাকে দেখতে দেখতে নেত্রের দৃষ্টি সঙ্কুচিত হয়ে আসে উদীয়মান ভানুতে দৃষ্টি পড়লে যেমন হয়। তার মুখমণ্ডলের প্রস্বেদ-বিন্দুকে তারকার মতো মনে হয়েছে, যেন চন্দ্র নক্ষত্রকে নিয়ে আকাশে উদিত হয়েছে। তার ললাট একপ দীপ্তিমান ছিলো যেন দামিনীর চমকিত মূর্ছনা, সে কারণে দৌড়ে চলতে গিয়ে আমি পড়ে গেলাম। ললাটের জ্যোতির প্রকাশ এমন ছিলো যে আমি চমকিত হলাম এবং আপনাকে সংবরণ করতে পারলাম না। তার ললাট দেখে আমি বিমুগ্ধ হলাম এবং হে শাত্রীমাতা, আমি বুদ্ধিহারা হলাম। হৃদপিণ্ডের রক্ত তপ্ত হয়ে পানি হয়ে গেল। হে মাতা, এখন এর ঔষধির কথা বল।”

“তার ভুরু ছিলো অর্জুনের ধনুকের মতো। যার দিকে ঘুরে দেখতো তার প্রতিই সে বাণ নিক্ষেপ করতো। কালকূটের মতো বিষাক্ততার বাণ, পঞ্চবাণের মতো দৃষ্টিতে পতিত হতে না হতেই আহত করতো। অথবা এ বাণ কর্ণের বাণের মতো প্রথর এবং তীক্ষ্ণ। মুখ ফিরিয়ে ভুরুভঙ্গে যার উপর সে শর নিক্ষেপ করতো, তার জন্য তন্ত্রমন্ত্র অথবা ঔষধির উপযোগিতা থাকতো না। আমি যেন মৃগ হয়েছিলাম এবং সে শিকারী, সে বিষাক্ত বাণ নিক্ষেপ করে আমাকে আহত করে গিয়েছে। কামিনীর ভুরুকে কলিযুগে সংহারকর্তা পরশুরাম বলে বিবেচনা করতে হবে। হৃদয়ে তার শল্য প্রবেশ করেছে কিন্তু রুধিরও প্রবাহিত হয়নি, আঘাতের চিহ্ন ধরা পড়ছে না।”^{১৩}

এরপর যার কাব্যে ‘নখশিখ’ পূর্ণাঙ্গ রূপে এবং অবিচ্ছিন্নভাবে প্রদীপ্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে, তিনি হচ্ছেন মালিক মুহম্মদ জায়সী। ঠেঁট হিন্দী ভাষায় রচিত তাঁর ‘পদুমাবৎ’ কাব্যে ‘নখশিখের’ একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত রয়েছে। আমি এখানে জায়সীর ‘পদুমাবৎ’ থেকে ‘নখশিখের’ দৃষ্টান্ত সৈয়দ

আলী আহসানকৃত অনুবাদের মাধ্যমে তুলে ধরছি। জায়সীর ‘নখশিখ’ বর্ণনার প্রথম দুই স্তবক এবং শেষ দুই স্তবকের অনুবাদ নমুনা হিসেবে নিম্নে প্রদর্শিত হচ্ছে :

“১. হে রাজন, তার শৃঙ্গারের কি বর্ণনা করব। তার শৃঙ্গার তাকেই শোভা পায় অর্থাৎ তার অঙ্গের শোভা বর্ণনার অতীত। প্রথমে শিরোদেশে কুম্ভরী-সুগন্ধ কেশ, যার কাছে নরেশ তো অতি সাধারণ, বাসুকি পর্যন্ত বলি হয় বা নিবেদিত হয়। রাণী হল মালতী এবং কেশ হল ভ্রমর। মালতীর সুগন্ধ আত্মাণ নিচ্ছে বিষধর ভ্রমর। সে যখন বেণী খুলে চুলকে উন্মুক্ত করে দেয়, স্বর্গ থেকে পাতাল পর্যন্ত অন্ধকার হয়ে যায়। তার কোমল এবং কুটিল কেশ পর্বতের উপরে সর্পের মতো যেন অনেক তরঙ্গ ছড়িয়ে অধিস্থিত। যেন মলয়াচলের সুগন্ধ পেয়ে শিরোদেশে এসে তারা সুগন্ধ নিচ্ছে। বিষনিষিক্ত তার অলকগুচ্ছ গ্রীবাকে বেষ্টন করেছে।

শিরোদেশের কেশগুচ্ছ ফাঁদ বা বন্ধনের মতো যা গ্রীবাকে বন্ধন করে এবং তার কেশের বিন্যাসে অষ্টকুল নাগের বসতি।

২. যে সীমস্তে এখনো সিন্দূর লাগে নি, শিরোভাগের সে সীমস্তের বর্ণনা করছি। সিন্দূরবিহীন সে সীমস্ত দীপকের মতো রাত্রিতে অন্ধকার পথকে যেন উজ্জ্বল করে। অথবা কষ্টিপাথরে স্বর্ণের রেখা, যা ঘন মেঘপুঞ্জের দামিনীসদৃশ। যেন গগনে বিশেষ সূর্যকিরণ অথবা যমুনার জলে প্রতিবিম্বিত সরস্বতীর উজ্জ্বল ধারা। অথবা রক্ত-লিপ্ত খড়্গধার, ত্রিবেণী-মোহনার করপত্রের মতো। বেণীতে বিন্যস্ত মুক্তা যেন যমুনার মধ্যে গঙ্গার স্রোত। তপস্বীরা ত্রিবেণী সঙ্গমে করপত্রের দ্বারা দেহ বিক্ষত করে যেন সে রক্তে তার সীমস্তে সিন্দূরের রেখা হয়। দ্বাদশ-ভাতি স্বর্ণ তার সীমস্তের সোহাগা বা সৌভাগ্য-কামনা করছে। গগনাস্তনে শোভমান নক্ষত্র সকল সে সীমস্তের সেবা করছে।

১৯. পদ্মাবতীর নাভিকুণ্ড মলয়াচলের সমীরসদৃশ সুগন্ধ এবং সমুদ্রের গভীর আবর্তের মতো। সমুদ্রের অনেক আবর্ত তার নাভিকুণ্ডের সঙ্গে সমতা না করতে পেয়ে ঘূর্ণিবায়ু হয়ে উড়ে গেছে। চন্দ্রনের মধ্যে কুরঙ্গীর পদচিহ্ন তার গুপ্ত দেহভাগ, কে সেই রাজা ‘ভোজ’ যে তা অধিকার করবে? কে এর জন্য হিমাচলে তপস্যা করে তাপদক্ষ হবে? কার ভাগ্যে পদ্মাবতী নাম লিখিত আছে? কে তার কামনায় আরক্তিম বা অনুরাগী হয়েছে? তীর কমল-সুগন্ধ সে দেহে (মদন মন্দিরে) এবং তার আবরণ বস্ত্র পবনে হিমোলিত সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় শোভমান। বস্ত্রে রত্নখচিত রেশমগুচ্ছ দোদুল্যমান। জ্ঞানিনা এভাবে সুসজ্জিত করে কামদেব কার উপর কোপ বর্ষণ করছেন? তার গুপ্ত দেহভাগ এখন পর্যন্ত কমল-কলিকা, জ্ঞানিনা কোন ভ্রমরের জন্য তা নিধারিত আছে। সমস্ত সংসার তার পরিমল মেদের সুগন্ধে বাসনাবদ্ধ। ভ্রমর এ সুগন্ধের আত্মাণ নিয়ে লুপ্ত হয়ে নীবিবন্ধ ত্যাগ করতে চাচ্ছে না।

২০. তার কটিদেশের শোভা যে নিতম্ব তার বর্ণনা করছি। যে নিতম্বের কারণে সে গজগামিনী, যা দেখে মন লুপ্ত হয়। অতিসূন্দর দুই জঙ্ঘা সেখানে সংযুক্ত হয়েছে যেন বিপরীতভাবে প্রোথিত দুটি কদলী স্তম্ভ। তার কমল-চরণ অতি রক্তিম, সর্বদা তারা সিংহাসনের উপর থাকে, কখনও মুক্তিকা স্পর্শ করে না। সকল দেবতা দুহাত দিয়ে তার পদদ্বয় ধারণ করে আছে। যেখানে পদ্মাবতী তার চরণ স্পর্শ করে সেখানে দেবতার শির নোয়ায়। কে সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যে তার চরণ কমলদ্বয় আপন শিরোদেশে স্থাপিত করবে? পদালঙ্কার চূড়া চন্দ্র এবং সূর্যের মতো উজ্জ্বল, মধ্যে মধ্যে পায়ল সমুদ্রের মতো বক্ষার তুলছে। তার পদাঙ্গুলির অলঙ্কার ‘অনবদ্য’ এবং বিছা, যেন নক্ষত্র এবং তারা। তার সেই পায়ের কাছে কে অগ্রসর হতে পারে? পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনা করলাম পদনখ থেকে শিরোদেশ পর্যন্ত কিন্তু তবুও যেন সমস্ত শৃঙ্গারের বর্ণনা করা গেল না। পৃথিবীতে এমন কোনও যোগ্য বস্ত্র আমার দৃষ্টিতে পড়ছে না যার সঙ্গে তার উপমা চলতে পারে।”^{১৪}

জায়সীর পরবর্তী অবধি কবি মনবান তাঁর কাব্য ‘মধুমালতী’তে ‘নখশিখ’ প্রথা রক্ষা করেছেন, কিন্তু তা জায়সীর মতো অত উচ্চ কোটির নয়; ভাষা দুর্বল এবং অনেকাংশে জায়সীর অনুসরণ।

বাংলা ভাষায় কবি আলাওল জায়সীর ‘পদ্মাবতী’-এর প্রথম অনুবাদ করেন এবং এই অনুবাদ-কর্মের মধ্য দিয়ে নতুন একটি ‘নখশিখ’-এর ধরণ তিনি বাংলা কাব্যে প্রবর্তন করেন। সৈয়দ আলী আহসান, তাঁর পদ্মাবতী নামক গবেষণাগ্রন্থে জায়সীর ‘পদ্মাবতী’ এবং আলাওলের ‘পদ্মাবতী’ কাব্যের যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, তাতে দেখা যায় ‘নখশিখ’ অধ্যায়ে আলাওল কোথাও মূলানুসরণ কবেছেন, কোথাও নিজস্বতা প্রদর্শন করেছেন। এই অধ্যায়ে আলাওলের অনুবাদ কোথাও নিষ্প্রভ আবার কোথাও উজ্জ্বল। আলাওলের অনুবাদ যে অংশে নিষ্প্রভ হয়েছে, সেরকম একটি প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসান বলেন, “মূলের ত্রয়োদশ-চতুর্দশ চরণে আছে :

সমুদ্র হিলোর করহি জনু বুলে।

খঞ্জন লরহি মিরিগ বন ভুলে।।

অর্থাৎ যখন তার নয়ন গতি পায় অথবা কম্পিত বা চঞ্চলভাবে এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করে, তখন যেন সমুদ্র হিলোলিত হয়। যেন খঞ্জন-যুগল বিবদমান অথবা যেন পংখ্রাশ্র মৃগ!...

আলাওল ত্রয়োদশ-চতুর্দশ চরণে বলেছেন:

কাননে কুরঙ্গ জলে সফরী লুকিত।

খঞ্জন গঞ্জন নেত্র অঞ্জন রঞ্জিত।।

এখানে তুলনা কয়টি নয়নের সাধারণ রূপের সঙ্গে, চঞ্চলতার সঙ্গে নয়। কবি বলতে চাচ্ছেন যে পদ্মাবতীর চক্ষু দেখে বনে হরিণ আত্মগোপন করল, মাছ লুকাল গভীর জলে। তার সে অঞ্জনরঞ্জিত নেত্র খঞ্জন পাখীকেও গঞ্জন দেয়। আলাওলের বর্ণনাটি প্রথানির্ভর এবং দুর্বল।”^{১৫}

আবার আলাওলের বর্ণনা যে স্থলে উজ্জ্বল সেরকম একটি প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসান বলেন, “আলাওলের পঞ্চম ও ষষ্ঠ চরণ মূলের চেয়ে অধিকতর উজ্জ্বল। বিশেষ করে ‘তাম্বুল রাতুল হইল অধর পরশে’।

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে এই চরণটি অসাধারণ এবং দ্বিতীয়রহিত। মূলে আছে : “ভই সজীঠ পননহ রং লাগে” অর্থাৎ পানের রং লেগে তার অধর মঞ্জীষ্ঠার মত লাল হয়েছে।

জায়সীর কথাটি একটি সাধারণ সত্য, কিন্তু আলাওলের কথাটিতে হৃদয়ের উত্তাপ আছে এবং প্রেম-কল্পনার আশ্রয় আছে।”^{১৬}

‘নখশিখ’ অধ্যায়ের তুলনামূলক বিবেচনাকালে সৈয়দ আলী আহসান উদ্ঘাটন করেছেন যে, আলাওল কোথাও কোথাও মূলের অনুসরণ করেছেন, কোথাও পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংক্ষেপণ এবং নতুন সংযোজন করেছেন। এই পর্যালোচনা শেষে তিনি মন্তব্য করেন—“পদ্মাবতীর রূপবর্ণনায় আলাওল যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছেন। বস্তুবিভাগে মূলের উপর নির্ভরশীলতা আছে, তথ্যনির্ণয়ও মূলানুগ, কিন্তু আবেগ ও প্রতিক্রিয়ায় আলাওলের একটি অন্তরঙ্গ রূপ এ অধ্যায়ে স্পষ্ট হয়। যদিও সর্বত্র মূলের মত বর্ণনার বিস্তার নেই অথবা তথ্যগত সে প্রাচুর্য নেই যে প্রাচুর্যে পাণ্ডিত্য স্পষ্ট, তবুও একটি সজাগ আনন্দিত চিত্তের বিকাশ আলাওলের রচনায় ধরা পড়েছে।”^{১৭}

তুলনামূলক আলোচনার ক্রমাগত অগ্রসর হয়ে আমরা অবশেষে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে পদ্মাবতীর সৌন্দর্যবর্ণনা অধ্যায়ে আলাওলের নিজস্ব কবিসত্তার প্রকাশ আছে। তথ্যসংগ্রহ জায়সীর উপর নির্ভরশীল হলেও এ সর্গে আলাওল মূলত: অনুবাদক নন, বরঞ্চ নতুন তাৎপর্যের কবি।”^{১৮}

আলাওল-বিরচিত 'নখশিখ' অংশ থেকে একটি নিদর্শন হিসেবে ষোড়শ শ্তবকটিকে আমরা
নিম্নে উদ্ধৃত করছি:

“।।১৬।।

স্বর্ণস্থালী জিনিয়া হৃদয় পরিপাটি।
কনক কটোরা দুই রাখিছে উলটি।।
ফলের উপমা কি কহিব কবিকুল,
বিচারি চাহিল সব নহে সমতুল।।
দেখিয়া সুন্দর অতি কুচযুগ ভঙ্গি।
সুরঙ্গী হইয়া নাম ধরিল নারঙ্গি।
বড়হি কঠিন চিন্ত উরোজ্ঞ অবলা।
কমল শরীর নাম ধরিল কমলা।।
শ্যামতারা নাম ধরে মন তার নয়।
তে কারণে ডালেত পিঙ্গল বর্ণ হয়।।
ডালিস্ব দেখিয়া কুচ অতি সুরুচির।।
লজ্জাএ বিদার হএ আপনা শরীর।।
কটিলতা ভাবিয়া শরীর করি কষ্ট।
তথাপিহ তুল নহে শ্রীফল শ্রীদ্রষ্ট।।
জামির ছোলঙ্গ পুনি অন্নরস হৈয়া।
ডালেত পিঙ্গল হএ অতি লজ্জা পাইয়া।।
কুচ দরশনে অঙ্গ না দেখিয়া ভাল।
উলটা সংযোগে পুনি হয় লতা তাল।।
কনক কলসি কিবা ভরিয়া রতন।
শ্যামচাপ শিরে দিয়া রাখিছে মদন।।
করিবর কুণ্ড জিনি কুচ মনোহর।
নিচলে রাখিছে কিবা হেম ধরাধর।।
চক্রবাক যুগ নিশি বিচ্ছেদের ডরে।
অখণ্ড মিলনে কি রহিছে উরঃসরে।।
সগর্ব আদরে কটিলতা অতিশয়।
রাজচক্রবর্তী শির নঙ্গহ করএ।
শ্যামছত্র শিরেত বেকত ছত্রপতি।
স্বইচ্ছায় কর দিতে সবার আরতি।।
উর-সিংহাসনে বৈসে অবলার বল।
একপাটে দুই রাজা বড় কুতূহল।।
কতেক কহিতে পারি কুচ সুলক্ষণ।
যুবক আনন্দ হৃদে বালক জীবন।।
সত্যাক্ষল পটেত থাকএ সর্বক্ষণ।
পরশিতে নারে কেহ মানব নয়ন।।
নৃপকুলে বহু যত্নে দেব আরাধেস্ত।
কর দিতে নারে সবে কর কচালেস্ত।।

স্তবকটি সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসানের মন্তব্য “আলাওলের ষোড়শ স্তবকটি মূলের পঞ্চদশ স্তবক। এ স্তবকটিতে পদ্মাবতীর স্তনযুগল বর্ণিত হয়েছে। আলাওল এখানে মূলকে অনুসরণ করেন নি। মূলের সাতটি চরণদ্বৈত এবং দোহা অংশের দুটি চরণ আলাওলে ছত্রিশটি চরণে পরিণত হয়েছে। বক্ষস্থলকে আলাওল নানাভাবে বর্ণনা করেছেন—এবং বিভিন্ন উপমার বিন্যাসে তার স্বরূপকে উজ্জ্বল করেছেন। দেহের অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় এ বর্ণনা সীমিতরিক্ত।”^{২০}

অন্ত্যমধ্যযুগের সর্বপ্রধান এবং শেষ কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে ‘নখশিখ’র সর্বশেষ উদাহরণ আমরা পাই। তাঁর ‘অরুদামঙ্গল’ কাব্যের ‘বিদ্যাসুন্দর’ খণ্ডে নায়িকা বিদ্যার বর্ণনা আছে—যে বর্ণনাটি মূল সংস্কৃত কাব্য ‘বিলহন চরিতে’র ‘চৌরপঞ্চাশিকা’ অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করে রচিত। কিন্তু ভারতচন্দ্র সংস্কৃত কাব্যের প্রভূত পরিবর্তন ঘটিয়েছেন এবং নতুন ভঙ্গিতে একটি অভিনব শৃঙ্গারকাব্য রচনা করেছেন। ভারতচন্দ্রের কাব্য থেকে আমরা ‘নখশিখ’র একটি উদাহরণ নিম্নে উপস্থিত করছি। উদাহরণটি অবশ্য আলাওলের মত পূর্ণাঙ্গ নয়, কিন্তু এটি রিরংসাজনিত আবেশে নতুন ভঙ্গিতে প্রস্তাবিত :

বিনাইয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়। সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকাই।।
কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা। পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলি।।
কি ছার মিছার কামধনু রাগে ফুলে। ভুরুর সমান কোথা ভুরু-ভঙ্গে ভুলে।।
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়ন-হিম্মোলে। কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে।।
কি কাজ সিন্দূরে মাজি মুকুতার হার। ভুলায় তর্কের পাঁতি দম্ব-পাঁতি তার।।
পদ্মযোনি পদ্মনালে ভাল গড়েছিল। ভূজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল।।
কত সরু ডমরু কেশরি-মধ্যখান। হরগৌরী করপদে আছয়ে প্রমাণ।।
কে বলে অনঙ্গ অঙ্গ দেখা নাহি যায়। দেখুক সে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজায়।।
মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া। অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া।।
যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন। সেই বলে ভাল চলে মরাল-বারণ।।
জিনিয়া হরিদ্রা চাঁপা সোনার বরণ। অনলে পুড়িছে করি তায় দরশন।।
রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িৎ। কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কাদচিৎ।।
প্রমর বাক্সার শিখে কঙ্কণ-ঝঙ্কারে। পড়ায় পঞ্চম স্বর ভাবে কোকিলারে।।^{২১}

মধ্যযুগের শেষ কবি-প্রতিনিধি ভারতচন্দ্রের কাব্যে প্রদর্শিত এই দৃষ্টান্তের পর বাংলা কাব্যে ‘নখশিখ’ প্রকরণে বিলুপ্তি ঘটে। শুধু বাংলাকাব্যেই নয় আধুনিক চৈতন্যের জাগৃতির কালে পৃথিবীর সকল সাহিত্যেই মধ্যযুগীয় এই আ-পাদশির রূপবর্ণনা পদ্ধতির বিস্মোপ ঘটেছে।

এ দেশীয় পুরাতন সাহিত্য পর্যালোচনা করে দেখা গেল নারীর প্রত্যেক অঙ্গের বিমুগ্ধ রূপপ্রেক্ষণ প্রত্যেক অঙ্গের জন্য অসংখ্য চরণাঞ্জলি, প্রত্যেক অঙ্গের জন্য এক বা একাধিক উপমান-নির্বাচন, উপমানের শ্রেণী সজ্জিতকরণ এবং পারস্পর্য নিখরিত, প্রথাসিদ্ধ উপমার মধ্যে আবর্তন, ব্যতিরেক অলংকারের অজস্রতার মধ্যে অনির্বচনীয়ত্ব তৈরির আকাঙ্ক্ষা—এ সকল মধ্যযুগীয় ভঙ্গির অবসান ঘটেছে। কিন্তু এ সকল ভঙ্গি, যা ‘নখশিখ’ প্রকরণের মধ্যে ছিল—তা এককালে চূড়ান্ত তাৎপর্য ধারণ করতো এবং সেইকালের কবিকুলের কাছে অপরিহার্য অবলম্বনের মত ছিল। সেই আমুগু রূপবর্ণনায় প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুপুঙ্খ বর্ণনা নয় বরং সংকেতময় দেহবর্ণনার সঙ্গে অন্তর্গত আবেগকে উদঘাটিত করা হয়। আধুনিক যুগের কবিরা নারীকে সামগ্রিকভাবে দেখেন। একটি কি দুটি চরণে হয়তো একজন রমণীর আপাদমস্তক আমরা লক্ষ্য করি—যেখানে মধ্যযুগের কবিদের ব্যয় করতে হতো অনেক সমুদ্র চরণ। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, ‘ঘরেতে এল না সে তো, মনে

গর নিত্য আসা যাওয়া/পরশে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর’^{২২}—তখন সেই অনামিকা মেয়েটির অনেকখানি দেহরূপ এবং আন্তররূপ এই দুই চরণে উদ্ঘাটিত হয়ে যায়। কিংবা ‘সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে/দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে’^{২৩}—এই রমণীর জন্য কোনো তুলনা উপমার প্রয়োজন হয় না—কোনো উপমান ছাড়াই সে তুলনাহীনা।

জীবনানন্দ দাশ নারীর চোখকে যখন ‘পাখির নীড়ের মত’^{২৪} দেখেন—তখন সেই চোখে আশ্রয়, আশ্বাস এবং নির্ভরতা চান। এভাবে নারীর চোখের প্রথাচ্যুত এক অভিনব উপমান নির্মিত হয় এবং সেই চোখে হৃদয়ের রহস্য ব্যঞ্জিত হয়।

আধুনিক যুগের কবিকুল নারীরূপনির্মিতকালে চেতনার দিগন্তে নিত্য-অগ্রসরমান, তবুও পূর্বকালের ‘নখশিখ’ প্রকরণ আমাদের কাছে মূল্যবান সম্পদের মত।

তথ্য-নির্দেশ :

১. বুদ্ধদেব বসু অনুদিত : কালিদাসের মেঘদূত, কলকাতা, আষাঢ়, ১৩৮২, পৃ: ১২০।
২. প্রাণ্ডস্ত, পৃ. ৩।
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মানসী (কবিতা) ‘চৈতালি’ (কাব্য)।
৪. শঙ্করীপ্রসাদ বসু : চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি, কলকাতা, পৃ: ৫১।
৫. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত : পদ্মাবতী (প্রথম খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ২৬।
৬. ‘কুমারসম্ভবম্’ কাব্যে কালিদাস দেবী পার্বতীর রূপবর্ণনকালে পদনখ থেকে আরম্ভ করে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হয়ে শিরের কেশকলাপ পর্যন্ত পৌঁছেছেন, কিন্তু ‘মেঘদূতম্’ কাব্যে মানববোধসম্পূর্ণতা যক্ষপ্রিয়ার রূপবর্ণনকালে কিংবা ‘রঘুবংশম্’ কাব্যে রাজকুমারী ইন্দুমতীর রূপবর্ণনকালে তিনি উক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করেননি। সৈয়দ আলী আহসান তাঁর সম্পাদিত ‘পদ্মাবতী’ কাব্যে ‘পদ্মাবতীর রূপবর্ণন খণ্ডের টীকা অংশে লিখেছেন, “প্রধান প্রধান সংস্কৃত কবিগণ দেবতার অঙ্গশোভা বর্ণনাকালে পদনখ-বর্ণন থেকে আরম্ভ করে সর্বশেষে কেশবর্ণন করতেন এবং মানুষের ক্ষেত্রে কেশবর্ণন থেকে আরম্ভ করে অবশেষে পদনখ-বর্ণন করতেন।... (প্রেমানুরাগী প্রথমাই প্রিয়তমার কেশ এবং তারপর নয়নের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, এবং উপাসক ভক্ত উপাস্য দেবীকে প্রশংসা করতে যেয়ে প্রথমই তাঁর চরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।” সূত্র: সৈয়দ আলী আহসান: পদ্মাবতী, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ: ৩৫২।
৭. কালিদাস রচিত ‘কুমারসম্ভবম্’ কাব্যের এই অনুবাদ অংশটি সৈয়দ আলী আহসানের সহায়তায় প্রস্তুত। প্রসূন বসু সম্পাদিত: সংস্কৃত সাহিত্য-সম্ভার (দ্বিতীয় খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃ: ৩২৩-৩২৪।
৮. শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ, কলিকাতা, ১৩৯২, পৃ: ২৭৫।
৯. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত : বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য, ঢাকা, ১৩৭৪, পৃ: ৭৫-৭৬,
১০. প্রাণ্ডস্ত, পৃ: ১০১-১০২।
১১. শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ, কলিকাতা, ১৩৯২, পৃ: ৩১৪
১২. সৈয়দ আলী আহসান অনুদিত : আবদুর রহমান : সদেশ-রাসক, ঢাকা, ১৩৯৯, পৃ: ১৬-১৭।
১৩. সৈয়দ আলী আহসান : কৃতবন-কৃত প্রেমকাব্য মৃগাবতী (মূল অবধী থেকে অনুবাদ) (প্রবন্ধ), মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত ‘সাহিত্য পত্রিকা’; সপ্তবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, শীত ১৩৯০।
১৪. সৈয়দ আলী আহসান : পদ্মাবতী, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ: ৩১৮-৩২৭

১৫. প্রাণ্ডক্ত, পৃ: ৩৩১।
১৬. প্রাণ্ডক্ত, পৃ: ৩৩৩।
১৭. প্রাণ্ডক্ত, পৃ: ৩২৭।
১৮. প্রাণ্ডক্ত, পৃ: ৩৩৯।
১৯. প্রাণ্ডক্ত, পৃ: ৩৪৭-৩৪৮।
২০. প্রাণ্ডক্ত, পৃ: ৩৩৭।
২১. শ্রীমদনমোহন গোস্বামী : ভারতচন্দ্র, সাহিত্য আকাদেমী, নিউ দিল্লী, ১৯৬১, পৃ: ৭২।
২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাঁশি (কবিতা); পুনশ্চ (কাব্য)
২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : (স্বরবিতান)
২৪. রণেশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত : জীবনানন্দ দাশের কাব্যসম্ভার, পরিবর্ধিত ৪র্থ সংস্করণ, ঢাকা, ১৩৮১, পৃ. ১৪৭।

A Literary Journal, Department of Bengali Language and Literature
University of Calcutta, Joint Editors : Prof. Manas Majumdar, Prof. Bimal Kumar Mukhopadhyay

